আমার জীবনী

সম্পাদনা
শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক



প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ লেনিন সরণী. কলিকাতা-৭০০ ০১৩

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
১লা জুন, ১৯৬০

প্রচ্ছদ : শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক : শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক
অকাল-প্রয়াত বন্ধুত্রয়
অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী
অধ্যাপক মুফজ্জল হায়দর চৌধুরী
স্মরণে

সম্পাদকের বক্তব্য

'আমার জীবনী'র সন্ধান প্রথম পাই সাহিত্যসাধকমালার অন্তর্ভুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'মীর মশাররফ হোসেন' পুস্তিকায়। কিন্তু বইটি পশ্চিম বা পূর্ববঙ্গে কোথাও পাইনি। পরে আমার বন্ধু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী জানান, ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে বইটি আছে এবং তিনি তাঁর 'মীর মানস' (১৯৬৫) গ্রন্থে বইটির বহু অংশ উদ্‌ধৃত করেন পরিশিষ্ট পর্যায়ে। আমি সম্পূর্ণ বইটির ফটোস্টাট কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে সংগ্রহ করি ও সম্পাদনান্তে পুনঃ প্রকাশের আয়োজন করি। বইটির সম্পাদনা সম্পর্কে আমার বক্তব্য, মূল পাঠ বা টেক্‌সট সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন চেহারার মধ্যে সংগতিরক্ষার জন্য একটি বিশেষ বানান-পদ্ধতি (uniform pattern) গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। কারক-বিভক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যেমন সম্বন্ধপদে বহুক্ষেত্রে র, এর, আর—চিহ্নের লোপ যথাযথ রক্ষিত আছে। অথবা মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ যেমন মুট (মুঠ) পট (ফট) বদলানো হয়নি। তার কারণ এই ধরনের প্রয়োগ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। মূল বইটিতে যতিচিহ্ন স্থাপনে লেখকের অমনোযোগের বহু সাক্ষ্য মেলে। সেজন্য পড়বার সময় পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে ভেবে যতিচিহ্ন যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স-এর বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সুরজিৎচন্দ্র দাস সাগ্রহে বইটি প্রকাশনের ভার গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের সহকারী অধ্যাপক (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণারত) ডক্টর ওয়াকিল আমেদ শব্দার্থ-সূচীটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমি সর্বান্তঃকরণে এঁদের মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

ভূমিকা

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) বাংলা সাহিত্যে 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। উনবিংশ শতকের শেষপাদ অবধি লক্ষ করলে দেখা যায় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় অনুৎসাহ। এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার প্রতি বাঙালী তথা ভারতবাসীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪)। মশাররফ হোসেনের রচিত 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকের সমালোচনা কালে তিনি লেখেন :

> বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানদের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান ঐক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।

এই পটভূমিকায় মশাররফ হোসেনের রচনার তিনি সমাদর করেছেন :

> অতএব মীর মসাঃরফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।

—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০

বাঙালী মুসলমানের বঙ্গসাহিত্যসাধনায় ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করতে গিয়ে একালের একজন সুধী ব্যক্তির অভিমত উৎকলন-যোগ্য বলে মনে করি :

> বরং বলা যায় তাঁর হাত ধরে আমাদের গৃহপ্রবেশ হলো। এতদিন বটতলায় ছিলাম এবার ঘরের মধ্যে বৈঠকখানায়। চিরকাল বটতলায় ছিলাম না। আরাকানের দরবারেও আমরা ছিলাম। কিন্তু মাঝখানে কিছুদিন বটতলায় কেটেছে। মশাররাফ হোসেন বুক ফুলিয়ে—তাঁর বুকটা

খুব চওড়া ছিল—ভিতরে গিয়ে বসলেন। তখন থেকে আর কোন বাধা রইল না। সঙ্কোচ কেটে গেল।

—জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী,
একুশের পর, শব্দের সীমানা।

মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা বলতে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'আমার জীবনী', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ও 'বিবি কুলসুম' এই চারখানি বইকেই ধরা উচিত।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক বইটিকে 'উপন্যাস' বলেছেন। 'মুখবন্ধে' তিনি জানিয়েছেন :

> …এই অসার, অপরিচিত, অস্থায়ী "আমি", আমার ভাবনা চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ হয় পারিব। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, আর মা—জানেন। কারণ শোনা কথাই পথিকের মনের কথা।
>
> —উদাসীন পথিক।

'আমার জীবনী'র সঙ্গে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র 'শেষ অংশের সম্বন্ধ না আছে একথা বলিতে পারি না।' গাজী মিয়াঁর বস্তানী-র প্রথম অংশ ১৮৯৯ সালে বার হয়। এই বইটিকেও "উপন্যাস" আখ্যায় লেখক চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী অংশ 'আমার জীবনী'র সঙ্গে প্রকাশিত হয়। লেখক "আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি কথা"-য় পাঠকদের জ্ঞাপন করেছেন :

> প্রতিখণ্ডে সম্পূর্ণ দুই কি তিন ফর্মা 'আমার জীবনী' থাকিবে। অপর ফর্মায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে। 'আমার জীবনী'র সহিত গাজী মিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া জীবনীর সঙ্গেই প্রকাশ হইবে।

কিন্তু 'আমার জীবনী'র সেই ঘোষিত অংশ তিনি লিখে যেতে পারেন নি। কেননা 'আমার জীবনী'তে ১৮৬৫ সাল অর্থাৎ মশাররফ হোসেনের সতের বৎসর বয়সে মজারপুরে প্রথম বিবাহ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে আর 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে তাঁর দেলদুয়ারে পরিণত বয়সের কর্মজীবনের বর্ণনা (১৮৮৪-৯২)। তবে সবই ছদ্মনামে। সেখানে লেখকের নিজের ছদ্মনাম 'ভেড়াকান্ত'।

'বিবি কুলসুম' বইটি ১৯১০ সালের মে মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়। 'আমার জীবনী'র একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড একসঙ্গে বার হয়েছিল। প্রথমে 'আমার

নিবেদন' অংশে লেখক পত্নী বিবি কুলসুমের পরলোক গমনের সংবাদ জানিয়ে বলেছেন :

বিবি কুলসুম নামে একখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।

এই বইটিতে লেখক নিজেদের দাম্পত্যজীবনের স্নিগ্ধচ্ছায়ারূপটি গভীর মমতার সঙ্গে যেমন এঁকেছেন, আবার কুলসুমের বিয়োগে তাঁর হৃদয়ের মর্মান্তিক হাহাকারও পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

'আমার জীবনী' বইটির প্রথম খণ্ড ১৩১৫ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে [১৯০৮] '৩৬ নং গোরাচাঁদ রোড, ইটালী' থেকে 'মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত' ও '১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন', "কালিকা যন্ত্রে" শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত হয়। বইটির গোড়ায় গ্রাহকদের জানিয়েছেন—

আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি কথা।

১। আমার জীবনী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতিখণ্ড ৮ পেজী ডিমাই চার ফর্মা মাসে মাসে অথবা মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে।

২। প্রতিখণ্ডে সম্পূর্ণ দুই কি তিন ফর্মা 'আমার জীবনী' থাকিবে। অপর ফর্মায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে। আমার জীবনীর সহিত গাজী মিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংশ্রব আছে বলিয়া জীবনীর সঙ্গেই প্রকাশ হইবে।

৩। আমার জীবনীর সংশ্রবী কোন জীবনীর কোন বিষয় যদি কেহ জ্ঞাত থাকেন, তাহা লিখিয়া 'আমার জীবনী'র সাহায্য করিলে লেখকের নিকট চিরবাধিত হইব।

৪। আমার জীবনীর ১২ খণ্ড আপাততঃ মূল্য নাই। সামান্য খরচা ১।০ আনা মাত্র—তিনখণ্ড প্রকাশ হইলেও যিনি অনুগ্রহ প্রকাশ না করিবেন অর্থাৎ ঐ ১।০ আনা না পাঠাইবেন, তাঁহার নিকট 'আমার জীবনী' আর প্রেরিত হইবে না। পাঠকগণ সমীপে বিনীত প্রার্থনা—২য় খণ্ড প্রকাশ হইলেই উপরোক্ত ১।০ আনা পাঠাইতে মনযোগী হইবেন।

৫। 'আমার জীবনী' সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটী, ভুল-ভ্রান্তি জনিত উপদেশ দান পক্ষে যাঁহার বিবেচনায় যাহা হয় লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহা শিরোধার্য পূর্বক গ্রহণ করিয়া জীবনীতে প্রকাশ করিব। সঙ্গত হইলে সংশোধনের চেষ্টা করিব এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থান হইতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।

৬। খরচা ৷১০ আনা আদায় জন্ত আমরা ভিঃ পিঃ করিব না। এবং তাহা করিতে কোন গ্রাহক আমাদিগকে অনুরোধ করিবেন না।

৭। কোন বিষয়ের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই পোষ্টকার্ড অথবা দুই পয়সা মূল্যের টিকিট না পাঠাইয়া কোন বিষয়ের উত্তর তলব করিবেন না।—ইহা সবিনয়ে প্রার্থনা।

৮। কোন মহানুভব মহোদয় 'আমার জীবনী' প্রকাশে এককালীন কিছু সাহায্য করিলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া জীবনীর শেষ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তি স্বীকার করিব। যদি নাম ধাম গোপন রাখিতে আজ্ঞা করেন, সে আজ্ঞাও প্রতিপালিত হইবে।

৯। চিঠি-পত্র টাকা সমুদায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় তাহার নামে পাঠাইতে হইবে।

১০। কোন গোপনীয় বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে পত্রের শিরোনামার উপরে 'গোপনীয়' শব্দ বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে।

বিনয়াবত—

মীর মশাররাফ হোসেন

৩৬নং গোরাচাঁদ রোড, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

'আমার জীবনী' গ্রন্থের পাঠকদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন :

মাননীয় পাঠকগণ সমীপে।

প্রিয় পাঠকগণ! "আমার জীবনী" প্রকাশ কথা হঠাৎ মনে হইয়া অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি তাহা নহে। এ সংকল্প বহুদিনের। এ আশা এক যুগেরও অধিককালের। কালচক্রের—চক্রে অবস্থার গতিকে, আজ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও আশাপথে দঁণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। দেখুন—প্রমাণ। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' পুস্তকের দ্বিতীয় তরঙ্গে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন! কি লিখা আছে।

বাঙ্গলা ১২৯৭ সালে 'আমার জীবনী'র বিষয় আলোচনা হইয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে তাহাও লিখক আভাসে বলিয়াছেন। আজ কোন দিন? ১লা আশ্বিন ১৩১৫ সাল। প্রায় ১৯ বৎসরের কথা। ১৯ বৎসর পূর্বের সংকল্প।

খোদাতায়'লার কৃপা না হইলে কিছুই হয় না। ১৯ বৎসর মধ্যে সুযোগ সুবিধা করিতে পারি নাই। এখন দয়াময় প্রভুর অভিপ্রায় হইয়াছে

—বোধ হয় তাহাতেই প্রকৃতি আজ আমার ঘাড় ধরিয়া "আমার জীবনী" প্রকাশে দণ্ডায়মান করিয়াছেন।

আমার জীবনে শত শত ত্রুটী, শত শত "জাহেলী" (মূর্খতা) এবং অবিবেচনার কার্য হইয়াছে। তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি মানব সন্তানও যদি সাবধানে সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক ও সহস্র-লাভ মনে করিব।

আর একটি কথা বলিয়াই আমার কথা শেষ করিতেছি। "আমার জীবনী" অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে। আর যে সকল কথা মোসলমান সমাজে সর্বসাধারণ মধ্যে প্রচলিত আছে তাহার অবিকল বাঙ্গলা আমি জানিনা। ভাবার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। লাভের মধ্যে শ্রুতি কঠোরতায় কেহ শুনিতেই ইচ্ছা করেন না। সেই সকল শব্দ যেমন প্রচলিত আছে সেই রূপই প্রকাশ করিব।

'আমার জীবনী'র তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে "পরীক্ষা" নামে একটি বিজ্ঞপ্তি পাই। তা থেকে জানা যায় "ঈশ্বর কৃপায় এ পর্যন্ত ১০০ শত গ্রাহক পত্র লিখিয়া আগ্রহ প্রকাশে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।" কিন্তু তবু আশঙ্কা রয়েছে "না জানি কতজনার সহিত জীবনীর বিচ্ছেদ ঘটিবে বলিতে পারি না—তাহাতেই বলিতেছি পরীক্ষা—এই বারেই 'আমার জীবনী'র ভাগ্য পরীক্ষা।" এ কথা লেখার কারণ "তিনখণ্ড প্রকাশ হইলেও যিনি অনুগ্রহ প্রকাশ না করিবেন অর্থাৎ ঐ ১।০ আনা না পাঠাইবেন তাঁহার নিকট 'আমার জীবনী' আর প্রেরিত হইবে না।" আবার চতুর্থ খণ্ডে দেখি ময়মনসিংহের কোন বিখ্যাত জমিদার ভদ্রমহিলা 'আমার জীবনী'র সাহায্যার্থে ২৫ টাকা পাঠিয়েছিলেন বলে লেখক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। পঞ্চম খণ্ডে 'বিশেষ বিজ্ঞাপন' অংশে ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন—"মোস্‌লেম ভ্রাতাগণের বিবেচনা বিচার সকলি দেখিলাম। ১৩৭ জন গ্রাহক মধ্যে মাত্র ৪৫ জন আমার জীবনীর ১২ খণ্ড জন্ত খরচা বাবদ নির্ধারিত এক টাকা চারিআনা পাঠাইয়াছেন।" পরে "আমার জীবনীর পাঠক কে?" অংশে লিখেছেন: "যিনি আমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন তিনিই জীবনীর প্রকৃত পাঠক।"—লেখক এক শ্রেণীর গ্রাহক যাঁরা কোনো অর্থ সাহায্য করেননি অথচ রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে বই নিয়েছেন তাদের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছেন—

"ইহাতে তাঁহারাও এক বাজী জিতিলেন, আমরাও মনের আনন্দে বগল

বাজাইয়া স্বর্গীয় হরিনাথ দাদার [কাঙাল হরিনাথ] গানটি গাহিয়া এ কথার ইতি করিলাম—

কার চক্ষে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালী করে রে মন তা বোঝ না
সে যে হয় জগতহর্তা, বিচারকর্তা অন্তর্যামী তা জান না।
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন সকলি তার আছে জানা—
তার চক্ষে ধূলা দিয়ে যাবে চলে কথনও রে তা হবে না—
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে দেখছে রে সব ঘটনা।

বাস্! আর কি চাই? ইহাতেই আমাদের আনন্দ। যে সকল গ্রাহক অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ভালবাসার চিহ্ন দর্শাইয়াছেন, উপরে ঈশ্বর আর নিম্নে তাঁহারা, তাঁহাদিগকে লইয়াই আমরা দশজনকে আমার জীবন-কাহিনী শুনাইব। সর্বতোভাবেই ঈশ্বর দয়াময়। তাঁহাতেই আমাদের নির্ভর। তিনিই আমার জীবনীর আশ্রয়! ভবিষ্যত কথায় আশ্বাস দিয়া বাজার গরম করা আমাদের স্বভাব নহে।...

এই ক্ষণে সেই অসীম শক্তিধর জয় জগদীশ নাম করিয়া আপাততঃ ১২ খণ্ড শেষ করিতে পারিলেই লজ্জার দায় হইতে রক্ষা পাই। ভবিষ্যৎ অন্য চিন্তা—অন্য বন্দোবস্ত। শুধু অমুক তারিখে জন্মিলাম, অমুক সনে অমুক কার্য করিলাম —অমুক তারিখে মরিলাম—ইহাতে জীবনী সম্পূর্ণ হয় না।

আর সকল জীবনীতেই বিশুদ্ধ চরিত্র কার্যদক্ষতা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়—সরল দেশহিতৈষী ইত্যাদি গুণেরই দীপক বেহাগ ললিত ভৈরবী রাগের গান—চৌতাল, ধামার, ধ্রুপদ, আড়াঠেকা বাজনার সহিত শুনিতে পাই। কিন্তু আমার মত হতভাগার জীবনীর ন্যায়—সত্ অসত্ পাপ-তাপ ভাল-মন্দ পরিপূর্ণ জড়িত জীবনী এ পর্যন্ত কাহার শুনি নাই—দেখি নাই।—হইতে পারেন তাঁহারা স্বর্গীয় দেবতা, হইতে পারেন তাঁহারা এ নরাধম মহাপাপী হইতে শতসহস্র গুণে পুণ্যময়—পুণ্যের আকর, পুণ্যেই জন্ম, পুণ্যেই পূর্ণ—পুণ্যেই লয়—পুণ্যেই জীবন শেষ। বড়ই সৌভাগ্যের কথা। শত সহস্র হিংস্রক পশু কণ্টক-বেষ্টিত সংসার অরণ্যে—মহা ভয়ঙ্কর শত্রুপূরিত দেহ লইয়া অক্ষত শরীরে যিনি স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

—কিন্তু প্রাচীন সাধু মহাজ্ঞানী কবি—কবীর একদিন পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, জাঁতা যন্ত্রে গোধুম পিষিতেছে। মহাতত্ত্ববিৎ সুকবি

কবীর—জাঁতা-যন্ত্রের নিকট অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া স্থিরচিত্তে স্থির নেত্রে জাঁতায় পেষণ, গোধূমের অবস্থা দেখিয়া কবীরের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল এবং মুখে উচ্চারিত হইল—

"চালতী চাক্কি দেখ কার দিয়া কবীরা রো
দো পাটনকে বিচমে সাবেত্ গিয়া না কো।"

মোসলমান সমাজে প্রবাদ আছে যে আকাশ চক্রাকারে ঘুরিয়া থাকে পৃথিবী অর্থাৎ 'জমিন' মৃত্তিকা স্থিরভাবে আছে।—'কবীর' জাঁতা যন্ত্রের সহিত পৃথিবী আর আকাশের তুলনা করিয়া ঐ কথাটা বলিয়াছেন—যথা—আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া কেহই অক্ষত শরীরে বাহির হইতে পারে নাই। কেহ অর্ধপেষিত দেহ একেবারে পেষিত হইয়া বাহির হইতেছেন। কবীরের বচনের সমর্থন করিয়া আমরাও বলিতেছি জগতে আসিয়া কেহই অক্ষতশরীরে বাহির হইতে পারেন নাই। কিছু না কিছু ক্ষত হইয়াছে, আর না হয় কিঞ্চিৎ দাগ লাগিয়াছে। আমার জীবনীও দাগ ধরা—যাঁহার জীবনী তিনি অক্ষত শরীরে বাহির হইতে পারিবেন না।—কারণ তিনি পুণ্যাত্মা নহেন—মহাপাপী!

পাপীর জীবন কাহিনী শুনিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইবে না। লোককে শুনাইতে বিশুদ্ধ চরিত্র, পুণ্যের আকর করিয়া জীবন-কাহিনী গঠিত করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। যাহা সত্য তাহাই আমাদের আশ্রয়। হউক তাহাতে কাহার ঘৃণা, হউক তাহাতে কাহার অরুচি, ক্ষতি নাই। তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না।—কেহ পাঠ না করিলেও আমরা দুঃখিত নহি। ঘটনা সকল যেরূপ ঘটিয়াছে, কালি কলমে কাগজে আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলে আর কিছু হউক না হউক—ভবিষ্যৎ বংশধরগণের বিশেষ কার্যে আসিবে। আমার জীবনী শুনিয়া কেহ সতর্কও হইতে পারেন। সে কথা প্রথম খণ্ডেই প্রকাশ করিয়াছি।

উদ্ধৃত অংশে লেখক সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন তিনি মহাপাপী, পুণ্যাত্মা নন, এবং 'যাহা সত্য তাহাই' তাঁর আশ্রয়। আত্মজীবনীর দিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

'আমার জীবনী'-র একাদশ ও দ্বাদশখণ্ড একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই যুগ্মখণ্ডের মূল্য চার আনা। ১ নং জাহির পুকুর স্ট্রীট থেকে মীর মহতাব হোসেন

কর্তৃক প্রকাশিত হয় ২রা মার্চ (১৯১০) তারিখে। প্রথমে 'আমার নিবেদন' অংশে লেখক জানান :

> "আমি এইক্ষণে জীয়ন্তে মৃতবৎ হইয়া আছি। দুঃখের কথা কি বলিব, বিগত ২৬ শে অগ্রহায়ণ আমার জীবনের জীবন প্রিয়তমা সহধর্মিণী বিবি কুলসুম পরলোকে গমন করিয়াছেন। আমি আছি এই মাত্র বিশ্বাস। কিন্তু কোন বিষয়ে আমার উৎসাহ যত্ন বাসনা সাধ কিছুই নাই। এই সকল কারণে জীবনী প্রকাশে আরও বিলম্ব হইল। আমার দুঃখে যদি কেহ দুঃখবোধ করেন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। বিবি কুলসুম নামে একখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।"

'আমার নিবেদন'-এর পর "বিদায়—"

> চির বিদায় নহে। কিছুদিনের জন্য বিদায়।...এই ১২ সংখ্যা জীবনীতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক জীবনের প্রথম হইতে যৌবনকাল পর্যন্ত (বিবাহ ঘটনা) প্রকাশ হইয়া রহিল। জীবনের চারি ভাগের এক ভাগ প্রকাশ হইল। অদ্য পর্যন্ত (১৩১৬ সালের ভাদ্র মাস) ৪৩ বৎসরের ঘটনা প্রকাশে বাকি রহিল। যদি জীবনে কুলায় দয়াময় এলাহির কৃপা হয় তবে ঐ অংশ অবশ্যই প্রকাশ করিব।

কিন্তু সে-সম্ভাবনা অপূর্ণই রয়ে গেল। কেন না ১৯১২ সালে মৃত্যু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল।

'আমার জীবনী' চিত্তাকর্ষক রচনা। মীর মশার্‌রাফ হোসেন কোনো ব্যক্তির আত্মচরিত কোন দৃষ্টিতে রচিত হওয়া উচিত তা জানতেন—'যাহা সত্য তাহাই আমাদের আশ্রয়। হউক তাহাতে কাহার ঘৃণা, হউক তাহাতে কাহার অরুচি, ক্ষতি নাই।' কিন্তু তিনি সর্বত্র তাঁর এই ঘোষণার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখিয়েছেন এখন কথা বলা কঠিন। 'নীলদর্পণে'র লেখক দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা তিনি 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়' প্রকাশ করেছেন 'আমার জীবনী'তে তার বিপরীত দেখতে পাই। হিন্দু সমাজ সম্পর্কে অনেক বক্রোক্তি তাঁর পূর্বরচনার বিপ্রতীপ। 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়' তাঁর মাতা দৌলতন্‌নেসার যে পতিভক্তির বিবরণ আছে 'আমার জীবনী'তে তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখতে পাই। তাঁর স্খলিতচরিত্র পিতার দোষ তাঁর মাতা মৃত্যুকালেও ক্ষমা করেননি এই তথ্যই প্রবল। অথবা নাজির সাহেবের বড়ো মেয়ে লতিফন বিবির সঙ্গে তাঁর প্রণয় ব্যাপার, ভালোবাসা, বিরক্ত বিবাহের অতি

নাটকীয় বিপর্যয় ও পরিবর্তে আজীজন্নেসার সঙ্গে বিবাহের বর্ণনা উপন্যাসকেও হার মানায়। এর কতটুকু যে প্রকৃত তথ্য তা জানবার জন্য কোনো সূত্র বিদ্যমান নেই। তবে বিবাহের আট বছর পরে তিনি 'আজীজন্নেহার' পত্রিকা হুগলী থেকে বার করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। যে পত্নীকে তিনি ভালোবাসেন নি তাঁর নামে পত্রিকা বার করতে গেলেন কেন, তার কোনো সদুত্তর মেলে না।

প্রথম প্রণয়ের যে মধুর বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তার সদৃশরূপ নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৯০৮) মেলে। মশার্‌রাফ হোসেন, তার ছায়া প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা তাও বিচার সাপেক্ষ। নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' রচনায় যে উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন—মশার্‌রাফ হোসেনের 'আমার জীবনী' গ্রন্থরচনার অভিলাষগত মিল অনুরূপভাবে চোখে পড়ে।

সাহিত্যিক মূল্য ছাড়া এই গ্রন্থের অপর উল্লেখযোগ্য মূল্য সামাজিক। এই প্রথম একজন আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী মুসলমান লিখিত আত্মজীবনীর সন্ধান পাওয়া গেল। এই আত্মজীবনীর প্রথমাংশ শ্রুত পারিবারিক কাহিনীর বর্ণনা বা নীলকর কেণীর অত্যাচারের বিবরণ। বাল্য-কৈশোর-শ্রুত সেই সব কাহিনীর মধ্যে সেকালের বাঙালী মুসলমান সমাজের বিশেষতঃ সম্পন্ন পরিবার সমূহের যে বিলাসের চিত্র ফুটে উঠেছে তাকে মোটেই প্রশংসনীয় বলা চলে না। মশার্‌রাফ হোসেন তাঁর বাল্যকালে দাসদাসী বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল বলে জানিয়েছেন :

> রঙ্গপুর অঞ্চলে সে সময় পিতা কন্যাকে, স্বামী স্ত্রীকে যথেষ্ট টাকা পাইলে দুঃখী লোক কন্যা ভগ্নী স্ত্রী বিক্রয় করিত। আমাদের বাটীতে ৩০।৩২ জন দাসী ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ নাচ করিত কেহ গান করিত।

কোরাণ শরীফের অর্থজ্ঞান মৌলবীদের বিশেষ ছিল না—

> আরবী কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। এখন পর্যন্ত মোল্লার দল যাহারা কোরাণ শরীফ পড়িয়া পয়সা উপার্জন করে তাহারা ত জানেই না। শুধু পড়িয়া যাওয়া তাহাদের শিক্ষা।

নিজের ব্যক্তি জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি চেপে রাখেননি এইটি তাঁর সততার প্রমাণ—

> দাসী বান্দী কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্করেখায় কলুষিত হয়।
> (বিদ্যাশিক্ষা পৃঃ ১২৭)

অথবা, 'ঘরের মধ্য হইয়া আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী [নবাব সাহেবের রক্ষিতা] মূর্তি। সেই এক প্রকার জোরে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুকে

> স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই অতি মোলায়েম সৌগন্ধিযুক্ত গণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটি কথা চুপি চুপি বলিলেন—এবং আমায় হাতে কয়েকটি পানের খিলি দিয়া বলিলেন, 'ফেলিয়োনা মায় খাইবে!' (বংশ পুরাণ পৃঃ ১৯৫)

এধরনের খোলামেলা ভাব বইটির মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু মন্ডারপুরে লতিফন প্রসঙ্গে প্রকৃত তথ্য অপেক্ষা রোমান্স-রস প্রক্ষেপের ঝোঁকই প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

মশাররাফ হোসেনের শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কিত ধারণা যে খুব উচ্চ ছিল, 'আমার জীবনী' পড়লে তা জানা যায়—

> বঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার আদি গুরুস্থান নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপে মহামাননীয় হিন্দু ধর্মসংস্কারক সর্বজীবে সমদয়া, দয়ার অবতার, সর্বজীবে সমস্নেহ, জাতিভেদে বৈরক্তি, প্রেমের উৎস, প্রেমের প্রস্রবণ, প্রেমবশে দুষ্কৃতিদলন ; প্রেমবশে দুশ্চরিত্র নির্দয় পাষাণ হৃদয় মানবগণের চরিত্র সংশোধক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মহোদয়ের জন্মস্থান লীলাস্থান। (বংশ পুরাণ পৃঃ ২০১)

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যে* বইটি যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নেই।

---

* আমার 'বাংলা আত্মচরিত সাহিত্য' (যন্ত্রস্থ) গ্রন্থে এবিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা আছে।

প্রার্থনা

হে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন,—অসীম করুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বর। সর্ব নিয়ন্তা জগৎপাতা, সর্বময় সৃষ্টিকর্তা, এলাহি! তোমার অনন্ত মহিমা স্মরণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত সহিত তোমারই সহায়ে "আমার জীবনী" জনসমাজে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রভু—সহায় হও।—সত্যতত্ত্ব প্রকাশে হৃদয়ে বল দেও। অসত্য ঘটনা, অসত্য ধারণা প্রকাশ হইতে লিখনী সঙ্কোচিত কর। সদাসর্বদা পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরকুৎসা, পরনিন্দা হইতে তফাৎ রাখিও।

দয়াময়! তোমার এই দাসানুদাস অধমের আজিকার দিন পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাসহ জীবন বৃত্তান্ত—আমার জীবনীতে প্রকাশের অবসর প্রদান করিয়া জীবনান্তের পূর্বে আমার জীবনী শেষ করিতে শক্তি দিও। আশা নাই—আর আশা নাই। মৌলুদ শরীফের বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে ৯০ পৃষ্ঠার প্রার্থনা মধ্যে আক্ষেপ করিয়াছি,—

কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হল দন্ত পাতি খসে পল,
চক্ষু জ্যোতি হইল মলিন।
সুন্দর সুকান্তি হায়, একে একে সরে যায়,
দেখিতে দেখিতে গত দিন॥
শরীর হয়েছে জরা— বেদনা যাতনা ভরা—
আজ এটা কাল ওটা হায়।
শিথিল গায়ের চর্ম— এমনি দেহের ধর্ম,
সরস্থানে শরাসন প্রায়॥

এইত অবস্থা—শরীরের আশা নাই। দয়াময়! জীবনে আর আশা নাই। তাহাতেই কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি, জীবন শেষের পূর্বে আমার জীবনী যেন শেষ হয়। দয়াময়! তুমি দয়ার অবতার! তোমার কৃপা ও দয়া ভিন্ন কোন কার্যই পূর্ণ হইবার নহে।—এলাহি! তুমি সর্বজ্ঞ সর্ব অন্তর্যামী। তোমার চক্ষের ধূলি দিয়া চতুরতার সহিত চতুরালি খেলিবার সাধ্য কাহারও নাই। হৃদয়ের অন্তর স্থানের কথা মুখে প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তোমার জ্ঞান গোচর হয়। এখন আর কোন আশা নাই।—মাত্র এই জীবনী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ আশাই অন্তরে সদাসর্বদা জাগিতেছে।

দয়াময়!—"এসলামের জয়"—প্রকাশ আশা পূর্ণ করিয়াছ। হজরত ইউসোফ যন্ত্রস্থ—শেষ আশাই—"আমার জীবনী"—করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি অধমের মনের আশা পূর্ণ করিও।—

উপক্রমণিকা ঃ আমি কে ?

চিনি না। চিনিতে পারিলাম না। কতদিন ভাবিলাম কত চিন্তা করিলাম, মাথার মগজ ক্ষয় করিলাম, কিছুই হইল না,—আভাস ইঙ্গিতেও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতদিন জনমানববিহীন বিজন বনে, কতদিন সুপ্রশস্ত প্রান্তরে, কত নিশীথ সময়ে নির্জন গৃহে, শয়ন শয্যায়, দার্জিলিং পাহাড়ের উচ্চ শিখরে নির্জন উপবনে, ঘোর নিশীথ সময়ে গৌরীনদী তটে, বসিয়া কত চিন্তাই করিয়াছি,—জানিতে পারিলাম না—আমি কে ? যুগ যুগান্তর কাটাইলাম,—কিছুই নির্ণয় হইল না। পরিচয় পাইলাম না। আমি কে ?

তবে একটা সত্য আবিষ্কার হইল, প্রমাণের সহিত উপলব্ধি হইল আমি আদম সন্তান মানবকুলের অন্তর্গত মনুষ্যত্ববিহীন নরাকার জীববিশেষ। মানুষের আকারে সকলই আছে, নাই কেবল মনুষ্যত্ব।

হস্ত-পদ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক যাহা মানুষের প্রকাশ্য দেহে দেখিতে পাই, তাহা আমার আছে। আর পেটের মধ্যে যাহা যাহা আছে শুনুন! প্রথম ক্ষুধা, পিপাসা, হিংসা দ্বেষ কুবাসনা, সুখভোগের ইচ্ছা—টাকার লোভ, লালসা, আশা, শঠতা, কৃত্রিমতা, কপটতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বহু সাজসরঞ্জাম পেটের মধ্যে আছে।

মাথা একটি।—মাথায় কিছু নাই বলিয়াই বোধ হয়। মাথায় কিছু থাকিলে এভাব হইবে কেন?—যাহা সাধনা করিবার সাধ্য নাই,—তাহাতে সাধ হয় কেন? যাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা ধরিতে যাই কেন? যে আশা কখনই সফল হইবার নহে,—সে আশা হৃদয়ে পোষণ করি কেন?

তাহাতেই স্থির করিয়াছি মাথাটায় কিছু নাই। চক্ষু আছে,—থাকিলে কি হইবে? গৃহ দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিলে মনের সহিত লড়াই করিতে হয়। দুর কর বাহিরে যাই, মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে খোলা মাঠে অথবা খোলা রাস্তায় যাই। কৃত্রিম সাজে সাজিয়া যাহা নয় তাহা সাজিয়া, যে দরের লোক আমি নই তাহা সাজিয়া—পিতা প্রপিতামহ যে দরের সাজে বিশেষ বিশেষ স্থানে গমনাগমন করিতেন, হতভাগা আমি—এখন সেইরূপ সাজে সাজিয়া সচরাচর রাস্তাঘাটে বাহির হই। আমার সাজ-পোশাক দেখিলে অচেনা লোকের নজরে পড়িলে তাহারা নিশ্চয় ভাবিবে যে, আমি একজন দশ হাজারি লোক। অর্থাৎ আমার আয় বাৎসরিক দশ হাজার টাকা।

তাহা না হইলে সোনার ঘড়ি চেন, রেশমী কাপড়ের গোয়ার হাতের ছাঁটা "চাপকান"—আমার অঙ্গে শোভা করিবে কেন? দেশকাল ভেদে মন-মজান ছাঁট কাটে, সে আর এখন চাপকান নাই,—পাপকান হইয়াছে। অর্থাৎ পাপকান সমান হইয়াছে, মাত্র মাথাটুকু জাগে। সে মাথাটুকু ঢাকিয়াছি কিসে? শত ধন্যবাদ, হাজার হাজার ধন্যবাদ, না সারার—হ্যাটে সে মাথাটুকু ঢাকি নাই। অসভ্য জাতির ন্যায় উলঙ্গ রাখি নাই, ঢাকিয়াছি। কিসে ঢাকিয়াছি? তুরস্ক দেশীয় ফেজ নগরের অথবা ইরান দেশীয় সিয়া সম্প্রদায়ের ইরানী টুপিতে। ভারতীয় মোসলমানের কি কিছুই নাই! মাথায় দিবার মাথার শোভা বর্ধন করিবার কি কিছুই নাই?

যাহা হউক পথে বাহির হইলে, চক্ষে দেখিতে চায় কি? লজ্জার কথা কি বলিব? সত্য কথা বলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই দুটি চক্ষুই দেখিতে চায় কামিনী আর কাঞ্চন। সেখানে টাকার ঝন্‌ঝনি আর শাঁখা বাতানীর কন্‌কনি, সেই দিকেই দুটি চক্ষু ছুটিয়া যাইতে চায়। ঘৃণার কথা! লজ্জার কথা, —পাপের কথা—আর কি বলিব? ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতরা,—রোগে শোকে জরা-জীর্ণ-শীর্ণা স্থবিরার দিকে দৃষ্টিযন্ত্র দৃষ্টি করিতে চাহেনা,—বড়ই নারাজ। এইত চক্ষের দশা।

হাত পা আছে—অকর্মার এক শেষ। মস্‌জিদে যাইতে কষ্ট বোধ করে—অতি নিকটস্থ মস্‌জিদে নামাজ (উপাসনা) সময়ে যাইতে কষ্ট বোধ করে—কিন্তু যে স্থানে পুণ্যের নাম গন্ধ নাই,—পবিত্রতার কণামাত্র নাই, এমন স্থানে যাইতে পদ মহাশয় পাথর ঠেলিয়া ইট মাড়াইয়া, ঝাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া—যাইতে প্রস্তুত। হস্তের কথা আর কি বলিব?—সৎকার্যে বড়ই নারাজ—অপকার্যে ইচ্ছা না করিলেও তিনি প্রশস্ত।

কর্ণ মহোদয় শ্রবণ ইন্দ্রিয়, সকল কথাই তাঁহার শুনিবার শক্তি আছে। কিন্তু সৎকথা সৎ উপদেশ শুনিতে চাহেন না। ঈশ্বরের করুণার কথা শুনিতে চাহেন না। সৎকথার প্রসঙ্গেই কান পাতিতে চাহেন না—চাহেন কি? ওহো! আমার কর্ণ শুনিতে চায় কি? পরনিন্দা—পরকুৎসা, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতির কষ্টের কথা, তাহাদের অনাটন অনাসন কথা,—আর দুকান পাতিয়া শুনিতে চায়—আমার প্রশংসার কথা।

মনের কথা—আর কি বলিব? সকল কথা খুলিয়া বলিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারি। মনের কথা মনেই থাকিল।

এই ত আমার দশা,—সেই আমি। আমার আবার "জীবনী"।—তবে লোকাচারে যাহা দেখিতেছি, যাহা বুঝিতেছি,—সেই পরিচয় দিয়াই জগৎ সমাজে দণ্ডায়মান হইতেছি।—জীবনের আদি অন্ত ঘটনা শুনাইব। কম নহে,—বাল্যজীবন হইতে গত ৬৫ বৎসরের ঘটনা শুনাইব। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সময়ের ঘটনাও, সময় সময় প্রকাশ করিব। হয়ত যেদিন আমার জীবনের শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন হইবে, জীবনীর ইতিও সেইদিন হইবে।

প্রিয় পাঠকগণ!—আমি কপটভাব শিক্ষা করি নাই। যে কথা খোদাতা'লার নিকট গোপন নাই, তাহা মানুষের নিকট গোপন করিব কেন? খোদাতা'লা, অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ শাস্তিদাতা রক্ষাকর্তা—মার্জনাকারী। মানুষ তাহা নহে—তবে মানুষের ভয় কিসে?

সত্যাশ্রয়ে সত্যই আমার জীবনীর মূল উদ্দেশ্য। সত্য প্রকাশেই আমার স্থির সংকল্প।

যদি লোকশিক্ষা দিতে কমর বাঁধিতে হয়,—যদি স্বজাতি মানবের উপকার সাধন জন্য সত্যপথে দণ্ডায়মান হইতে হয়। যদি মোস্‌লেম সমাজের উপকারে হস্ত প্রসারণ করিতে হয়,—মনে মুখে সমাজের উপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়—তবে সত্যই আশ্রয়। সত্যই প্রকাশ।—সত্যই সহায়।

নিন্দার ভয় করি না,—পায় ধরিয়া কোনরূপ সাহায্যের আশা রাখিনা। তোমাদের গীত গাইয়া প্রশংসার তালে নাচিয়া ও কাহারও মনোরঞ্জন করিতে ইচ্ছা করি না। আমার একমাত্র বল-ভরসা সত্য—সেই সত্যের সার অংশেই ঈশ্বর—পরম কারুণিক খোদাতা'লা, সেই জগৎপালক সৃষ্টিকর্তা এলাহিই আমার আশ্রয় ও অবলম্বন। প্রিয় পাঠক! মীমাংসা হইল না। মীমাংসা করিতে পারিলাম না আমি কে? তবে লোকাচারে যাহা বলে,—পুরুষানুক্রমে লৌকিক আচারে ব্যবহারে কথায়, লিখিত পুস্তকে কুরসী নামায় গভর্নমেণ্টের আপিসে, আদালতে, ফরিদপুর সবজজ আদালতে ১৯০৬ সালের ৩৯ নং মকদ্দমায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্য দেহের মীমাংসা করিতেছি আমি কে?*

জগৎবিখ্যাত বোগদাদ নগর হইতে মহা মাননীয় তাপসপ্রবর সৈয়াদ সাদুল্লা

* ঐ মকদ্দমার দাবী এক লক্ষ পনর হাজার। বাদী সৈয়াদ মীর মহতেশাম হোসেন ব্যারিষ্টার-এট-ল। বিবাদী আসমতননেসা এবং তাঁহার স্বামী মৌলভী সৈয়দ শামসল হোদা এম্. এ. বি. এল উকীল মহামান্য হাইকোর্ট, মোহাম্মদ এসমাইল খান চৌধুরী জমিদার বরিশাল।—প্রভৃতি আসামী।

জগৎ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশ,—বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অধুনাতন ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত—সেকাড়া গ্রামে উপস্থিত। এত নগর—এত দেশ থাকিতে অমন গণ্ডগ্রামে, উপস্থিত হইলেন কেন? প্রথম ঈশ্বরের মহিমা, তাঁহারই আদেশ, তাঁহারই ইচ্ছা! কার্য সফলতার পথ আবিষ্কার। সংযোগ—উপায়-অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় কথা তাপসপ্রবরের তপস্যার উপযুক্ত স্থান নির্জনতার প্রয়োজন, যে সময়ের কথা, সে সময় পূর্ববঙ্গে জনমানবের বসবাস অতি কম ছিল। অতি কম হইলেও দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের কথা। সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লা একা একা ভ্রমণে বহির্গত হন নাই। তাঁহার সঙ্গে বিস্তর লোকজন ছিল। রজক নরসুন্দর পর্যন্ত ছিল। শিষ্য সেবকের ত কথাই নাই।—কিন্তু কাহারও সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল না।

সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লার পিতাও ফকীর দরবেশ বেশে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সাদুল্লা সাহেবের পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত আসিবার ইহাও এক প্রধান কারণ বলিয়া উপলব্ধি হয়—পিতার অন্বেষণ। তাহার পর তাঁহার গুরুপুত্র সাহ্সাহ্ পাহলওয়ান যিনি বহুপূর্বে মহানগরী বোগদাদ শরীফ পরিত্যাগ করিয়া ফরিদপুর অঞ্চলে আসিয়া ঐ সেকাড়া গ্রাম চন্দনানদীর তীরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছিলেন—তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া পূজনীয় পিতৃদেবের সংবাদ জ্ঞাপন হওয়াও স্বভাবসিদ্ধ ভাব। যাহাই হউক সাহ্সাহ্ পাহলওয়ানের আশ্রমে অতি যত্নের সহিত সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পূর্বকালে কুটুম্ব স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগের আদর অভ্যর্থনার ভাব—বর্তমান সময়ের মত ছিল না।—অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। এখন যেমন নিছক ফাঁক—মুখে মাখামাখি মুখে আঁটাআঁটি, মুখেই আত্মীয়তা, মুখেই বন্ধুতা। দেড়শত বৎসর কি দশ বৎসর পূর্বে এরূপ আত্মীয়তা ভালবাসা ছিল না।

সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লা অতি যত্নে আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহে সাহ্ পাহলওয়ান সাহেবের পবিত্র আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। বৎসর কাল গত হইল, সাহ্ পাহলওয়ানের ভালবাসার হ্রাস হইল না,—বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ কি? স্বার্থশূন্য জীব কোথায়?—ক্রমে প্রকাশ পাইল,—ক্রমে কথা ফুটিয়া উঠিল! সাহ্ পাহলওয়ান বলিলেন—বাবা সাদুল্লা! তুমি আমার দেশের স্বর্ণ-মণ্ডিত একটি টিয়ে পাখি বিশেষ। তুমি যখন দেশ পরিত্যাগ করিয়াছ - তোমাকে আবদ্ধ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। তোমাকে আটকাইতে, আমার দেশের অন্য অন্য তাপসগণ যাঁহারা এই বাঙ্গলা দেশে স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে আছেন, অনেকেই

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেহই সমর্থ হন্ নাই। অনেকেই সে সকল কথা আমাকে জানাইয়াছেন,—এইক্ষণে আমি অনুরোধ করিতেছি, আর দেশে যাইয়া কি লাভ হইবে। আমার একটা মাত্র কন্যারত্ন আছে তাহাকেই গ্রহণ কর। ধর্মানুসারে তাহাকে গ্রহণ করিয়া আমার এই পর্ণ কুটীরে বাস কর।

ঈশ্বরের অভিপ্রায় যেন তাহাই ছিল,—সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লা, তাপসশ্রেষ্ঠ সাহ্ পাহলওয়ানের কন্যারত্নকে ধর্মশাস্ত্র মতে গ্রহণ করিয়া গৃহধর্মে মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমে সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লার চারি পুত্র জন্মিল। পুত্রগণ পিতার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিলেন। সময়ে সাহ্ পাহলওয়ানের মৃত্যু হইল। কিছুদিন পরে সৈয়াদ সাহ্ সাদুল্লারও অন্তিমকাল উপস্থিত। অন্তিমকালে পুত্রগণকে বলিলেন পুত্রগণ! তোমরা বিদ্যাবুদ্ধিতে সকলেই সুপণ্ডিত—কোনোরূপ উপদেশ. অতিরিক্ত ভাবে আমার নিকট নাই—যাহা আমি তোমাদিগকে দিতে পারি। তোমরা সকলেই বিদ্বান বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান। তবে একটি মাত্র আমার উপদেশ এই যে,—আমার জীবনান্ত হইলে আমার "কবর" কখনো উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ করিয়া দিও না। আমার কবর পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ করিয়া দিও। সাবধান! আমার "গোর" উত্তর দক্ষিণ করিয়া দিও না! পশ্চিম শিয়রি করিয়া পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘে কবর দিও। একথাটা কখনো অবহেলা করিও না। আমি পিতা সর্বোপরি আমার উপদেশ তোমাদের মাননীয়।

সময়ে হজরত সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লা জগৎ পরিত্যাগ করিলেন। পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে, কবরের ব্যবস্থা লইয়া বাদানুবাদ চলিল। অবশেষে তাঁহারা সকলেই ধর্মশাস্ত্রের বিধান প্রতি নির্ভর করিয়া এই মত প্রকাশ করিলেন যে, পিতা যদিও আদেশ করিয়াছেন পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘে "কবর" করিও কিন্তু শাস্ত্রের বিধান,—চিরপ্রথা, মোস্‌লেম সমাজের চির নিয়ম ভঙ্গ—করি কি প্রকারে?—

চার ভ্রাতা ধর্মসম্মত গ্রন্থসকল যাহা যাঁহার আয়ত্ত ছিল—সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন কোন গ্রন্থেই পিতৃ উপদেশের পোষকতার—কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন না। কি করেন বাধ্য হইয়া চিররীত্যনুসারে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘে—কবর খনন করিতে আদেশ করিলেন এবং পিতৃদেবের মৃতদেহ সেই কবরে প্রোথিত করিলেন।

নিশীথ সময় নিদ্রাবস্থায় প্রত্যেক ভ্রাতাই স্বপ্ন দেখিতেছেন। পূজনীয় পিতৃদেবকে স্বপ্নে দেখিতেছেন এবং তাপসপ্রবর বলিতেছেন—পুত্রগণ! তোমরা

আমার কথা না মানিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার "কবর" উত্তর দক্ষিণ রোখে দিয়াছ। খোদাতালার অনুগ্রহে তপস্যার ফলে, আমার কবর আমি উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ হইতে, পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ করিয়া লইলাম। কারণ কবরের মধ্যে উপাসনার সুবিধার জন্য এই কার্য করিলাম। তোমরা ইহার প্রত্যক্ষ ফল রাত্র প্রভাতেই দেখিতে পাইবে। সন্তানগণ! ধর্ম শাস্ত্রের সামান্য বিধান লঙ্ঘনে পিতৃ আদেশ অবমাননা করিলে? তোমরা মহাবিদ্বান হইয়া পিতার আদেশ মত কার্য করিলে না বড়ই দুঃখের বিষয়। আর কি বলিব! এই কবর আমার মনমত সোজা করিতে, উত্তর দক্ষিণ হইতে, পূর্ব পশ্চিম ফিরাইতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছে, দুঃখও হইয়াছে। তাহাতেই বলিতেছি—তোমাদের বংশ মধ্যে কেহ কোন কালে ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে না। আর একটি কথা! পুত্রগণ! এই কবর ফিরাইয়া, আনিতে যেমন তপস্যার ক্ষয় করিয়াছি, শারীরিক কষ্টও ভোগ করিয়াছি। আমার কটিদেশে অত্যন্ত চোট লাগিয়া বেদনাপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমার বংশানুবংশ রক্তের সংশ্রবীগণ বার বৎসর বয়সে উপনীত হইলেই কমরে বেদনা বোধ করিবে। কোন ঔষধে সে বেদনার উপশম হইবে না। কোন কারণে তাহাও যদি না হয় —তবে মৃত্যুর পূর্বে কমরে বেদনার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

এই পর্যন্তই কথা শেষ। প্রিয় পাঠকগণ! পূর্বদেশগামী রেলওয়ে লাইন পাংশা স্টেশন হইয়া যে গোয়ালন্দাভিমুখে গিয়াছে। পাংশা স্টেশন ছাড়িলেই চন্দনা ব্রীজ উপর হইয়া গাড়ী গোয়ালন্দ অভিমুখে চলিয়া যায়। সেই চন্দনা ব্রীজ হইতে দক্ষিণ দিকে স্রোত প্রবাহের অনুকূলে প্রায় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিলেই সোনাপুর মাজবাড়ী,—তাহার পর দক্ষিণবাড়ীর হাট—তাহার পর পদমদীর কুঠিবাড়ী—তাহার পর বাঁকেই চন্দনার বাম পার্শ্বে পূর্বপারে সেকাড়া গ্রাম। সেই গ্রামের মধ্যে নদীতীরে আমার পূর্বপুরুষ সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লা সাহেবের সুবিখ্যাত সমাধি (কবর) ইটের গাঁথনী। বহুকালের গাঁথনী। আজ পর্যন্ত তপস্যার অলৌকিক ফল জগৎবাসীকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত দেখাইতেছে। যদি কাহার দেখিতে ইচ্ছা হয় পাংশা স্টেশনে নামিয়া বর্ষাকালে নৌকায় যাইতে তিন ঘণ্টার বেশী লাগে না। সেকাড়া গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগাইলেই সে মহা পবিত্র সমাধি দেখিতে পাইবেন। হাঁটিয়া গেলে, পাংশার স্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে যে রাস্তা সোনাপুর মাজবাড়ী পদমদী গ্রামের দিকে গিয়াছে,—এগার মাইল পথ অতিবাহিত করিলেই পদমদী গ্রাম। ঐ গ্রামের পূর্বদিক চন্দনা নদী, চন্দনা পার হইলেই সেকাড়া গ্রাম।

পাঠক! সেই মহাতাপস সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লার পৌত্র সাহ্ সৈয়াদ মীর কুতবুল্লা।

কার্যের পারদর্শিতা অনুসারে রাজদত্তা উপাধি মীর এবং বংশমর্যাদা ও বংশ পরিচয়ের উপাধি সৈয়াদ। মীর হইলেই সৈয়াদ হইতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি কার্যের পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ রাজদত্তা উপাধি মীর। আর বংশ মর্যাদা পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণই সৈয়াদ। সাহ্ সৈয়াদ সাদুল্লা মীর উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার বংশধরগণ মীর উপাধিকে পরিচিতি। সৈয়াদ তাঁহাদের বংশের উপাধি। মীর কুতবুল্লার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ সৈয়াদ মীর ওমার দারাজ, কনিষ্ঠ সৈয়াদ মীরআলী আকবর—

"ওমর দারাজের পুত্র—
|
"মীর এবরাহিম হোসেন—তৎপুত্র
|
"মীর মোয়াজজাম হোসেন—তৎপুত্র
|
"মীর মশাররাফ হোসেন
ও
মীর মহতেশাম হোসেন ব্যারিস্টার-এট-ল

"আলী আকবরের পুত্র—
|
মীর আলী আহমদ—তৎপুত্র—
|
মীর আলী আশরাফ—তৎপুত্র
|
নওয়াব মীর মোহাম্মদ আলী ও
সৈয়দ আবদাচ্ছামাদ।

নবাব মীর মোহাম্মদ আলী, জীবনে বিবাহ করেন নাই। মীর আবদাচ্ছামাদ বরিশাল জিলার অন্তর্গত বামনী গ্রামে, চৌধুরী হোসেনদ্দীন সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে চার কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠা কন্যা আশরাফননেসা। সাএস্তাবাদের জমিদার বর্তমান নওয়াব সৈয়াদ মোয়াজ্জম হোসেনের পুত্র সৈয়াদ মোহাম্মদ হোসেন সহিত বিবাহ হয়। মধ্যমা কন্যা, মৌলবী সৈয়াদ শামসল হোদা এম. এ. বি. এল. মহামান্য হাইকোর্টের উকিল বিবাহ করেন। বিবাহের পরেই কন্যার মৃত্যু হয়। তাহার পর তদকনিষ্ঠা বিবি আসমতন্নেসরা সহিত মৌলবী শামসল হোদা সাহেবের বিবাহ হয়। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা আবেদন্নেসার বরিশাল চরামদ্দীর জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ এসমাইল সাহেবের সহিত বিবাহ হয়। কালের কুটিল চক্রে চারটি কন্যার একটিও ইহ জগতে নাই। ইহাদের বিবাহ অতি আশ্চর্য। যদি কোন মহানুভব মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হই, আর

আমার জীবনে কুলায় তবে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজে উপহার দিব। নতুবা এই পর্যায়ই শেষ।

মীর ওমার দারাজের পুত্র মীর এবরাহিম হোসেন। মীর এবরাহিম হোসেন সম্বন্ধে একটি বিশেষ আশ্চর্য ঘটনা ও আবশ্যকীয় কথা আছে বলিয়াই তাঁহার কথাটা বিশেষরূপে অগ্রে প্রকাশ করিতে হইল। সময়ে এই ঘটনার কার্যফল সহিত অনেক ঘটনার সংস্রব আছে, তাহাতেই বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। আরও কথা —আমার জীবনীর গৌরব ও মানমর্যাদার মূল কারণই মীর এবরাহিম হোসেনের আশ্চর্য ঘটনা।

মীর ওমর দারাজের পুত্র মীর এবরাহিম হোসেন। এবরাহিম হোসেন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল। যৌবনকালে পদার্পণ করিলেই কেবল শক্তির উপাসনাতেই রত হইলেন। লাঠিখেলা তরবারি খেলা—কুস্তিখেলা বনে বনে শিকার করা এই সকল কার্যেই তাঁহার নিত্য নিয়মিত কার্য ছিল। সঙ্গীর অভাব ছিল না। একদল বলিষ্ঠ গুণ্ডা তাঁহার সেবায় সদাসর্বদা নিযুক্ত থাকিত। জঙ্গলে জঙ্গলে শূকর শিকার করা তাঁহার এক প্রকার নেশা ছিল। প্রতিদিন পদব্রজে বল্লম বর্শা লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে বরাহ শিকার করিয়া বেড়াইতেন। যেরূপ বরাহই কেন হউক না, তাঁহার সম্মুখে পড়িলে আর সে রক্ষা পাইত না। যত দূরেই যাউক,—যে জঙ্গলেই প্রবেশ করুক,—তাহাকে বধ করিয়া তবে তিনি বাটীতে ফিরিতেন। বলবীর্য সাহস বিক্রমে প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু কালিকলম কাগজের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। সে সময়ের বিদ্যা ফারসি,—অথবা আরবি। তিনি কোন বিদ্যারই ধার ধারিতেন না।

একদিন দলবল সহ শিকার করিতে বহির্গত হইয়াছেন। বসতি গ্রাম পদমদী ছাড়িয়া বহুদূরে গিয়াছেন। কিন্তু কোন জঙ্গলেই বরাহ সহিত দেখা হইল না। সূর্যদেব মাথার উপরে। রৌদ্রতেজ অতি প্রখর। সঙ্গীরা বলিল হুজুর! চলুন বাড়ী ফিরিয়া যাই। আজ আর শিকার পাওয়া যাইবে না।

মীর এবরাহিম হোসেন তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ঐ সম্মুখের জঙ্গলটা একবার দেখিয়া যাই। জঙ্গলে যাইয়া সকলেই শিকার খুঁজিতেছেন,—দৈবাৎ—এক প্রবীণ শূকর তাঁহার সম্মুখে পড়িল। শিকার সম্মুখে পড়িতেই আগে তাঁহার অভ্যাসমত দুইটি বল্লম দুই বগলে চাপিয়া আপন কায়দা মত শূকরের পার হইতে পাতিয়া বসিলেন। তিনি হস্তস্থিত বল্লম দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়া

শূকর মারিতেন না। শূকরের গোঁ বুঝিয়া তাহার সম্মুখে বর্শা বগলে দাবিয়া বসিয়া পড়িতেন। শূকরকে গালাগালি দিয়া—আও! বলিয়া ডাকিতেই শূকর গোঁভরে তাহার স্বধার দন্তচাকি বাহির করিয়া মীর এবরাহিমের প্রতি ছুটিয়া আসিল। প্রথম দক্ষিণ হস্তের বল্লম দ্বারা শূকরের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেই, শূকর দন্ত দ্বারা বল্লমের ছড় জোরে কামড়াইয়া ধরিয়া চক্ষের পলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শিকারী তৎক্ষণাৎ বাম হস্তের বল্লম দ্বারা পুনরায় শূকরের বক্ষভেদ করিতেই সে বল্লম দণ্ড (ছড়) খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পেটে* দন্ত বসাইতে না বসাইতে পৃষ্ঠরক্ষক সঙ্গীদল একযোগে ১০।১২টি বল্লম দ্বারা শূকর বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল। মীর এবরাহিম এতদিন শিকার করিতেছেন, কোন দিন এরূপ বিপদে পতিত হন্ নাই।

সকলেই বাড়ী আসিলেন—ক্রমে এই কথা মীর ওমর দারাজের কর্ণে উঠিল। তিনি পুত্রের উপর মহাবিরক্ত হইয়া, বাটীর মধ্যে যাইয়া সমুদায় অবস্থা স্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। স্ত্রীকে বলিলেন—আমার হুকুম.—এবরাহিম বাটী আসিলে তাহাকে আজ ছাই খাইতে দিও। আমি বার বার বলিতেছি কখনো তাহার পাতে ভাত দিও না। এক রেকাবি ছাই দিও। এত বড় হইল লেখাপড়ার নাম করিল না। কিছুই শিখিল না। গোঁয়ার গুণ্ডার দলে মিশিয়া জীবন মাটি করিল। বাপ দাদার নাম হাসাইল আমার বংশে কালি দিল, আমি উহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। বনে জঙ্গলে শিকার করা ছাড়িয়া দিয়া যদি লেখাপড়া করে তবে আদর পাইবে। তাহা না করিলে, আর যেন আমার সম্মুখে না আসে। অমন কুলাঙ্গার কুপুত্রের মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না।

মীর এবরাহিম হোসেন কেবল দুবেলা আহারের সময় বাটী আসিতেন। পিতার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হইত না। পেটের দায়ে আহারের অনুরোধে দিনে রাত্রে দুইবার জননীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত।

রাত্রে আহারের সময় বাটী আসিয়া নির্দিষ্ট আহারের ঘরে উপস্থিত হইতেই জননী পুত্রের আহার জন্য আজ ভারি বিপদে পড়িলেন। স্বামীর আদেশ প্রতি-পালন না করিলেও মহাপাপ মনে করিলেন,—এ দিকে সন্তানের মায়া। ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া কি করেন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর বুদ্ধির সহায়তায় উভয় কুল বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেন। সন্তানের আহার যোগাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে পুত্রও—মা! ওমা! বলিয়া ডাকিয়া আহার চাহিতে লাগিল।

এবরাহিম হোসেন দেখিতেছেন, আজ মার মুখে হাসি নাই ম্লান মুখ। চক্ষের কোণে জলের রেখা মুখে কথাটি নাই। সন্তানের সম্মুখে ভাতের রেকাবী (থালা) রাখিয়া দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। পুত্রের মনে নানা কথা উপস্থিত, —আজ মায়ের একি ভাব। হাত ধুইয়া ভাতের রেকাবী সম্মুখে টানিয়া লইয়া মুখে ভাত তুলিয়া দিবেন, রেকাবীর কিনারায় নজর পড়িতেই দেখেন যে একমুঠ ছাই ভাতের কিনারায় পড়িয়া আছে। মাতাকে অতি করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! আমার ভাতের কিনারায় একমুঠ ছাই কেন মা? মার মুখে কথা নাই—নীরব। চক্ষে জল ঝরিতেছে। পুত্র মায়ের চোখে জল দেখিয়া আর ভাত মুখে দিলেন না। মিনতি করিয়া বলিলেন—মা! আজ একি দেখিতেছি! আপনার চোখে জল মুখে কথাটি নাই। পূর্বের মত স্নেহ ভালবাসার ভাব কিছুই আজ দেখিতেছি·না, অথচ ভাতের কিনারায় একমুঠ ছাই এ সকল কি ব্যাপার? ওমা! একি ঘটনা? কারণ কি! মা! বলুন। আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে।

মাতা উত্তর করিলেন,—না, বাবা!—সে সকল কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই। কোন কথা হয় নাই। তুমি ভাত খাও। পুত্র ভাতের থালা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন মা! এ সকল ঘটনার বিষয় আমাকে খুলিয়া না বলিলে আমি আহার করিব না। আমি চলিলাম।

মায়ের প্রাণে বড়ই লাগিল। সম্মুখের ভাত ফেলিয়া উঠিয়া যায় দেখে মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। শেষে নাচার হইয়া বিশেষ দায়ে ঠেকিয়া সমুদায় কথা প্রকাশ করিলেন। তোমার পিতা ভাতের পরিবর্তে ছাই দিতে আদেশ করিয়াছিলেন বাবা! তাহা আমি পারিলাম না। আমার প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। আবার স্বামীর কথা না রাখিলেও পরকালে স্থান পাইব না। সেই জন্য ভয়ে ভঁয়ে এই কার্য করিয়াছি ভাতও দিয়াছি—তাঁহার হুকুমও রাখিয়াছি। বাবা! তিনি যা বলেন তোমার ভালর জন্যই বলেন দুঃখ করি না। বাবা! ভাত খাও।

এবরাহিম হোসেন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—মা! আমি নিতান্তই নরাধম। যে পিতা কত স্নেহ করেন, ভাল ভাল খাদ্য নিজে না খাইয়া আমাকে খাওয়ান, তাঁহার মনে যখন এতদূর বিরক্তির কারণ হইয়াছে, সহস্র প্রকারে আমিই অপরাধী। সম্পূর্ণ দোষই আমার। মা! যদি ভাল হইতে পারি, যদি পিতার [illegible]ত্র হইতে পারি তবে আমার মুখ আবার দেখিবেন। আমিও মুখ পার [illegible] তাহা না পারিলে এই শেষ দেখা! মা! বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মীর এবরাহিম হোসেন মায়ের পদ চুম্বন করিয়া পদধূলি মাথায় লইয়া নিজ শয়ন ঘরে যাইয়া একখানি পারস্য ভাষায় প্রথম পাঠ্য পুস্তক লইয়া সামান্য বেশে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইলেন। মাতা এতদূর ভাবেন নাই যে পুত্র রাত্রেই বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে। শয়নগৃহে শয়ন করিতে গিয়াছে —যাই করুক আজ রাত্রে কিছুই করিবে না। যাহা হয় প্রাতে দেখিব। এবরাহিম হোসেন বাটীর বাহির হইয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। যদিও জীবনে কখনও বাটীর বাহির হইয়া একা একা দীন-দরিদ্র বেশে কোথাও গমন করেন নাই। হৃদয় মন বিচলিত হইবার কথা, তাহা তাঁহার হইল না। শরীরে বল আছে, হৃদয়ে সাহস আছে, নির্ভয়ে যাইতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন? বিদ্যাশিক্ষা—অবস্থার উন্নতি জন্য কোথায় যাইবেন? কোন দিন ঘরের বাহিরে হন নাই। স্বগ্রাম ছাড়িয়া আত্মীয়-স্বজন কুটুম্বগণের বাড়ী ভিন্ন, কোন স্থানে গমন করেন নাই। অন্য কোন স্থানের নামও জানা নাই, একমাত্র সে সময় "সহরে"র নাম জানিতেন। মুর্শিদাবাদকে সর্বসাধারণে সহর বলিত। মুর্শিদাবাদের নাম কেহ করিত না। "সহর" বলিলেই মুর্শিদাবাদ বুঝাইত। মীর এবরাহিম হোসেন মুর্শিদাবাদ যাইবেন। কারণ সে সময়ে মুর্শিদাবাদই বিদ্যাশিক্ষার লীলাক্ষেত্র। অন্য কোন সহর নগর নিকটে ছিল না, মুর্শিদাবাদেই মুসলমানের গৌরব স্থান, শিক্ষার স্থান। কিছুদিন মুর্শিদাবাদে থাকিলে বিদ্যাশিক্ষা যাহাই হউক উর্দু কথা অতি উত্তমরূপ শিক্ষা হইত। গ্রামে আসিয়া উর্দু ভাষায় সহজে কথা কহিতে পারিলেই, লোকে জানিত খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে।

মীর এবরাহিম হোসেন মুর্শিদাবাদ গমনই স্থির করিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে পথ ধরিলেন। বসতি স্থান পদমদী গ্রাম হইতে মুর্শিদাবাদ উত্তর পশ্চিম কোণে—সে কথাটা অতি অজ্ঞ ব্যক্তিরও জানা আছে। তিনি সারারাত হাঁটিয়া চলিলেন কত গ্রাম ছাড়াইলেন। পরদিন হাঁটিতে-হাঁটিতে পথে সামান্য গৃহস্থ বাড়ীতে অতিথি হইয়া কিছু আহার করিয়া একটু বিশ্রামের পর আবার চলিতে লাগিলেন। সে সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশ কেবল নূতন শাসনে আনিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থানে স্থানে রেশমের কুঠি করিয়া কারবার আরম্ভ করিয়াছেন। পথে "কুমারখালী"তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি বসিয়াছে, মুর্শিদাবাদ গমনপথ পথিক লোকের নিকটে গ্রাম্য লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছেন। গৌরী-নদী পার হইয়া বর্তমান কুষ্টিয়ার নাম সে সময় কুষ্টিয়া ছিল না। মজমপুর এড় পাড়ার মধ্য দিয়া মোঙ্গলবাড়িয়া হইয়া মুর্শিদাবাদের পথ ধরিতে হইবে। গৌরী-

নদীর খেয়াঘাট পার হইলেই শাওঁতা নামে একখানি গ্রাম পাওয়া যায়। গৌরী-নদী পার হইতেই সন্ধ্যা আসিয়া চতুর্দিক ঘিরিয়া ফেলিল। বিদেশে এই প্রথম রজনী। রাত্রি কোথায় যাইবেন কোথায় থাকিবেন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। খেয়াঘাটে শুনিলেন শাওঁতা গ্রামে একঘর জমিদার আছেন, তাঁহারা চিরকালই অতিথিভক্ত। যত পথিক মুর্শিদাবাদ যায় ঐ জমিদারবাটীতেই রাত্রিযাপন করে। মীর এবরাহিম হোসেন কয়েকজন মুর্শিদাবাদ যাত্রী অতিথিসহ শাওঁতা গ্রামের জমিদার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। নির্ধারিত অতিথশালায় অপর অপর অতিথির সহ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে শাওঁতার জমিদার একটি স্ত্রীলোক। পুরুষ জমিদার কেহ নাই। একটি বৃদ্ধা স্ত্রী, নাম আনার খাতুন। প্রত্যহ অতিথি সেবার বন্দোবস্ত আছে, সাধারণ অতিথির জন্য সামান্য ডাল-ভাত বরাদ্দ আছে। রাত্রিযাপন জন্য সামান্য মাদুর বিছানা চাটাই নির্ধারিত আছে, অন্য কোনরূপ শয্যা বা বালিশের বন্দোবস্ত নাই। মীর এবরাহিম হোসেন সামান্য অতিথিদিগের সঙ্গে বসিয়া সামান্য আহার—সামান্য শয্যাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্র প্রভাত হইল। অতিথিরা আপন আপন গম্য পথে যাইতে লাগিলেন। মীর এবরাহিম হোসেনও উঠিয়াছেন, যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় জমিদার বাটীর একটি দাসী বাহিরের ঘর পরিষ্কার করিতে অন্দরমহল হইতে বাহির বাটী আসিয়াছিল। মীর এবরাহিম হোসেন প্রতি চক্ষু পড়িবামাত্র দাসীর মনে সন্দেহ হইল যে—হায়! এমন সুন্দর যুবা এই সামান্য লোকের মধ্যে শয়ন করিয়াছিল। নিশ্চয়ই এ ভদ্র সন্তান। ভদ্রলোকের জন্য আলাহিদা বন্দোবস্ত আছে; থাকিবার জন্য ভিন্ন ঘর—সে ঘরে তক্তপোষ খাট চৌকি "ফরস" বিছানা আছে। সে স্থানে এই ভদ্রলোকটিকে স্থান না দিয়া চাকরেরা এই সাধারণ অতিথি মধ্যে স্থান দিয়াছিল—বড়ই অন্যায় হইয়াছে। ভদ্রলোক বোধহয় মোটা আউস (আশু) ধান্যের ভাত আর খেসারীর ডাল কখনই খাইতে পারে নাই। কর্ত্রী এ কথা শুনিলে বড়ই দুঃখিত হইবেন। দাসী একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, আপনি যাইবেন না, একটু অপেক্ষা করুন। দাসীর নিশ্চয় ধারণা এই যে কর্ত্রী এই অতিথির কথা শুনিলে দুই প্রহরে ভাল করিয়া আহার করাইয়া ভাল স্থানে রাখিয়া অতিথির মর্যাদা রক্ষা করিবেন। অতিথিকে সন্তোষ করাই কর্ত্রীর ইচ্ছা। এই প্রকার অনেকবার অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

দাসী তাড়াতাড়ি বাটীর মধ্যে যাইয়া অতিথির অবস্থা কর্ত্রীর নিকট বিস্তারিত রূপে বলিল—কর্ত্রী শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। চাকরদিগকে

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল হুজুর! সে অতিথ আমাদিগকে কিছুই জানায় নাই, সাধারণ অতিথি মধ্যে আসিয়া তাহাদের সঙ্গেই বসিয়াছে, একত্র আহার করিয়া মাতুরের উপরেই শুইয়াছিল। ছেলেটি দেখিলে বোধহয় খুব বড় ঘরের সন্তান। কোন দিন বাটির বাহির হয় নাই, অতিথের নিয়ম পথিকের বিধিব্যবস্থা কিছুই জানে না। এ বাটীতে সে আর কখনও অতিথি হইয়া আইসে নাই। তাহা হইলে এ বাড়ীর নিয়মাদি অবশ্যই জানিত, সাধারণ লোকের মধ্যে কখনই বসিত না, আহারও করিত না।

পাঠক! যে সময়ের কথা—সে সময় উঠা বসা খাদ্য খাওয়া সম্বন্ধে বড়ই বাদ-বিচার ছিল। জাতীয় গৌরব, বংশ মর্যাদা ঘরাণার গৌরব—বড়ই কঠিনভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল।

কর্ত্রী অতিথির অবস্থার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। চাকরদিগকে অনুমতি করিলেন, তোমরা সাধ্য-সাধনা করিয়া যাতে হয় অতিথকে অদ্য রাখিয়া ভদ্রতানুসারে তাহার আদর-অভ্যর্থনা কর। উপযুক্ত স্থানে আনিয়া বসাও। নাস্তা (জলযোগ) লইয়া দেও,—মুখ হাত ধৌত করার পানী দেও।—কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়। নিতান্ত পক্ষে আজিকার দিনরাত রাখিয়া যত্ন করিও। না থাকিতে চায়,—দুই প্রহরের আহার করাইয়া বিদায় কর। দুই প্রহরের আহার না করাইয়া কিছুতেই যাইতে দিও না। আমার বোধ হইতেছে রাত্রে সেই ভদ্র-সন্তান কিছুই খাইতে পারে নাই। বিছানা বালিশের অভাবে ঘুমাইতেও পারে নাই। নাস্তা খাওয়াইয়া বিছানা করিয়া দেও—ঘুমাইয়া থাকুক। ভদ্রসন্তান কাল রাত্রে অনাহারে অনিদ্রায় বড়ই কষ্ট পাইয়াছে।

চাকরেরা চলিয়া গেল। কর্ত্রী ঠাকরাণী দাসীকে বলিলেন, তুই যা বাহিরে বাবার গ্রা—অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয় দেখি, কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, নাম কি?—কাহার পুত্র? তোদের সকলের কথায় আমার বোধ হইতেছে, কোন ভদ্র ঘরের সন্তান বিবাগী হয়ে পালিয়ে এসেছে।

দাসী বহির্বাটীতে যাইয়া অতিথিকে সমুদায় কথা জিজ্ঞাসা করিলে,—তিনি যে উত্তর করিলেন দাসী আসিয়া কর্ত্রীকে বলিল,—পদমদীর মীর ওমার দারাজের পুত্র, নাম মীর এবরাহিম হোসেন। সহরে তালে বেলিমি (বিদ্যাশিক্ষা) করিতে যাইতেছে।

আনার খাতুন বলিলেন—

অসম্ভব কথা! মীর ওমর দারাজের পুত্র এই অবস্থায় সহরে তাল বেলিমি

করিতে যাইতেছে—অসম্ভব কথা। মীর ওমর দারাজ আমার দূর সম্পর্কে আত্মীয় —সম্বন্ধ আছে। তুই অতিথিকে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া আন, আমি শুনিতেছি, আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিব। তাহাকে দেখা দিব। কোন আপত্তি নাই। এখনি ডাকিয়া আন।

দাসী আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। —মীর এবরাহিম হোসেন বাটীর মধ্যে আসিয়া আনার খাতুন বিবিকে সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

বিবি আনার খাতুন বলিলেন—তুমি আমার ভাই! —মীর ওমর দারাজের পুত্র তুমি—সম্পর্কে ভাই। তুমি এবেশে কোথায় যাইতেছ? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, গোপনে বাটী হইতে বাহির হইয়াছ। তোমাকে কখনি এবেশে এভাবে বাটী হইতে কেহই কোথায় যাইতে অনুমতি করে নাই। সত্য কথা বলতো ভাই! আসল কথা কি?

মীর এবরাহিম হোসেন বলিলেন—আমি লেখাপড়া করিতে সহরে যাইতেছি—আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। আমি বাটী হইতে রাত্রে বাহির হইয়াছি। কাহাকে বলিয়া আসি নাই।

আনার খাতুন বলিলেন—ভাই! আমি তোমার হাব-ভাবে সকলি বুঝিয়াছি, কোন কথায় কথান্তর হইয়া কাহাকে না বলিয়াই তুমি বাটী ছাড়িয়াছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা যাহাই হউক, খোদাতা'লা যখন তোমাকে আমার হাতে দিয়াছেন, আর তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিতেছ না। আমি এখানে মুন্সী রাখিয়া দিতেছি, তুমি আমার এখানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর। অনর্থক সহরে যাইয়া পরের বাটীতে এক মুটো ভাতের জন্য তাহার গলগ্রহ হইবে কেন? লেখাপড়া শিখাই তো তোমার উদ্দেশ্য, আমি লেখাপড়া শিখাইব। আনার খাতুন বিবি মীর এবরাহিম হোসেনকে আর সহরে যাইতে দিলেন না। মুন্সী রাখিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। মীর এবরাহিম হোসেন বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা রহিল না।

পাঠক! এইক্ষণে আনার খাতুন বিবির অবস্থা শুনুন! তাহার পর মীর এবরাহিমের কথা শুনিবেন। আনার খাতুনের পিতার নাম মীর নরুল্লা। মীর সাহেবের বিষয়সম্পত্তি কিছু ছিল না। তিনি একজন তপস্বী দরবেশ ছিলেন, দিবারাত্র ঈশ্বর উপাসনা করিতেন। দেশ-বিদেশ তাঁহার তপস্যার কথা প্রচার ও প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি যেমন বিদ্বান তেমনি সৎ। সংসার সংস্রবে তাঁহার

নতান্তই ঘৃণা ছিল। দেশ-বিদেশের লোক তাঁহার দর্শনলাভ জন্ত সাঁওতায় াসিত। তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে বিশেষ মান্তের সহিত পরিচিত ছিলেন। ময় সময় মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর তাঁহাকে সমাদর করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া াইতেন। নবাব সরকারে তাঁহার আদরের অবধি ছিল না। জাতিতে সৈয়াদ াহার পর তাপস। নবাব বিশেষ সমাদর করিতেন। দেশের হিন্দু জমিদার শ্রেণী াহাকে ফকীর দরবেশ বলিয়া মান্ত করিত। কিন্তু মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে য তাঁহার এত প্রতিপত্তি, মান-সম্ভ্রম ছিল, তাহা তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন না। বাব যেরূপ মান্ত করিতেন স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ সেরূপ মান্ত করিতেন না। বে ক্ষমতাশালী ফকীর এই অবস্থায় যেরূপ মান্ত তাহাই করিতেন।

তরফ সাঁওতা তখন নলডাঙ্গার রাজার জমিদারীভুক্ত। নলডাঙ্গার মহারাজই ীর মুরুল্লার জমিদার। সাংসারিক কার্যে মীর মুরুল্লার কোন সংস্রব ছিল না, াজেই জমিদারদিগের সহিতও তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। তত্রাচ তিনি জা—সামান্ত প্রজা। রাজা তাঁহাকে চিনিতেন না, জানিতেন না। রাজসরকারে াহার কোনরূপ মান-সম্ভ্রমও ছিল না। গ্রাম্য কর্মচারী, তহশিলদার, পাইক ায়দা যাহারা সাঁওতা গ্রামের খাজানা আদায় করিত, তাহারাই একজন ক্ষমতাপন্ন দরবেশ বলিয়া জানিত। যাহা কিছু মান্ত তাহারাই করিত।

যে সময়ের কথা—সে সময়ে বাংলাদেশের জমিদারগণ মুর্শিদাবাদের নবাবের াজানাখানাতেই জমিদারীর খাজানা দিতেন। এখন যেমন জমিদারদিগের মান- ম্ভ্রম এজ্জাত ব্রিটিশ রাজদরবারে হইয়াছে, নবাবী আমলে সেরূপ ছিল না। মিদারীর খাজানা প্রায়ই বাকি পড়িত। নবাব সরকারের সেপাই সান্ত্রী আসিয়া াজা জমিদার নিকট খাজানা তলব করিত। খাজানা না দিতে পারিলেই মুর্শিদাবাদ রিয়া লইয়া বন্দীখানায় আটক করিত, টাকা আদায় জন্য শারীরিক শাস্তি দিতেও ়টি করিত না। ছ' মাস, বছর দু'বছর নবাবের বন্দীখানার জমিদারগণ কয়েদ াকিতেন। এমন ঘটনাও অনেক হইয়াছে। কেহ কেহ বন্দীখানার কার্যকর্তা- িগকে বেশী পরিমাণ টাকা সেলামী দিয়া গোপনে দেশে চলিয়া আসিয়াছেন। দি নবাব পর্যন্ত খবর গিয়াছে—তবে এই খবর হইয়াছে, যে আসামী অমুক রাজা লাইয়া গিয়াছে। জমিদারেরা বাকী খাজানার জন্ত নাজেহাল হইতেন। অনেক মিদার জমিদারীকে গলগ্রহ স্বরূপ মনে করিতেন। হয়ত কোন জমিদার নবাব র্মচারীদিগের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া—আত্মহত্যা করিত। কেহ াত্যধিক অত্যাচারে মরিয়া যাইত।

একবার মীর নুরুল্লা নবাবের আহ্বানে মুর্শিদাবাদ গমন করিয়াছিলেন। নবাব পরিবারেরা তাঁহাকে পীরের ন্যায় ভক্তি করিত। স্বয়ং নবাব মীর নুরুল্লার বিশেষ ভক্ত—আদর সম্মান যতদূর করা সম্ভব তাহা করিতেন। একদিন বিকালে নবাব সাহেব নিকটে মীর নুরুল্লা বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। এমন সময় নলডাঙ্গার মহারাজাকে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় নবাব সম্মুখে হাজির করিয়া প্রধান কার্যকারক রীতিমত কোরনেশ আদায় করিয়া জোড় হস্তে বলিলেন—

হুজুর!—এই রাজা কিছুতেই খাজানার টাকা দিতে পারিল না। আর কত দিন নাজিরের জিম্বায় থাকিবে। বন্দীখানায় দস্তুরমত আটক না করিলে আর টাকা আদায় হইবে না।

মীর নুরুল্লা নলডাঙ্গার রাজাকে চিনিতেন না। কেবল নলডাঙ্গার নামে পরিচিত ছিলেন।

নবাব বাহাদুর বলিলেন, মীরসাহেব!—এইসকল রাজা সাহেবরাই আমার বিরোধী। উচিত খাজানা যাহা চিরকাল দিয়া আসিতেছেন, এখন দিতে এত আপত্তি কেন?—দেখুন! দিন দিন চাষী প্রজার অবস্থা ভাল হইতেছে। খেতে খুব শস্য পাইতেছে, তাহাদের দেয় খাজানার একটি কড়িও বাকি নাই। এরা দশ হাজার বিশ হাজার সন সন বাকি ফেলে আসিতেছেন। এইত ঐ নলডাঙ্গার রাজা, প্রায় লক্ষ টাকা বাকি। আপনি যে বলেন সেপাই সান্ত্রী বেতন পায় না,—হাতি ঘোড়া খেতে পায় না। চাকরেরা মাহিয়ানা পায় না এঁরা খাজানার টাকাটা দিলে আর এরূপ হবে কেন? ইনি নলডাঙ্গার রাজা। শুনিয়াছি খুব বনিয়াদী ঘর! হিন্দু সমাজে বড়ই মান্য। দেখুন এঁর দশা—

মীর নুরুল্লা নলডাঙ্গার রাজার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। নবাব বাহাদুর তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—

এ রাজাকে কি আপনি—জানেন? —আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে নাকি?

হুজুর! ইনি আমার—জমিদার, ওঁর এলেকাতেই—আমার বাড়ী।

ওর জমিদারীর মধ্যে আপনার বসত বাড়ী?

হাঁ হুজুর!

তবে কি করা যায়?

হুজুর আর কিছু নয়—সরকারের কোনরূপ ক্ষতির কথা আমি বলিতে পারি না

দয়া করে ওঁকে বন্দীখানায় না দিয়া বাকী টাকার একটা কিস্তিবন্দী করিয়া লইলে টাকাও আদায় হইবে, রাজাও প্রাণে বাঁচিবে।

আচ্ছা! তাহাই হইবে। কর্মচারীর প্রতি আদেশ—

রাজাকে কয়েদে রাখিলে কোনই লাভ নাই।—মীর মুরুল্লা সাহেবের কথা মত আমি ওঁকে এবার ছাড়িয়া দিতেছি। কত দিনের মধ্যে টাকা দিতে পারে তাহার একটা কিস্তিবন্দী লিখাইয়া লও।

রাজার প্রাণে ধড় আসিল।' রাজার আপন কর্মচারী, লোকজন অনেকেই সঙ্গে ছিল। তাহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোক দুই-একজন মীর মুরুল্লাকে চিনিত। রাজার বাসাবাড়ীতে আসিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, আরে ভাই! আমাদের সাঁওতার মীর মুরুল্লার এত মান। নবাব সরকারে এত খাতির? দেখেছ! নবাব বাহাদুর মীর মুরুল্লাকে কত ভক্তি করেন। পীরের মত মান্তি করেন। আর দেখেছ তাঁর সামান্য একটু মুখের কথায় মহারাজের প্রাণ বাঁচিল। বন্দীখানায় বন্দী হলে কি মহারাজের আর দেহে জান থাকিত? মীর মুরুল্লার একটা কথায় নলডাঙ্গার ঘর রক্ষা পাইল।

এদিকে রাজাও আপন কার্যকারকদিগের মুখে মীর মুরুল্লাব পরিচয় পাইয়া, মহা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মীর মুরুল্লার পরিচিত জনৈক নিজ কর্মচারী দ্বারা তাঁহার নিকট হাজার হাজার সেলাম সহ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। আর বলিয়া দিলেন যে তাঁহাকে বলিও দেশে যাইযাই আপনার শ্রীচরণে রাজা উপস্থিত হইয়া দর্শন লাভ করিবেন।

মীর মুরুল্লার নিকট রাজার প্রস্তাব উপস্থিত হইল। নবাব সরকারের টাকার কিস্তিবন্দী লিখিত হইয়া দাখিল হইল। রাজা মুক্তিলাভ করিয়া দেশে আসিলেন—কিছুদিন পরে মীর মুরুল্লা সাহেবও নিজবাটী আগমন করিলেন। মীর মুরুল্লার মাত্র এক কন্যা আনার খাতুন।

কিছুদিন পর রাজা কার্যকারকগণকে ডাকাইয়া বলিলেন—সাঁওতার মীরমুরুল্লার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব। হাতী ঘোড়া পালকী বেহারা লোকজন সমুদায় প্রস্তুত রাখিতে বল। এই সপ্তাহের মধ্যেই যাইতে ইচ্ছা করি। প্রধান দেওয়ান বলিলেন—হুজুর! মীর মুরুল্লার বাটীতে যাইবেন? ইহা কখনই হইতে পারে না। মীর মুরুল্লার মত প্রজার বাটীতে হুজুরের যাওয়া কখনই হইতে পারে না।

রাজা ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—আপনি মীর মুরুল্লাকে চেনেন না; জানেন না।

হুজুর খুব চিনি, খুব জানি। তিনি ফকীর দরবেশ লোক। দিনরাত প্রায় উপাসনা আরাধনাতেই থাকেন। আমাদের নায়েব গোমস্তা প্যাদা পাইক তাঁহাকে খুব চিনে। তাদের সঙ্গেই তাঁহার বেশী আলাপ। আমাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ নাই। তবে তাঁহাকে জানি। তিনি নিতান্তই দীন-দুঃখী হীন অবস্থাপন্ন লোক। উচ্চ শ্রেণীর আমলারা তাঁহাকে কেহই চেনেন না। গ্রামের পাইক প্যাদা গোমস্তাদিগের সহিতই তাঁহার বসা-ওঠা বনিবনাও। ভদ্রলোকের সহিত আলাপ, বসা-ওঠা করিতে তাঁহার সাহসই হইবে না। একখানা তলবী চিঠি পাইলে তিনি সৌভাগ্য জ্ঞানে কাছারিতে উপস্থিত হইবেন। হুজুর সেখানে গেলে কি আর—

রাজা বিশেষ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, মহাশয়! থামুন আর বলিবেন না। মূল কথা আপনি মীর মুরুল্লাকে চিনিতে পারেন নাই—চিনেন না।

হুজুর, আর কি করিব। তরফ সাঁওতার মধ্যে সাঁওতা গ্রামে সামান্য ভাবে সামান্য কুঁড়ে ঘরে তিনি থাকেন। এক সন্ধ্যার আহারের জোগাড় হয় ত, অন্য সন্ধ্যায় উপাস করিতে হয়। কতকগুলি শিশু-টিশু আছে, তাহারাই কিছু কিছু করিয়া ভিক্ষা দেয়, তাহাতেই খাওয়া পরা চলে। দেশের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি নহেন। হুজুর উচ্চ ধারণার কথা বলিতেছেন, সেই জন্য আমি বলিতেছি আমরা কিন্তু মীর মুরুল্লাকে তুমি সম্বোধন করা ভিন্ন আপনি বলি না।

রাজা ক্রমেই বিরক্ত হইতেছেন।

অনেক লোকে,—তাকে দেখে ভয়ও করে শুনিয়াছি। যাকে যাহা বলে তাহাই হয়। শুনা কথা—তাও মুসলমানের মুখেই শুনিয়াছি। মুসলমানের ভক্তি বুঝিতেই পারিতেছেন।

রাজা বিরক্তির সহিত বলিলেন—আমাকে মার্জনা করবেন মহাশয়। আপনি এখন আপনার সেরাস্তায় গিয়ে কাজকর্ম করুন,—আমাকে বিরক্ত করবেন না।

প্রধান কার্যকারক মহাশয় মহারাজ মুখে এভাবের কথা কখনও শুনেন নাই। আজ নূতন রকম ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সেলাম বাজাইয়া চলিয়া গেলেন।

যে সকল লোক রাজা বাহাদুরের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিল রাজা বাহাদুরের নিষেধ-ক্রমে মুর্শিদাবাদের কোন ঘটনার কথা কেহ প্রকাশ করে নাই। মীর মুরুল্লার কথা কেহই জানিতে পারে নাই। তবে রাজা মীর মুরুল্লার বাড়ীতে যাইবেন এই কথারই বিশেষ আলোচনা হইতে লাগিল। রাজাবাহাদুর মীর মুরুল্লার সহিত সাক্ষাতে

দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। ক্রমে মহারাজ তাঁহার বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়িলেন। একবার রাজা বাহাদুর বলিলেন,—মীরসাহেব! আপনার বসতি গ্রাম এবং ইহার নিকটবর্তী আমার এলাকার মধ্যে যে কয়েকখানা গ্রাম আছে, তাহা আমি নিষ্কর করিয়া আপনার নজরানা স্বরূপ দিতেছি,—আপনি গ্রহণ করুন। তাহাতে মীর মুরুল্লা বলিলেন বাবা! আমি ফকীর মানুষ, বিষয় সম্পত্তি দিয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। রাজা বাহাদুর কিছুতেই ছাড়িলেন না। মীর মুরুল্লাকে তরফ সাঁওতায় ।⁄৬৮০ গণ্ডা অংশ মধ্যে যে কয়েকখানা গ্রাম আছে—যথা সাঁওতা, এমামপুর, কাঞ্চনপুর, রসুলপুর, মীরপুর, নিতইলপাড়া, ভড়ুয়াপাড়া এই কয়েকখানি গ্রাম নিষ্কর করিয়া দিতে নিতান্তই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মীর মুরুল্লা বলিলেন—বাবা তোমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে আমাকে দিবে দেও,—কিন্তু বাবা আমি খয়রাত স্বরূপ নিষ্কর লইব না। কিছু কর সাব্যস্ত করিয়া দেও। রাজা বাহাদুর কি করেন শেষে নিতান্ত বাধ্য হইয়া ৫ টাকা জমা ধার্য করিয়া দিলেন। আরও বলিলেন—হুজুর! আপনার অনেকগুলি মহিষ আছে এ সকল গ্রামও জলে ডোবা বিলেন জমি আপনার মহিষগুলির জন্য আর ভাবিতে হইবে না।—মীর মুরুল্লার ঐ সকল গ্রামে বেশী আয় ছিল না। সামান্য কয়েক ঘর প্রজা ছিল মাত্র। আর সমুদায়ই জলা, জলে ডুবিয়া থাকিত। কিছুদিন পর মীর মুরুল্লা জগত পরিত্যাগ করিলে তাঁহার একমাত্র কন্যা আনার খাতুন বিবি সমুদায় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। ঈশ্বরের মহিমায় বিলসকল ভরাট হইয়া ক্রমে প্রজা পত্তন হইতে লাগিল। আনার খাতুন সময়েই বাৎসরিক আয় প্রায় ছয় হাজার টাকা হইল। এই আয় হইতেই তিনি দীন-দুঃখীগণকে দৈনিক আহার যোগাইতেন। বিলের জমিতে ধান্য বুনানী করিয়া বিস্তর ধান পাইতেন। বৎসরের চাউলের খরচ ঐ সকল খামার জমির ধান্য হইতেই চলিত। প্রতি বৎসরেই বিল ভরাট হইয়া আবাদের উপযুক্ত হইত। এবং নূতন প্রজা পত্তন হইয়া বাড়ী ঘর বাঁধিয়া স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করিয়া লইত। আনার খাতুনের শেষ অবস্থায় মীর এবরাহিম হোসেন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন গত হয় আনার খাতুন পীড়িত হইলেন। ক্রমেই পীড়ার বৃদ্ধি। একে বৃদ্ধাবস্থা তাহাতে আমাশয় রোগ, পেটের পীড়ায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। সে সময় সাঁওতা অঞ্চলে যত ভাল ভাল কবিরাজ বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন ক্রমে সকলেই এক একবার করিয়া দেখিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। পীড়ার বৃদ্ধি ভিন্ন কমিল না।

আনার খাতুনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্পর্কে পিতৃব্যপুত্র মীর আসাদ আলী, মীর আরসাদ আলী বর্তমান। তাঁহাদের বাসস্থান কুমারখালীর উত্তরাংশে চারি মাইলের মধ্যে, গ্রামের নাম এদরাকপুর। বিধিব্যবস্থা সরাশাস্ত্র অনুসারে, আনার খাতুনের উত্তরাধিকারীই ঐ দুই ভ্রাতা। ভ্রাতাদ্বয় আনার খাতুনের জীবন শেষ প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছেন। আনার খাতুনের মৃত্যু হইলেই তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক তাঁহারাই হইবেন মনে মনে স্থির বিশ্বাস। আনার খাতুনেরও সেই বিশ্বাস। পরিণামে তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতি ভ্রাতা আসাদ আলী, আরসাদ আলীই প্রাপ্ত হইবে। আসাদ, আরসাদ মীর এবরাহিম হোসেনের আইসার পূর্বে প্রায়ই আসিতেন। তিনি আনার খাতুনের বাটী আসিয়া থাকার পর ভ্রাতাদ্বয়ের আসা-যাওয়া অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কেহই বলিতে পারেন না। তাঁহাদের মনই তাহা বলিতে পারে। আনার খাতুন বৃদ্ধা, তাঁহার এক পা গোরে এক পা উপরে। তিনি জগৎ ছাড়িলেই, জ্ঞাতি ভ্রাতাদ্বয় সমুদায় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবেন। যাহা কিছু আছে সকলি তাঁহাদেরই হইবে। আনার খাতুনের দাস-দাসী গরু-বাছুর সমুদায়ই তাঁহাদের হইবে তবে আর মনে কি কথা বসিতে পারে? মীর এবরাহিম হোসেন প্রতি সন্দেহ। কেহই তাহা জানিতে পারে নাই—কি সন্দেহ?

এবরাহিম হোসেন, ক্রমে ক্রমে আনার খাতুনের এতই ভালবাসা হইয়াছে, যে আনার খাতুন তাঁহাকে আপন পুত্রের ন্যায় দৃষ্টি করেন। এবরাহিম হোসেন ভক্তি শ্রদ্ধা যত্ন ব্যবহারে বিশেষ এই উপস্থিত রোগ শয্যায় দিবারাত্র নিকটে থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন, প্রাণপণে খাটিতেছেন। দিন দিন মুহূর্তে মুহূর্তে খাতুনের ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

একদিন আনার খাতুন আপন প্রধান কার্যকারক শীতলচন্দ্র দত্তকে ডাকিয়া নির্জনে কথা কহিতে লাগিলেন। আনার খাতুন বলিলেন, দত্ত মহাশয়! এবরাহিম হোসেন বহুদিন আমার এখানে রহিয়াছে। তাঁহার পিতার কোন বিষয়ে অভাব নাই। তত্রাচ সেই রাত্রি ভাতের পরিবর্তে ছাই দিতে এবরাহিমের মাতাকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই কথাটা এবরাহিমের মনে বড় বেশী লাগিয়াছে। সে বলে যে খোদাতালা মানুষকে প্রতিপালন করেন, রক্ষা করেন, জন্মান। অথচ সেই মানুষ খোদাতালার কত অবাধ্য হইয়া কার্য করে। তাঁহার হুকুমের অন্যথা করিয়া চলাফেরা করে। তাঁহাকে অমান্য করে, তাঁহাকে আবার কেহ জানে না, চেনে না। তিনি একজন সর্বকর্তা পয়দা কারনেওয়ালা একা

একজন আছেন তাও বিশ্বাস করেন না। এত পাপেও খোদাতালা আহারের পরিবর্তে অখাদ্য ছাই কাহারও পাতে দিতে আদেশ করেন না। সেই দুঃখে সে আজ কয় বৎসর মধ্যে বাড়ী-ঘরের নামও করে নাই। আমার নিকট বিশেষ কাঁদাকাটি করিয়া পা ধরিয়া বলিয়াছে যে, আপনি কোন খবর আমার পিতা-মাতার নিকট পাঠাইবেন না। আমি সে কথা প্রতিজ্ঞা করিয়া আবদ্ধ হইয়াছি। এবরাহিম যাহাতে মনের সুখে থাকে তাহাই আমার ইচ্ছা। বেশী দূর ত নয় পদমদী এখান হইতে এক দিনের পথ, ভাল চলনে-আলা হইলে, আড়াই প্রহরেও যাইতে পারে। ক্রোশের হিসাবে ১৪।১৫ ক্রোশ দূর হইবে। তাঁহার পিতামাতাও কোন তত্ত্ব-তাল্লাস করিলেন না। আমি কেন তাঁহাদিগকে উপরপড়া হয়ে খবর দিব। এবরাহিম ত আমার মাথার উপরে বোঝা হয়ে পড়ে নাই, গলগ্রহ যাকে বলে তাও হয় নাই। আমি কেন, পদমদীতে সংবাদ দিব ?

আমার ইচ্ছা যে আমি ওকে কিছু দিয়া যাই। জোত স্বত্বে দিয়া যাই কি, আমার সমুদায় সম্পত্তির মধ্যে একটা অংশ সাব্যস্ত করে একেবারে পৃথক করিয়া দিয়া যাই ? তাহা না দিলে, আমার দুরন্ত জালেম গণ্ডমূর্খ ভায়েরা কিছুই দিবে না। এবরাহিমকে আমি ভালবাসি বলিয়াই তাহারা যেন মনে মনে চটিয়াছে। এবরাহিম এখানে আইসার পর প্রথম প্রথম কয়েকবার আসিয়াছিল, এখন একেবারেই আসা-যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। আমার সম্পত্তির অতি অল্প অংশ আমি একজনকে দিব, তাহারা কি করিবে ? তাহারা জ্ঞাতি—এই মাত্র কথা। সহোদর ভাই থাকিলেই বা কি করিতে পারিত ? আমার বিষয় সম্পত্তি আমার, তাহাতে আর কাহার অধিকার নাই। একটি কথা বলিবারও কার সাধ্য নাই। আপনি একথা সাবধানে আপন মনে রাখিয়াই একটা মুশাবেদা করিয়া আমাকে শুনান। এবরাহিমও যেন কোন প্রকারে জানিতে না পারে। আমলাদের মধ্যে কেহ টের না পায়। যদিও সকলেই আমার চাকর, তাই বলিয়া আমার পরে যাহারা পাইবে তাহাদের সহিত এখন হইতেই কাহারও কথাবার্তা না চলিতেছে এ কথা আপনি মনে করিবেন না। আপনি জানিবেন যাহারা অপদে আছে কি কোন কারণে অপদস্থ হইয়াছে, অথবা আপনার সহিত যাহাদের মনে মনে দুহাত ফাঁক বনিবনাও নাই; তাহারা যে আমার জীবনের শেষ শয্যা—পীড়িত শয্যা দেখিয়া আপন স্বার্থ সাধনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে একথা কখনি মনে করিবেন না। অপুচ্ছ ক্ষুদ্র আমলার শত্রু নাই। থাকিলেও খুব কম। বড় বড়

আমলা কার্যকারকের'বড় বড় শত্রু, অধিক পরিমাণ শত্রু। একথাও মনে করিবেন। সাবধান ! কেহই যেন না জানিতে পারে।

জানিলে হইবে কি—আমার কার্যসিদ্ধি হইবে না। যাহার জন্য করিবেন সে শুনিলেও তাহার কাঁচা বুদ্ধি হেতু অপরের কানে যাইয়া তাহারই মন্দ করিতে পারে। সে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। তাহাতেও বারণ করিতেছি এবরাহিমও যেন কিছু না শুনিতে পারে।

প্রধান কার্যকারক বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় বলিলেন—হুজুর ! এবরাহিম হোসেন বয়সে কাঁচা হইলেও বুদ্ধিতে আমাদের চাইতে পাকা—কাজকর্মে কথাবার্তায় এক দু-দিন নয় আজ ৭।৮ বৎসর দেখিতেছি। বুদ্ধি বড়ই তীক্ষ্ণ। তা যাই হউক আমার কথাটাও আমি হুজুরে বলি।

আপনার ভাই সাহেবেরা বড়ই রাগী, যাহাকে লোকে গোঁয়ার বলে। আর স্বভাব চরিত্র একেবারে শুদ্ধ চরিত্র নহে। হুজুর অন্দর মহলে থাকেন, অনেক কথা শুনিতে পান না। আমরা অনেক কথা শুনিতে পাই। হুজুরের অভাবে এই সম্পত্তি আসাদ আলী, আরসাদ আলীর হাতেই যাইবে। কিন্তু হুজুর ! আপনার নাম থাকিবে না। এ সম্পত্তি তাঁহারা রাখিতে পারিবেন না, ভারি লোভী। টাকার লোভে দুই ভায়ে ঝগড়া বিবাদ হইবে, সম্পত্তি ভাগাভাগী হইবে, শেষে কথায় কথায় মারামারি কাটাকাটি হইবে। দুই পক্ষেই বদমায়েস বদ লোক জুটিবে। সাঁওতার ঘর ছারে-খারে যাইবে। আপনার আত্মায় কষ্ট বোধ করিবে। মীর মুরুল্লার নাম ডুবিবে। তাঁহার অভিসম্পাতে আত্মার আক্ষেপে তাঁহারা সবংশে নিপাত হইবেন। সে সকল কথা বলিয়া আর কি হইবে। এবরাহিমকে যাহাই দেন, আসাদ আলী, আরসাদ আলীর অত্যাচারে রাখিতে পারিবে না। অন্য উপায়ে যদি কিছু করিতে পারে।

আনার খাতুন বলিলেন—অন্য উপায় কি রকম ?

অন্য উপায় কি রকম—নবাব বাহাদুর বাঙ্গলা মল্লুকের বাদসা, রাজা যাহা বলেন তাহাই। বিলাতের ইংরেজরাজ এখন বাঙ্গলাদেশ শাসন করিতেছেন। সহরে হাকিম হয়ে বসে দেশ শাসন করিতেছেন। এবরাহিমের ত আর লোকবল নাই। পাইবেই বা কোথা ! আসাদ আলীরা আপনার জ্ঞাতি ভাই,—দেশের সকলেই জানে তাহারাই হকদার, তাহার পর যাহার বল বেশী তাহার দিকেই মল্লুকের টান বেশী হয়। আমি যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি—তবে আমিই কি এবরাহিমের পক্ষে প্রকাশ্যে থাকিতে পারিব ? আপনি তাহাকে যাহাই দেন,

তাহা বজায় রাখিতে আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ আপনার ঘর আমার পূর্বপুরুষের মনিব ঘর। সে লবণের গুণ আমাকে গাইতেই হইবে। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম ছাড়িয়া বাড়ীতে বসিতে হইবে। আপনার ভ্রাতারা, এবরাহিমের অনিষ্ট করিতে দুপায়ে খাড়া হইবেন। তাহার এখানে কেহ নাই। আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। মা বলিতেও আপনি, বাপ বলিতেও আপনি। আপনি যদি চলিয়া যান, তখন এবরাহিমের পক্ষে কে থাকিবে? কেহই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে না। তাহার নিজের কোন বল নাই। লোক বল, অর্থ বল, সহায় বল কিছুই সে পাইবে না। কাজেই সে ইংরাজ রাজ বাহাদুরের আশ্রয় লইবে এবং আপন দুঃখের কথা জানাইতেই সুযোগ ও সুপথ মনে করিবে। সেখানে যাহাই হউক হইবে। আপনি দিয়া গেলেও এবরাহিমের তাহা পাওয়া কঠিন হইবে। আপনি যখন তাহাকে ভালবাসেন তখন এমন কিছু দিয়া যান যে, তাহাতে এখানে দাঁড়াইতে পারে। তাহার কপালে থাকে রাখিতে পারিবে,—না থাকে আপনার দোষ কেহই দিতে পারিবে না।

আপনি কিরূপ বলেন?

আমি কিরূপ বলি শুনুন—আপনার বিবেচনাই বিবেচনা। তবে আমার কথা এই যে ওরূপ গ্রামে গ্রামে দুই তিনটা জোত না দিয়া মোট সম্পত্তির উপর—বাড়ী ঘর সোনা রূপা গরু বাছুর মোট সম্পত্তির উপর তাহার একটা অংশ স্থির করিয়া পাকা দলিল করে, দলিল খানা আপনি তাহাকে আমাদের সকলের সম্মুখে দিয়া যান, তাহার পর যাহা করিতে হয়—সে করিবে। রাখিতে না পারে খোয়াইবে।

কথা ভাল, কিন্তু হঠাৎ আমি আমার মনের কথা বলিতে পারি না। দেখুন! আসাদ, আরসাদ রাগী বদ মেজাজ জাহেল হইলেও আমার রক্তের রক্ত একই বংশের। তাহাদের বরাত মারিয়া পর বংশের একটি লোককে তাহাদের অংশীদার করিয়া যাইব, এটা বড়ই শক্ত কথা। তবে এবরাহিমকে আমি আপন পেটের সন্তানের মত দেখি। এবরাহিমের ভক্তি—আমার ভালবাসা, এ দুইটিতে একত্র হলে, আসাদ আরসাদের দাবি কতদূর দাঁড়ায় সেইটি আমাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আপনাকে অন্য সময় ডাকিয়া সকল কথা বলিব। আপনি আমার এ পীড়ার অবস্থা লিখিয়া এদরাকপুরে একটা লোক পাঠাইয়া দিউন। কেবল পীড়ার সংবাদ দেওয়া। আরও দুইবার লোক পাঠান হইয়াছে—কোন উত্তর দেয় নাই। এবারও পাঠান, কিন্তু আর কোন কথা লিখিবেন না। আর কোন কথা কি?

অনুরোধ করিবেন না যে ভাই! তোমরা আসিয়া আমাকে দেখ, আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। পীড়া হইয়াছে কাতর হইয়াছি, শক্ত পীড়া বাঁচিবার আশা খুব কম, কবিরাজ দ্বারা ঔষধ করান হইতেছে এই মাত্র। আমাকে আসিয়া দেখ—কি আমি দেখিতে ইচ্ছা করি এ সকল কথা লিখিবেন না।

দত্ত মহাশয় সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইলেন। বাহিরে কাছারী ঘরে যাইয়া তখনই কর্তার আদেশ মত পত্র লিখিয়া এদরাকপুরে লোক পাঠাইলেন।

• আরসাদ আলী, আসাদ আলী, এয়ার আসনা লইয়া আমোদ আহ্লাদে আছেন। ভবঘুরে অকর্মা দলের দুই তিনজন ঐ আমোদের দলে না আছেন তাহা নহে। একজন কার্যকারক একখানি পত্রহস্তে আসিয়া বলিল—হুজুর! বুড়া বিবি সাহেবার পত্র নিয়ে সাঁওতা হইতে একজন 'খতগীর' আসিয়াছে। পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই, আসাদ আলী বলিলেন ও পত্র পড়ে দরকার নাই। ওতে যা লিখা আছে তা আমি বলে দিচ্ছি ও আর পড়তে হবে না। ওতে লিখা আছে যে, কর্ত্রী বড়ই পীড়িত আপনি শীঘ্রই আসিবেন। কর্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ অবশ্যই আসিবেন। তোমার বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখ। কর্মচারী মহাশয় পত্র খুলিয়া একবার নজর ফিরাইয়াই বলিলেন—হুজুর! ঠিক বলেছেন। পত্রের মর্মও তাহাই।

তাহা আমি জানি—ওকথা ভিন্ন আর কথা নাই। বুড়ি মরে গেলে রক্ষা পেতুম গো। বুড়ি আমাদের হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারিল। মরে গেলে এক আপদ চুকে যায়। সকল নষ্টের গোড়া ঐ দত্ত বেটা। এবরাহিম নামে একটা ছোঁড়া আজ কয়েক বছর হতে, বুড়ির কাজকর্ম কচ্ছে। বুড়ি ছোঁড়াটাকে ভালও বাসে, শুনেছি বুড়ি ছোঁড়াটাকে কিছু দিয়ে যাবে। সেই দেওয়াটা আমার সম্মুখে হয়—বুড়ির ইচ্ছা তাহাই। শেষে আমরা কোন গোলমাল করি—দত্ত বেটা তাহাই বুঝিয়ে দিয়েছে, তাহাতেই ঘনঘন তলব আসছে।

ভবঘুরের মধ্যে হতে একজন বলিলেন—

হুজুর! সে ছোঁড়াটা কোথাকার ছোঁড়া? সেখানে এসে জুড়ে বসলো কি করে?

থাকুক না—ও কি করবে! আর তাকে দিলেই বা কি? সে ছোঁড়াটা বুড়ির পা দাবে, বুড়ির বেরাম হলেই ছোড়াটা পা দাবে, পায়খানায় পানি দেয়। বুড়ির বিছানা ঝেড়ে দেয়। বুড়ির সমুদায় কাজ, সেই ছোঁড়াটাই করে। তা বেশ ত গোলামী করে খেদমত খাদিমী করে, ভেড়াটা ছাগলটা, দুচারখানা কাপড় পায়

ভালই,—তা আর আমরা কি দেখব? লোকটাকে বিদায় করে দেও। চিঠির জবাব আর কি দিব। বলে দেও—আমরা আসছি।

আনার খাতুন বিবির লোক একটু আড়ালে থাকিয়া সকল কথাই শুনিতেছে। আসাদ আলী মোসাহেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অহে! তোমরা ভেবেছ কি? একদিন গিয়ে দেখেও এসেছ? তোমাদের মনে কি বলে?

হুজুর! আপনার কথা শুনে আমাদের আক্কেল গুড়ুম হইয়াছে। আপনি ভাবিয়াছেন কি? সে কি ছোকরা! বুড়ির খেদমত খাদিমী করে—সামান্য গোলামের মত ছোকরা? তা নয়—সে ছোঁড়াটা যেমন দেখতে, তেমনি শুনতে। লেখাপড়া জানে, ভদ্রলোকের মত বোধ হয়। বুড়ি বিবি তাকে ঘটি বাটী ছাগল ভেড়া দুই তিন টাকা দিবেন মনে করেছেন? তা নয় অনেক কথা আছে, শেষে ঐ ছোঁড়াটার জন্য আপনাদিগকে নাজেহাল হতে হবে। আপনারা সময় থাকতে প্রতিকারের উপায় কল্পনা করুন। শেষে পস্তাইতে হইবে।

পস্তানী আবার কি? ও আমাদের কি করিতে পারে? আর ও করবে কি? ওর আছে কি?

শেষে দেখবেন এ ছোঁড়াটাই গলার কাঁটা হয়ে বসবে। কি জানি বুড়ি বিবি যদি কোন জোত জমা লেখাপড়া করে দেন। তখন ত আপনাদেরই বুকের উপর এক শেল হয়ে বসবে। ওকে আগেই তাড়ান দরকার,—হাঁ বুড়ির জন্য প্রকাশ্যে তাড়াতে পারবেন না। গোপনে তাড়ালে আর ক্ষতি কি? তার চেয়ে আর একটি কাজ খুব ভাল। একদিন আমরা সকলে সাঁওতায় গিয়ে রাত্রে ওকে ডেকে নিয়ে বাড়ীর বাহিরে এনে,—হাত পা আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে কসে বেঁধে একেবারে গৌরীনদী—আপদ বালাই চুকে যাক।

আসাদ আলী হাসিতে হাসিতে বলিলেন। আচ্ছা। আচ্ছা হবে—পাওয়া যাবে। চলো—খোলা কামাই যাচ্ছে।

আনার খাতুনের বাটীর লোকটা যাহা শুনিল তা শুনিয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কি সর্বনেশে কথা! কি দুরন্ত ডাকাত! মীর এবরাহিম হোসেনকে কর্ত্রী ছেলের মত ভালবাসেন। আমরাও তাঁকে ভালবাসি ভক্তি করি,—আর তাঁকে গোলাম খানসামা বলে ঠিক করেছে। আর শেষে বল্লে হাত পা বেন্ধে গৌরীনদীর জলে—কি ভয়ানক লোক এরা?—কর্ত্রীমার অভাবে এই সকল ডাকাতদের হাতেই আমাদিগকে পড়িতে হইবে। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

আনার খাতুন বিবির পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিন দিন বলহীন

ও ক্ষীণ হইয়া অতিশয় দুর্বলা হইলেন। প্রধান কার্যকারক শীতলচন্দ্র দত্তকে ডাকাইয়া বলিলেন—দেখুন, আমি যাহাদের জন্য মরি যাহাদের দুঃখের প্রতি নজর রাখি, তাহারা আমাকে একবারও মনে করে না। আর তাহাদের ইচ্ছা যে, আমি শীঘ্র শীঘ্র দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাই। তাহা হইলেই তাহাদের মনের আশা পূর্ণ হয়। যাক্ আমি আর তাহাদের সুখ ভঙ্গ করিয়া এখানে ২।১ দিনের জন্য আসিতে বলি না—পত্রের জবাব দেয় না। আর এবরাহিম যারই পুত্র হউক তাহার প্রতি হিংসা করিয়া গোমরে থাকা, আর সে ভদ্রসন্তানকে গালাগালি দেওয়া, বড়ই দুঃখের কথা। এবরাহিম কি আমার খানসামা চাকরের মত লোক ? আমার খেদমত করে। আপন পেটের সন্তানের ন্যায় দিন রাত খাটে। যাহা তাহার করিবার নয় তাহাও করে। আমার দাসী বান্দী চাকরের অভাব নেই, অধিক পরিমাণে থাকিতেও সে আমাকে ভক্তি করিয়া আমার কোনরূপ কষ্ট হইবে ভাবিয়া আপন হাতে আমার "বদনা" পানি এগুয়ে দেয়, আমাকে ধরিয়া বসায়। তাহাতেই কি সে আমার চাকর হইল ? না গোলাম হইল ? আমি তাহাকে ঐ কার্যের ইনাম বক্‌শিস স্বরূপ দুটো ছাগল, কি দুটো ভেড়া, কয়েকটা টাকা দিই—তাহারই হুকুম জন্য ভাই সকলকে ব্যারামের ভাণ করিয়া ডাকিতেছি। আমার সম্পত্তি আমার বাড়ীঘর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে পারি, তাহাতে তাহাদের এত মাথা ব্যথা কেন ? যাক্ আপনি যেরূপ ভাবে দলিল লিখিয়া যে সম্পত্তি তাহাকে দিতে বলিতেছেন, আমি তাহাই দিব। তাহাতেই সম্মত হইলাম। আপনি আজই লেখাপড়া করিয়া আনুন, মোহর দস্তখত করিয়া দিতেছি। আমার সমুদায় জমিদারী, বাড়ীঘর জিনিসপত্র গরু বাছুর যাহা কিছু আছে, তাহার সিকি অংশ তাহাকে দিলাম। আপনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপ দলিল যত শীঘ্র হয় লিখিয়া আনুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

দলিল লেখাপড়া করিয়া শীঘ্রই আনুন, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। দত্ত মহাশয় সেই দিন হইতেই রীতিমত দানপত্র লেখা আরম্ভ করিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে আমলাদের মধ্যে ২।৩ জন ক্ষুদ্র আমলা প্রত্যাশী আমলা লেখাপড়ার কথা সমুদায় আসাদ আলীকে গোপনে জানাইল।

মীর আসাদ রাগিয়া রাগে রাগে বলিলেন—আচ্ছা বুড়ী লিখে দিয়া মরুক, না মরিলে আমি এদরাকপুর ছাড়িয়া সাঁওতায় তাহার বাটিতে যাইব না। কার ক্ষমতা আমার প্রাপ্য সম্পত্তি, অন্যকে লিখিয়া দেয়। বুড়ী মরিলেই হয়, একদিনের লাঠির চোটে এবরাহিমের পিত্তি নাড়ী বাহির করিয়া দিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম। খোদার

কসম, কোরানেরই কিরে—আনার খাতুন না ম'লে সাঁওতা গ্রামে যাইব না। তার তাজা মুখ আর দেখিব না। আরও প্রতিজ্ঞা, আল্লার কিরে। আমার ছেলের মাথা খাই। এবরাহিমকে সেই দিন সাঁওতা গ্রাম হইতে তাড়াইব, যেদিন আনার খাতুনের মরা খবর কানে আসিবে।

লোকের অভাব নাই। সকল প্রতিজ্ঞার কথা, আসাদ আলীর সকল রকম কসম খাওয়ার কথা—পীড়িত শয্যায় আনার খাতুনের কানে আসিল। তত্রাচ দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—ভাল করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া আসাদ আলীর নিকট পাঠাইয়া দেও। আমার শেষ সময় যদি দেখার ইচ্ছা থাকে তবে যেন শীঘ্রই আইসে।

পত্র লইয়া লোক এদরাকপুরে গেলে, আসাদ আলী রাগিয়া পত্রখানা পত্র-বাহকের গায়ে ফেলিয়া দিলেন। সর্দার লাঠিয়াল যাহারা সম্মুখে ছিল তাহাদের প্রতি আদেশ করিলেন ঐ লোকটাকে আমার সম্মুখে খুব আচ্ছা করে কষে কান মলে ঘাড়ে হাত দিয়া এদরাকপুরের সীমা পার করে দিয়া আইস। আর যেন কখনও এদরাকপুরমুখো না হয়। তখনই হুকুম তামিল হইল। সে লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আনার খাতুনের নিকট সমুদায় অবস্থা নিবেদন করিল। আনার খাতুন শুনিয়া দুই হাত উর্ধ্বে উঠাইয়া "বদ্ দোয়া" করিলেন—আসাদ, তুই আমার অনেক ছোট, যা করিলি ভালই করিলি। আর কি বলিব, তোদের ভালর জন্যেই ডাকিয়াছিলাম, তোরাই সুখে থাকিতে পারতি। আমি কি করিব, তোদের কপালে নাই। তুই যে আমার মনে ব্যথা দিয়েছিস এই পাপের জন্য তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেহ না থাকে। পাঠক, আনার খাতুনের "বদ্ দোয়া" আসাদ আলীর হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে। পরে সে বিষয়ে জানিতে পারিবেন।

এদিকে প্রধান কার্যকারক দত্ত মহাশয় সমুদায় সম্পত্তির সিকি দানপত্র দলিল আনার খাতুনের মোহর দস্তখত জন্য লইয়া আসিলে আনার খাতুন বলিলেন—

দত্ত মহাশয়!—আপনি এক কার্য করুন। ও দলিল ফাড়িয়া ফেলিয়া নতুন দলিল লিখুন। আমার সমুদায় সম্পত্তি বাড়ী ঘর দালান কোঠা, ছাগল ভেড়া গরু মহিষ ঘোড়া ইত্যাদি যাহা আছে তাহা, জিনিসপত্র আসবাব—রূপার আশা চুড়িআড়ানী সোনার অলঙ্কার নগদ টাকা মোহর এবং গালিচা সতরঞ্চ যাহা কিছু আছে সমুদায় ষোলআনা—মীর এবরাহিম হোসেনকে দিলাম। ষোলআনা সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া আনুন। প্রধান প্রধান প্রজা গ্রামস্থ মাতব্বর মণ্ডলদিগকে আমার মোহর দস্তখত পত্র দ্বারা জানাইয়া দেন যে সমুদায় সম্পত্তি মীর এবরাহিম

হোসেনকে দিলাম। আজ হইতে জমিদারীর মালিক তিনি হইলেন। আমার কোন দাবি থাকিল না।

দত্ত মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কর্ত্রীর আদেশমত দলিল লিখিয়া মোহর দস্তখত করাইয়া কর্ত্রীর হাতে দিলেন। আনার খাতুন তখনি সমস্ত আমলা চাকর দাস দাসী বাড়ীর সকলকে ডাকাইয়া এবরাহিম হোসেনকে সম্মুখে বসাইয়া বলিলেন—

এবরাহিম!—আজ আট বছর তুমি আমার খেদমত খাদিমি করিয়াছ। আমার পেটের সন্তানের মতো আমাকে সেবা করিয়াছ, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে আমার যাবতীয় সম্পত্তি দালান-কোঠা বাড়ী ঘর গরু ঘোড়া মহিষ ছাগল খাসি ভেড়া যত কিছু আমার বাড়ীতে আছে, তাহার পর জমিদারী সমুদায় তোমাকে দিলাম। এই নেও দানপত্র, এখন তোমার ভাল মন্দ তুমি বুঝিয়া চলো। আর আমার কথা কহিবার শক্তি হইতেছে না।

এবরাহিম হোসেন সজল নয়নে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলে, আনার খাতুন সঙ্কেতে নিষেধ করিলেন। বেশী গোলযোগ নিবারণ করিতে বলিলেন। সকলেই আনার খাতুনের ব্যাধি শয্যার নিকট হইতে চির বিদায় হইলেন। মীর এবরাহিম হোসেন দত্ত মহাশয়ের সহিত কতক্ষণ কি গুপ্ত পরামর্শ করিয়া দলিল খানা দত্ত মহাশয়ের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন আপনার বাটিতে লইয়া সাবধানে রাখিবেন। পরে বিবেচনা মত কার্য।

সে দিন ঐ প্রকারেই কাটিল। প্রভাত সময়ে আনার খাতুন এবরাহিম হোসেনকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি আমার সন্তানের কার্য করিয়াছ। আমার যাহা ছিল তোমাকে দিয়াছি। তুমি সুখে থাকিবে। কখনই পরপীড়ন অত্যাচার মিথ্যা ব্যবহার করিও না। খোদাতালা তোমার রক্ষক তুমি আমাকে বিদায় দেও।

এবরাহিম হোসেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—যাহা খোদাতালার ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক! আপনি আমাকে দোয়া করিয়া যাউন। যাহা দিয়াছেন তাহা রক্ষা করিয়া আপনার উপদেশমত চলিতে পারি। এই দোয়া আমাকে করুন।

আনার খাতুন দুই হাত তুলিয়া খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিয়া এবরাহিম হোসেনের মঙ্গল কামনা করিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—এবরাহিম! আমি তোমাকে সম্পত্তি দিয়াছি কিন্তু সমুখেই তোমায় সমূহ বিপদ। আমার প্রাণ বাহির হইবে, তুমিও বিপদসমুদ্রে পড়িবে। স্থির থাকিও। খোদাতালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিও, সত্যের জয় চিরকাল। তুমি মিথ্যা

দলিল লইয়া দাঁড়াইতেছ না। আমি তোমাকে দিয়াছি। খোদাতালা তোমার রক্ষক।

আনার খাতুনের বাক্‌রোধ হইল। আর কথা কহিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল নির্বাকে থাকিয়া "লা এলাহাইল্লাহ মহামদার রসুলল্লাহ" কালেমা তিনবার স্পষ্টভাবে পাঠ করিয়া চিরনীরব হইলেন। প্রাণপাখি কোন্ পথে দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল কেহই বুঝিতে পারিল না। সকলেই কাঁদিয়া উঠিল। অতি প্রত্যুষে আনার খাতুন জগত ছাড়িলেন।

রাত্র প্রভাত হইতেই দত্ত মহাশয় আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার প্রতিপালিকা মহাদেবী ভবধামে আর নাই। ক্ষণকাল চক্ষের জল ফেলিয়া এবরাহিম হোসেনের হাতে ধরিয়া বলিলেন—ভাই এবরাহিম! তুমি আমার বয়সের বার ভাগের এক ভাগের সমান নও। আমি তোমার পিতার সমবয়সী। তত্রাচ তোমাকে আমি ভাই বলিয়া ডাকিলাম। তুমি জানিও আমি নিশ্চয়ই তোমার ভাই। তোমার সম্মুখে ভারি বিপদ। অদ্যই তোমার বিপদের প্রথম দিন— আমি আর বেশীক্ষণ এখানে থাকিব না। আসাদ আলী এই আসিল, আসিয়া তোমার সঙ্গে কখনি ভাল ব্যবহার করিবে না। তুমি ভয় করিও না। তবে গোঁয়ার গুণ্ডা লোক হঠাৎ রাগের বশে কিছু করিতে পারে। আজ বেশী মাত্রায় কিছু করিতে সাহসী হইবে না। তুমি শেষ পর্যন্ত দেখিয়া আমার বাটীতে আসিও। বাড়ীর নেগাহবান চাকর চাকরানী ইহারা সকলেই তোমাকে ভালবাসে। আজ হঠাৎ কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি ভাই কখনি রাত্রে এখানে থাকিও না। শেষ পর্যন্ত দেখিয়া আমার বাটীতে চলিয়া আসিও।

তুমি কর্ত্রীর কাফন দাফন সম্বন্ধে কোন কার্যে হাত দিও না। শাস্ত্রানুসারে তাহারাই তাহার অধিকারী। একটু কড়া ভাব দেখিলে ক্ষণকালও এখানে থাকিও না, আমার বাড়ী ত তুমি দেখিয়াছ? সাঁওতার উত্তর পার্শ্বে লাহিনী পাড়া,— লাহিনী পাড়ার উত্তরাংশ সংলগ্ন জয়নাবাদ তিনখানি গ্রাম, একখানি গ্রাম বলিয়াই বোধ হয়। জয়নাবাদ গ্রামের মধ্যেই আমার বাড়ী। আর বিলম্ব করিতে পারি না। তোমার আবশ্যক জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় যাহা তোমার সর্বদা প্রয়োজন, সেগুলি একটা বাক্সে পুরিয়া আমার বাটীতে পাঠাইয়া দেও। এখনি দেও— আমি চলিলাম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

আনার খাতুনের মৃত্যুর কথা—রাত্র প্রভাত হইতে হইতে চারিদিক বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখ, মিরপুর, কাঞ্চনপুরের প্রজাগণ ম্লান মুখে

সজল নয়নে আসিতেছে। এদরাকপুরেও সংবাদ গিয়াছে, তাহারাও এখনি আসিবে। আমি চলিলাম।

এই কথা বলিয়া দত্ত মহাশয় বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। দলে দলে প্রজাগণ আসিতে লাগিল। প্রজাগণ সকলেই মীর এবরাহিম হোসেনকে ভালবাসিত। প্রত্যেক গ্রামের মাথাল মাথাল প্রধান প্রজারা তাঁহার বিশেষ ভক্ত ছিল। ক্রমেই প্রজার দল আসিতে লাগিল।

প্রজাদিগের মধ্যে একদল আসিয়া সংবাদ দিল যে, খেয়াঘাটে নদীর ওপারে ঢাল সড়কি বাঁধা, বাঁধাকমরে বহুতর লাঠিয়াল পার হইবার জন্য খাড়া আছে। আমরা এপার হইতে দেখিলাম। তার মাঝে ঘোড়সওয়ার দুই চার জন দেখা গেল, পালকি দুই তিন খানা দেখিলাম। বোধ হইতেছে এদরাকপুর হইতে মীর আসাদ আলী সাহেব লাঠিয়াল সর্দার লইয়া আসিতেছেন। মীর এবরাহিম হোসেনকে সেলাম করিয়া প্রধান প্রধান প্রজাগণ বলিল—আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমরা উপস্থিত থাকিতে, তাহারা আপনাকে কোন প্রকার অপমান করিতে পারিবে না। তবে তাঁহাদের ভগ্নির উত্তরাধিকারী তাঁহারা, গোর কাফান দিবার মালিকই তাঁহারা। গোর কাফান দিয়া তাঁহারা যদি এ বাটী হইতে না যান তাহা হইলে আপনি কি করিবেন? আমরা আপনাকে অবশ্যই রক্ষা করিব। কিন্তু মীর আসাদ আলীকে এ বাটী হইতে তাড়াইতে পারিব না। তবে জমিদারী বল করে দখল করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রজারা সহজে খাজনা দিবে না। কারণ কর্ত্রীর দস্তখতি চিঠি আমরা পাইয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে, সমুদায় সম্পত্তি এবরাহিম হোসেনকে দান করিয়াছি। তোমরা এখন মীর এবরাহিমকে আপন মনিব মানিয়া খাজানাপত্র তাঁহাকে দিও,—আমার স্থানে তিনি জমিদার হইলেন। তরফ সাঁওতার এই ।⁄৬৯০ গণ্ডা মধ্যে আমার কোন্ স্বত্ব দাবি দাওয়া রহিল না।

এই চিঠিই আমাদের বল। এই বলেই মীর আসাদ আলীকে খাজানা দিব না। কিন্তু জনাব! লাঠির কাছে কিছুই টেঁকে না। তারা যদি মারপিট করে জবরাণ করে খাজানা আদায় করে তখন উপায় কি? আপনি আপনার ভাল পক্ষে যাহা ভাল বিবেচেনা করেন করিবেন। আমরা সহজে খাজানা দিব না। আর আমরা অতি কম হইলেও এক হাজার প্রজা এখানে উপস্থিত থাকিতে কার সাধ্য আপনাকে অপমান করে? তবে জনাব! তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে আমাদের সাধ্য নাই।

ঐ ত তাহারা আসিয়া পড়িল। লাঠিয়ালদিগের হোহো শব্দ শুনা যাইতেছে। একি আশ্চর্য কথা—তাঁহারা আসিতেছেন, লাশের সৎকার কাফন দাফন করিতে। ইহাতে লাঠিয়ালদলের ডাক ভাঙ্গাভাঙ্গি কেন? আমাদের দেশে যখন জমিদারে জমিদারে লড়াই বাধে সেই সময় এইরূপ লাঠিয়ালদিগের গলাবাজী শুনা যায়, লাশ মাটি দিতে মৃতার বাড়ী আসিতে এ সকল কি কাণ্ড?

ক্রমেই লাঠিয়ালদিগের হুঙ্কার নিকটে বোধ হইল। মুহূর্তমধ্যে মার মার শব্দ, বেহারাদিগের হুঁহুঁহুঁহুঁ শব্দ, ঘোড়ার খুরের চটপটীতে এক তুমুল কাণ্ড বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সদর দেউড়ি পার হইয়া বাহির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত। আসাদ আলী পাল্কী হইতে নামিয়াই কর্কশ স্বরে বলিতে লাগিলেন—কৈ সে নতুন জমিদার কৈ? সে এবরাহিম কৈ? কে সে? আমি তাকে চিনি না, দেখাও আমাকে।

মীর এবরাহিম হোসেন প্রজাদের অগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন। কোন কথা কহিতেছেন না। আসাদ আলীকে তাঁহাদের পক্ষের একজন লোক, মীর এবরাহিম হোসেনকে দেখাইয়া দিলেন—আসাদ আলী মীর এবরাহিমের প্রতি নজর করিতেই, যেন স্বভাবত দমিয়া গেলেন। পূর্বের ন্যায় তেজের সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রোধে কাঁপিয়া বিকৃত রবে কহিতে লাগিলেন—

তুমি এ বাড়ীতে কেন?—ভালভাবে বলিতেছি, তুমি এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। এক মুহূর্ত দেরি করিতে পারিবে না।—এখনি চলিয়া যাও।

এবরাহিম হোসেন বলিলেন—আপনি একটু স্থির হউন। পরে কথা বলিবেন।

আমি স্থির হই বা না হই তোমার তাতে কি?

আমার তাহাতে কিছু নাই। আমি কর্ত্রীর কাফন দাফন হওয়াটা দেখিতে চাই।—মৃতা ঘরে পড়িয়া আছেন। তাঁহার জন্যে কোন কথা নাই। তাঁহার গোসল—কাফন, জানাজা গোর এ সকল কার্যের ব্যবস্থা নাই আগেই তাড়াতাড়ি?

আসাদ আলী তখন একটু সামলিয়া গিয়াছেন। আবার ক্রোধ হিংসা অহঙ্কার আসিয়া মাথায় চাপ দিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—আপন সর্দার লাঠিয়ালদিগের প্রতি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, দেখছিস কি?—তোরা শুনছিস কি? যা যা বলে দিয়াছিলাম সব ভুলে গিয়াছিস! এবরাহিম হোসেনকে ঘাড়ে হাত দিয়া সাঁওতার সীমানা পার করে দিয়ে আয়। বলিতেই লাঠিয়ালরা মার

মার শব্দে অগ্রসর হইতেই দুই হাজার প্রজা হুঙ্কার ছাড়িয়া খাড়া হইল। বলিতে লাগিল—

কার সাধ্য! আমরা এখানে উপস্থিত থাকিতে মীর এবরাহিম হোসেনের প্রতি অত্যাচার করে? তার গায়ে হাত দিতে আর একপদ বাড়ায়?

আসাদ আলী পূর্বেই দমিয়া গিয়াছিলেন, এখন আরও দমিয়া বলিলেন—আচ্ছা, ঝগড়া বিবাদের কোন কথা নাই। ওকে তোমরা বলো আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাক।—ও এখান হতে না গেলে মৃতার কাফন দাফনের কোন জোগাড় করিব না।

মীর এবরাহিম হোসেন ভাবিলেন—সে ত বড় অন্যায় কথা। ওরা না হইলে অন্য কাহারও দ্বারা একার্য হইবে না। উহারা উপস্থিত থাকিতে অন্য কোন লোকের কাফন দাফন জানাজা করিবার অধিকার নাই। কি করেন অগত্যা বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। কর্ত্রীর ত শেষ ক্রিয়া হউক।

মনে মনে ভাবিয়া প্রধান প্রধান প্রজা কয়েকজনকে ডাকিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। তাহারাও তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিল। মীর এবরাহিম হোসেন লোকের গোলযোগে মিশিয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন কেহই দেখিতে পাইল না, জানিতেও পারিল না।

মীর আসাদ আলী আনার খাতুনের কাফন দাফন জানাজা করিয়া গোরে রাখিলেন, মাটি চাপা দিয়া আসিয়া বাড়ীঘর জামিদারী দখল করিয়া বসিলেন। হুকুম প্রচার করিলেন যে, এবরাহিমকে যে এই সাঁওতার সীমায় দেখিবে তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে খবর দিবে, না দিলে তাহার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইবে। আসাদ আলী খুব জাঁকজমকে ধুমধামে জমিদারী দখল করিতে বসিলেন।

মীর এবরাহিম হোসেন নিরুপায় হইয়া দত্ত মহাশয়ের বাটীতে গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বলিয়া আর কালবিলম্ব করিলেন না। যাহা কর্তব্য তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। দানপত্র লইয়া যশোহর চলিলেন। যশোহরে ইংলিশ গভর্নমেণ্টের বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। দেওয়ানী ফৌজদারী একই হাকিম বিচার করিতেছেন। মীর এবরাহিম হোসেন কয়েকদিন হাঁটিয়া যশোহরে উপস্থিত হইলেন। সে সময় হোটেল সরাইখানা কিছুই হয় নাই। কাহারও বাসায় থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কাহাকে চিনেন না। তাঁহাকেও কেহ চেনে না। তাহার উপর মকদ্দমা মামলার কথা। কি করিবেন কোথায় যাই যেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সামান্য কয়েকটি টাকা সঙ্গে আছে। দুই-চার দিন

খোরাকী চলিতে পারে, কিন্তু থাকিবার স্থান না পাইলে তাঁহার কোন আশাই পূর্ণ হয় না। সারাটি দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। বিচারালয় দেখিলেন, যৎসামান্য কিছু খরিদ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। এবরাহিম হোসেন রাস্তার ধারে একটি বকুলবৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছেন। মনে মনে কত ভাবনাই ভাবিতেছেন। স্বগত বলিতেছেন—কপাল মন্দ হইলে কিছুতেই কুলায় না। পিতামাতার নিকট আদরে ছিলাম, কপালের দোষে বাড়ী হইতে ঘোর নিশীথ রাত্রে একাই বাহির হইলাম। সে রাত্রে কত কথাই মনে হইয়াছিল। একদিন এক রাত কষ্টের পর খোদাতালা সহায় জুটাইয়া দিলেন,—প্রায় ৮ বৎসর তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলাম। তিনি দয়া করে কিছু বিষয় সম্পত্তি দিলেন, কপালক্রমে তাহাও হারাইলাম। যদি এই সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি তবে দেশে যাইব। না পারি—কিছু না হয় দূরদেশে আরও দূরদেশে চলিয়া যাইব, দেখি ভাগ্যে আর কি আছে।

যে দিন বাটী হইতে রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম সে দিনেও একা—আজিও একা—খোদাই সহায় করিয়া দিবেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। ভাবিতে ভাবিতে গায়ের কাপড় পাতিয়া গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, নিদ্রায় বিভোর। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে একটি স্ত্রীলোক—যুবতী নহে, প্রাচীনাও নহে, মাঝামাঝি ৩০।৩২ বৎসর বয়স—কলসী কাঁকে করিয়া ভৈরব নদে জল আনিতে যাইতেছে। যাইবার সময় মীর এবরাহিম হোসেনের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িতেই গাছতলার নিকটে যাইয়া ক্ষণকাল মাথা হেলাইয়া দেখিল লোকটা জীবিত—নিদ্রা যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বলিল, কি সুন্দর পুরুষ! যেমনই মুখের গঠন, তেমনি গায়ের রং—বয়সে যুবা কেবল গোঁপদাড়ি দেখা দিয়াছে, এভাবে এখানে শুইয়া আছে কেন? একি এই দেশের লোক? আকার প্রকার ভাবে দেহের গঠনে বোধ হইতেছে, কোন বড় ঘরের সন্তান—এরূপ ভাবে এখানে পড়িয়া ঘুমাইতেছে কেন? কথাটা ভাবিতে ভাবিতে নদীর ঘাটে যাইয়া জলে কলসী পূর্ণ করিয়া ঐ পথে আসিতেই দেখে সেই নিদ্রা—যেরূপভাবে ঘুমন অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিল জাগে নাই। স্ত্রীলোকটি কলসী নামাইয়া মীর এবরাহিম হোসেনকে জাগাইতে চেষ্টা করিলেন। এমন সময় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা তাঁহার শীয়রের দিকে গালে হাত দিয়া বসিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। জলপোরা কলসীটা স্ত্রীলোকের বামপার্শ্বে আছে। মীর এবরাহিম হোসেন উঠিয়া বসিলেন। বলিয়াই

স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে দুঃখিতভাবে চাহিতেই স্ত্রীলোকটিও তাঁহার দিকে ধীরভাবে চাহিয়াই বলিল—

তুমি এভাবে এখানে রাস্তার ধারে গাছতলায় শুইয়াছিলে কেন? এ শহরে কি কাহার ঘর বাড়ী নাই?

এবরাহিম হোসেন গম্ভীর ভাবে মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন, আমি বিদেশী, এখানে মাত্র আজ প্রাতে আসিয়াছি, আমি কাহাকেও চিনি না। কোথায় যাইব?

কাহাকেও চিন না বলিয়া কি মানুষের বাড়ী মানুষ যায় না? কত উকিল, মোক্তার, আমলা, বড়লোক—নিকটেই চাঁচড়ার রাজবাটি। গেলেই থাকিবার জায়গা পেতে।

আমি সে সকল যায়গায় যাইব না।

কেন?

কোন কারণ আছে।

আচ্ছা থাকুক—কারণ, তোমার দেশ কোন দেশ? আর তোমার নাম কি?

আপনি আমাকে মাপ করিবেন, ও দুটি সওয়ালের জবাব দিতে আমি এইক্ষণে অপারগ।

তোমার কি বাড়ী-ঘর-দোর নাই?

ছিল—এখন নাই।

মা বাপ আছে?

তাও বলিতে পারি না। আজ ৮ বৎসর মা বাপ ছাড়া হয়েছি।

এখন তোমার আশা কি?

আমার আশা বেশী কিছু নয়।

চাকুরী?

না—না—চাকুরি আমার বংশে কেউ করে নাই। আমিও চাকুরীর আশা করি না।

তবে তোমার আশা কি?

মীর এবরাহিম হোসেন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—আমার আশা—এই শহরে হাকিমের কাছারির নিকটে কোন স্থানে থাকিবার সুযোগ হইলেই আমার এইক্ষণের আশা পূর্ণ হয়।

তবে তোমার নামটি বলিতে হইবে। আর কি উদ্দেশ্যে তুমি শহরে আসিয়াছ—তাহাও খুলিয়া বলিতে হইবে।

বিশ্বাসী লোক না হইলে বলিতে পারি না।

কিসে বিশ্বাসী হওয়া যায় ?

আপনি বিরক্ত হইবেন না। বিশ্বাসী কিসে হওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—শুনুন। তাঁহার চরিত্র কেমন ? তিনি কথা গোপন রাখিতে জানেন কি না, আর একটি শক্ত কথা—আমার হিতপক্ষে তাঁহার চেষ্টা আছে কিনা ? আমাকে ভাল বলিয়া জানেন কিনা ?

স্ত্রীলোকটি একটু হাসিয়া বলিল—মহাশয়, এই কথা !! আপনি যদি ঘৃণা না করেন তাহা হইলে আমার বাটীতে আসিতে পারেন।

ঘৃণার কারণ কিছুই নাই। মাথা রাখিবার একটু স্থান পাইলেই আমি রক্ষা পাই।

স্ত্রীলোকটি কলসী কাঁকে করিয়া খাড়া হইয়া বলিল—আসুন আমার সঙ্গে।

মীর এবরাহিম হোসেন সেই দয়াবতীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারই বাটীতে বাসা করিলেন। তাঁহার সহিত ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া মনের কথা ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট ভাঙ্গিলেন। সেও তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। শেষে সপ্তাহকাল মধ্যে জেলার হাকিমের নিকট তাঁহার দরখাস্ত দাখিল হইল। কিন্তু পাঁপরে নালিশ করিলেন। কোন সম্পত্তি নাই কিছুই নাই, মোকদ্দমায় খরচ চালাইতে পারিবেন না। পাঁপরে ফরিয়াদী হইয়া সম্পত্তি পাইবার নালিশ করিলেন। হাকিম বিলাতী সাহেব, সম্পূর্ণ জেলার মালিক ঐ এক হাকিম। আর সে সময়ের পাঁপর, এখনকার পাঁপরের ন্যায় ছিল না। পাঁপরে ফরিয়াদীর মোকদ্দমা বিলম্বে হইত কিন্তু সমুদায় খরচ সরকার বহন করিতেন। দরখাস্ত দাখিল হইল। ছ-মাস এক বৎসর ক্রমে দুইটি বৎসর গত হইল। মোকদ্দমার কিছুই হয় না। মীর এবরাহিম ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ীতেই আছেন। সময় সময় কাছারিতে যান সন্ধানও করেন কোন খবর নাই। তাহার খাওয়া পরার সমুদায় খরচ সেই দয়াবতী স্ত্রীলোক সাহায্য করিতে লাগিল। আর এক বৎসর কাটিয়া গেল, একদিন এবরাহিম হোসেন জেলখানার নিকট হইয়া যাইতেছেন, সোরগোল হুলুস্থুলু ব্যাপার, রাস্তায় লোকের দৌড়াদৌড়ি—ঐ গেল—ঐ গেল—ধর ধর শব্দ তাঁহার কানে প্রবেশ করিল। তিনি সেই পথে সেইদিক যাইয়া দেখেন, চক্রাকারে মানুষের বেড়—মধ্যস্থলে একদল লোক, তাহাদের হাতে এক একটি লাঠি, পরিধানে জেলের কয়েদীর পোশাক,—লোহার বেড়ীর জিঞ্জির ছিঁড়িয়াছে, বলয়টা পায়েই রহিয়াছে। চতুর্দিকে জনসাধারণ, লাল পাগড়ি থানার বর বরকন্দাজ, দারোগা জমাদার সঙ্গী।

স্বয়ং হাকিম অশ্বে। বিলাতী সাহেব। মুখে পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো হুকুম। দারোগা জমাদার মুখেও পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো ধর ধর—হুকুমের উপর হুকুম। শুনিলেন বিখ্যাত ডাকাত দল—যশোহরের জেলখানা বাঁশের বেড়া দেওয়া ছিল, জেলখানা ভাঙ্গিয়া ৩২ জন ডাকাত জেলখানার পাহারাওয়ালা বরকন্দাজদিগকে মারপিট, জখম করিয়া হাতের হাতকড়ী পায়ের বেড়ী ভাঙ্গিয়া জেল হইতে গায়ের জোরে বাহির হইয়া যাইতেছে। কেহই ধরিতে পারিতেছে না। ডাকাত দলের চতুর্দিকে লোক ঘিরিয়া চলিয়াছে—তাহাদের নিকটে কেহই যাইতে পারিতেছে না। ধরিতেও পারিতেছে না। জেলখানা ভাঙ্গিয়া বত্রিশজন ডাকাত চলিয়া যাইতেছে—জেলের হাকিমবাহাদুর শুনিয়া অশ্বারোহণে আসিয়াছেন। কিন্তু ডাকাতদলের লাঠির নিকট সাহস করিয়া কেহই যাইতে সাহসী হইতেছে না। যে একটু অগ্রসর হইয়া তাহাদের দিকে যাইতেছে—লাঠির বাড়ি খাইয়া হয় পড়িতেছে, না হয় হটিতেছে।

এবরাহিম হোসেন সে জনতার মধ্যে মিশিয়া চলিলেন। ডাকাত দল এমনি কৌশলে লাঠি ভাঁজিতেছে, কেহই তাহাদের নিকট যাইতে পারিতেছে না। রাস্তার দুইধারে বাড়ীঘর, তাহাতেই তাহারা যেন মৃদু মৃদু ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ক্রমে ফাঁকা যায়গায় মাঠের মধ্যে পড়িলে সাধ্যও নাই যে কেহ তাদের নিকটে যায়, লাঠির আগে দাঁড়ায়। এইরূপ লাঠির সাহায্যে প্রায় ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল। শহর ছাড়িয়ে মাঠে পড়িবে—এমন সময় সাহেব হুকুম দিলেন, থানার বরকন্দাজ লোক কোন কাজের নহে। এই তো শহরের শেষ সীমা অতি নিকটে শহরের মধ্যে যখন ডাকাত দল ধরা পড়িল না, মাঠে বাহির হইলে কি আর তাহাদের নিকট কেহ যাইতে পারিবে? ধর ধর, যাহার শক্তি থাকে সেই ধর। বকশিস দিব। চাকরি দিব। যে উপযুক্ত মত যাহা চায়—সম্ভব মত যে চাকরি চায়—তাহা আমি অদ্যই দিব। যদি ডাকাত দলকে ধরিতে পারে।

সাহেবের ঘোষণা শুনিয়া মীর এবরাহিম হোসেন কোমর বাঁধিয়া এক দারোগার হাতের লাঠি সজোরে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—সাহেব! এ সকল কাজ সাহসের কাজ। ছি ছি!—এদেশে কি পুরুষ নাই। চার পাঁচশত লোকের মধ্য হইতে ৩০/৩২ জন লোক শুধু লাঠি ভাঁজিয়া চলিয়া যায়। আলী আলী কাছাড়িয়া ডাকাত দলের মধ্যে পড়িলেন। তিন চারবার লাঠি ঘুরাইয়া ভাঁজিতেই ৪।৫ জন ডাকাত তাঁহার মাথায় লাঠি মারিতে উদ্যত হইল। সাহেব দেখিতেছেন, দারোগা জমাদার দেখিতেছেন, দর্শকমণ্ডলী দেখিতেছেন। এ লোকটা ডাকাতের হাতে

আজ মারা পড়িল। দেখিতে দেখিতে কি দেখিল! সেই লোকটার লাঠির ভাঁজে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। চক্ষের পলকে দুই ডাকাতের মাথা ফাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আর পায় কে? মার মার করিয়া আর আর লোকসকল ডাকাত দলে পড়িয়া লাঠির ঘায়ে সকল ডাকাতকে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। মীর এবরাহিম হোসেন তখন মাটিতে পড়া ডাকাতদিগকে কাপড় দিয়া পিটমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। সমুদায় ডাকাত ধরা পড়িল। সমুদায় লোক স্বয়ং সাহেব বাহাদুর মীর এবরাহিম হোসেনের পিট চাপড়াইয়া, সাবাস সাবাস বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কেহ আলিঙ্গন করিয়া জড়াইয়া ধরিল। কেহ বলিল, ভাই! তোমার বাড়ী কোথা। খুব কপাল জোর—কম হইলে দুশ টাকা বকশিস পাইবে।

দারোগা জমাদার বরকন্দাজগণ ডাকাতদিগকে বাঁধিয়া জেলখানায় লইয়া গেল। জজ সাহেব মীর এবরাহিম হোসেনকে ডাকিয়া পিট চাপড়াইয়া বলিলেন, সাবাস! সাবাস বাবা! তুমি আমাদের মান রক্ষা করিয়াছ। তুমি এরূপ সাহস করিয়া ডাকাতের দলের মধ্যে না পড়িলে ঐরূপভাবে মাথা ফাটাইয়া না দিলে কখনই এই সকল দুরন্ত ডাকাত ধরা পড়িত না। খুব বাহাদুর ছেলে! আমি তোমাকে দুশ টাকা বকশিস দিব।

মীর এবরাহিম হোসেন সেলাম বাজাইয়া সাহেবকে বলিলেন—হুজুর! আমি আপনার হুকুম তামিল করিয়াছি বকশিস পাওয়ার জন্য ডাকাতের মাথায় লাঠি মারি নাই। হুজুরের হুকুম তামিল করিয়াছি।

বেশ বেশ আমার হুকুম তামিল করিয়াছ। আমি খুশি হইয়া তোমাকে বকশিস দিব।

হুজুর আমাকে বকশিস দিয়া আমার কুলে কলঙ্কদাগ বসাইবেন না। আমি বকশিস চাহি না।

আমি তোমাকে দারোগা বানাইব। দারোগাগিরি চাকুরী দিব।

দোহাই ধর্মাবতার! আমার বংশে কেউ পরের হুকুমবরদারী তাঁবেদারী করে না। আমি চাকুরী চাহি না।

সে কি? চাকুরী কেহ পায় না।—তুমি স্বীকার কর না, এ বড় আশ্চর্য কথা! তুমি কি চাও?

হুজুর আমি চাই আপনার অনুগ্রহ ও দয়া।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—ঐ আমার অনুগ্রহ ও দয়া।

না হুজুর, ঐরূপ অনুগ্রহ দয়া আমি চাই না।

কিরূপ অনুগ্রহ ও দয়া তুমি চাও, বল।

হুজুর, আমি আমার অবস্থা হুজুরে নিবেদন করিব। আপনি শুনিবেন এই অনুগ্রহ ও দয়া আমি চাই।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—এতো সহজ কথা—বল।

না হুজুর! আমি এখানে বলিতে চাহি না। আপনার ঘরে যাইয়া সকল কথা হুজুরে বলিব। আমার মনের কথা সমুদায় হুজুরে নিবেদন করিব।

আচ্ছা আচ্ছা! ভাল কথা। তুমি প্রাতে হাত মুখ ধুইয়াই আমার কুঠিতে যাইও। তখন আমি নির্জনে থাকিব। তোমার মনের কথা মনোযোগের সহিত শুনিব—বলিয়াই সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন।

দর্শকগণের মধ্যে থানার দারোগা জমাদারদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা মীর এবরাহিম হোসেনকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই বলিলেন ২০০ শত টাকা কম কথা! তাহা লইল না। দারোগা মহলের কথা। দারোগাগিরী চাকুরী, সাদা চাকুরী তাই লইল না। এ বেটা নিশ্চয় পাগল। মনের কথা সাহেবের নিকট বলিবে। ওর আবার মনের কথা কি? বেটা নিতান্তই আহম্মক। আপন লাভ কিছুই বোঝে না। এইরূপ যাহার মনে যে কথা উঠিল যাহার মাথায় যে কথা উদয় হইল তাহাই বলাবলি করিতে করিতে আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল।

মীর এবরাহিম হোসেনও আপন বাসায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আশ্রয়দাত্রী সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, দেখ এবরাহিম! তোমার আসিবার পূর্বেই আমি লোকের মুখে রাস্তার লোকের মুখে শুনিয়াছি যে এইরূপ আকৃতির একটি যুবাপুরুষ সেই ডাকাত ধরিয়াছে। জজ সাহেব তাহাকে ২০০ শত টাকা পুরস্কার দিতে চাহিল, সে তাহা লইল না। চাকুরী দিতে চাহিল তাহা স্বীকার করিল না। কেবল চাহিল সে সাহেবের সাক্ষাৎ।

আমি বড় খুশী হইয়াছি। তোমার প্রার্থনার কথা শুনিয়া আমি বড়ই খুশী হইয়াছি—রাত্রে প্রভাত হইলেই তুমি সাহেবের কুঠিতে যাইও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

রাত প্রভাত হইল। এবরাহিম হোসেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া জজ-সাহেবের কুঠিতে গেলেই চাপরাসীরা তাহাকে দেখিয়া বড় খুশী হইল। সাহেবের নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ দিতেই সাহেব বাহিরে আসিয়া এবরাহিম হোসেনকে

বসিতে আসন দিলেন, নিজেও বসিলেন এবং বলিলেন, এবরাহিম হোসেন! আমি তোমার সাহস শক্তি বীরত্ব দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কি তোমার কথা বল শুনিতেছি।

মীর এবরাহিম হোসেন আদি-অন্ত বিবরণ—আনার খাতুন বিবির বাটীতে আগমন, তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করা, তাহার পর দানপত্রের কথা, সমুদয় সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়ার কথা, আনার খাতুনের মৃত্যু, আসাদ আলীর আগমন, সাঁওতায় আসিয়া বলপূর্বক বাটী দখল, তাঁহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার কথা• সমুদয় স্পষ্টভাবে সাহেবের নিকট বলিলেন। তাহার পর পাঁপয়ে দরখাস্ত, আজ তিন বৎসর গত হয়, বিচার হয় নাই। তিনটি বৎসর যশোহরে সামান্য লোকের ন্যায় অতি সামান্য স্থানে থাকিয়া মোকদ্দমার বিচার অপেক্ষায় আছেন। এইক্ষণে প্রার্থনা—হুজুর! আমার দরখাস্ত ও দলিল দেখিয়া যাহা বিচারে সাব্যস্ত হয় তাহাই করুন। আমার মোকদ্দমায় সুবিচার হইলেই সহস্র প্রকার পুরস্কারে পুরস্কৃত হইব।

সাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—এবরাহিম হোসেন! তুমি অদ্য কাছারির সময় কাছারিতে আমার এজলাশে যাইবে। তুমি কোন কথা বলিও না তোমাকে দেখিলেই আমার মনে হইবে। কোন কথা কহিও না, কি জন্য কাছারিতে উপস্থিত হইয়াছ—তাহাও কাহার নিকট বলিও না। তাহার পর আগামী কল্য পুনরায় ১১টার সময় কাছারিতে উপস্থিত থাকিবে। তোমার নাম ধরিয়া আমার আরদালী ডাকিলেই এজলাসে উপস্থিত হইবে। যাও কোন চিন্তা করিও না।

মীর এবরাহিম হোসেন ঘাড় নওয়াইয়া সাহেবকে সালাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। সমুদয় কথা তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিনী আশ্রয়দাত্রীর নিকট প্রকাশ করিলে স্ত্রীলোকটি অতিত্রস্তে তাঁহার আহারের জোগাড় করিয়া দিয়া নিয়মিত সময়ে কাছারিতে পাঠাইয়া দিলেন।

মীর এবরাহিম কাছারী মধ্যে যাইয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।—সাহেবের নজর পড়িল না—সাহেব কাছারী যাইয়াই পেস্কার সেরাস্তাদারকে ডাকিয়া মীর এবরাহিমের দরখাস্ত ও দানপত্র বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা এবরাহিম হোসেনের স্বপক্ষে যতদূর বলিতে হয় তাহা বলিয়াছেন। শেষে দরখাস্ত সহ দানপত্র আনিয়া দেখাইয়াছেন।—আর বলিয়াছেন বিপক্ষ আসাদ আলীকে অনেকবার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তলব করা হইয়াছে। সে ইংরাজের বিচার চাহে না। সে হুজুরের বিচার খবরেই আনে না। সাহেব হুকুম দিয়াছেন আগামীকল্য ১১টার পর মোকদ্দমার বিচার করিব। দরখাস্তকারী কাছারীতে আসিলেই

তাহাকে বলিয়া দিও।—এ সকল কথাবার্তা মীর এবরাহিম কাছারী যাওয়ার পূর্বেই স্থির হইয়াছিল।

একটু পরেই সাহেবের নজর তাঁহার প্রতি পড়িতেই সাহেব বলিলেন—আপনি কল্য ১১টার সময় কাছারীতে উপস্থিত হইবেন। এবরাহিম হোসেন সেলাম করিয়া বাসাবাড়ীতে আসিলেন। সেদিন চলিয়া গেল। পরদিন ১১টার সময় কাছারীতে উপস্থিত হইলেই তাঁহার ডাক পড়িল। সাহেবের এজলাসে খাড়া হইলেন। সাহেব বলিলেন তোমার নালিশের কথা কি? প্রথম হইতে আমার নিকট বল। মীর এবরাহিম হোসেন আদি-অন্ত বিবরণ সাহেবের নিকট এজাহার করিলেই সাহেব দানপত্র বহাল রাখিয়া দানপত্রের লিখিত সমুদায় সম্পত্তি ডিক্রী দিলেন। ডিক্রীর সম্পত্তির সরকার পক্ষ হইতে দরখাস্ত-কারীকে দখল দেওয়ার জন্য সে সময়ের প্যাদা "বালাগন্তী" দুইজন সাব্যস্ত হইল। তাহারা এবরাহিম হোসেনকে সাঁওতায় লইয়া বাটী ও জমিদারীতে দখল দেওয়াইবে। টাকা পয়সা যে যেখানে আত্মসাৎ করিয়াছে, কি চক্রান্ত করিয়া গোপন করিয়াছে সমুদায় আদায় করিয়া দিয়া আসিবে। যদি কেহ এই দখলে বাধা দেয় তাহাকে বাঁধিয়া থানায় চালান দিয়া হুজুরে পাঠাইবে।

মীর এবরাহিম হাকিমকে সেলাম করিয়া বাসায় আসিয়া আশ্রয়দাত্রীকে সকল অবস্থা জানাইয়া কয়েকদিন থাকিয়া হুকুমনামা এবং দানপত্র ফেরৎ লইয়া বালাগন্তী সহকারে যশোহর হইতে রওয়ানা হইলেন। আশ্রয়দাত্রী রমনী সন্তোষ সহকারে তাহাকে বিদায় করিয়া কিছু অর্থ খরচপত্র সাহায্যের জন্য অর্পণ করিয়া বলিল, এবরাহিম হোসেন! তুমি, সুখে থাকিবে। যদি কখনও যশোহরে আসিতে হয়—আমার সঙ্গে দেখা করিও।

মীর এবরাহিম হোসেন বালাগন্তী প্যাদাদ্বয় সহ যশোহর হইতে রওনা হইলেন। সে সময় "পায়দল" পদব্রজ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। পালকির ব্যবহার আছে সে কেবল রাজা জমিদার হাকিমান লোকেরাই যোগাড় করিয়া ব্যবহার করেন। কাজেই মীর এবরাহিম হোসেন বালাগন্তী সহ পাঁচ দিন হাঁটিয়া ছয় দিনের দিন প্রাতে সাঁওতার খেয়াঘাট পার হইতেই লোক বালাগন্তী প্যাদার সাজসজ্জা দেখিয়া-হৈ-হৈ-রৈ-রৈ শব্দ পড়িয়া গেল। সে সময় বালাগন্তীর নাম শুনিলে বড় বড় জমিদার অস্থির হইয়া উঠেন। সাধারণ লোক কে কোথায় পালায় তাহার খোঁজ খবর থাকে না। পারানী ঘাট পার হইয়া সাঁওতার মাটিতে পা রাখিলেই চারদিকে বালাগন্তীর নাম ছড়াইয়া পড়িল। আসাদ আলী ভয়ে

আড়ষ্ট হইয়া কোথায় কোন পথে পলাইবেন তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। সঙ্গের লোকজন সহ খিড়কির দরওয়াজা দিয়া ঝাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, কয়ার ঘাট পার হইয়া এদরাকপুর মুখ হইলেন। কয়ার ঘাট সাঁওতার উত্তরে। সাঁওতা পিছনে রাখিয়া সম্মুখের ঘাট কয়ার ঘাট পার হইয়া চিরকালের মত, আনার খাতুন বিবির বাড়ীঘর জমিদারী ছাড়িয়া প্রাণটি লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু, মনের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে মীর এবরাহিমের সহিত ভয়ানক শক্রতার সৃষ্টি হইল। আজীবন শক্রতা করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। সে সকল শক্রতার বিষয় বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। হিংসা এমনই বালাই যে সেই শক্রতা বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়া বিগত ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইয়াছে। আসাদ আলীর বংশে বাতি দিতে আর কেহ নাই।*

মীর এবরাহিম হোসেন বাড়ীঘর জমিদারী দখল করিয়া লইলেন। আনার খাতুনের সময়ের কার্যকারকগণকে সমাদরে আনাইলেন। যাহার যে কার্য ছিল তাহাতেই নিযুক্ত করিলেন। সময়ে লোকজন কার্যকারক আরদালী নেগহবান সহ—পালকি আরোহণে পদমদীতে যাইয়া পিতামাতার চরণে পতিত হইলেন। পিতামাতা হারাধন পাইয়া খোদার দরগায় সোকরা আদায় করিয়া পুত্রধন ক্রোড়ে লইলেন। এবরাহিম হোসেন কিছুদিন পদমদী থাকিয়া সাঁওতায় আসিলেন। কখনও সাঁওতা কখনও পদমদী যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শেষে পিতামাতার যত্নে বিবাহ করিলেন। বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে, মীর জোলফেকার আলী, কনিষ্ঠ পুত্র মীর মোয়াজ্জম হোসেন, কন্যা হাফিজা খাতুন ও নসিমা খাতুনের জন্ম হইল। তাহার পর—সাঁওতা গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত স্থান দেখিয়া নতুন বাড়ী প্রস্তুত

* আসাদ আলীর পুত্র মীর সাজ্জাদ আলা—মীর সাজ্জাদ আলা, চিরকাল মীর এব্রাহিম হোসেনের পুত্র মীর জোলফেকার আলী, মীর মোয়াজ্জম হোসেন সাহেবের সহিত শক্রতা করিয়াছেন। সাজ্জাদ আলীর পুত্র মীর মহসেন আলী মীর মোয়াজ্জম হোসেনের পুত্রগণ ও মীর জোলফেকার আলীর কন্যা সুকরণনেসা ও তাঁহার পুত্র নুরন্দীন এমামদ্দীন সহিত একাল পর্যন্ত ঘোর শক্রতাসাধন করিয়াছেন। মীর মহসেন আলীর বংশে কেহ নাই। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে কুষ্টিয়ার বাসাবাটিতে ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিলেন। রাত্র প্রভাত সময়ে হঠাৎ পশ্চাদ্ দিক হইতে কে যেন আসিয়া ছেন দা অর্থাৎ খেজুর গাছ কাটা দার দ্বারা কাটিয়া খুন করিয়াছে। যে সময় ঘাতুক আঘাত করে সে সময় নাকি তিনি জাগ্রত ছিলেন। গরমের জন্য পাখা হাতে করিয়া বাতাস লইতেছিলেন। হস্তে ছেন দার দ্বারা আঘাত করিলেই তিনি তাহার নাম ধরিয়া বলেন যে করম আলী তুই আমাকে খুন করিলি। করম আলা তাঁহার প্রজা। মোকদ্দমা কুষ্টিয়ার ডিপুটী মাজিষ্টার এজলাসে বিচার হইয়া দায়রার সোপর্দ্দ হইয়া করম আলীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে।

করিলেন। সেই বাটীর দালান কোটা আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। সুকরণ নেসার পুত্র সাহ এমামদ্দীন, এবং পৌত্র সাহ সামছদ্দীন বাস করিতেছেন।

মীর এবরাহিম হোসেনের দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং পরিবার লইয়া নূতন বাড়ীতে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া জমিদারীর কার্যভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। মানবভাগ্যে চিরকাল সুখ-দুঃখ সমভাবে সমান যায় না। মীর এবরাহিম হোসেনের সুখের সংসারে দৈব দুর্ঘটনায় দুঃখের ছায়া পড়িতে আরম্ভ হইল। তাঁহার স্ত্রী পীড়িতা হইলেন। দুরন্ত রোগ অজ্ঞাতে আসিয়া আক্রমণ করিল। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না, কিন্তু রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না—কয়েক মাস ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান মীর মোয়াজ্জম হোসেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা হাফিজন্নেসার যত্নে, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর জোলফেকার আলীর স্নেহ ভালবাসায়, মাতৃহারা কনিষ্ঠ সন্তান কোন প্রকারে কষ্টের ভোগ, কিঞ্চিৎমাত্রও ভোগ করিলেন না। সর্বোপরি দৃষ্টি পিতার। মাতৃহারা সর্ব কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি পিতার যত্ন আদর স্বভাবতই অধিক হইয়া থাকে।

বিষয়াদির কার্য মীর জোলফেকার আলী অতি সুন্দর রূপে নির্বাহ করিতেছেন। বৃদ্ধ মীর সাহেবকে সে সকল বিষয় কিছুই দেখিতে হয় না। কোনরূপ চিন্তারও কারণ হয় না। কিছু দিন পরে নলডাঙ্গার রাজাবাহাদুর তরফ সাঁওতার হিস্যা আর নিজ জমিদারী ভুক্ত রাখিলেন না। কোম্পানীর খাস আমলের বন্দোবস্ত সময় মীর এবরাহিম হোসেনের নামে লিখাইয়া দিলেন। সরকার বাহাদুর মীর এবরাহিম হোসেনের নামে তৌজিতে নাম রেজিস্টারী করিয়া লইলেন। সদর খাজানা ইত্যাদি মীর এবরাহিমের নিকটই আদায় হইতে লাগিল। মীর সাহেবের সময় ঐ সম্পত্তির আয় পূর্ব হইতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা হাফিজন্ নেসার বিবাহ অল্প বয়সে হইয়াছিল এবং অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতার ঘর সংসারের কার্য তিনিই করিতেন। বাটীর মধ্যে তিনিই কর্ত্রী ছিলেন। বাহিরের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান কার্য মীর জোলফেকর আলী করিতেন। পরিবারগণের মধ্যে কাহারও কোন প্রকারে মনঃকষ্টের কারণ ছিল না। ভাই ভগ্নী, বাহির ভিতরের কার্য দৃষ্টি করায়, তাঁহাদের ঘর-সংসার সুখের সংসারে পরিণত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর এই প্রকার সুখেই সংসার চলিল। ঝগড়া বিবাদের নাম নাই। স্ত্রীলোকেরা হিংসাবশে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকে, একের উন্নতি অপরে দেখিতে নারাজ—মীর সাহেবদিগের সংসারে সে সকল কুলক্ষণ,

অমঙ্গলের নামগন্ধও ছিল না। মনের সুখে সকলেই মহাসুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। মীর এবরাহিম হোসেন কখনও পৈতৃক বাটী পদমদীতে গমন করিতেন, কিছুদিন তথায় থাকিয়া আবার নিজ বাটী সাঁওতায় আগমন করিতেন।

একবার পদমদী হইতে নৌকাপথে সাঁওতায় আসিতে দক্ষিণবাড়ীর বাজারের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া স্নান আহারের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। নৌকার দাঁড়ী মাঝিরা নৌকার নিকটেই উনুন জ্বালিয়া ভাত রাঁধিতেছে। নৌকার উপরে তাঁহাদের পাক হইতেছে। মীর এবরাহিম বসিয়া আছেন। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা মাটির কলসী কাঁকে একহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া নদীর ঘাটে আসিয়া জলে নামিতেছে বস্ত্রাবৃত হইয়াই জলে ডুব দিতেছে, গা মাজিতেছে। চুপে চুপে দুই একটি কথা কহিয়া ভিজে কাপড়েই কলসী ভরিয়া মাথা মুখ ঢাকিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে সময় চরখার হাতকাটা সূতায় গ্রাম্য জোলাহারা হাত-তাঁতে যে কাপড় বুনাইত, তাহাই সকলের ব্যবহার্য ছিল। সে কাপড় গৃহস্থ মেয়েদের বিশেষ উপযোগী। একখানা কাপড় হইলে এক বৎসর যাইত। সে কাপড় এত পুরু ঘন বুনানী যে জল বাঁধিয়া এক ক্রোশ পথ অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইত। ময়লা হইলে ক্ষারে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইলে ধবধবে সাদা হইত। অঙ্গাবরণের অধিক উপযোগী ছিল। ভিজিয়া গায়ে সাট হইয়া লাগিয়া গেলেও দেহের বর্ণ ফুটিয়া বাহির হইত না। কত স্ত্রীলোক আসিতেছে, জলে নামিতেছে, স্নান করিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে একটি যুবতী স্ত্রীলোককে দেখিলেন, সে নাক মুখ ঢাকিয়া ঘোমটা দেয় নাই, সঙ্গিনীদের সহিত যে কথা কহিতেছে—তাহাতেও একটু বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ভদ্রতার সহিত কথা কহিতেছে। দেহের বর্ণ স্পষ্ট চক্ষে না পড়িলেও দেহের গঠন দেখিয়া বৃদ্ধ মীর সাহেব অনুমান করিলেন যে, এ স্ত্রীলোকটি একেবারে কৃষক শ্রেণীর কন্যা বলিয়া বোধ হইতেছে না। আবার ভাবিলেন গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে হইলে এত বয়সে বিবাহ হয় নাই, অতি আশ্চর্য।

সে সময় সধবা স্ত্রীলোকের নাকে কানে হস্তে কোন না কোন অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার থাকিত। সাধারণ কৃষক, কারিগর শ্রেণীর হাতে পায়ে কাঁসার অলঙ্কার, জোলাহাদিগের হাতে পায়ে দস্তার অলঙ্কার শোভা করিত। অবস্থা ভাল হইলে কানে সাধারণ চাঁদীর ঝুমকা ব্যবহার হইত। দক্ষিণ বাড়ী পদমদী অঞ্চল বর্ষাকালে এক প্রকার জলে ডুবিয়া যায়, এখনও বর্ষাকালে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলে অধিকাংশ স্থানেই নৌকার প্রয়োজন হয়। নৌকা অভাবে কলাগাছের

ঝাঁড় বাঁধিয়া ঘরের কানাচে বাঁধিয়া রাখে, প্রয়োজন মতে ব্যবহার করে। বাড়ীর নিকট জল যতদিন শুকাইয়া না যায়, ততদিন ঐ জলেই সকলে স্নান করে। অনেক গরীব ভদ্রঘরের মেয়েরাও বাড়ীর কানাচির জলে নামিয়া স্নান করিয়া থাকে। যাহাদের বাড়ীর নিকটে নদী, গরীব ভদ্রঘরের মেয়ে হইলেও সে সময়ে নদীতে নামিয়া স্নান করিত। এইক্ষণে অনেক স্থানে পূর্ব ভাব নাই, অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সভ্যতা প্রথা সাধারণ কৃষক গার্হস্থ সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। কাঁসার অলঙ্কার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, থালা বাটি গ্লাসেও কাঁসার ভাঁজ পাওয়া যায় না। ইনেমেল, চিনে কাঁচ, কাঁসার বাসনের স্থান অধিকার করিয়াছে। কাঁসা, দস্তার স্থানে অঙ্গে সোনা রূপা কাঁচ উঠিয়াছে। সেই সময় বিধবার অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার শোভা পাইত না। এখন আর সে কাল নাই। বিধবা সধবা চেনা ভার।

মীর এবরাহিম হোসেন ধোঁকায় পড়িয়াছেন। সে যুবতী কন্যাটি কুমারী,—সধবা কি বিধবা? অতবড় মেয়ে কুমারী হইতে পারে না। তবে কি বিধবা? বৃদ্ধ মীর সাহেবের মনে এই তর্ক উপস্থিত হইল কেন? তিনি এ সন্ধানে ব্যস্ত হইলেন কেন? ঈশ্বরের মহিমা। দক্ষিণবাড়ী পদমদীর অতি নিকটে। সকলি তাঁহার চেনা। তখনই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। খানসামা খেদমতগার দ্বারা সন্ধান করাইলেন। দুই তিনটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেই সকল কথা ব্যক্ত হইল। সন্ধানীরা আসিয়া বলিল যে এইগ্রামে মলঙ্গ ফকীর নামে যে গরীব ভদ্রলোক আছে তাহারই বিধবা কন্যা। ৭ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। এখন ২০।২১ বৎসর বয়স।

বৃদ্ধ মীর সাহেব ঐ কথা শুনিয়া বিশেষ চিন্তায় চিন্তিত হইলেন। আহার সমাধা করিয়াই নৌকা ছাড়িবার কথা। নৌকা ছাড়া হইল না। মাঝি মাল্লারা আহার সমাধা করিয়াই নৌকা ছাড়িতে আদেশ চাহিল। আদেশ পাইল না। বরং নিষেধসূচক ইঙ্গিত প্রকাশ পাইল। মাঝিরা মনের আনন্দে গাছতলায় পাইলের ছালা বিছাইয়া শয়ন করিল। বৃদ্ধ মীর সাহেব চিন্তায় নিমগ্ন। অনেক চিন্তা অন্তরে, অনেক প্রকার চিন্তার কথা,—অবতারণা করিয়া শেষে মুখ ফুটিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন—দাসী বান্দীর দ্বারা সেবা শুশ্রূষা কখনই হইতে পারে না। একটু সম্বন্ধে জড়িত থাকিলে মায়া মমতা ভক্তি ধর্ম এই চার একত্রে, সেবা শুশ্রূষায় আরাম পাওয়া যায়। একটি কথা—আমার বয়স? তাহাতে আমি কোন ক্ষতিই দেখতেছি না। তাহার পর শক্ত কথা আমার ছেলে মেয়ের কোনরূপ কষ্টের কারণ হইবে কিনা? হইতে পারে কি না?—তাহাদের কোনরূপ মনঃকষ্টের

কারণ হয় কি না?—ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহারাই সর্ববিষয়ে কর্তা। বাহিরে ঘরে সংসারে তাহারাই সকল। তাহারাই মালিক, তাহারাই প্রবল, তাহারাই সর্বে-সর্বা। তাহাদের আবার কষ্টের কারণ কি? তাহাদের অধীনেই থাকিতে হইবে। তাহাদের হুকুম মতেই চলিতে হইবে। তাহারা যাহাতে খুশী থাকে সেই ভাবেই বাস করিতে হইবে। তাহাদের কষ্ট কি? সন্ধ্যা হইয়া আসিল জনৈক খেদমতগার দ্বারা মঙ্গল ফকীরকে ডাকাইয়া নৌকায় আনিলে—সে দুইহাতে সেলাম বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া বৃদ্ধ মীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এ-আলাপ সে-আলাপের পর মীর সাহেব নৌকা হইতে নামিয়া মঙ্গলের সহিত নির্জনে কথা কহিতে লাগিলেন।

অনেক কথা হইল। শেষে মীর সাহেব মনের কথা প্রকাশ করিলেন। মঙ্গল শ্রবণমাত্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। স্পষ্টই বলিল হুজুরের যাহা ইচ্ছা হয় করুন। আমরা তাঁবেদার। যে আজ্ঞা করিবেন তাহাই তামিল হইবে। এখনি লইয়া যান। আমার সৌভাগ্য,—তাহার সৌভাগ্য। আমার চৌদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য যে, আপনার নজরে পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ মীরসাহেব বলিলেন—তবে আর বিলম্ব করিও না। তুমিও আমার সঙ্গে সাঁওতায় চল, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া তুমি চলিয়া আসিও। তুমি সঙ্গে থাকিলে ভয়ের কোন কারণ হইবে না। বাপ মা ছাড়িয়া ভিন্নস্থানে যাইতেছে বলিয়া মনে কোন কথাই উদয় হইবে না। সেও ভাবিতে পারে তুমিও ভাবিতে পার যে বান্দী বানাইতে লইয়া যাইতেছে। তাহা মনে করিও না। আমি নেকাহ করিব। মঙ্গল ফকীর বাড়ির খরচ পত্র ও স্ত্রীর কাপড়ের জন্য কিছু টাকাও প্রাপ্ত হইল।

আর কোন কথারই আপত্তি নাই, শীঘ্র শীঘ্র সকল কার্য সমাধা লইয়া গেল। রাত্র আড়াই প্রহরের সময় নৌকা ছাড়িয়া চন্দনার উজান জল,—মাঝিরা গুন টানিয়া চলিল। যথা সময়ে সাঁওতার ঘাটে নৌকা লাগিলে বৃদ্ধ মীর সাহেব বাটীতে উঠিলেন। কয়েকমাস পর পুত্র কন্যাগণ পিতৃদেবকে দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে দক্ষিণবাড়ীর বাজারের ঘাটের কাণ্ড-কথা লোকজনের মুখে শুনিয়া, পরে স্বচক্ষে দেখিয়া সকলেই মনে মনে দুঃখিত হইলেন—মীর জোলফেকার আলী বিষয়কর্মে বড়ই পাকা ছিলেন, ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহার মাথায় অধিক পরিমাণে ছিল। ধৈর্য গুণও অত্যধিক ভাবে মজ্জার শিরায় শিরায় সংযোজিত ভাবে চাপা গুপ্ত প্রকাশ্য তিন ভাবে ছিল। তিনি বেশী কথা

বলিতেন না। আজ সে চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ মহা বিষয়কার্যে পরিপক্ক, মুখে অনেকক্ষণ পর মৃদু মৃদু ভাবে কথা বাহির হইল—এ সংসারের সুখ শান্তি আজ হইতে ফকীরের পদধূলিতে ঢাকা পড়িল। অথবা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অলক্ষ্মীর অঞ্চল স্পর্শ করিল। পিতা মহাপূজনীয়, পুত্রকে সকলি সহিতে হয়,—তাঁহার মন যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে তাহাতেই পুত্রের সন্তোষ থাকা কর্তব্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে ঈশ্বর জানেন। ইহার পর আরও যদি কিছু অগ্রে বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই অমঙ্গলের কথা। ছোট ভাইটির প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী হাফিজন্‌নেসার নিকট এই কথা কয়েকটি বলিয়া মীর জোলফেকার আলী আর ঐ সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করিলেন না।

বাড়ীতে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধ্ আছে, উপযুক্ত পুত্র আছে, বুদ্ধিমতী, জ্ঞানবতী কন্যাদ্বয় আছে, কনিষ্ঠ পুত্রের কথা ত ধরিবারই নয়। এই সকল পরিবার পরিজন মধ্যে, দাসদাসী চাকর চাকরানীর মধ্যে, বৃদ্ধ মীর সাহেবের এই নূতন কাণ্ড, মহাকাণ্ডে পরিণত হইল। কে আদর করে? কে মান্য করে? অবশ্যই খাওয়া পরার কোন কষ্ট না হইতে পারে,—বসা উঠা কথাবার্তা, ইহাতেই মহা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। পিতার প্রিয় কি অপ্রিয়,—স্ত্রী,—কি সেবিকা, অথবা পরিচারিকা, পুত্র কন্যাগণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। স্ব সমাজ ভিন্ন অসমাজে বিবাহ হওয়া সে সময় বড়ই দোষের কথা ছিল। যদি এরূপ ঘটনা কার্যে দাঁড়াইত, তাহা হইলে সে—যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর সঙ্গে আহার বসা উঠা করিতে হইত। উচ্চ সমাজে কখনই মিশিতেও পারিত না। কেহ মিশিতেও ইচ্ছা করিত না। বাটীর মধ্যে কি এক উপসর্গ অশান্তি মনোদুঃখের কারণ হইল, তাহা কেহই কাহারও নিকট মন খুলিয়া বলিতে পারে না, সকলের মনে মনেই জাগিতেছে। আগুন জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে।

শিক্ষিত লোককে সর্বদাই যদি অশিক্ষিত গণ্ডমূর্খের সহিত সহবাস করিতে হয়, শ্রেষ্ঠ ভদ্রবংশীয় লোককে যদি সামান্য মুটিয়া মজুরের সহিত এক ঘরে এক স্থানে বাস করিতে হয়, সাধু সচ্চরিত্র লোককে যদি চোর ডাকাত গুণ্ডার সহিত থাকিতে হয়, ভদ্রলোককে যদি কৃষক চাষাবৃত্তি লোকের সমাজে বাধ্য হইয়া বসিতে হয়, সরল সজ্জন মহাশয় ব্যক্তিকে যদি কুটিল কু-জন ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির সহিত বাস করিতে হয়,—সে একপ্রকার পাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?—হয় অদৃষ্টের লেখা (কোন কোন মতে) নয়

পূর্বকৃত পাপের পরিণাম ফল। পরস্পর খাওয়া-পরা কথাবার্তা, বসা-উঠা পরস্পর গরমিল। প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে মনোকষ্ট। নানা কারণে বিরক্তির একশেষ। তাহারও অসুবিধা, অসন্তোষ বিরক্তি উপদ্রব, মনোকষ্ট অসুখের একশেষ। এ পক্ষও নারাজ, ও পক্ষও বিরক্ত। মিলন হয় না, মেলে না, মিলিতে পারে না। আগেও গরমিল, মধ্যেও তাহাই—শেষেও ঐ কথা।

মনে সুখ কাহারও নাই। বৃদ্ধ মীর সাহেবেরও নাই। ফকীর দোহিতারও নাই। নানা কারণে তাহার মনে অশান্তি অসুখ। সে ভাবিত যে আমি বাড়ীতে ছিলাম, ভালই ছিলাম। যখন মনে হইত এ-বাড়ী ও-বাড়ী ছুটিয়া যাইতাম। বর্ষাকাল আসিল—দাঁড় ঠেলিয়া জলপাড়ি দিতাম। বেশী জলে ডুব মারিয়া স্নান করিতাম। খোলা বাতাস গায়ে লাগিত। খোলা মনে খোলা জায়গায়, যে কোন স্ত্রীলোক হউক না কেন—মন খুলিয়া কথা কহিতাম। এক তরকারী দিয়া ভাত খাইতাম। সকালে পান্তা, দুপোরে গরম, বিকালে চিঁড়ে মুড়ি খেজুরের গুড়—না হয় গাছের পাকা কলা, বিচে কলা খাইয়া ঠাণ্ডা হইতাম।

এ কি? বাপ্‌রে বাপ! এ কি! দেয়ালে ঘেরা। চারিদিক দেয়ালে ঘেরা। কয়েদীর মত থাকিতে হয়। হাসিয়া কথা বলিবার সাধ্য নাই। উঁচু করিয়া কথা কহা—কি কাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করার সাধ্য নাই। এ ঘর সে ঘর এবং পায়ে হাঁটিয়া চোটপাটে যাওয়া দোষের কথা। পুকুরের জল, খালের জল, নালার জল চক্ষে দেখিবার সাধ্য নাই। ডুবিয়া স্নান করিবার উপায় নাই। তোলাজলে স্নান করিলে কি গা ঠাণ্ডা হয়! মাঠের বাতাস গায়ে লাগাইবার উপায়ই নাই। কোন স্ত্রীলোক সহিত কথা বলিবার সাধ্য নাই। এ বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোকই দেখি না। কাহার সঙ্গে কথা বলিব? দশ রকম ব্যঞ্জন দেখিলে কোনটা খাইব, কোনটা খাইব না, এই ভাবিতে ভাবিতে খাওয়াই হয় না। একটা খাইতে খাইতে পেট ভরিয়া যায়, আর পাঁচটা পড়িয়াই থাকে। এত তেল কি খাওয়া যায়! পান্তা ভাত চক্ষেও দেখিতে পাই না। পাকা কলা এ বাড়ীতে দেখি, খেতেও দেয়, কিন্তু বিচে কলা ত দেখিতে পাই না।—মেটে ঘরে মাটির মেজেয়—পাটি কি চেটাই পেড়ে শুলে, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চক্ষে যেন ঘুম ভেঙ্গে পড়ে,—আর এ পোড়া মাটিতে যেন আগুন বর্ষাচ্ছে। নিচে আগুন উপরে আগুন, দেয়ালে বেড়া আগুন সকলের উপরে মনের আগুনে বেশী পুড়িয়ে ছাই কল্লে না, আঙ্গরা করে দিলে। আমি আশা পথ চেয়ে আছি। কিসের আশা?—বুড়োর লেজ ধরে আছি কেন? কি সেই আশা?—হাঁ মনে হয়েছে।

তিনিই জানেন, আর আমি জানি। কে বলে কোঠাঘরে বড় মানুষের ঘরে স্ত্রীলোকের বড় সুখ! সুখের উপর সুখ!

চেটাইয়ের উপর চেটাই—তোষকের উপরে তোষক। বাল্লিশের গায়ে বালিশ, কোলে বালিশ—কানে বালিশ—পায়ে বালিশ। এত বালিশের সুখ কি? বুঝিলাম না।

মনের মিল না হলে, চামে চামে, মাসে মাসে মিল হলেও মেলে না! তায় আবার শিমুলের তুলা পোরা বালিশ। আমি মাদুর পেড়ে পিঁড়ি মাথায় দিয়ে বাড়ীতে ঘুমুতেম। মহাসুখে ঘুম আসতো। একি উৎপাত—থাকি কি যাই।

যা হোক বৃদ্ধ মীর সাহেবের নবগৃহিনী কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা হইল। দশমাস দশদিন কয়দিন? কালে একপুত্র জন্মিল। পুত্রের নাম হইল মীর মহেব আলী। তখন অনেকের মনেই ভয় হইল। মীর জোলফেকার আলী যে কথা বলিয়াছিলেন—সকলি ফলিয়াছে। বাকী ছিল একটি কথা যদি আরও কিছু অগ্রসর হয়, বাড়িয়া যায়, তবে বড়ই অমঙ্গলের কথা। কিছুদিন পরে আর একটি কন্যাও জন্মিল—আরও অগ্রসর—আরও বাড়িয়া গেল।

এখন অনেক কাজকর্ম গৃহিনীর হাতে পড়িয়াছে। রান্না ঘরের সর্বপ্রধানা। খাদ্যাদি বিতরণকারিণী, রাঁধা শেষ হইলে গৃহিনী রান্না ঘরের দ্বারে পিঁড়ি পাতিয়া বসেন। বাজে লোক চাকর চাকরাণী দাসী বান্দী সকলের ভাত তরকারী তাঁহারই আদেশ উপদেশ মত দেওয়া হয়। দুইপুত্র পুত্রবধূ—দুই কন্যার রন্ধন ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের আহারাদির উপর গৃহিনীর কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু সময় সময় তিনি তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন কিন্তু মীর জোলফেকার আলীর ভয়ে পারিয়া উঠেন না।—তবে কোন কোন দিন দুধের অনটন হইলে—আর কেহ দুধের আশা করেন না। মীর মোয়াজ্জাম হোসেন অল্পবয়স্ক তাহার জন্য দুধের নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠে, গৃহিনীর পুত্র কন্যার জন্য দুধ সর্বদাই প্রয়োজন। তাঁহার ঘরে গরুর দুধ প্রায়ই থাকে। মীর মোয়াজ্জাম হোসেনের নাম করিয়া দুধ চাইতে গেলেই অম্লান বদনে বিনা ওজর আপত্তিতে বাটি পুরিয়া দুধ দেন। দুধ আনিয়া প্রদীপের আলোতে দেখা যায়, সাদা রং বটে—দুধের কিঞ্চিৎ গন্ধও পাওয়া যায়, কিন্তু সে দুধ নহে। দুধের পাতিল ধোয়া জল। চাকর চাকরাণীদিগের মধ্যে খাদ্যাদি লইয়া বড়ই অসুবিধা ও গোলযোগের কারণ হইয়া উঠিল। কেহ ভাত পায় ত তরকারী পায় না। তরকারী পায় ত ভাতে পেট ভরে না। কোন দিন কাহার কপালে

ভাতই জোটে না। প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা কোন একটা গোলযোগ লাগিয়াই আছে। চাকর চাকরাণী কর্মচারী যাহারা সরকারে আহার করিয়া থাকে, খাদ্যাদির গোলযোগে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। শেষে সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া প্রথমে মীর জোলফেকার আলীর নিকট শেষে বৃদ্ধ মীর সাহেব নিকট কাতরকণ্ঠে সকলেই আহারাদির দুরবস্থা বেবন্দোবস্ত বিষয় জানাইল। বৃদ্ধ মীর সাহেবও বুঝিলেন যে, অনুপযুক্ত অপাত্র, ক্ষুদ্রমনা স্ত্রীলোকের হস্তে এই বৃহৎ ব্যাপারের ভার অর্পণ করায় এই ঘটনার সূচনা হইয়া শেষে এই অবস্থা ঘটিয়াছে, যাহা হউক আমি ইহার ব্যবস্থা শীঘ্রই করিতেছি।

বৃদ্ধ মীর সাহেব জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এক সময় নির্জনে পাইয়া বলিলেন,—বাবা! আমার একটা কথা! মহেব আলীর মাতার সহিত এবাটীতে কাহারও বনিবনাও নাই। আমি উহাদিগকে স্থানান্তরে রাখিতে ইচ্ছা করি। আমাদের এলাকা মধ্যে কোন এক গ্রামে তাহাদের বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। উহারা সেই বাড়ীতে গিয়া বাস করুক। এবাড়ীর কাহারও সহিত কোন প্রকারে সংশ্রব থাকিবে না। আমিও রাখিতে ইচ্ছা করি না।

মীর জোলফেকার আলী বলিলেন আপনার হুকুম আমার শিরোধার্য। পিতা পুত্রের সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একথার উত্তর করিতে হইলে কোন উত্তর নাই। যেখানে যে গ্রামে আপনার ইচ্ছা হয় উহাদের বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। আপনি যাহা করিবেন বাধ্য হইয়া আমরা তাহাতে মাথা নোয়াইয়া স্বীকার করিব।

বৃদ্ধ মীর সাহেব বলিলেন—বাবা!—আমি দুনিয়ার কারবার অনেকটা বুঝি। ভবিষ্যতের ভাবনা একটা কথা আছে, তাহাও বিশ্বাস করি। আমি তোমাকে পরামর্শস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে, সেইরূপ করিলে ভবিষ্যতে আমার পুত্র কন্যার কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে কি না? আর তোমারই বা ইচ্ছা কি? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কার্য করিতে পারি না। তুমি আমার খাতিরে একথার উত্তর করিও না। খাঁটি কথা আমাকে বলিবে।

মীর জোলফেকার আলী বলিলেন, উহাদের বাড়ী ঘর প্রস্তুত সম্বন্ধে আপনার হুকুম অনুসারেই আমি আমার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতেছি। বাদ প্রতিবাদ তর্ক বির্তক করিয়া বুঝাইব না। আমার মনের কথা যাহা তাহাই বলিতেছি। প্রথম কথা আর ক্ষণকালও তাহাদের এবাটীতে থাকা উচিত নহে। তাহাদের ব্যবহারে বাটীর সকলেই মহা নারাজ। কয়েকদিন থাকিলেই যে কি

ঘটিবে ঈশ্বর জানেন। তাহাতেই বলিতেছি এবাটীতে থাকা তাহাদের উচিত নহে। —দ্বিতীয় কথা তাহাদের বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু আমাদের বাড়ীর নিকটে নহে, সাঁওতা গ্রামে নহে। তরফ সাঁওতার ।৶৵ গণ্ডার অন্তর্গত যে সকল গ্রাম আছে, সে সকল গ্রামে নহে। আমাদের সংশ্রব মধ্যে নহে। যতদূরে থাকিবে, তাহারাও ভাল থাকিবে আমরাও ভাল থাকিব।

মীর এবরাহিম হোসেন বিশেষ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এক কথায় পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, আচ্ছা তাহাই করিব, তোমার মত অনুসারেই এবিষয়ের মীমাংসা করিব।

বৃদ্ধ মীর সাহেব, সেই দিন হইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোথায় কোন্ গ্রামে ইহাদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া বাড়ী-ঘর প্রস্তুত করিয়া দিই। অনেক চিন্তার পর মনে মনে একটা গ্রাম স্থির করিলেন। তাঁহার অনুগত দুই একজন লোক যাহারা ছিল, তাহাদের নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। তাহারাও শুনিয়া পছন্দ করিল। আর বলিল সাঁওতার নিকটেই, যাওয়া-আইসার পক্ষে কোনই অসুবিধা নাই, লাগা গ্রাম, একগ্রাম বলিলেই হয়। বিশেষ লাহিনী পাড়া গ্রামের আজকাল খুব উন্নতি দেখা যাইতেছে। কাসীমপুর গ্রাম গৌরী নদীর ভাঙ্গনে প্রায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কাসীমপুরের মুন্সী সাহেবরা লাহিনী পাড়ায় আসিয়া বাড়ীঘর প্রস্তুত করিতেছেন। সাঁওতা এলাকার সহিত লাহিনী পাড়ার কোন সংশ্রব নাই। যদিও লাগা গ্রাম সে গ্রাম, নড়াইলের জমিদার বাবু রামরতন রায়ের এলাকা, খুব ভাল পছন্দ করিয়াছেন।

বৃদ্ধ মীর সাহেব বলিলেন পছন্দ করিয়াছি। এখন আমি ইহাই চাই যে জমিদারের জমির মধ্যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করি না। নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর কি লাখেরাজ, দেবোত্তর পীরপাল, এই সকল জমির মধ্যে বাড়ী প্রস্তুত করা আমার ইচ্ছা।

হুজুর! কাসীমপুরের মুন্সী জেনাতুল্লাই সর্বপ্রধান। রঙ্গপুর জেলার হাকিমের মীর মুন্সী। তিনিও রতনবাবুর জমিদারির অন্তর্গত জমির মধ্যে বাড়ী প্রস্তুত করিতেছেন না। কাসীমপুরের ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি এক 'চকে' যাহা ছিল সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া বাড়ী করিতেছেন। ঐ গ্রামে অনেক ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ জমি আছে।

—আমিও তাহাই সন্ধান করিতে বলিতেছি। মুন্সী সাহেবেরা আজকাল টাকাওয়ালা বড়লোক এক 'চকে' প্রায় ৭।৮ ঘর ভদ্রলোক পৃথক পৃথক বাড়ী

করিতেছেন। তাঁহাদের বাড়ীর নিকটেও না হয়। অথচ কোন গরীব ভদ্রলোকের বাড়ীর নিকটে হইলে ভাল হয়।

—"লাহিনী পাড়া" গ্রামের আদি বাসিন্দা মীর খোয়াজ আলী খোন্দকারকে হুজুর চিনেন। তিনি এদেশের সাধারণ মোসলমানের পীর এবং খোন্দকার তাঁহারা অতি নিরীহ। তাঁহাদের বাড়ী গ্রামের উত্তরাংশে। ঐ এক ঘর মোসলমান ভদ্রলোক ভিন্ন লাহিনী পাড়ায় আর মোসলমান ভদ্রলোক কেহই ছিল না। কাসীমপুরের মুন্সী সাহেবরা নূতন আসিতেছেন। ঐ মীর খোয়াজ আলী খোন্দকারের বাড়ীর নিকট হইতে ২।৩ দাগ জমি লাখেরাজ আছে। তাহাই যদি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন তবে সুবিধা হইতে পারে। হুজুর যে প্রকারের স্থান তল্লাস করিতেছেন, সেইরূপই হয়। একবার হুজুর আপন নজরে দেখিয়া আসিলে ভাল হয়। আমি সে জমি চিনি।—বৃদ্ধ মীর সাহেব অন্য সময় বেড়াইতে বেড়াইতে যাইয়া সে স্থান দেখিয়া আসিলেন, পছন্দ হইল। জমির মালিক কে তাহারই সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মীর জোলফেকার আলী সাহেবের পক্ষীয় লোকেরা বৃদ্ধ মীর সাহেবের মনোগত ভাব, লাহিনী পাড়া গ্রামে মীর মহেব আলীদিগের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবেন, একথাও সন্ধানে জানিয়া আপন ভালবাসা মনিব নিকট নিবেদন করিলেন। মীর জোলফেকার আলী তখনি সন্ধান করিয়া জমির মালিক কে জানিতে পারিলেন। পূর্বে উহা এক ফকীরের লাখেরাজ ছিল। অল্প দিন হইল মুন্সী জেনাতুল্লা ঐ জমি খরিদ করিয়াছেন। এখন মুন্সী সাহেবই মালিক। মুন্সী জেনাতুল্লার সহিত মীর জোলফেকার আলীর বিশেষ বন্ধুত্ব ভাব ছিল। তখনি রঙ্গপুরে মুন্সী সাহেবের কার্যস্থানে পত্র লিখিয়া লোক রওয়ানা করিলেন। পত্রে লিখিলেন, আপনার নূতন খরিদা, মীর খোয়াজ আলীর বাড়ীর উত্তরাংশে যে নিষ্কর ভূমিখণ্ড আছে আমি ঐ জমি খণ্ড আপনার নিকট চাহি। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মুন্সী জেনাতুল্লা সাহেব পত্র পাইয়া ঐ লোক মারফত জমি বন্দোবস্তের নিদর্শন এক পাট্টা লিখিয়া নাম সহি করিয়া মীর জোলফেকার আলী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। একথা অন্য কোন লোক জানিতে পারিল না।

এদিকে বৃদ্ধ মীর সাহেব জমির মালিক সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। সে বলিল আমি ঐ জমি মুন্সী জেনাতুল্লার নিকট বিক্রয় করিয়াছি। আমার কোন স্বত্ব এখন ঐ জমিতে নাই। বৃদ্ধ মীর সাহেবও কয়েক দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে

রঙ্গপুরে মুন্সী জেনাতুল্লার নিকট লোক পাঠাইয়া জমি খণ্ড বন্দোবস্ত করিয়া আনিবেন স্থির করিলেন। জমি নিষ্কর বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে নিষ্কর হইল না। মুন্সী জেনাতুল্লার প্রজাত্ব স্বীকার করিবেন কিনা? এই কথার মীমাংসা করিতে অনেক সময় নষ্ট হইল। কি করিবেন? শেষে বাধ্য হইয়া রঙ্গপুরে পত্রসহ লোক পাঠাইলেন। মুন্সী জেনাতুল্লা—বৃদ্ধ সাহেবের পত্র পাইয়া দুঃখের সহিত উত্তর লিখিলেন—

"হুজুরের আদেশ প্রতিপালন করিতে আমার কোন ওজর ছিল না। প্রায় এক মাস গত হয় ঐ জমি, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর জোলফেকার আলীকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি।" বৃদ্ধ মীর সাহেব মুন্সী জেনাতুল্লার পত্র পাইয়া হাসিতে হাসিতে পত্র হস্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন, বাবা! তোমার বুদ্ধিকে আমি শতবার প্রশংসা করি। আর আশীর্বাদ করি যে তুমি সংসারে এইরূপ বুদ্ধি চালনা করিয়া কার্য করিবে। যাহা হউক মুন্সী জেনাতুল্লার এই পত্র দেখ। জমিখানি আমাকে দেও।

মীর জোলফেকার আলী বলিলেন, হুজুর! সকলি আপনার, যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

—না-না আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি তোমার অমতে এ সম্বন্ধে আমি কোন কার্য করিব না। তুমি একথা কখনই মনে স্থান দিও না, যে আমি স্বার্থান্ধ হইয়া, কি কাহার অনুগত বাধ্য হইয়া, তোমাদের কোনরূপ ভবিষ্যতে মনোকষ্টের কারণ সৃষ্টি করিয়া যাইব। আর এই সম্বন্ধে তোমার স্বাধীন মতকে দূরে ফেলিয়া আমার স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল করিব। কখনি একথা মনে স্থান দিও না।

—তবে হুজুর! যাহারা বাড়ী করিবে, তাহাদের পক্ষ হইতে একখানা কবুলিয়ত লিখিয়া দিন, এখনই জমি বন্দোবস্ত করিয়া পাট্টা দিতেছি।

বৃদ্ধ মীর সাহেব সন্তুষ্ট চিত্তে নাবালক মীর মহেব আলী পক্ষ হইতে কবুলিয়ত লিখিয়া দিলেন। লাহিনী পাড়া গ্রামে মীর মহেব আলীর বাটি প্রস্তুত হইতে লাগিল। বাড়ী প্রস্তুত হইলে মীর মহেব আলী মাতা ভগ্নীসহ নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

বৃদ্ধ মীর সাহেব জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আনার খাতুন দত্তা সম্পত্তি হইতে মীর মহেব আলীকে কিছু দেওয়ার নামও মুখে আনিলেন না। অন্য উপায়ে একজনের সহায়তা করিয়া সেই আসাদ আলীর পুত্র, সাজাদ আলীদিগের অস্ত্র সম্পত্তি কৌশলে লাভ করিয়া তাহাই মীর মহেব আলীকে দান করিলেন।

ক্রমেই শরীরের অবস্থা জরাজীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। জীবিত থাকিতে একটা পাকা পোক্ত লেখাপড়া করিয়া না দিলে তাঁহার অভাবে মীর মহেব আলী, তরফ সাঁওতার হিস্যা ।৴৬৸ গণ্ডার সম্পত্তি হইতেও নিজ অংশের দাবি করিতে পারে। এই সকল ভাবিয়া বৃদ্ধ মীর সাহেব একখানি আসিয়াতনামা উপদেশ পত্র প্রস্তুত করিয়া সমুদায় সম্পত্তি ছেলে মেয়েদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। দুই আনা জ্যেষ্ঠ পুত্র, দুই আনা কনিষ্ঠ পুত্র—এই গেল চারি আনা—৵১০ আনা করিয়া দুই কন্যাকে দিলেন এক আনা। বাকি রাখিলেন ৬৸ গণ্ডা। এই পৌনে সাত গণ্ডা সম্পত্তি এবং সাঁওতার বসতবাটী এজমালিতে রাখিলেন। কনিষ্ঠ কন্যা বিবি নাসিমা খাতুন,—তাঁহার স্বামীর বিষয় সম্পত্তি আছে। সিরাজগঞ্জের নিকট সৌলী গ্রামে তাঁহার স্বামীর বাড়ী।

কনিষ্ঠ পুত্র মীর মোয়াজ্জাম হোসেন শিশুকালে মাতৃহারা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ মীর সাহেব বড়ই ভালোবাসিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসিতেন। ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণের জন্য ঐ ৬৸ গণ্ডা সম্পত্তিতে দুই পুত্র দুই কন্যার সমান অধিকার রাখিয়া দিলেন। আর পদমদীর বাটী যে স্থানের তালুক জমা জমি বাগান পুষ্করিণী সমুদায় কনিষ্ঠ পুত্র মীর মোয়াজ্জাম হোসেনকে স্বতন্ত্ররূপে দান পত্র লিখিয়া দান করিলেন। মীর জোলফেকার আলী তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। তবে স্বার্থশূন্য মন জগতে নাই। মীর জোলফেকার আলী ভবিষ্যৎ চিন্তায় বড়ই পরিপক্ক পণ্ডিত ছিলেন। তরফ সাঁওতার সম্পত্তি গ্রাম গ্রাম ভাগ বাটাওয়ারা করার সময় অংশমত অর্থাৎ দুই আনা তাঁহার, দুই আনা কনিষ্ঠ ভ্রাতার। তখন যে কয়েকখানি গ্রামে বিল জলাহেতু গর আবাদ ছিল, তাহাই তিনি লইলেন। জমির পরিমাণে ভাগ না করিয়া সেই সময়ে যে গ্রামে যত খাজনা আদায় হইত সেই খাজনার সংস্থান অনুসারে বণ্টন করিলেন।

মীর মোয়াজ্জাম হোসেনের অংশে যে যে গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন তাহাতে বিল ঝিল, গর আবাদী পতিত জমি ছিল না। ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির আশা ছিল না। আর তাঁহার ভাগে যে কয়েকখানি গ্রাম নির্দিষ্ট করিলেন, তাহাতে বিল গর আবাদী জলা বিস্তর ছিল। পিতাকে বুঝাইলেন দেখুন! আমি জলা জমি ডোবা গ্রাম লইয়া ছোট ভাইকে ভাল ভাল গ্রাম দিলাম। হায়রে স্বার্থ! আবাদী অংশই জমার সংখ্যানুসারে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সমান সমান করিয়া লইলেন। জলা, বিল বেশী পরিমাণ থাকিল। কালে কোন সময়ে যদি ঐ সকল জলা ভূমি জল সরিয়া গিয়া আবাদের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার আয় অপেক্ষা তাঁহার অংশে দ্বিগুণ

আয় দাঁড়াইবে। বিশেষ পদমদী তালুকের অংশে কনিষ্ঠ সহোদর যে পরিমাণ বেশ পাইলেন কালে তাহা হইতে অনেক বেশী আয় তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হইবে। উপস্থিত সময়ে লোক জানিল, পিতাও দেখিলেন যে জ্যেষ্ঠ সন্তান কনিষ্ঠ জন্য বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিল।

এই দলিলই আসিয়াতনামা। ইহাই মূল দলিল।*

কিছু দিন পরে বৃদ্ধ মীর সাহেব বাঙ্গালা ১২৩৩ সালের চৈত্রমাসে রমজান শরীফের রোজার মধ্যে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। সাঁওতার বাড়ী ঘর স্টেটের কোনরূপ পরিবর্তন হইল না। পূর্বেও যে প্রকার যে ভাবে মীর জোলফেকার আলী সাহেব শাসন সংরক্ষণ করিতেন, বৃদ্ধ মীর সাহেবের অভাবেও সেইরূপই থাকিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্বে যে রূপ প্রিয়পাত্র ভালবাসার পাত্র ছিলেন, পিতার অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বেশী পরিমাণ ভালবাসার পাত্র হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের উন্নতি।

মীর মহেব আলী নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তিত রূপে আপন বাটীতে বৃদ্ধ মীর সাহেব দত্তা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া পরম সুখে সংসারে বাস করিতে লাগিলেন।

মীর জোলফেকার আলীর পুত্র সন্তান কেহ নাই। একটি কন্যা রাখিয়া তাঁহার প্রথম স্ত্রী জগৎ পরিত্যাগ করেন। সে কন্যার নাম খএরননেসা। জ্যেষ্ঠ ভগিনী হাকিজননেসা, খএরননেসাকে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। এবং তাহার নিজ অংশ দশগণ্ডা যাহা পিতার আসিয়াতনামা সূত্রে পাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ খএরননেসাকে লিখিয়া দিলেন। খএরননেসার বিবাহ জিলা যশোহরের অন্তর্গত জোকা গ্রামে মৌলবী হাদিদাদ্দীন সহিত হইয়াছিল। খএরননেসার তিন পুত্র, মধ্যম নজফ আলী জীবিত আছেন।

মীর জোলফেকার আলী কিছুদিন পরে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। সেই সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেন।

মীর জোলফেকার আলীর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র সন্তান হইল না। এক কন্যা শুকরণনেসা; শুকরণনেসাকে রাখিয়া কিছু দিন পরে মীর জোলফেকার আলী স্বর্গে নীত হইলেন। বিষয়াদি সমুদায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর মোয়াজ্জাম হোসেনের কর্তৃত্বাধীন হইল। পিতৃহীনা কন্যাটিরও তিনিই অভিভাবক হইলেন।

মীর জোলফেকার আলী মৃত্যু সময় ভ্রাতাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাই

* এই দলিল জন্য গোলামাজম যে যে কাণ্ড করিয়াছিলেন,—পাঠক! অনুগ্রহ করিয়া উদাসী পান্থকের মনের কথা একবার পাঠ করিবেন।

আমার কন্যা শুকরণ সহিত তোমার একমাত্র পুত্র আজগর আলীর বিবাহ দিও। ভাই সাবধান শুকরণকে পর ঘরে দিও না। আজগর আলী বাঁচিয়া থাকিলে কখনই অন্য ঘরে বিবাহ দিও না। ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে ঘরে থাকিবে তুমিও নিশ্চিন্তিত মনে থাকিতে পারিবে। বিষয় সম্পত্তি বাড়ী ঘর যেমন থাকিল সেই ভাবেই থাকিবে। ভাই আমার কথার অন্যথা করিও না।

মীর মোয়াজ্জাম হোসেনও ভ্রাতার কথা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কাল-চক্রের চক্র ভেদ করে কার সাধ্য? নিয়তি লেখা কে খণ্ডন করিতে পারে? মীর মোয়াজ্জাম হোসেনের স্ত্রীও কালগ্রাসে পতিতা হইয়া জগৎ পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসর পর আজগার আলীও স্বর্গধামে মাতৃক্রোড়ে নীত হইলেন। একটি পুত্র ছিল তাহাও গেল। থাকিবার মধ্যে থাকিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাবালিকা কন্যা শুকরণনেসা। শুকরণনেসাকে দেখিয়াই তিনি কথঞ্চিত স্থির রহিলেন। সময়ে শুকরণনেসার বিবাহ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গট্টি গ্রামের সাহ গোলামাজম সহিত দিয়া জামাইকে ঘরজামাই রাখিয়াছিলেন।*

জামাতা সাহ গোলামাজমের কৌশলে নিমকহারামীর আচরণে চোরের চরিত্রে বদমাইস ডাকাতের ব্যবহারে, চক্ষুলজ্জাহীন দয়া-মমতাবিহীন পাথরের কলিজার ঘৃণিত টঙ্কারে, মীর মোয়াজ্জাম হোসেন পৈতৃক বাটী হইতে, বিষয় সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ হইলেন। আসিয়াতনামা কিরূপে জামাইবাবুর হস্তগত হইয়া ছিল এবং মীর সাহেব জমিদার বাড়ীঘর হইতে উচ্ছেদ হইয়া কিরূপ কষ্টে পড়িয়া ছিলেন নিরাশ্রয় পথের ভিখারী হইয়া আমার পূজনীয়া জননীকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর জামাই শ্বশুর আত্মকলহ বিবাদ নিষ্পত্তি এবং পূজনীয়া মাতৃদেবীর লোকান্তর গমন পর্যন্ত উদাসীন পথিক মনের কথায় সমুদায় কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমার পুনঃ প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। এই ক্ষণে মাতৃকুলের পরিচয় দিয়া উপক্রমণিকা শেষ করিব।

লাহিনী পাড়ার উত্তরাংশ হইয়া পূর্ব দেশগামী রেল লাইন গৌরনদী পার হইয়া গোয়ালন্দ পর্যন্ত গিয়াছে। কুষ্টিয়া স্টেশন হইতে কালিগঙ্গা জংশন তাহার কিছুদূর পূর্বেই ১১২ মাইল পোষ্টের দক্ষিণ যে গ্রাম ঐ গ্রামেই লাহিনী পাড়া। দক্ষিণে লক্ষ্য করলেই আটচালা ঘরযুক্ত একটি বাড়ী দেখা যায়।

* জামাইবাবুর ব্যবহার ঘরজামাতা রাখার ফল হিসাবে যাহা ফলিয়াছিল, সে সকল হৃদয়-বিদারক ঘটনা উদাসীন পথিক মনের কথায় বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

সে বাড়ী জীবনী লেখকের কন্যা শ্রীমতী বিবি রাওসান আয়ার বাড়ী। আর একটি কথা বলিয়া রাখি ঐ বাড়ীই বৃদ্ধ মীর সাহেব দত্তা মীর মহেব আলীর ছিল। ঈশ্বরের মহিমায় ঐ বাড়ী এইক্ষণে লেখকের সম্পত্তি। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশ্য। ঐ স্থানের একটু পূর্বেই একটি গলি রাস্তা গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। কয়েকটা খর্জুর বৃক্ষ সেইস্থানে প্রহরীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। ঐ স্থান হইতে পাঁচশত হাত পরিমাণ গমন করিলেই মীর সাহেবদিগের বাটী সংলগ্ন বৃহৎ আমবাগান।

মুন্সী জেনাতুল্লার একমাত্র কন্যা বিবি দৌলতননেসা। সেই দৌলতননেসাই জীবনী লেখকের পূজনীয়া জননী। মাতামহ মুন্সী জেনাতুল্লার পূর্ব বাস গৌরীনদীর পূর্ব তীর কাসীমপুর গ্রামে। বর্তমান গৌরী সেতুর পূর্ব সীমা কাসীমপুর পশ্চিমসীমা লাহিনী পাড়ায়। কাসীমপুর গ্রাম পরগণে বিরাহিমপুর অন্তর্গত। যাহার মালিক কলিকাতার সুবিখ্যাত ঠাকুর জমিদার। মুন্সী জেনাতুল্লার পিতা মুন্সী হেদাএতুল্লা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রজা। মুন্সী হেদাএতুল্লা পরগণা বিরাহিমপুর মধ্যে ঠাকুর জমিদার নিকট বিশেষ সম্মানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহারই হস্ত হইয়া জমিদার মহাশয় সে সময় বিরাহিমপুর পরগণার ৩০/৩২ হাজার টাকা কর পাইতেন। এক্ষণে বোধ হয় তিন লক্ষের উপর উঠিয়া থাকিবে। সদ্ব্যবহার সত্য আচরণ নানা প্রকারে প্রজার হিতসাধন প্রজারঞ্জন ফলেই এইরূপ উন্নতি। কোথায় ৩০/৩২ হাজার আর কোথায় তিনলক্ষের উপর আয়! ধন্য! ঈশ্বরের মহিমা। ধন্য পুণ্যের ফল! মুন্সী হেদাএতুল্লা স্বয়ং জমিদার ছিলেন না। সম্ভ্রান্ত সুবিখ্যাত আদর্শ জমিদারের প্রজা তাঁহার মান-সম্ভ্রম নিকটবর্তী অনেক মুসলমান, জমিদার তালুকদার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল।

মুন্সী জেনাতুল্লা নদীয়া জেলার বর্তমান থানা নওপাড়ার অধীন বিজনগর গ্রামে মীর শামসের আলীর ভগ্নী বিবি ফাখেরা খাতুনকে বিবাহ করেন। ফাখেরা খাতুন গর্ভে দৌলতননেসার জন্ম হয়। মুন্সী জেনাতুল্লা কোম্পানীর চাকুরী করিতেন। জেলা রংপুর জেলার হর্তা-কর্তা বাহাদুরের মীর মুন্সীর পদে ছিলেন, টাকাও বিস্তর উপার্জন করিতেন। ব্যয় অতিরিক্ত ছিল। দান খয়রাত কার্যে তত অধিক আয়েও কুলাইত না। বাংলা ১২৫২ সালের পৌষ মাসে দৌলতননেসার বিবাহ হয়। ৫৫ সালে মুন্সী জেনাতুল্লার মৃত্যু হয়। মৃত্যু সময় স্ত্রী কন্যা কেহই নিকটে ছিল না। রঙ্গপুর বাপের বাসায় তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

এক্ষণে একটি কথা অন্তরে উদয় হইল। "গৌরী নদী", গৌরী নদী জীবনী লেখকের বড়ই প্রিয়। গৌরীর জল যেমনই শীতল তেমনি পরিষ্কার। গৌরী নদীর জল পান, জলে স্নান করিয়া (একসময়) দুমাস তিনমাস মধ্যে অনেক কঠিন কঠিন পীড়া হইতে অনেকে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। লেখকের নিকট গৌরী জল অতি প্রিয় এবং অতি উপাদেয়। পীড়িত হইলেই গৌরী জল পান করিতে ইচ্ছা হয়। কলিকাতায় পীড়িত হইয়া গৌরী নদী হইতে রেল গাড়ীতে জল আনাইয়া পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। জন্মভূমির ফলমূল, জল, খাদ্যাদি, বায়ু, ব্যোম, মৃত্তিকা ঝড়, জঙ্গল, আগাছা প্রভৃতি লেখক চক্ষে অপূর্ব পবিত্র, স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায়। একথায় কেহ হাসি বিদ্রূপ রঙ্গরসের অঙ্গ বাড়াইয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইবেন—হউন,—লেখকের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। তাঁহার ধারণা অচল অটল, লেখকের জন্মস্থান গৌরীতটস্থ গ্রামে। গৌরী নদীর অপূর্ব জন্ম কথা যাহা প্রবাদ ও প্রমাণের সহিত বর্তমান আছে, তাহা লেখক প্রকাশ করিতে বাধ্য।

গৌরী নদী

বাস্তবিক পক্ষে যেরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে সেই বর্ণনা করিতেছি। বহুকালের কথা—কুষ্টিয়া মহকুমার সৃষ্টি হয় নাই। বর্তমান কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত থানা নওপাড়ার অধীন আমলা সদরপুর নামে যে গ্রাম আছে। বর্তমান সময়ে ঐ গ্রামে বহুতর ধনী মহাজন বাস করিতেছেন। ৮০ বৎসর পূর্বে ঐ গ্রামে, দেশ বিখ্যাত জমিদার প্যারীসুন্দরীর নাম দেশময় হইয়াছিল। তাঁহার একটি কার্য বিষয় উদাসীন পথিক—তাঁহার মনের কথায় প্রকাশ করিয়াছেন।* প্যারীসুন্দরীর পিতা রামানন্দবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে দেওয়ানী কার্য করিতেন। বর্তমান ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কুমারখালী স্টেশন যেখানে হইয়াছে ঐ স্টেশনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিমে কোম্পানীর রেশমের প্রকাণ্ড কুঠি ছিল। সাহেবদের বাসের ঘরের নাম ছিল শীতল কোঠা। সেই রেশমের কুঠিতে রামানন্দবাবু দেওয়ানী কার্য করিতেন। তাহাতেই তাহার অবস্থায় জমিদারী

* প্রিয় পাঠকগণ উদাসীন পথিকের মনের কথার ৯ পৃষ্ঠা হইতে তৃতীয় তরঙ্গ প্যারীসুন্দরী প্রস্তাব আরম্ভ হইয়া ষষ্ঠ তরঙ্গ পর্যন্ত তাহার পর প্রথম তরঙ্গ দ্বাদশ তরঙ্গ পর্যন্ত পাঠ করিলেই প্যারীসুন্দরীর দয়া প্রজা রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি অনেক গুণের প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

উন্নতি। সদরপুরের জমিদারী সৃজনের বহু পূর্বে আমলা গ্রামে এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণ বড়লোক ছিলেন না। খড়ো ঘরে বাস করিতেন কোন প্রকারে দিন গুজরান হইত।

ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান যাইবেন। গৃহিনীর নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় হইয়া প্রায় ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া "কুপদহ" পরার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন। প্রত্যুষে উঠিয়া সাংসারিক কার্য শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ধুতি, চাদর, ছাতা, লাঠি লইয়া গঙ্গাস্নান যাইতে বাটীর বাহির হইবেন, এমন সময় তাঁহার বাটীর দাসী অতি নম্রভাবে বলিল ঠাকুর! আপনি গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, আমার এই ফুলটি মা গঙ্গাকে নিবেদন করিয়া দিবেন। দাসীর নাম গৌরী। বহুদিন হইতে গৌরী ব্রাহ্মণের বাটীতে আছে। স্বভাব চরিত্র খুব ভাল, কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ নাই। সকলকেই ভালবাসে। ব্রাহ্মণ নিতান্ত আগ্রহে গৌরী প্রদত্ত ফুল চাদরে বাঁধিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন। নিয়মিত সময়ে ব্রাহ্মণ "কুপদহে" যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী ফিরিয়াছেন। অর্ধপথের বেশী পথ আসিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, —গৌরী প্রদত্ত ফুল ত গঙ্গা দেবীকে দেওয়া হয় নাই। বড়ই অন্যায় হইয়াছে। অঙ্গীকার করিয়া আসিয়া না দিয়া গৌরীর নিকট কি বলিব? গৌরী যখন জিজ্ঞাসা করিবে,—হায়! হায়! তখন আমি কি উত্তর করিব? গৌরী আমাদের এত কাজ করে, কত প্রকার সাহায্য করে, তাহার দ্বারা আমি একা নহি বাড়ী সমেত লোক উপকার প্রাপ্ত হয়; আর তাহার একটি কাজ করিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বগত বলিলেন,—যাহাই হউক আবার কুপদহে ফিরিয়া যাই। গৌরীর ফুলটি গঙ্গাদেবীকে দিয়া আসি। দুই তিনপদ যাইয়া, মনে কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল চিন্তিয়া পর চতুর্দিকে চাহিয়া পথের ধারেই একটি গো-খুর চিহ্ন অর্থাৎ গোরু চলিয়া গিয়াছে, খুরের দাগ বসিয়া তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ জল জমিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভক্তিভাবে সেই গো-খুর মধ্যস্থিত জল সম্মুখে করিয়া বসিলেন। চাদরের কোণ হইতে গৌরী দত্তা ফুল হস্তে লইয়া গঙ্গা-স্তব করিতে করিতে ঐ গো-খুরস্থিত জল মধ্যে দেবী উদ্দেশ্যে পুষ্প প্রদানমাত্র, কি অপরূপ! কি অপরূপ মহিমা! কি আশ্চর্য! দেবী হস্ত বাড়াইয়া গৌরীদত্তা ফুল স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। চতুর্দিক সমুজ্জল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ অজ্ঞান! কি দেখিল? যাহা কখনও দেখিবার ভাগ্য হয় নাই তাহাই দেখিল। গৌরীর কল্যাণে তাহাই নয়ন গোচর করিলেন।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, গৌরী সামান্ত মেয়ে

নহে। আমরা আজীবন গঙ্গাস্নান করি, ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে জলে ভাসাইয়া দেই,—কৈ কোন দিনও ত দেবী এরূপভাবে পুষ্প গ্রহণ করেন না। এইক্ষণে বাটী যাইয়া গৌরীকে আর ওভাবে রাখিব না। গৌরীর পদখানি ধরিয়া পূজা করিব। যতনে রাখিব। এই স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ বাটীতে চলিলেন। কত চিন্তাই তাঁহার মনে উঠিতেছে। গৌরী কি মানুষ? না দেবী? মানবাকারে আমার বাড়ীতে ছদ্মবেশে রহিয়াছেন। আমি নরাধম চিনিতে পারি নাই। হায়! আমার ঘরে লক্ষ্মী, আমি চিনিতে পারি নাই।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যাইয়াই দেখেন যে গৌরী ঘর নিকাইতেছে। গৌরীর হাতে "নুড়ি", সম্মুখে কাদা গোলা পূর্ণ ছড়া পাতিল। ব্রাহ্মণ গৌরীকে দেখিয়াই একেবারে মাটিতে পড়িয়া গৌরীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন মা! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমাকে এত দীর্ঘকালেও চিনিতে পারি নাই। মা, আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দেও।

ব্রাহ্মণী দেখিয়া অবাক! গৌরী দাসী, দাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া ঠাকুর গঙ্গাস্নান হইতে আসিয়া এরূপ করেন কেন?—ত্রাস হইল। গৌরী কাহারও সহিত কোন কথা কহিল না। হস্তস্থিত নুড়ি ও ছড়া পাতিল হাতে করিয়া গৌরী ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে তখনই বাহির হইল। গৌরী স্বাভাবিক পদবিক্ষেপে যাইতেছে, ব্রাহ্মণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রস্তপদে যাইয়াও গৌরীকে ধরিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণের বাড়ী, আমলা গ্রামের প্রকাণ্ড "বিল" (একপ্রকার ক্ষুদ্র হ্রদ) ধারে ছিল। গৌরী যে যে পথে চলিল ঐ বিল হইতে জলস্রোত আসিয়া গৌরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধার বাঁধিয়া ছুটিল। ব্রাহ্মণ ত্রস্তপদে যাইতেছেন আর আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া গৌরীকে ধরিবার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন গৌরী ফের! গৌরী ফের! আমি ডাকিতেছি, ফের। আর গৌরী ফিরিবার নহে, ব্রাহ্মণও ছাড়িবার পাত্র নহে। গৌরী কিছুদূর আসিয়া হাতের নুড়ি ফেলিয়া দিলেন, যে স্থানে নুড়ি ফেলিয়াছিলেন গৌরী নদীর সে স্থানের নাম আজ পর্যন্ত নুড়িদহ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ গৌরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর যাইতে পারিলেন না। জলস্রোত তাহার গতি রোধ করিল। কি করেন জলের কিনার হইয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। আরও কতক দূর যাইয়া হাতের ছড়া পাতিল ফেলিয়া দিলেন। কল কল রবে জল ডাকিয়া গৌরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। সেই স্থানের নাম পাতিলাদহ হইয়া আজ পর্যন্ত

সেই নাম পরিচিত হইতেছে। আরও কতক দূর আসিয়া ব্রাহ্মণ চেঁচাইতে লাগিলেন। সে স্থানের নাম চেঁচানেরদহ হইয়াছে। গৌরীর গমন কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না, ক্রমাগত যাইতেছে, জলস্রোত প্রবল বেগে গৌরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। বর্তমান কুষ্টিয়া, রেল স্টেশন বাজার যে স্থানে হইয়াছে ঐ স্থানের নাম কুষ্টিয়া নহে। ঐ স্থানের নাম ডাকদহ। ডাকদহ নামেই চিরকাল প্রচলিত ছিল। মহকুমা স্থাপনের পর হইতে ডাকদহ নাম ক্রমে লোপ পাইতেছে। গৌরী ঐ স্থানে আসিলে ব্রাহ্মণ অধিক উচ্চৈস্বরে গৌরীকে ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই ডাকদহ নাম হইয়াছে। গৌরী ফিরিলেন না, ক্রমেই দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন। দৌড়িতে দৌড়িতে বর্তমান লাহিনী পাড়া গ্রামের উত্তরাংশে জয়নাবাদ গ্রামের উত্তর সীমা মাথাভাঙ্গা নামে একটি বটবৃক্ষ ছিল এবং সেই স্থানের নাম মাথাভাঙ্গা। মাথাভাঙ্গার বটগাছ লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সে গাছটি নদীর ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া গৌরী গর্ভে পড়িয়া গিয়াছে। স্থানের নাম এখনও মাথাভাঙ্গার ঘাট বলিয়া পরিচিত আছে।

ব্রাহ্মণ গৌরীর পিছনে পিছনে দৌড়িয়া আসিয়া যে স্থানে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া মাথা ভাঙ্গিয়া মৃত্যু হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম মাথাভাঙ্গা হইয়া আজ পর্যন্ত সে অতীত কাহিনীর প্রমাণ করিতেছে। গৌরী জয়নাবাদ লাহিনী পাড়া সাঁওতার পূর্বদিক হইয়া কুমারখালী খোক্‌সা হিজলাবট জালস্থকা অম্বলসার হইয়া ক্রমে দক্ষিণ দিকে নানা স্থানে নানা নাম পরিচয়ে যথা গৌরী, গড়ই, কামারখালী, মধুমতী, এলংজানি বালেশ্বররূপে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। গৌরীর জন্ম আমলাসদরপুরের মধ্যস্থিত বিল হইতে। প্রথম গৌরী বেশী পরিসর ছিল না, প্রমাণ আমলার বিল জন্মস্থান হইতে কুষ্টিয়া টাউনের পশ্চিম সীমা মোঙ্গল বাড়ীর পর্যন্ত সেই পূর্বপরিসররূপে আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। দেড় শত বৎসর পূর্বে গৌরীর অবস্থা সর্বত্রই যে ঐ পরিমাণ ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাচীন লোকের মুখে শোনা যায়। জয়নাবাদ লাহিনী পাড়ার নিম্নে গৌরীর পরিসর পূর্বে কম ছিল। যে স্থানে গৌরীর পশ্চিম পাহাড়ী ছিল সে স্থানের মাটি আজ পর্যন্ত উঁচু হইয়া রহিয়াছে। নিম্নে এখনও একহাত পরিমাণ খাদচিহ্ন দেখাইয়া স্থানে স্থানে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিলেই বোধ হয় গৌরী নদী সর্বত্রই এইক্ষণে পুরাতন গৌরী নামে যে পরিমাণ স্থান, প্রায় ১০/১২ মাইল অর্থাৎ আমলার বিল হইতে মোঙ্গলবাড়ীয়া পর্যন্ত অতি কম পরিসর অবস্থাতেই আছে। "পুরাতন" নামই তাহার বিশেষ

প্রমাণ। ডাকদহর উত্তরাংশে পদ্মা নদী যে স্থান বর্ত্তমান বাজিতপুরের ঘাট। পদ্মার ধারে বাজিতপুর। পদ্মা কোন সময়ে পাহাড়ী ভাঙ্গিয়া ডাকদহ নিকটে গৌরী সহিত মিশিয়া লাহিনী পাড়া জয়নাবাদ সাঁওতার দিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বেশী পরিসর হইয়া গিয়াছে। আদি স্থান হইতে প্রায় ৮/৯ ক্রোশ মঙ্গলবাড়ীয়া পর্য্যন্ত পুরাতন গৌরী নামেই পরিচিতা হইতেছে। এই পরিচয় স্থানের উপরেই লাহিনী পাড়া গ্রামের উত্তরাংশের ঘাটে পূর্ব দেশগামী রেলওয়ে কোম্পানী গৌরী সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। মেঃ ব্রাডফর্ লেসলী বৃহৎ মস্তকের মজ্জা ক্ষয় করিয়া সাতটি বৎসরে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। ইংরেজী ১৮৭১ সালে সেতুবন্ধন শেষ হইয়া গাড়ী চলা আরম্ভ হইয়াছে, ভারতে চির বিখ্যাত মহামতি লর্ড মেও বড়লাট বাহাদুর গৌরী সেতু খুলিয়াছিলেন। গৌরী সেতুবন্ধন সময়ে অনেক মান্যমান হিন্দু মুসলমান কেরানী, ড্রপসম্যান কেশিয়ার, বড় বাবু সাজিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে কার্য করিতেন। খাস ইউরোপিয়ান, অতি কম হইলে ২০/২৫ জন, দেশী ফিরিঙ্গী, প্রায় ঐ পরিমাণ, নিগ্রো হাবসী ১০/১২ জন, কেরানী দল ৭০/৮০ জনার কম ছিলেন না। অল্প অল্প ইংরেজী বাঙ্গলা জানা লোকও ২০/২৫ জন ছিলেন। হাতী, ঘোড়া, বোট, নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার বিস্তর ছিল। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের এবং দেশীয় কুলি হিন্দুস্থানী কর্মকার সূত্রধর কুলি মজুরের সংখ্যা করা কঠিন। স্বর্গীয় দুর্গাচরণ গুপ্ত—যাঁহার গুপ্তপ্রেস, গুপ্ত পঞ্জিকা বঙ্গদেশ বিখ্যাত, তিনিও গৌরী সেতুবন্ধন উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানীর বেতনভোগী হেড বাবু হইয়া কার্য করিতেন। গৌরী সেতুসম্বন্ধে সমুদায় অবস্থা গৌরী সেতু নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। লেখকের বাটীর নিকটেই গৌরী সেতু। বাঙ্গালী বাবুদিগের সহিত লেখকের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল।

প্রিয় পাঠকগণ! আমি কে? প্রকাশ্য সম্পর্কে আমি কাহার কে, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন। এইক্ষণ স্থির ধীরভাবে আমার জন্ম-বৃত্তান্ত শুনুন।

আমার জন্ম বৃত্তান্ত হইতে বাল্যজীবন গত হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল বিবরণ লিখিত হইল, তাহা সমুদায় আমার পরম পূজনীয়া মাতামহী মহোদয়ার মুখে শুনা। বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদের মুখে শুনা কথা। বিশেষ পূজনীয়া মাতামহী মহোদয়া সময় সময় আমার বাল্যজীবনের অনেক কথা আগ্রহাতিশয়ে আমার যৌবনকালে আমাকে শুনাইয়াছেন। এই আভাসেই যথেষ্ট। উপক্রমনিকা শেষ। জন্ম-বৃত্তান্ত আরম্ভ।

জন্ম বিবরণ

পরিদৃশ্যমান জগতে দৈহিক সম্বন্ধে প্রমাণের সহিত পরিচয় পাইলাম আমি কে? আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ তদূর্ধ্ব পুরুষেরও পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারিলাম আমি কে? কিন্তু একটি সন্দেহ রহিয়া গেল। সে সন্দেহের কথা প্রকাশ করিলে অনেকে অনেক প্রকার ভাবিবেন।

হয়ত কেহ নিশ্চয় মনে করিবেন, সত্য সত্যই আমার মাথা নাই। থাকিলেও ভাবিতে পারেন, সত্যই সে মাথায় কিছু নাই। কারণ এ খামখেয়ালী গাঁজাখুরি খেয়াল করে কে? এ গুলিখোর চিন্তায়, সময় নষ্ট করে কে? যিনি যাহাই বলুন, যাহাই ভাবুন, কথায় যখন—কিন্তু বসিল, সন্দেহের অধিকার জন্মিল, তখন একটা মীমাংসার দরকার। মীমাংসা না করিয়া নিঃসন্দেহভাবে না বুঝিয়া, পরের কথায় হাঁ, হুঁ করিয়া, মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিব,—যে হাঁ-বুঝিয়াছি, তাহাত পারিব না। তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিব। বুঝিয়া সমজিয়া স্পষ্ট উচ্চারণে বলিব হাঁ-বুঝিয়াছি। দশ জনেও বুঝিবে যে হাঁ বুঝিয়াছে। আমরা দশজনেও বুঝিয়াছি।

কথাটা কি? মানব জন্মের মূল কোথায়? যেমন, আমার পিতা অমুক, তার পিতা অমুক তার পিতা অমুক এই তিন সিঁড়ি উঠিলাম। এইরূপ কত সিঁড়ি উঠিলে গোড়া পাওয়া যায়। গোড়াটা ঠিক হলেই, সকল গোল চুকিয়া যায়। নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন, নানা সম্প্রদায়ে নানারূপ কহিতেছেন। সে সকল সুশ্রাব্য অশ্রাব্য কথার সমালোচনা করিতেছি না। সে সকল মোটা ভাবের মধ্য হইতে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাব গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার নাই। আমি মোটামুটি ভাব বুঝি। তাহারই আলোচনা করিব। কেহ দশ বিশ পুরুষ পর্যন্ত চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন, আর উর্দ্ধে যাইতে ইচ্ছা করেন না। কেহ কিঞ্চিৎ তদূর্দ্ধে যাইয়া আর যাইতে পারেন না। মুখে বলিয়া ফেলেন, যা থাক্ থাকুক পূর্ব পুরুষ যাহা হয় হউক, আমাদের তাতে আসে যায় কি? বর্তমান সময় সরস্বতীর প্রিয় স্থায়ী আবাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান মহা বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলাভূমি। যাঁহারা বিদ্যাবলে, কোন কোন সম্প্রদায়ের দেবতাদিগকে গোলামী সাজে সাজাইয়া দিবা রাত্র বিনা বেতনে খাটাইয়া লইতেছেন, নাকে দড়ি দিয়া যথেচ্ছা টানিয়া লইতেছেন, যথা—অমরাপুর অধিপতি শচীপতির চির অধিকৃত নিজস্ব হাতের

অস্ত্র তাহারা কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নানা আকারে, গাড়ীতে জুতিয়াছেন, পাখা টানাইতেছেন, খবরাখবর করিবার জন্য খতগির খবুরে পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তেল সলতের স্থানে বসাইয়া রোশনাই বিলি করাইতেছেন। রাস্তা ঘাটে বাজারে দরবারে মলমূত্র ত্যাগ গৃহের অন্ধকার দূর করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। যেমন অহঙ্কার তেমনি জব্দ। পশ্চিম দিকপালকে, হুকুমের তাঁবেদার বানাইয়া, পাটের গাঁইট বাঁধাইতেছেন, কাঠ চেরাই করিতেছেন, অতি কদর্য স্থান সকল বিধৌত করাইয়া পরিষ্কার করাইতেছেন, যেখানে ইচ্ছা কানে মোড়া দিয়া লইয়া যাইতেছেন, পাঠাইতেছেন। পবনকে বাঁধিয়া আনিয়া, লোহার বড় বড় নলে পুরিয়া ময়লা পরিষ্কারে লাগাইয়া দিয়াছেন। যে স্থান হইতে ইচ্ছা হয়, যে পাত্র হইতে ইচ্ছা হয় তাড়াইয়া দিতেছেন।

রবিঠাকুর খুব সদাশয় সকলেরই উপকার করেন, কারণবশতঃ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছেন। এমন শক্ত ঠাকুর, তাঁহার দ্বারা চিত্র করাইয়া লইতেছেন। দেবতা বলিয়া আর মান্য নাই। শ্রম কর—খাট, খাও। না খাট গোল্লায় যাও। হুতাশনের এত তেজ, তাঁহাকেও পরাস্ত করিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছে! অতি ক্ষুদ্রকায় নগণ্য বাক্সে দীপশলাকায় সংলগ্ন করিয়া অতি জঘন্য-ভাবে রাখিয়াছে। যথা অযথা স্থানে এমন কি পকেটে রাখিলেও কোন ভয়ের কারণ নাই। এমন মহাশক্তিসম্পন্ন জাতি তাহাদের মধ্য হইতে মহাপ্রাজ্ঞ প্রবীণ প্রাচীন—নাম ডারউইন মহোদয় যে মীমাংসা করিয়াছেন, এতকাল পরে তাঁহাকেই কি, সেই বিপিনবিহারী মহোদয়কে কি—সেই আদি স্থানে বসাইব? কি বলেন? সেই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জাতির কথায় কি শাখামৃগ বাহাদুরকে আদি জন্মদাতা স্বীকারে মর্কটদলের সহিত সম্বন্ধ পাতাইব? ছি ছি! কি ঘৃণা! কি লজ্জার কথা! মানুষ হইয়া বানরের বংশধর স্বীকারে জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজ্যের অধিকারী হইব। "নাউজ বিল্লাহ"।

যাঁহারা ডারউইন সাহেবের মতের বিরোধী নহেন, বিপক্ষে নহেন, তাঁহারা মর্কটের বংশধর স্বীকারে গৌরবান্বিত হউন, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, এক বংশের বংশধরগণকে খুঁজিয়া পাঁহাড় জঙ্গলে সম্বন্ধ বিস্তারে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করিতে থাকুন,—আমাদের কোন আপত্তি নাই।

সেই মহাশক্তিধর অদ্বিতীয় এলাহির মহিমা ও তাঁহার কালাম (বাণী) কার্য প্রতি যাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই, তাঁহারা এই উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসা যেভাবে, যে অর্থে করিতে ইচ্ছা করেন করুন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে যাঁহাদের

ভাবোদ্ধারের কথা তাঁহারা যে ভাবে ইচ্ছা হয় ভাবোদ্ধার করিয়া যাহা মনে লয়—মাথায় জন্মায় বলিতে থাকুন। আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নাই।

কথাটার মীমাংসা কি হইল? উত্তর-মীমাংসার জন্য বেশীদূর যাইতে হইল না। সামান্য একটু চিন্তা করিলেই এমন অকাট্য প্রমাণের সহিত, সত্যতত্ত্ব সত্যবান, সৎদৃষ্টান্ত সৎভাবের সহিত চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিল। আমার মনই আমাকে বলিল—দয়াময় এলাহি কৃপায়, মোসলেম ঔরসে মোসলেম ললনার গর্ভে, মোসলেম আত্মীয় মোসলেম ধর্মের বিধি ব্যবস্থায় আমার জন্ম হইয়াছে, মোসলেম ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস বলিয়াই, অতি সহজেই মোসলেমের ধর্ম পুস্তক খোদার পবিত্র বাণীর মর্মানুসারে উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল।

ভাই! তুমি যদি সত্য মুসলমান হও তবে আমার মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইবে। বিনা খটকায় হৃদয়ে প্রবোধ জন্মিবে। ভ্রাতাগণ! আমরা নিতান্তই অবোধ তাহাতেই এ পণ্ডিত সে পণ্ডিত মহা মহা বিদেশী পণ্ডিত নিকট খোদার কালামের উপরেও মীমাংসা করিতে অগ্রসর হই। ভ্রাতঃ পাঠকগণ! বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, এই জগতে যত ধর্ম আছে, সকলেই স্ব স্ব ধর্মের উপর হস্তক্ষেপণ করিয়া মনের মত গড়াইয়া লইয়াছেন, লইতেছেন। মোসলেম ধর্মে তাহা হইবার নহে, হইবে না, হইতে পারে না। মুসলমান-মনে ওরূপ কথা উদয়ই হয় না। হইবার কোন কারণ হয় না। হইবেও না।

মোসলেমগণ যাঁহাকে সর্বশক্তিধর অনন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন অদ্বিতীয় এবং অংশী-শূন্য সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, সে আল্লাহর ভুল নাই, নির্ভুল। তিনি কেমন সুনিয়মে, সুগঠনে আমাদের আদি পুরুষকে আদেশে সৃজন করাইয়াছেন। তাহার জন্ম কথা—তাহার গঠন কথা তাহার দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কথা সেই হজরত আদম (আঃ) জন্মকথা জন্মের আনুষঙ্গিক কত কথা কেমন পবিত্রতার সহিত রহিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান কেমন সুখের স্থান। প্রথম বাসস্থান বেহেস্তে। তিনিই আদি পুরুষ, আমাদের আদি এবং তাঁহারই বামপঞ্জর হইতে যে পবিত্র রমণীর জন্ম হয়, তিনিই আমাদের আদি মাতা বিবি হাওয়া। হজরত আদম (আঃ) দেহে মোসলেম আত্মাসংস্থাপিত অদ্বিতীয় এক আল্লাহর উপাসক, সুতরাং মুসলমান। আমরা সকলেই মোসলেম সন্তান—মুসলমান।

কোন কোন পাঠক মনে মনে বিরক্ত হইতে পারেন। বলিতেও পারেন। জীবনীর মধ্যে ধর্মের কথা কেন? উত্তর—ধর্মই সর্বসার। ইহকাল পরকালে

সর্বকালের সার ধর্ম। ধর্মের সহিত জীবনের সংস্রব না থাকিলে সে জীবন বৃথা—জীবনী বৃথা, তাহার জন্ম বৃথা। কোন কথা মনে উদয় হইলে একটু স্থির হইয়া মনকে প্রবোধ দিবেন। লেখক মুসলমান। যাহার জীবনী সেও মুসলমান।

শুনুন এখন আসল কথা। প্রমাণের সহিত সাব্যস্ত হইল, আমি আদম সন্তান হজরত আদম (আঃ) আমার আদি জন্মদাতা, তাহার পর কত হাজার কি কত লক্ষ বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশেষে পিতা মীর মোয়াজ্জাম হোসেন, জননী বিবি দৌলতননেসা ইঁহাদের ধর্মানুসারে সংযোগ আমার জন্ম। শুধু আমার নহে, জগৎময়। জন্মকাণ্ডের মধ্যে কি কোন ভাবিবার কথা নাই? হায়! হায়! অনন্ত শক্তিধর অসীম জ্ঞানসম্পন্ন অদ্বিতীয় এলাহির কি অপরূপ অনন্ত মহিমা এই মানবের জন্মকাণ্ডে নিহিত রহিয়াছে। আমিও ত মানব-সন্তান সে মহাশক্তি সম্মুখে সামান্য কীটাণু হইতেও নীচ, আমি সে অনন্ত মহিমার কি বুঝিব? অপরকেই বা কি বুঝাইব।

কবি গাহিয়াছেন ঃ

১। এক বিন্দু বারি হতে
কিবা খেলা এ জগতে,
প্রকাশিলে আদমের জাত।

২। দরবেশ ও আম্বিয়া,
অলিওল্লাহ আউলিয়া
কামেল ফকীর নেক জাত॥

৩। কোতব, গাওস্, গাজী,
সুফি মোল্লা-মুফতিকাজী,
জাঁহাপানা সোলতান এমাম।

৪। সাহান সাহ নবাব সাহ,
শত শত বাদসাহ,
নজীব শরিফ কত নাম॥

৫। দীন দুঃখী কানা খোঁড়া,
চির বাস জামা জোড়া,
লক্ষপতি কড়ার ভিখারী।

৬। রাজা প্রজা রাজরাণী,
সাহাজাদী মাগ্ন মানী,
সকলেরই মূলে সেই বারি ॥
(মৌলুদ শরীফ)

দয়াময় এলাহি আমাকে যে প্রকারে যে নিয়মে যে বিধানে জন্মাইয়াছেন, সকলকেই সেই প্রকারে জন্মাইয়াছেন। উপরের কয়েকটি পদেই তাহার বিশেষ প্রমাণ করিতেছে। মানবদেহে ক৩ প্রকার জিনিসের সমাবেশ। কত কল কৌশল, কত বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া, কত ভাণ্ডার, কত কোষ, কত ধমনী নাড়ী শিরা—মাংস শোণিত মজ্জা অস্থি, কেশ, লোম, চর্ম, নখ ইত্যাদি। চক্ষুর মধ্যেই বা হায় হায়! কি কারিগরী। পাকস্থলী, ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা, কলেজা, জিহ্বা, দন্ত, অন্ননালী, নাসিকা ইত্যাদি—কত বলিব। এক একটি অঙ্গ এক একটি রাজ্য বিশেষ। কতই কারিগরী কত প্রকারের যন্ত্র সংযোগ, তাহার সীমা করাই কঠিন। জয় জগদীশ্বর! তোমার কারিগরীর অন্ত নাই।—ক্ষুদ্র জীব মানবের সাধ্য কি তোমার করুণার কণা মধ্যে প্রবেশ করে? কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য ক্ষমতা ও কৌশল! মানব- কুলের জনমকাণ্ডে মনোনিবেশ করিলে, হতজ্ঞান হইতে হয়, বুদ্ধিশক্তি লোপ পায়। সেই সামান্য জল মধ্যেই ঐ সকল সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সমুদায় নিহিত রহিয়াছে। চুল, দাড়ি, গোঁফ, অস্থি, মাংস, নাড়ী, ধমনী ইত্যাদি সকলই ঐ বিন্দুপরিমাণ বারির অন্তর্ভূত। মায়ের উদরের বিষয় কাহারও জানিবার সাধ নাই। কি প্রণালীতে ক্ষুদ্রস্থান জরায়ু মধ্যে শরীরের গঠন হইতেছে, অঙ্গের অবয়ব যথারীতি প্রকাশ পাইতেছে। হায়! হায়! ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয় যায়। কি প্রকারে শ্বাসযন্ত্র চালিত হইতেছে। ভ্রূণ দেহ বর্ধিত হইতেছে। কেহ নয় মাস দশ দিনে, কেহ আট মাস, কেহবা সাত মাসেই গর্ভ কারাগার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া জগতের মুখ দেখিতেছে। আহা! সে নবজাত শিশুর মুখে সময় সময় হাসির রেখা কে টানিয়া দেয়? দুই দিনের শিশু হাসে কেন? কান্দিবার কারণ অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু হাসে কেন? কি আনন্দে অমন মহামূল্য দুইখানি কচি ঠোঁটে কেন হাসি দেখা দেয়? তাহার মন কি কারণে প্রফুল্ল হয়? কচি কচি ওষ্ঠ দুখানিতে হাসি দেখা দেয়। এ সকল গুরুতত্ত্বের ভার কে বুঝিবে? কে ইহার মূলতত্ত্ব উদঘাটন করিবে। কি প্রকারে জরায়ু কারাগারে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিলাম, কি খাইয়া এত দীর্ঘ সময় জীবিত রহিলাম। জরায়ু কারাগারে জলে ডুবিয়া কেবলই নিদ্রায় বিভোর ছিলাম। কখন কখন জাগিয়া ঘোর অন্ধকা

স্থান ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিয়াই ছিলাম। বুদ্ধি চালনা করিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক চিকিৎসক ডাক্তার হাকিম বুদ্ধি খাটাইয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া গিয়াছেন। মানবজন্মের রহস্য কথা কলমে কাগজে আঁকিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকল খাঁটি খবর নহে। জগতের প্রকাশ্য আলোকে যাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহাতেই নানা মুনির নানা মত, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বদর্শীর ভিন্ন ভিন্ন মত। এ অবস্থায় দেহমধ্যস্থিত চর্মাবরণ মধ্যে জরায়ু কোষে কি কাণ্ড হইতেছে তাহার সত্যতত্ত্ব নির্ধারণ করা সহজ নহে। ধন্য জগদীশ্বর! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

অবশ্যই একদিন জন্মিয়াছি। আমিও একদিন জননীর উদর হইতে জগতে আসিয়াছি। যদিও সে সকল ঘটনা জন্মদিনের ঘটনা আমারও মনে নাই—থাকিতেও পারে না, অসম্ভব অসম্ভব। তবে পূজনীয়া মাতামহীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছি,...স্মরণশক্তির সহিত কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইলে যাহা দেখিয়াছি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী জন্মিলে জন্মকালীন ক্রিয়াকাণ্ড যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, জন্ম ঘটনায় কি কি কাণ্ড হইয়াছিল তাহাতেই বুঝিয়াছি।

বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমান অবশ্যই সাধারণ ও অজ্ঞ মুসলমানদিগের বাটীর জাত-ঘরের কথাই অগ্রে বলিতেছি। পরে আমাদের বংশের জাত-ঘরের কথা বলিব। মুসলমান ঘরের জাত-ঘরের কথা না বলিলে জাত-ঘরের পার্থক্য ভাব পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন না। সাধারণ জাত-ঘর বাটীর মধ্যে সদর আঙ্গিনায় হয় না। কোন নোংরা স্থানে অথবা কানাচিতে একটু স্থান থাকিলে সেই স্থানে অতি সামান্য ভাবে ৫ হাত দীর্ঘ ৩ হাত প্রস্ত কুঁড়ে ঘর যেন-তেন প্রকারে বাঁধিয়া লতাপাতা খড়কুটা দ্বারা অগ্রেই প্রস্তুত করিয়া রাখে। সে ঘরের মেজেয় মাটি দিয়া আঙ্গিনা হইতে উঁচু করা হয় না। কেহ কেহ উঁচু করিলেও দুই-তিন অঙ্গুলী উঁচু করিয়া মাটি দেওয়া ভিন্ন বেশী পরিমাণ দিতে পারে না। বেড়া চারখানি দেয় বটে, কিন্তু সে না দেওয়ার মত। পাতা ডাঁটা গাছ-গাছড়া বড় জোর উলু খড়, কি বিচালী দ্বারা বাঁশের চটা সংযোগে কোন প্রকারে খাড়া করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। প্রসূতির বিছানা বালিশ মধ্যে ছেড়া মাদুর বা পুরাতন চাটাই। খড়ের আঁটি কি বিচালীর আঁটি বাঁধিয়া অথবা ছেঁড়া নেকড়া একত্র করিয়া তাহারই বালিশ করিয়া দেওয়া হয়। আহারের জন্য থালা ঘটি জলপাত্র মাটির। অথবা এরূপ জঘন্য যে তাহা মনুষ্যের ব্যবহারে রুচি হয় না। আহারের সামগ্রী নূতন প্রকার। যাহা স্বাভাবিক শরীরে কেহ কখনও খায় না—তাহাই। ভাজা চালের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া সামান্য একটু আখের গুড়ের মিষ্টির সহিত

ঝালে ঝোলে একত্র করিয়া সেই কিম্ভূতকিমাকার খাদ্য প্রসূতিকে দেওয়া হয়। ছেঁড়া নেকড়া ছেঁড়া কাঁথা ইহাই প্রসূতির ভাগ্যে ঘটে। শীতকালে সন্তান প্রসব হইলে প্রসূতি ও নবশিশুর যে কি কষ্ট তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রসূতিকে কেহ স্পর্শ করে না। খাইতে হয় কলাপাতে নয় অতি জঘন্য পাত্রে। প্রসব করিয়া কি অপরাধেরই যে কার্য করে, তাহা কেহই মুখ ফুটিয়া বলে না। অথচ গৃহিনী জাতগৃহে মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য নহে। পশু হইতে নীচ, বাড়ীর পোষা কুকুর হইতেও ঘৃণার পাত্র।

হায়! সমাজ এ প্রথা কোথায় শিক্ষা করিয়াছে? এসলাম ধর্মের কোন পুস্তকে এরূপ বিধি বিধান পদ্ধতি নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা উপদেশ আদেশ রহিয়াছে? এ সকল শিক্ষা করিয়াছ কোথায়! হে বঙ্গীয় সাধারণ মুসলমান ভাই সকল! এ শিক্ষার ওস্তাদ কাহারা? বলিব না। কাহারও মনে আঘাত দিব না। তুমি ত অন্য দেশে যাও নাই। কোন মুসলমান রাজ্য দেখ নাই, তাহাও জানি। তবে এ ব্যবস্থা এ নিয়ম শিখিলে কোথায়?

এখন আমাদের জাত-গৃহের কথা বলিতেছি। বাস গৃহের বিভিন্ন কুঠরিতে কি ভিন্ন ঘরে প্রসূতি সন্তান প্রসব করে। আমাদের মধ্যে কোন কালে স্বতন্ত্র জাত-ঘর বাঁধা হয় না। জাত-ঘর নিমিত্ত কোন শয্যা কি কোন পাত্র ইত্যাদি কোনরূপ পৃথক করিয়া রাখা হয় না। যে জিনিসপত্র জাত-ঘরে দেওয়া হয়, ৪০ দিন পরে তাহা মাজিয়া ঘষিয়া কি কলাই করার কোন পাত্র হইলে তাহা কলাই করিয়া লওয়া হয়। অতি উত্তম স্থানে পরিষ্কার শয্যায় প্রসূতির স্থান দেওয়া হয়।

সেই প্রথানুসারে লাহিনী পাড়ার বাটীর পশ্চিম দ্বারী বৃহৎ ঘর, যে ঘরে আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী শয়ন করিতেন সেই ঘরে আমার জাত-ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা যত ভাই ভগ্নী ঐ এক ঘরেই সকলের জন্ম হইয়াছে। জাত হইতে চল্লিশ দিন গত হইলেই আবার সেই ঘর বাসের ঘর হইয়াছে! চল্লিশ দিন প্রসূতির নামাজ রোজা করিতে হয় না। আমার জন্ম সন মাস তারিখ দণ্ড সকলি জন্ম পত্রিকায় লেখা আছে। জন্ম পত্রিকার সকল অংশ এই স্থানে প্রকাশ অসাধ্য। কারণ বৎসর ফল, মাস ফল, দৈনিক ফল পর্যন্ত লেখা রহিয়াছে। সে সকল ফলাফল প্রতি অক্ষরে বিশ্বাস নাই আমি তাহা কখনও খুলিয়াও দেখি নাই। তবে জন্মের তারিখ দণ্ড ইত্যাদি তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত কয়েকটি বচন সহ, এবং জ্যোতির্বী পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন তাহার নামমাত্র উল্লেখ করিব।

যদি বলেন এরূপ জন্ম পত্রিকা হইবার কারণ কি? খাঁটি মুসলমান গৃহে এরূপ ঘটিবার কারণ কি? ৬০ বৎসর পূর্বে বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা ছিল তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আমি সেই দুর্ঘটনা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই জীবনীতে সন্নিবেশিত করিব! সে সময়ে বঙ্গে মুসলমান সমাজের দুর্দশার কারণই, ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে অনিচ্ছা। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় শৈথিল্য। জাতীয়ভাব রক্ষায় অমনোযোগী এ সকল ঘটিবার কারণ? বিধর্মীদিগের প্রবল পরাক্রম; ধন গৌরব শাসন, বিচার রাজ্য বিভাগ সমগ্র, বিভাগেই মুসলমানশূন্য। যাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল স্থান অলঙ্কৃত তাহারা দেখিতেও ভাল, ক্ষমতাও কম নহে। তাঁহাদের বাক্স, সিন্দুক টাকা পয়সায় পরিপূর্ণ। বিজাতীয় ভাষার কল্যাণে রাজপুরুষদিগের সহিত মাখামাখি ভাব, কাজেই নির্জ্জীব নিরক্ষর বঙ্গীয় মুসলমানগণ অনেক কার্যে তাঁহাদেরই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বড় বড় জমিদার, ধনী মুসলমান,—জোড়া জোড়া প্রতিমা তুলিয়া আশ্বিন মাসে প্রতিমা কল্যাণে দু-দশ হাজার বাহাবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বিজাতীয় মহোদয় সেই সকল মুসলমানের মাথা খাইয়া নরক নিবাসে পাঠাইবার জন্য তাঁহাদের সন্তোষ জন্য, প্রকাশ্য সভায় ডাক ছাড়িয়া বলিয়াছেন, "যে এই লোক কি মুসলমানের উপযুক্ত? না মুসলমান? কি পাপে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিতে পারি না। নিশ্চয় পূর্ব জন্মে হিন্দু ছিলেন। ঘোরতর পাপে নীচ ঘরে ম্লেচ্ছ ঘরে জন্মিয়াছেন।" যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হইতেছে তিনিও মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইতেছেন। মুখের উপর রক্তাভছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চোখে মুখে মহা খুশির লক্ষণ উভরিয়া পড়িতেছে। বোধ হয় এই সকল কারণে সঙ্গ দোষে তোষামোদের কুহকে চাটুকার রাজ্যে আমার পূজনীয় পিতৃদেব আমার "ঠিকুজি" জন্ম পত্রিকা যাহাকে কুষ্ঠি কহে জ্যোতিষী পণ্ডিত দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। জন্ম পত্রিকার প্রথম অংশের কতক অংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জন্ম সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র মত যত শ্লোক যতরূপ অঙ্ক চিহ্ন যে প্রকারে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা সমুদায় প্রকাশ অসাধ্য। কোন ফলও নাই! তাহার পর বর্ষ ফল, মাস ফল, দৈনিক ফল প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মাত্র জন্মতারিখ আর ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।*

* সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে কম্পোজ করা কঠিন বলিয়াই এবার হইল না আগামীতে চেষ্টা করিব।

আমি পূর্বেই আমাদের জাত-ঘরের কথা প্রকাশ করিয়াছি। আমার জন্ম বিবরণ মাতামহীর নিকট শুনিয়াছি। তাহাও প্রকাশ করিয়াছি। কাজকর্ম না থাকিলে সন্ধ্যার পর সকল ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া মাতামহী এক মাদুর পাড়িয়া বসিতেন, আর গত কথাসকল সবিস্তারে বলিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন। তাহাতে আমার কথা আমি বলিতেছি। গত কথা স্বয়ং মাতামহী প্রকাশ করায় আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আরও হইয়াছে কি, মাতামহী মাতাপিতা প্রতি যিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল লোকের প্রতি আমার মনের ভাবও সেইরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, উপকার হেতু প্রাণপণে খাটিয়াছেন, সঙ্কট সময়ে সাহায্য করিয়াছেন, আজ পর্যন্ত তাঁহাদের বংশধরগণ আমাদের চক্ষে সেই হিতৈষী, চিরহিতৈষী ভাবে রহিয়াছে, আর যাঁহারা অন্যায় অত্যাচার করিয়াছেন চিরকাল শত্রুতা সাধন করিয়াছেন, অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের নাম করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি রক্তমাংস শরীরধারী মানুষের যে প্রকার ভাব উদয় হইতে পারে, যে চক্ষে মানুষে তাহাদিগকে দেখিতে পারে, আমরা সেইরূপ ভাবে দেখিতেছি।

মাতামহী আমাদের নিকট জন্ম বিবরণ এবং জন্ম হইলে যাহা করিয়াছিলেন, সমুদায় বলিয়াছেন। তাহার পর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীদিগের জন্ম ঘটনায় স্বচক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমুদায় আমার মনে আছে। অনুমানে কোন কথার অবতারণা করিতেছি না।

লাহিনী পাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জেনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতননেসার গর্ভে, বাটীর মধ্য আঙ্গিনার অত্যুৎকৃষ্ট ঘর, যে ঘর, পূজনীয়া জননীর শয়ন ঘর নির্দিষ্ট ছিল, সেই পশ্চিমদ্বারি ঘরে আমার জন্ম হয়। আমার যে সময় জন্ম হয় সে সময় আমাদের দেশে অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল। ভূতও এক শ্রেণীর ছিল না। ভূত, প্রেত, দানো, গোদান—গরু মরিয়া ভূত হইলে তাহাকে গোদান কহে। ইহার পর উচ্চ শ্রেণীর ভূত ব্রহ্মদত্তি বা ব্রহ্মদৈত্য। ব্রাহ্মণ মরিয়া ভূত হইলে ব্রহ্মদত্তি হয়। ব্রহ্মদৈত্য ভূত শান্ত ধীর। ভদ্রলোক ভদ্র স্বভাব। দুষ্ট ভূত চণ্ডাল যোগী, তাঁতী ধীবর (জেলে) চোর ডাকাত। স্ত্রীলোক মরিয়া ভূত হইলেই প্রেতনী বা পেতনী পরিচিতা হয়। নামে মাত্র মুসলমান অথচ মুসলমানিত্ব তাহাতে কিছুই নাই। মুসলমানের কালমা দরূদ কিছুই জানেনা,—নামাজ রোজা হাজ জাকাত ইত্যাদির ধার ধারে না। এই শ্রেণীর লোক মরিয়া ভূতযোনী প্রাপ্ত হইলে তাহারাই মামদা—লালু—কালু—লেলুয়া—ভুলুয়া ভূত হয়। তাহার পর সাকচুন্নি—

পেঁচ-পাঁচি। ডাইন জীবন্ত স্ত্রীলোকই হইয়া থাকে। ডাইনে শিশুসন্তানের দেহের রক্ত চুষিয়া-চুষিয়া খায়। ইহার পরও জেন্, পরি, দেও, দানব, দৈত্য নানা শ্রেণীর অপর জীব সে সময়ে আমাদের দেশে চলাফেরা করিত। কেহ কেহ বড় বড় ডালে বাসা করিত। শিশু সন্তানদিগের জন্য পেঁচাপেঁচি নির্ধারিত ভূত। জাত-ঘরে তাহাদেরই অধিকার আধিপত্য।

জাত-ঘরের বারান্দায় দিবারাত্র সমভাবে আগুন জ্বলিত। শুকনো কাঠের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ক্ষণকাল জন্য আগুন নিবিবে না। বারান্দার একপার্শ্বে চাটাই দ্বারা ঘিরিয়া দিবারাত্র পবিত্র কোরাণ শরিফ পাঠ হইতেছে। জন্মের পরক্ষণেই একাদিক্রমে সাতবার আজান দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এবং রাত্র ১২টার পর সাত সাতবার করিয়া আজান দেওয়া হইত। প্রত্যেকের মনে বিশ্বাস, যে আজানের আওয়াজ যতদূর বাতাসে লইয়া যায়, কি স্থির বায়ু ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, ততদূর ভূতপ্রেত দেও দৈত্ত দানো জেন্ পরি—অধিকন্তু শয়তান থাকিতে পারে না। ইহার পরেও বাড়ীর সীমার মধ্যে উচ্চ বংশখণ্ডে গরুর মাথা,—মুড় ঝাঁটা বাড়ুন বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। জাত-ঘরের দরজার একপার্শ্বে গরুর মাথা, গোহাড়, কাটা কুমড়ার ডাঁটাসহ পাতা কপাটের গায়ে চৌকাটের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জাত-ঘরের কপাট জানালার ফাঁক, বেড়ার ছিদ্র যেখানে যতটুকু ছিল তাহাও বন্ধ করা হইয়াছিল। কোন স্থানে একটু ফাঁক অথবা ছিদ্র না থাকে। বাতাস ত যাইবেই না। তাহার পর জাত-ঘরে সমস্ত রাত্র যে প্রদীপ জ্বলিবে, সে প্রদীপের আলোর রশ্মিকণা বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পারে। এ সকল আয়োজন পেঁচ-পাঁচির ভয়ে। জাত-ঘরের মধ্যেও দিবারাত্র আগুন জ্বলিবে, ধূমে পরিপূর্ণ থাকিবে। বেলা ৪টার পরে জাত-ঘরের দরজা বন্ধ হইবে। সারারাত জাত-ঘরে বারি মত স্ত্রীলোক জাগিয়া থাকিবে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেই পেঁচ-পাঁচি সেই অবসরে ঘরের মধ্যে আসিয়া, শিশুর উপর নির্ভর করিয়া অনিষ্ট করিবে ইহাই স্ত্রীলোকগণের বিশ্বাস, এই ভয়ে সারারাত দুইজন স্ত্রীলোককে জাগিয়া থাকিতে হইত। তাহারা গল্প, স্ত্রীলোকের গ্রাম্য গান, কোন কেচ্ছার আলোচনা করিয়া রাত্র কাটাইত। প্রসূতি ৪০ দিন মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতেন না। পাঁচ দিন গত হইলে ষষ্ঠীর রাত্র। আমাদের দেশে ষষ্ঠীর রাত্রকে ছয় কুলার রাত কহে। প্রবাদ আছে সেই রাতে বিধাতা পুরুষ জাত-ঘরে আসিয়া শিশুর কপালে যাহা লিখিয়া যান তাহাই শিশুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কর্মফল, সেই ফলই আজীবন

ভোগ করিতে হইবে। আর সেই রাত্রি বড় সাবধান সতর্কের রাত্রি। পেঁচ-পাঁচির ভারি আবদার বেজায় রোখ। সেই রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ হওয়ার পূর্বে ভাল কলম দোত কালি সাদাকাগজ, একখানা কলমকাটা ছুরি এই কয়েকটা জিনিস অগ্রে যত্নপূর্বক এক পাত্রে করিয়া উচ্চ কোন স্থানে রাখা হয়। তাহার পর "সরস্বতীর বিদ্যার" ঢোল তবলা সেতার বেহালা তাস পাশা দাবা লাঠি সড়কি তরবার, ইত্যাদি শিশু শিয়রে রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল বিদ্যায় শিশু পারদর্শিতা লাভ করিবে। ইহাই আশা।

আমি শুনিয়াছি, আমার জাত-ঘরে ষষ্ঠীর রাত্রে দোত কলম কাগজ রাখা হইয়াছিল। তবলা ঢোলক সেতার বেহালাও দেওয়া হইয়াছিল। তাস পাশা দাবা এ-সকলও ছিল। তাহার পরদিন নাম রাখা, মস্তক মুণ্ডন, স্নান, শিশুর চুল নিক্তিতে ওজন করিয়া, ওজন পরিমাণ সোনা চাঁদি দীন দুঃখীকে দান কর্ণমূলে মুখ দিয়া কালেমা ইত্যাদি দুই কানে শুনান কতকগুলি সামাজিক ক্রিয়া করা হইয়াছিল। যাহা—আজ পর্যন্ত আমাদের সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে—এ কার্য শাস্ত্র সঙ্গত।

শিশুর নামকরণে স্নান, মস্তক মুণ্ডন পর্বকে আকিকা কহে। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দুইটি ছাগ কোরবাণী দিতে হয়। পুত্র হইলে দুইটি, কন্যার জন্য একটি। সেই যে দুইটি ছাগ কোরবাণী দেওয়া হইল, তাহার মাংস, হাড় হইতে এমন ভাবে ছাড়াইয়া লইতে হয় যে হাড়ে আঘাত না লাগে, দাগ না বসে, ভাঙ্গিবার ত কথাই নাই। পিতামাতা ব্যতীত আর আর সকলেই সে মাংস খাইতে পারে। পিতামাতার খাওয়া নিষেধ। আমার এ-সকল ক্রিয়া হইয়াও গাজীর গান হইয়াছিল। রতন গায়ানী গান করিয়াছিল। রতন সে সময় গাজীর গানে ওস্তাদ ছিল।

মাতামহ মুন্সী জেনাতুল্লা আমাকে দেখেন নাই। আমার জন্ম সময়ে তিনি চাকুরী স্থলে রঙ্গপুরে ছিলেন। আমার জন্ম সংবাদ লইয়া যে নরসুন্দর ও সংবাদ-বাহক তাঁহার নিকট গিয়াছিল, তাহাদিগকে থালা ঘটি বাটি কলসী কাপড় বনাত নগদ টাকা বিস্তর দিয়াছিলেন। অন্য অন্য আমলা মুহুরী দারগা জমাদার প্রভৃতির নিকটেও তাহারা অনেক টাকা পাইয়াছিল।

মাতামহী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। একটি মাত্র কন্যা তাহার প্রথম পুত্র আমি—ভালবাসিবারই কথা। পিতাও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

পূর্ব স্ত্রীর সন্তানগণ সকলি মারা গিয়াছে। তাহার পর বিষয় সম্পত্তি ভাইঝি জামাই সাগোলাম বেইমানী করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে, পৈতৃক বসতবাটী হইতে বেদখল করিয়াছে। নানা আপদ বিপদের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপায় একজন মান্যমান

ধনবানের কন্যা বিবাহ করিয়া আশ্রয়স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহার পর দয়াময় একটি পুত্র সন্তানও দিলেন, বিশেষ সন্তুষ্ট হইবারই কথা। মাতৃকুলেও আমি এক পুত্র। পিতৃকুলেও সে সময় আমিই এক একা পুত্র। আমার আদর যত্নের অবধি ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার বদমেজাজী হটকারিতা এবং দুষ্টুমি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোদে রোদে দৌড়াদৌড়ি সারাটি দিন খেলা করা ইহাই আমার ভাল লাগিত।

বাহির বাড়ী আর বাটীর মধ্যেই দৌড়াদৌড়ির সীমা ছিল। আর দুধ* খাইতে হটতা, কিছুতেই দুধ খাইব না মায়ের বুকের দুধ বেশী দিন খাইতে সুযোগ হয় নাই। গরুর দুধ খাইতে হইত। কিছুতেই দুধ খাইব না। খাইব না তো খাইবই না। দুই একদিন না খাইতে দিলে বুঝিতাম দুধ খাইতাম কিনা? মাতা, মাতামহী আমার দুধ না খাওয়ায় ভারি অস্থির হইতেন। ক্ষুধা যেন তাঁহাদিগকে চাপিয়া ধরিয়াছে। তাঁহারাই ছটফট করিতেন, এত বেলা হইল ছেলে দুধ খাইল না। মাতামহী বলিতেন—আহা! আহা! মানিক আমার এতক্ষণ কিছু খায় নাই। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে। কত আদর কত বার মুখ চুম্বন। সহাস্য মুখে "সোনা ভাই আমার দুধ খাও", আমার সেই এক রোখ খাব না—খাবনা বলিয়া শেষে গড়াগড়ি। মাতা তত জেদ্‌ করিতেন না। বলিতেন ক্ষুধা হলে অবশ্যই খাইবে। মাতামহী বলিতেন—সে কি কথা! না খেয়ে পিত্তি পড়বে, পেটের নাড়ী শুকিয়ে যাবে। অজ্ঞান হয়ে পড়বে—দুধ খাও। আমি কি আর সে কথা শুনি। হয়ত দুধের বাটি হাতের ধাক্কা পায়ের ধাক্কা দিয়ে চিতপাত করে ফেলেই দিলাম। শেষে কেহ গান কেহ নাচ করে। দাসী বাঁদির অভাব ছিল না। মাতামহ রঙ্গপুর অঞ্চল হইতে টাকা দিয়া দাসী খরিদ করিয়া পাঠাইতেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে সে সময় পিতা কন্যাকে, স্বামী স্ত্রীকে যথেষ্ট টাকা পাইলে, অথবা দীন দুঃখী লোক কন্যা ভগ্নী স্ত্রী বিক্রয় করিত। আমাদের বাটীতে ৩০।৩২ জন দাসী ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ নাচ করিত কেহ গান গাইত। তাহার পর ঢোকে ঢোকে দুধ খাইতাম। আর এক সময় আবদার, সে মহা আবদার খেউরির দিনে। সাধ্য কি নাপিতে আমার মাথায় ক্ষুর দেয়। আমাকে শান্ত ধীর স্থির করিতে এক মাত্র উপায় ছিল, গান বাজনা আর নাচ। কেহ ঢোল বাজাইত, নাচিত গান করিত, আমি স্থির হইয়া বসিতাম।

তিন বৎসরের কয়েক মাস বয়সের সময়—বেলা দুপ্রহরের সময় রৌদ্র মধ্যে বাটীর মধ্যের আঙ্গিনায় বড়ই চেঁচামেচি দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলাম। পূজ্যপাদ

পিতা আহার করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আমার দুষ্টুমিতে তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়া আমাকে ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। একজন দাসী ধরিয়া লইয়া যেই তাঁহার হাতে দিয়াছে, তিনি অমনি তুই উরুদেশে আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, চেঁচা দেখি। এখন কত চেঁচামেচি করিতে পারিস। উরুর চাপনে আমার বাকরোধ হইয়া চক্ষু ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। জননী সেই স্থানে বসিয়া ছিলেন, তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল গড়ান ভিন্ন মুখে কিছুই বলিতেছেন না। যে দাসী ধরিয়া আনিয়াছিল সে সোরগোল করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই আর আর পরিবারেরা আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইয়া গেল। মাতামহী ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। মাতার চক্ষে জল ভিন্ন মুখে একটি কথাও নাই। মাতাকে সকলে নিন্দা করিতে লাগিল, কেন তুমি ছেলেকে রক্ষা করিলে না। তাহার উপস্থিত কষ্ট নিবারণ জন্য একটি কথাও কেন বলিলেন না। তিনি বলিলেন আমি কেন বলিব? যাহার ছেলে সে শাস্তি দিবে আমি বাধা দিব কেন? তাঁহার কি বুদ্ধি নাই? আমার সহ্য হইল না বলিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ছেলের প্রতি আমার যে অধিকার, আমার হইতে তাঁহার বেশী অধিকার। মায়া মমতাও আমা হইতে যথার্থ পক্ষে ধরিতে গেলে তাঁহার বেশী। আমি অনুরোধ করিলে তিনি যদি না শুনিতেন, তখন আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত। আমি যখন জানি তিনি ভয়ানক রাগী। তখন তাঁহার প্রথম রাগের সময় আমি কিছু বলিলে আরও রাগ বৃদ্ধি হইত। গোল মিটিয়া গেল। একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখি পিতা সেই যে আমার সাড়ে তিন বৎসর বয়স সময় যে শাস্তি দিয়াছিলেন তাহার পর তাঁহার জীবনে আমার গায়ে হাত দেন নাই। কোনদিন গালাগালি দেন নাই। তুই বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। জননীর স্নেহ অপর অপর জননীদিগকে যেরূপ দেখি, আমার মাতার সেরূপ স্নেহ ভালবাসা ছিল না। তিনি পুত্রকে কোলে করিয়া আদর করেন নাই। আয় চাঁদ আয় চাঁদ বলিয়া চাঁদকে ডাকেন নাই। নানা প্রকারের অযথা অপকথা মিথ্যা কথার ছড়া গাইয়া, কি মেয়েলী পদ্য আওড়াইয়া আমাকে ভালবাসেন নাই। বাবা! বলিয়া কোন দিন ডাকেন নাই। আমার নাম ধরিয়া কখনও ডাকেন নাই। "বড় হুজরত" বলিয়া ডাকিতেন, এতই ভালবাসিতেন এতই স্নেহ করিতেন যে তাহা মুখে প্রকাশ অসাধ্য। অন্তরের সহিত নিখুঁত খাঁটি ভালবাসা যাহাকে বলে তাহাই বাসিতেন। লোক দেখান ভালবাসা তিনি জানিতেন না। কি প্রণালীতে যে তিনি ভালবাসিতেন

তাহা তিনিই জানিতেন। আর আমরা বুঝিতাম। কখন আমাকেও বলেন নাই। অন্য কোন ছেলে মেয়েকে তুই বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, আপনি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এ তাঁহার স্বাভাবিক ভাব। সন্ধ্যার পর আমাদিগকে লইয়া খেলা করিতেন, কোলে বসাইতেন। সেই সময় মুখে চুমাও দিতেন। একজনের চক্ষু স্বহস্তে ধরিয়া সকলকেই ঘরের মধ্যে স্থানে স্থানে লুকাইতে বলিতেন। খুঁজিয়া আনিতে পারিলেই তাহাকে কোলে বসাইতেন, মুখ চুম্বন করিতেন। আর কে কয়টা জিনিসের নাম জানে তাই জিজ্ঞাসা করিতেন। কে কতদূর গণিতে জানে শুনিতেন। মাতামহ মুন্সী জেনাতুল্লা সাহেব আমাকে দেখেন নাই। আমার জন্মকালে চাকুরীর স্থানে ছিলেন পূর্বে বলিয়াছি। আমাকে দেখিবার জন্য ছুটি লইয়া বাটী আসিবেন। নিয়তির কল্যাণে তাহা আর ঘটিল না। রঙ্গপুর হইতেই জীবলীলা শেষ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। কাহার সহিত আর দেখা হইল না। কন্যার বিবাহ দেখেন নাই। জামাতাকে দেখেন নাই। দৌহিত্রকেও দেখিতে ভাগ্য হইল না। নগদ টাকা আসবাব যাহা ছিল তাহা সমুদায় মাতামহীর হস্তে ছিল। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রঙ্গপুর তুষভাণ্ডার জমিদার এলাকা মধ্যে জোত স্বত্বে কিছু সম্পত্তি করিয়াছিলেন। আর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে রঙ্গপুর পায়রাবন্দের অন্যতম জমিদার বার খোরদার আলী চৌধুরীর বিধবা স্ত্রীকে নেকাহ করিয়া কিছু সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ নেকার পর বৎসর কাল গত না হইতেই চৌধুরানীর মৃত্যু হয়। মাতামহ কথা এই স্থানে ইতি করিয়া আমার বিদ্যাশিক্ষার বিষয় বলিতেছি।

বিদ্যাশিক্ষা

চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতেখড়ি) হইয়াছিল। গ্রাম্য শিক্ষক মুন্সী ভিন্ন পাশ করা মৌলবী আমাদের দেশে কেহ ছিল না। বিশেষ বিদ্যার চর্চা লেখাপড়ার চর্চা ওঅঞ্চলেই ছিল না। তবে কোন কোন গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছিল। মক্তাব মাদ্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসী আরবি কেহ পড়িত না। অভিভাবকেরাও প্রয়োজন মনে করিতেন না। বাঙ্গালাবিদ্যা গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল; হাতেখড়ির পর ক খ গ ঘ মাটি আঁচড়ান সারা হইলে, তালপাতা ধরিতে হইত, কলাপাতার পরই তালপাতা। তালপাতা কাটিয়া গোবর আর জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতেই ফলা বানান সট্‌কে কড়াকে নাম, নামতা লেখা হইত। সে সকল শিক্ষা হইলে কাগজ ধরিতে হইত। কাগজে পত্র তেরীজ জমা ওয়াশীল বাকী—চিঠে পাঠে খতিয়ান লেখা হইলেই পাঠশালার বিদ্যা শেষ, পাকা মুহুরী উপাধি। গ্রামে আরবি ফারসী পড়ার নিয়ম নাই, প্রয়োজনও বেশী নাই। পুণ্য জন্য আরবি শিক্ষা। কোরাণ শরীফ পাঠ। সে পাঠ বড়ই আশ্চর্য। অক্ষর পরিচয় হইলেই কোরাণ শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবি কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। এখন পর্যন্ত মোল্লার দল যাহারা কোরাণ শরীফ পড়িয়া পয়সা উপার্জন করে, তাহারা ত জানেই না। শুধু পড়িয়া যাওয়া তাহাদের শিক্ষা, বিদ্যা বঙ্গবাসী মুসলমানের পক্ষে বড়ই কঠিন। শিশুদিগের পাঠার্থ যে সকল কেতাব নির্ধারিত ছিল, ফারসী বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান না জন্মিলে তাহার একটি পদের অর্থও হৃদবোধ হওয়া দুঃসাধ্য। বিশেষ ফারসী বিদ্যায় যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া খ্যাত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ফারসী ভাষায় কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন। পারিতেন কিনা পরীক্ষা করা হয় নাই। কেবল কথায় কথায় কার্য ব্যবহারে বিবাহের মজলিসে, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ স্বরূপ পদ্য পদ মুখস্ত আওড়াইয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন। চিঠিপত্র লেখা অভ্যাস কোন মুন্সীর নাই। কোন কারণে লেখা আবশ্যক হইলে প্রথম মুসবেদা তাহার পর কাটকুট, রদবদল, তাহার পর শেষ। সে পত্রও বৎসরে দুই একখানি লেখা প্রয়োজন হইত কিনা সন্দেহ। আর কোরাণ শরীফ অর্থশূন্যভাবে কণ্ঠস্থ করিতে পারিলে তাঁহার নাম গ্রাম, গ্রাম দূরে থাকুক পরগণায় পরগণায় জারি হইল—

অমুক গ্রামে অমুকে হাফেজ হইয়াছেন। পিতা উপস্থিত থাকিয়া আমার হাতে-খড়ি দিলেন। লাহিনী পাড়ার নিকটস্থ পাহাড়পুর গ্রামনিবাসী মুন্সী জমিরুদ্দীন আমার হাতেখড়ি দিলেন।

জমিরুদ্দীনের নাম শুনিলেই অল্পবয়স্ক ছেলেদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত। কলিজার রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইত। মুন্সী জমিরুদ্দীন পুরা পাঁচ হাত জওয়ান। গৌরবর্ণ দাড়ি বক্ষঃস্থল ঢাকিয়া উদর পর্যন্ত ঢাকিয়া পড়িয়াছে। সাদা দাড়ি সাদা চুল, দেখিতে ভয়ঙ্কর চেহারা।

মুন্সী সাহেবের দেহ দারাজ, দাড়ি দারাজ, হাত দারাজ, বেত চালানের হাতও খুব দারাজ। চক্ষু রাঙ্গাইয়া জোড়া বেত হাতে করিলেই অল্পবয়স্ক শিশুগণ চিৎকার করিয়া উঠিত। ভয়ে কাঁপিতে থাকিত। পূজনীয় পিতার হাতেও এই মুন্সী সাহেব খড়ি দিয়াছিলেন। প্রবাদ ছিল মুন্সী সাহেব হাতেখড়ি দিলে তাহার দারগাগিরী চাকুরী না হইয়া যায় না। মুন্সী সাহেব বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। সে সময়ের বাঙ্গালা পত্র, কথাবার্তায় ভাষায় অর্থাৎ যে গ্রামের যেরূপ কথা তাহাতেই লেখা হইত। খত্ পত্র ভিন্ন অন্য কোন কার্যে ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ চিঠে পাঠে জমা ওয়াশীল বাকি, মনকষা, সেরকষা, চাকরাণ, মাহিনার হিসাব, জমা-খরচ নগদ টাকা দাদন উশীল, খরিদ বিক্রয় হিসাব ভিন্ন, সে সময় সাধু ভাষা ব্যবহারের কোন স্থান ছিল না। কাজেই মুন্সী সাহেবেরা বাঙ্গালার কিছুই জানিতেন না। যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল, তাহারা জমা খরচ বাকীজায়, দাখিলা লেখা চিঠে পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাঁহার নাম জাঁকিয়া উঠিত। মুন্সী সাহেবরা ওরকম বিদ্যার নিকটে যাওয়া অপমান বিশেষ বোধ করিতেন। ঐ পরিমাণ বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাহা জানিবেন কেন? আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষর চিনিতেন, যেমনই কেন জড়ানো লেখা না হউক পড়িতে পারিতেন। কথার ভাষায় চিঠির এবারত বলিয়া দিতেন, মুহুরী অথবা অপর কেহ পত্রাদি লিখিত। তিনি ফারসীতে নাম সহি করিতেন।

আমার হাতেখড়ি হইল। বাতাসা বিতরণ করা হইল। আমার শিক্ষার জন্য মুন্সী হেরাছতুল্লা নামে একজন মুন্সী মাসিক দুই টাকা বেতনে আলিফকে পড়াইতে নিযুক্ত হইলেন। গ্রামের দুর্গাচরণ রায়ের হাতের অক্ষর খুব ভাল

ছিল। তাঁহারই অক্ষর দেখিয়া বাঙ্গলা অক্ষর ভাল করিয়া লেখা আরম্ভ করিলাম বেশী দিন মাটি আঁচড়াইতে হয় নাই। লাহিনী পাড়ার উত্তরেই জয়নাবা গ্রাম। ঐ গ্রামে জগমোহন নন্দীর এক পাঠশালা ছিল। অনেক ছেলে ঐ পাঠশালায় লিখিত। পিতার অনুরোধে নন্দী মহাশয় আমাদের বাটীতে ঐ পাঠশালা উঠাইয়া আনিলেন। আমি নন্দী মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা অক্ষর লেখা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আরবির বর্ণমালা শিক্ষার অগ্রে বাঙ্গালার বর্ণমালা মুখস্ত হইল। তালপাতে অক্ষরও লিখিতে শিখিলাম।

এক বৎসর কাল এই প্রকারেই শিক্ষা হইল। এক বৎসরের মধ্যেই কোরাণ শরীফের প্রথম প্যারা (অধ্যায়ের) তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরা পাঠ শেষ করিলাম অক্ষর পরিচয়ে বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরাণ পাঠ করা হইল শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরাণের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে? কোরাণ-শরীফ পড়িতে পারিলেই সেসময়ের মতে অবধি শিক্ষা হইল প্রাতে আর সন্ধ্যার পর কোরাণ পাঠ শিক্ষা করিতাম। আহারান্তে বিকাল বেলা বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতাম। বাঙ্গলায় নাম লেখা প্রায় শেষ হইয়াছে গুরু মহাশয় শিক্ষা কার্যে খুব পটু। আমাকে যে ভালরূপে শিক্ষা দিয়াছেন তাহ দেখাইবার জন্য কাঠের কলম, মেটে দোত, একতাড়া তালপাতা, বগলে করাইয় পিতার নিকট উপস্থিত করিতেন। নাম লিখিতে হুকুম করা মাত্র মুহূর্ত মধ্যে একদমে একশত নাম লিখিয়া উপস্থিত করিতাম। পিতা আগ্রহ সহকারে আমার হাতের লেখা দেখিতেন, অক্ষর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। পিতার নিকট যাহারা বসিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমাকে ঠকাইবার জন্য কোন নীলকর কুঠীয়াল সাহেবের নাম লিখিতে বলিলেন, তাহারা সাহেবদিগের নাম যিনি যে ভাবে উচ্চারণ করিতেন সেইভাবেই লিখিয়া দিতাম, কেহ বলিতেন লেখ দেখি মৃত্যুঞ্জয় রক্ষিত। বড় বড় মুহুরীর এ নাম লিখিতে মাথা ঘুরিয়া গলা শুকাইয়া যায়। আমি ময় হ্রস্বইকার র আর ত ওকার দিয়া যে সে এক "ন" লিখিয়া যথেচ্ছা একটা "জ" আর "অ" লিখিয়া রক্ষিত লিখিতেই আমার গলা শুকাইয়া গেল। কান দিয়া আগুনের ভাপ্ বাহির হইতে লাগিল, অনেক ভাবনা চিন্তার পর র আর থয় হ্রস্বইকার দিয়া থ লিখিলেই দু'শ বাহবা পড়িয় গেল, পিতাও খুব খুশী, গুরু মহাশয় সাবাস্ সাবাস্ করিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয় দিতেন, যদিও আমি বালক, মনে মনে ভাবিতাম, যাহা হউক বাঙ্গালা ত শিখিয়াছি।

জোরে কবিতা পড়িলাম, পাঠশালার ছুটির পূর্বে আমরা সকলে কলম কপালের নিচে রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িতাম, নন্দী মহাশয় পড়াইতেন—

জয় জয় দেবী, চরা চর সারে
কুচযুগে শোভে মুক্তার হারে
বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
ত্বং সরস্বতী নির্মল বরণ ;
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণ।
(ইত্যাদি)

মাথা খুব জোরে কলমের উপর চাপিয়া ধরিতাম, যে কলমটি কপালে লাগিয়া কপালের সঙ্গে বাঁধিয়া উঠে, বাঁধিয়া উঠিলেই মহাপণ্ডিত হইব, না বাঁধিলে গণ্ড-মূর্খ হইতে হইবে। কপালে লাগিয়া পড়িয়া গেলে লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও দুঃখ পাইতে হইবে। এসকল ফল ভাবিয়া গলা টানা করিয়া মাথা পিঠের দিকে নীচু করিয়া রাখিতাম, যে কলম কপাল হইতে ছিটকিয়া না পড়ে।

মুন্সীজির নিকট সে সময়ের নিয়মানুসারে শিক্ষা হইতেছে। ৩০ অধ্যায় কোরাণ-শরীফ শেষ করা সহজ কথা নহে।

মুন্সীজির নিকট হইতে ছুটি পাইলে, স্নান আহার করিয়া একটু ছুটি পাইলে আর আমায় পায় কে ? আমায় সাবধান সতর্কে রাখিবার এবং দুষ্টুমি করিতে না পারি তাহা দেখিবার, মাঠে ঘাটে রৌদ্রে রৌদ্রে বেড়াইতে না পারি, ইহার জন্ম পূজনীয় পিতা একটি বৃদ্ধ লোক—নাম বসারতকে মাসিক ৩ টাকা বেতনে চাকর রাখিয়াছিলেন। তাহার কার্যই ছিল আমাকে লালনপালন করা। আমি তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া দিব্বি ঘুড়ি লইয়া নদীর দিকের মাঠে, কোন দিন বিলের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইতাম। ওদিকে আমার খোঁজ পড়িয়াছে, খোঁজ খোঁজ! কোথা গেল ? এমন দুপুরে কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে কোথা গেল ? দুই মাঠেই লোক ছুটিল, একমাঠে আমাকে পাইল। সে দিন ঐ পর্যন্তই হইল। পরদিন দুপ্রহরের আহারের পর বসারত ভাই, আমার কোমরের সূতায় আর এক মজবুত সূতা বাঁধিয়া তাহার কোমরের সূতার সহিত বাঁধিয়া রাখিল। সে দিন আর ঘুড়ি উড়ান হইল না। তাহার পরদিন আমায় কোমরে সূতা বাঁধিতেই আমি শুইয়া পড়িলাম। বসারত ভাইও আমার কাছে নিশ্চিন্তভাবে শুইল। শয়ন

মাত্রই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া সূতার গেরো খুলিয়া—দে চমপট্ট।

আবার সেই মাঠ। বসারত ভাই হঠাৎ জাগিয়া দেখে আমি নাই। আজ বড়ই অপ্রস্তুত। শেষে বসারত ভাই আর সূতায় সূতায় বাঁধিত না, জাগিয়া থাকিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত যেন শয়তানী কিছু কিছু কমিতে লাগিল। এদিকে কোরাণ-শরীফ পাঠ শেষ হইল, মুন্সীজিও বরখাস্ত হইলেন। ফারসী পড়ান জন্য নূতন মুন্সী সাহেব নিযুক্ত হইলেন। মিঃ টি. আই. কেণীর সালঘর মধুয়ার কুটীর নিকটে সানপুখরিয়া গ্রামে বাস, নাম মুন্সী কছিমদ্দীন। মুন্সী সাহেব পন্দেনামা পড়াইতে লাগিলেন। আমিও মুখস্থ করিয়া পড়িতে লাগিলাম।

কারিমা ববখসায়ে বায় হা লেমাঁ,
কেহাস্তাম আসিরে কামান্দে হাওয়া॥
(ইত্যাদি)

দুঃখের বিষয় মানে বুঝিতাম না। মুন্সীজি বলিতেন—পন্দেনামার মানে পড়িতে নাই। যাক এখন পন্দেনামা শেষ করিয়া গোলেস্তাঁ ধরিলাম। গোলেস্তাঁর মানে বুঝিতে লাগিলাম। কিন্তু সে মানে মথনের মত হইল। মুন্সীজি লিখিত পদগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কিছু কিছু উর্দ্দুর আমেজে বলিতেন। কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম না। বুঝি নাই বলিবার সাধ্য নাই। না বুঝিয়াই বুঝিতে হইত। আমার মাথার দোষেই বা বুদ্ধির দোষেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতাম না।

এদিকে গুরুমহাশয়ের কল্যাণে কাগজ ধরিয়াছি। খতপত্র লিখিতেছি। কেহ বলিয়া দিলে ছোটখাট পত্র বাঙলা অক্ষরে লিখিতে পারি। পূজনীয় পিতৃদেব আমার হাতের লেখা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। ছোটখাট পত্র লেখার দরকার হইলে তিনি বলিয়া দিতেন, আমি লিখিতাম। দুই তিন মাস পরে এরূপ হইল যে প্রায় পত্র আমার দ্বারা লিখাইতেন। ছয়মাস পরে আমি উপস্থিত থাকিতে আর কাহার দ্বারা কোন পত্র লিখাইতেন না। এইরূপ পত্র লিখিতে লিখিতে লেখার অভ্যাস হইতে লাগিল। আর ঐ সকল পত্রের কথার অর্থ ভাব ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মাথায় বসিতে লাগিল। বৎসর কালের মধ্যে সাংসারিক অনেক কাজকর্মে কি করা, কি না করা,—আমার জ্ঞানের মধ্যে মাথার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

শিখিলাম—এখন আমার বয়স দশ বৎসর। পিতৃদেবের নিকট বসিয়া পত্র লেখার

দরুন অতি দীর্ঘ সময় দোয়াত কলম কাগজের সহিত কারবার করিতে হইত। চিত্তের অস্থিরতা, বাল্যজীবনের চঞ্চলতা ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। একস্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া লেখাপড়া করা অভ্যাস, আমার শরীরের আঁতে আঁতে মনের সম্পূর্ণ স্থানে ক্রমে স্থায়ীরূপে স্থায়িত্ব হইতে আরম্ভ হইল। এক বৈঠকে ৬।৭ ঘণ্টা ক্রমাগত লেখার অভ্যাস পূজনীয় পিতৃদেবের চরণপ্রসাদাত। সে সময় অনেক সময় বিরক্ত হইতে হইয়াছে। লিখিতে লিখিতে কষ্টবোধ করিতেও হইয়াছে। সাধ্য নাই, পিতৃদেবের সম্মুখে উপযাচক হইয়া কথা বলি। অতিরিক্ত কথা বাজে কথা, কোন কথা উপযাচক হইয়া বলিবার সাধ্য ছিল না। যে প্রকার কষ্টই হউক নীরবে সহ্য করিতে হইত। তিনি যখন বুঝিতেন যে, অনেকক্ষণ বসিয়া লিখার কার্য হইতেছে, তখন আদেশ করিতেন, একটু বিশ্রাম করিয়া আইস। আহারের কি জলযোগের সময় অতীত হইলে শীঘ্র শীঘ্র কার্য শেষ করিয়া বিদায় দিতেন।

পূজনীয় পিতৃদেবের সহিত, সাগোলামাজম (ভাইঝি জামাই) সহিত ঘোর লাঠালাঠি মারামারি চলিতেছে। কেহই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন না। শান্তির জন্য শান্তিরক্ষক দারোগা মহাশয়ের সাহায্যও চাহিতেছেন না। নিজের বল বুঝিতেই হারজিত পরীক্ষা হইতেছে।* টি. আই. কেনীর সহিত পিতৃদেবের বিশেষ প্রণয় ছিল। নীলকর কুঠিয়াল আমাদের দেশে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই মীর সাহেবকে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। মেঃ টি. আই. কেনীর সহিত গাঢ়রূপে প্রণয় ছিল। বিপদে আপদে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতেন। কোন গুরুতর ঘটনা হইলে উভয়ে পরামর্শ স্থির করিয়া কার্য করিতেন।

পিতৃদেবের সহিত কেনীর একবার সাক্ষাৎ হওয়ায় কেনী বলিলেন,"মীর সাহেব"। নীলকর সাহেবমাত্রই পিতৃদেবকে মীর সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমাদের দেশে মীর সাহেব বলিলে সে সময় পিতৃদেবকেই বুঝাইত। হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই মীর সাহেবের নাম জানিতেন। স্থানে স্থানে আর আর মীর যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মীরত্ব, মীর মোয়াজ্জম-হোসেনের নামের প্রভায় ঢাকিয়া গিয়াছিল।

কেনী বলিলেন—মীর সাহেব, আপনি আমাদের অর্থাৎ একা আমার নহে সমুদায় ইংরেজ জাতির হিতৈষী। বিশেষ আমরা যে কয়েকজন নীলকুঠী করিয়া

* উদাসীন পথিক মনের কথায় বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

এদেশে বাস করিতেছি, আপনি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যথাসাধ্য আমরা সকলে আপনার উপকার সাহায্য করিতে সর্বতোভাবে বাধ্য। যে প্রকার সাহায্য আপনি চাহিতেছেন, আমরা করিতেছি। আমি যতদিন বাঁচিব করিব। আমাদের সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস আপনিও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য উপকার করিবেন। আমাদের নীলকরদিগের এমন কি বৃটিশ জাতির হিত ভিন্ন কখনই অহিতের দিকে অগ্রসর হইবেন না। এই সকল ভাবিয়া আমি আপনার অযাচিতভাবে, একটি উপকার আমরা নিঃস্বার্থভাবে করিতে চাই, ইহাতে আপনার কি অভিপ্রায় ?

মীর সাহেব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—সাহেব কি উপকার করিতে চান্ ? আমি অবশ্যই এটা ভাবিতে পারি যে, যে উপকার অপর কাহার দ্বারা প্রাপ্তির আশা নাই, আর যাহা সহজে পাইবারও উপায় নাই, বোধ হয় সেইরূপ কোন উপকার হইবে। আমার অযাচিতরূপে আপনি উপকার করিতে প্রস্তুত। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সে সাধারণ উপকার নহে। আপনি অনুগ্রহ করিলে সকলি করিতে পারেন।

সাহেব বলিলেন, আপনি বেশ মনোযোগ করিয়া শুনিতে থাকুন। কথাটা একেবারে নূতন, সহজে আপনার বিশ্বাস হইবে না। আমি আপনাকে বলিতেছি বলিয়াই আমার সাহস হইতেছে যে, আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না।

দেখুন !—এই যে জিলায় জিলায় ম্যাজিস্টার সাহেবরা আছেন, মহকুমায় এ্যাসিস্টাণ্ট সাহেবরা আছেন, তাহা ত চক্ষেই দেখিতেছেন ?

হ্যাঁ তাহা ত দেখিতেছি, সকলি হাকিম।

ঐ হাকিমত্ব পদ যাঁহারা পাইয়াছেন, আপনারা ভাবিতে পারেন ঐ সকল সাহেবরা মহারাণীর আত্মীয়স্বজন। নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনকে দেশ শাসন করিতে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

—রাজ-আত্মীয়সকল না হইলে বিশ্বাসের সহিত এরূপ উচ্চ পদ কি সাধারণে পাইতে পারে ?

যাহা আপনি বলিতেছেন তাহা ঠিক। আপনাদের বাদসা নবাব এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্যে অপরকে বিশ্বাস করেন নাই। যেরূপ আপনাদের মেজাজ তাহা করিতেও পারেন না। কিন্তু মীর সাহেব ! আমার বৃটিশজাতি পরস্পর খুব বিশ্বাসী। বিশ্বাসের কারণও অনেক আছে। একধর্ম একজাতি একই পোশাক একই আহার একই ব্যবহার। একই প্রাণ একই শক্তি। শুনুন ! এই সকল

হাকিমান মধ্যে কেহই রাজ আত্মীয় নাই, রাজ কুটুম্ব নাই। তাঁহারা এদেশে কোন কার্যের ভার লইয়া আইসা দূরে থাকুক, বেড়াইয়া দেখিতে আসাও ঘৃণা মনে করেন, এদেশে আসিতে নিতান্তই নারাজ। হয়ত এ রাজ্যের খবরই রাখেন না। যাঁহারা কিছু কিছু খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে এ:দেশ একটা অসভ্য প্রদেশ। নেঙ্গটার মুলুক। মূর্খ বর্বরের রাজ্য। জঙ্গলী লোকের বাস। আপনি মনে কিছু করিবেন না। আপনার উপকার আপনার বংশের উপকার করিতেই আমি আজ এত কথা আপনার নিকট মন খুলিয়া বলিতেছি।

ঐ সকল সাহেব লোক হাকিম হইয়া কোথায় বিলাত আর কোথায় বাঙ্গলা মুলুক—একা একটি প্রাণ লইয়া কেমন সাহসের সহিত কার্য করিতেছেন। এদেশে উপরোধে অনুরোধে অনেক চাকরী হয়, আমাদের দেশে ওসকল নীচ প্রবৃত্তি কাহার নাই। বিদ্যার জোরে চাকুরী পায়। যার বেশী বিদ্যা সেই সকলের ভাল চাকুরী লাভ করে। আপনি বোধ হয় জানেন, ঐ সকল হাকিম সাহেবরাই কমিশনার হয়, ছোটলাট পর্যন্ত হইতে পারে। এখন শুনুন আসল কথা। আমার দেশের লোক যে কলেজে পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া পাশ হয় এবং চাকুরী লইয়া এদেশে আইসে, আপনার দেশের লোকও আমার দেশে গিয়া সেই কলেজে পড়ে, পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিলেই ঐ চাকুরী লইয়া এ দেশে আসিতে পারে। হাকিম হইয়া জেলায় মহকুমায় হাকিমি কাজ করিতে পারে। উপযুক্ত কার্যকারক হইলে জজ কমিশনার হইতে পারে। আমার দেশে কোনরূপ জাতির বিচার নাই। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিলেই প্রথম চাকুরী আসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রী, তার পরেই জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রী, তাহার পর হয় জিলার কালেক্টার, নয় জজ নিশ্চয় হইবে। বাঙালী বলিয়া কোন বাধা নাই, কেহ কোনরূপ আপত্তি করিবে না। হিন্দুরা জাতি যাওয়ার ভয়ে কেহ যাইতে পারে না। মুসলমানের ত সে ভয় নাই। অনায়াসে বিলাতে গিয়া শিক্ষা করিতে পারে। একটি নিয়ম আছে। ঐ পরীক্ষা মধ্যে একটি নিয়ম আছে। ২১ বৎসর বয়সের মধ্যে ঐ পরীক্ষাটা দেওয়া চাই। ১৮ বৎসরেও দিতে পারে। ১৯ বৎসর বয়সের সময় দিতে পারে। ২১ বৎসর পার হইলে আর ও-পরীক্ষা দিতে পারে না। এরূপ বয়সের বাঁধাবাঁধি সকলের পক্ষেই সমান। আমার দেশের লোকেরও ঐ নিয়ম। আপনার দেশের লোক যদি ঐ পরীক্ষা দিবার জন্ত শিক্ষা করিতে বিলাত যায় তার পক্ষেও ঐ নিয়ম। বিদ্যাশিক্ষা পরীক্ষা চাকরী পাওয়া সম্বন্ধে আমার দেশের লোকেরও যেরূপ অধিকার, আপনার দেশের

বালকদিগেরও সেই অধিকার। কোন ইতর বিশেষ নাই। তাহাতেই আমি বলিতেছি আপনার বড় পুত্রটিকে এই সময় ঐ বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান। এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে কিছু বেশি টাকার দরকার। আপনার একটি পয়সা খরচ লাগিবে না। এখান হইতে বিলাত যাওয়া-আসার খরচ, সেখানে থাকার খরচ, পড়ার খরচ—সমুদায় আমি দিব। আপনার সে জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। সমুদায় আমার জিম্মা। আমার দুই কন্যা বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাইতেছে। সেখানে আমার বাড়ী আছে। আমার মা বাপ আছেন, ভগিনী আছেন। আমার মেয়েরা যদি আপন বাড়ী থাকিয়া লেখাপড়ার সুবিধা পায় আপনার ছেলেও আমার কন্যাদের সহিত আপন বাড়ীতেই তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। আর তাহারা যদি অন্য কোন স্থানে থাকে, আপনার পুত্রও সেইখানে থাকিবে। কোন কষ্ট হইবে না। প্রতিমাসে তাহাদের খবর আসিবে। আপনিও মাস মাস খবর পাইবেন। চার বৎসর মন বাঁধিয়া ছেলেকে আমার কন্যাদের সহিত বিলাত পাঠান। সে যখন ফিরিয়া আসিবে, দেখিবেন একটা মানুষ হইয়া আসিবে। আপনার চক্ষেই তাহাকে আপনি আসিস্টাণ্ট মাজিস্টার কালেক্টার জজ হওয়া পর্যন্ত দেখিতে পারেন। আপনি আমার কথা শুনুন। আপনার বংশের গৌরবের জন্যই আমি এত বলিতেছি, অনুরোধ করিতেছি। আপনার পুত্রের শিক্ষার ভার আমি লইতেছি।

পূজনীয় পিতা বলিলেন, সাহেব! এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এখনি স্বীকার হইয়া বাড়ী গিয়া ছেলেকে আপনার নিকট আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু ছেলের মা, মাতামহী—ইহাদের সম্মতির আবশ্যক। তাঁহাদের সম্মতি হইলে আমার কোন কথাই নাই। এত সুযোগ কে পায়? ইহা অপেক্ষা ভালবাসা অনুগ্রহ আর কাহাকে বলে?

পিতা বাটীতে আসিয়া প্রথম আমার মাতার মত কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, পুত্রের শিক্ষালাভ জন্য যে দেশে যেখানে ইচ্ছা পাঠাইতে পারেন। এখানেও যিনি রক্ষক—সেখানেও তিনিই রক্ষক—মাসে মাসে সংবাদ পাওয়া যাইবে। আবার চার বৎসর পর কেণী সাহেবই আনিয়া দিবেন। তাঁহার মেয়েরাও আসিবে। ইহাতে আমার কোন কথা নাই। লোকে বলিবে, ছেলে সাহেব হইয়া আসিয়াছে—তাহাতেও আমার ভয় ভাবনা নাই। সকলের মাননীয় পূজনীয় হইয়া আসিবে ত? সাহেব হওয়া নিন্দার কথাটুকু বেশী দিন থাকিবে না। সে যে চাকুরী পাইয়া দেশে আসিবে, সে ত

সাহেবদিগেরই কাজ, সাহেবদিগেরই চাকুরী। তাহাতে সাহেব হইয়া আসিলে লোকসান কি? মান সম্ভ্রম ক্ষমতা—বিদ্যার নিকট ও একটু আধটু কথা কিছুই নহে। আমি সাহেবের অনুগ্রহে খুব সন্তুষ্ট হইলাম।

পূজনীয় পিতা বলিলেন, তোমার ত দেখি খুব সাহস। তুমি খুশী হইলে কি হইবে? কর্ত্রীকে ত রাজি করিতে হইবে? তিনি বাঁচিয়া থাকিতে ছেলের সম্বন্ধে এক প্রকারে আমাদের কোন হাত নাই। কারণ তাঁহার না-রাজিতে আমাদের কোন কার্য করা উচিৎ নয়। আমি যে না বুঝি তাও নহে। একটি ঘরের এইটি বড় ছেলে। আর একটির বয়স মাত্র তিন মাস। বড় ছেলেটাকে দেখেই তিনি তাঁহার সকল দুঃখ ভুলেছেন। তিনি যে এই সাত বছরের ছেলেকে কোথায় বেলাত কে জানে—সমুদ্রের পারে, জাহাজে যেতে ছ'মাসের কম যাওয়া যায় না, এই দূরদেশে পাঠাতে যে রাজি হবেন, তা বুঝি না, তবে তুমি বলে কয়ে যদি রাজি করাতে পার।

—ছেলে বিদ্বান হবে, মানুষের মত একটা মানুষ হবে, মান্যমান হবে, দেশময় নাম পড়ে যাবে। গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে সৎভাবে টাকাও উপার্জন করবে। হাকিম হয়ে বিচার করবে। অথচ এই শিক্ষার জন্য একটি পয়সাও খরচ দিতে হবে না। টমস্ কেণীর মেয়েরা যে ভাবে যে যত্নে থাকবে, ছেলেও সেই যত্নে সেইভাবে মহাসুখে থাকবে। এতে যদি তিনি নারাজ হন উপায় নাই। একথা আমিও স্বীকার করি মায়ের না-রাজিতে আমরা ছেলেকে কোন স্থানে পাঠাতে পারি না। কপালে না থাকলে মানুষে কি করবে?

পূজ্যপাদ পিতা আমার জননীর মনের ভাব পরীক্ষার জন্য বলিলেন—আচ্ছা, ভাব, ছেলে বেলাত গেল, সেখান হতে যদি মেম বিয়ে করে নিয়ে আসে তাহলে কি করবে?

আদরে ঘরে তুলব। ছেলে যেখানে ইচ্ছা বিয়ে করুক না কেন? ছেলের ভালবাসাই আমার ভালবাসা। ছেলে যাকে ভালবাসবে, স্ত্রী বলে ঘরে আনবে, আমি তাকেই কোলে করে নিব।

আর আর লোকে কি বলবে?

কি বলবে?

মেম বউ নিয়ে ঘর কচ্ছে?

বল্লেই বা তাতে আসে যায় কি? আমি ত মন্দ কাজে সায় দিচ্ছি না। মেমদের কথা যেমন শুনি—তারা আমাদের চাইতে অনেক ভাল।

আচ্ছা তাহলে ছেলে যদি খৃষ্টান হয়ে আসে তার কি ?

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কথাটা শক্ত বটে। কিন্তু আমার খুব সাহস আছে। আসলে খাতা নাই, কম আসলে ওফা নাই। যে বংশের সন্তান আর যে বংশের পেটে জন্মেছে, দশ বছর বেলাতে থাকলেও আপন ধর্ম কখনই পরিত্যাগ করবে না। কখনই করবে না। খোদা রক্ষক। খোদার মর্জিতে আমি সাহস করে বলতে পারি আমার পেটের আপনার ছেলে, দশ বার বেলাতে গেলেও সে খৃষ্টান হবে না, মেমও বিয়ে করবে না।

সময়ে মাতামহী আমার বিলাত গমন সম্বন্ধে কথা শুনিয়া তিনি কান্দিয়া উঠিলেন, আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। তিনি স্পষ্ট বলিলেন, ছেলেকে আমার কোল ছাড়া করিলে আমি গলায় ছুরি দিব।

সকলে নীরব—আর কেহ কোন কথা কহিল না। মাতা সাহস করিয়া কোন কথাই মুখে আনিতে পারিলেন না। চুপচাপ, সকলি চুপচাপ। বিলাত গমন কথা ঠাণ্ডা।

সপ্তাহকাল আমার বড়ই আনন্দ। নন্দী মহাশয়ও ডাকেন না। মুন্সীজিও আর তলব করেন না। মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়াই থাকি। আমি কিছুই বুঝি না। কোথায় বিলাত কোথায় নিয়া যাবে। কে নিয়া যাবে। ১৫ দিনের মধ্যে সকল কথাই শেষ হইয়া গেল।

আমার জন্মের তিন বৎসর পরে আমার এক ভগ্নী জন্মিয়াছে, তাহার নাম রাখা হইয়াছে সাম্‌সান্‌নেসা। ভগ্নীর জন্মের তিন বৎসর পর এক ভ্রাতা এবং এক ভগিনী যমজ জন্মিয়াছে। ভগ্নীটি জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই দুনিয়া ছাড়িয়াছে। ভ্রাতা জীবিত আছে। সেই আমার মধ্যম ভ্রাতা, নাম সৈয়াদ মহতেসাম হোসেন। আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন। ঈশ্বর কৃপায় পূজ্যপাদ জননীর সাহসের কথা সফল হইয়াছে। আমার মধ্যম ভ্রাতা বিলাত গিয়াছিলেন। ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়াছেন। জননীর আশীর্বাদসহ সাহসের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বিলাত গমন বিষয়ে পরে প্রকাশ করিব।

কয়েক বৎসর পর আমার আরও দুইটি ভাই জন্মগ্রহণ করিল। একজনার নাম সৈয়াদ মকারম হোসেন। সর্ব কনিষ্ঠ নাম সৈয়াদ বজলল হোসেন। ভগ্নীর বয়স ৯ বৎসর সময় পাবনা জিলার ফৌজদারী আদালতের নাজির মুন্সী নাদের হোসেন সাহেবের পুত্র মুন্সী ফজলে হাক সাহেবের সহিত বিবাহের জন্য

নাজির নাদের হোসেন সাহেব পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন। হাজার টাকা পণ স্বীকার হইয়া পিতৃদেবকে পাঁচশত টাকা দিলেন। অবশিষ্ট পাঁচশত টাকা বিবাহের সময় দিবেন। পিতা সাহেব নাদের হোসেনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। একেবারে অসম্মত না-রাজী ভাবও প্রকাশ করিলেন না। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে কন্যার মাতামহী এবং মাতার অভিপ্রায় না হইলে আমার সাধ্য নাই। নাজির সাহেব সে কথার উত্তরে বলিলেন—স্ত্রীলোকের আবার সম্মতি অসম্মতির অভিপ্রায় কি? ওসকল কথা কিছুই নহে। আপনি রাজী হইলেই হইবে।

পিতা বলিলেন—নাজির সাহেব। আপনি কি কথা বলিলেন? স্ত্রীলোকের সম্মতি অসম্মতি কি? বড়ই আশ্চর্যের কথা। এসকল সম্বন্ধে—বিশেষ বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকেরা কিছুই নহে! আপনি কিরূপ মনে করেন বুঝি না। আপনার পরিবারেরা আপনার চক্ষে অপুচ্ছ তুচ্ছ হইতে পারে। কিন্তু আমার পরিবারেরা আমার চক্ষে অপুচ্ছ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের পাত্রী নহে। আরও কথা আমার স্ত্রী বুদ্ধিমতী জ্ঞানবতী। সচরাচর স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বামীর কথায় সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ—সেরূপ নহেন। তিনি রাজী না হইলে আমার সাধ্য নাই।

নাজির সাহেব বলিলেন—স্ত্রীলোককে অত স্বাধীনতা দিলে পুরুষের গৌরব মাটি হয়।

আপনার সহিত ওসম্বন্ধে আমি তর্ক করিব না। যদি আমার স্ত্রী শাশুড়ী ইঁহারা সম্মত হন তবে আপনাকে সংবাদ দিব। আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন বুঝি না।

—টাকা আমি দিলাম—না হয় শেষে যাহা ইচ্ছে হয় করবেন।

পিতা বাটীতে আসিলেন। কয়েক দিন পর আমার মাতার নিকট নাজির সাহেবের প্রস্তাব পাঁচশত টাকার কথা সকলি বলিলেন।

পূজনীয়া জননী মনোযোগের সহিত কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, দেখুন! আপনাকে কোনরূপ মনঃকষ্ট দিয়া কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। আপনার মেয়ে, আপনি তাহাকে জলে ডুবাইতে পারেন যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমার সবিনয় প্রার্থনা জোড়হাতে বলিতেছি, আপনার পাদুখানি ধরিয়া মিনতি সহকারে বলিতেছি—আপনার নিখুঁত কুলে এক হাজার টাকার লোভে কালি মাখাইবেন না। আপনি কি নাদের হোসেন মুন্সীকে জানেন? সে কি এদেশের লোক? পাবনায় গেলে তারই বাসায় আপনি থাকেন তাও শুনেছি। আপনার

সঙ্গে খুব আলাপ আছে তাও জানি। মীর মহেব আলীর ফেল জামিনে মকদ্দমায় যে এক বৎসরের ফাটক হইয়াছিল, মীর মহেব আলীই আমার নিকট বলিয়াছেন, নাজির নাদের হোসেন আমার পায়ে বেড়ী না দিয়া লোহার কড় পরাইয়া দিলেন। মীর মহেব আলীর মুখেই আমি সকল কথা শুনিয়াছি নাদের হোসেন যশহরের জিলার নাজির ছিল, সেই সময় গরীবপুরের ফকী মামুদ তরফদারের কন্যাকে বিবাহ করে। সেই ফকীর মামুদের নাতিই নাদে হোসেনের পুত্র। ফকীর মামুদের হাতী থাক, ঘোড়া থাক, জমিদারী থাক হাজার থাক। নাদের হোসেনের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার চাইতে বিষ খাওয়াইয়া মেয়েটিকে দুনিয়া হইতে তফাৎ করা ভাল। আপনি আমা মাথার মণি, আমি আপনার দাসী, আপনি সকলি জানেন, নাদের হোসেনকে খু চিনেন। আপনার মেয়েকে তরফদারের নাতিবউ করিবেন না। নাদে হোসেন যখন এদেশের লোক নয়—কোথায় সিউড়ী জেলা, সেখানকার লোক এমন না-জানা অচেনা লোকের পুত্রবধূ আপনার মেয়েকে করিবেন না পূর্বপুরুষের অভিসম্পাত গ্রহণ করিবেন না।

পূজনীয় পিতা আমার মাতাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি যে নারাজ হবে তা আমি আগেই জানি, নাদের হোসেনকে বলিয়াও আসিয়াছি আর আমি কি পাগল যে, ঐ ঘরে মেয়ে দিয়া আমার মান মর্যাদা বং গৌরব মাটি করিব। কখনই নহে। সে কথা কখনি হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

আমি নিশ্চিন্তিত হই কি বলিয়া? আপনি যখন টাকা পাঁচশত হাতে তুলিয়া আনিয়াছেন, আর কি বলি?

কি করি, গোলামাজ্জমের সহিত সর্বদা মারামারি কাটাকাটি প্রায়ই হইতেছে নাদের হোসেন ফৌজদারির নাজির। তার হাতে সর্বদাই পড়িতে হয় লোকটাকে না চটাইয়া কাজ উদ্ধার জন্য টাকা হাতে করিয়াছি।

তবেই ত আর সন্দেহের কথা।

না, না তুমি কোন সন্দেহ করিও না। আমি কি আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিব? বাপ দাদার নাম ডুবাইব? আমার মেয়ে চিরকাল আইবুড় হয়ে ঘরে থাকলেও আমি কখনই নাজিরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিব না।

মাতা দুই হাত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—এ আল্লাহ! আমার মেয়ের বিবাহ কখনই যেন নাদের হোসেনের পুত্রের সঙ্গে না হয়। নিতান্ত

কাহার যদি ঐরূপ মনের গতি হইয়া থাকে তবে দয়াময়! তোমার দাসের করুণ কণ্ঠে এই প্রার্থনা! যত শীঘ্রই হয়, দুনিয়া হইতে উহাকে উঠাইয়া নেও। কুল মান জাতি ধর্ম রক্ষা হউক।

দুই মাস গত হইল। তৃতীয় মাসে সামসন্নেসার জ্বর হইল। সপ্তাহ মধ্যে সেই জ্বরে জগৎ হইতে চলিয়া গেল। পূজনীয়া মাতৃদেবীর প্রার্থনা দয়াময় ঈশ্বর পূর্ণ করিলেন। বিবাহ-কথা ফুরাইল।

পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত। সে সময় আমাদের দেশে নীলকর কুঠীয়াল ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন ইংরেজ ছিল না, নিকটবর্তী সমুদায় কুঠীয়াল ইংরেজ সহিত পিতার বন্ধুত্বভাব ছিল। নীলের দৌরাত্ম্য সহিতে না পারিয়া সর্ব সাধারণ প্রজা নীলবিদ্রোহী হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণে' নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। পরিণাম ফল—নীলকরের দৌরাত্ম্য সহিত পরিণাম ফল—কি প্রকারে বাঙ্গলা দেশের লোক নীল বর্জন করিল, নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কি প্রকারে শান্তির বাতাস বহিল, প্রজারা আশ্বস্ত হইল, বৃটিশরাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধুবাবু ইংরেজের ত্রুটি, ইংরেজের কুৎসাই গাহিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ মধ্যে যে দেব ভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নেমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সেই ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন, বংশধরেরা যে ইংরেজ রাজ্যে বাস করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন, সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া যশ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম "পাতফোঁড়"—যে পাতে খান, সেই পাতেই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে।

প্রজারা নীলের দৌরাত্ম্য সহিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত। নিকটস্থ গ্রামের ভদ্রলোক, পরিচিত বড় বড় জমিদার সকলেই আসিয়া পিতাকে ধরিয়াছেন যে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া ইংরেজ পক্ষে রহিয়াছেন কেন? ইংরেজ কি চিরকালই এদেশে থাকিবে? আপনারা কি ইংরেজরাজ প্রতিও এ কথা বলিতেছেন!

না না—সে কথা বলিতেছি না। আমরা নীলকর কুঠীয়াল ইংরেজকেই বলিতেছি।

তবে কেন বলিলেন যে ইংরেজ কি চিরকালই এই দেশে থাকিবে? হাঁ, নীল কাজ বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এ দেশে থাকিবে। আর আপনারা যে এক জোট হয়ে নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নীল নাও হতে পারে, নীলকর সাহেবরাও আর নীল বুনানী করবেন না। তাঁদের যা কিছু করা এই দেশের লোক দ্বারাই করবেন। তাহারা যদি নীল জমি চাষ, নীলের আবাদ নাই করে, নীলকর সাহেবরা অন্য কারবার আরম্ভ করবেন। আপনারা যে তাহাদিগকে এ দেশ হতে তাড়াতে ফিকির করছেন তাহা কখনই পারবেন না। নীল না হয় তার যে উপায় থাকে করুন, আমি তাহার মধ্যে আছি। কিন্তু নীলকর ইংরেজ তাড়ান মধ্যে আমি নই।

আপনি তার মধ্যে নাই, কথায় বলছেন, কিন্তু কোন সময় বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে হাঁ তার মধ্যে হই বা আছি।

আচ্ছা সে সময় আসুক। তখন না হয়, যা ইচ্ছা তাই করব। এখন আমি আপনাদের কথার মধ্যেও নাই দলের মধ্যেও নই।

মীর মহেব আলী, মীর জোলফেকার আলী সাহেবের কৌশলে সাঁওতার অথবা তরফ সাঁওতার ।/৶৹ অংশ মধ্যে স্থান পান নাই। মীর এবরাহিম হোসেন, মীর মহেব আলীর বাটীর জন্য কতই ব্যস্ত ছিলেন, পরে জ্যেষ্ঠপুত্র মীর জোলফেকার আলীর নিকট লইতে লাহিনী পাড়ার মধ্যে একখণ্ড নিষ্কর জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া বাড়ী প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরের মহিমা সেই লাহিনী পাড়ায় মীর মোয়াজ্জাম হোসেন মীর মহেব আলীর বসতবাড়ীর জমির আসল মালিক মুন্সী জেনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলত্‌ননেসাকে বিবাহ করিয়া সমুদায় সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। যে শত্রুকে মীর জোলফেকার আলী কৌশলে তফাৎ করিয়াছিলেন, মীর মোয়াজ্জম হোসেনকে সেই শত্রুর শত্রুতায় সময় সময় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। শেষে নিরুপায় হইয়া জেল জামিন সচ্চরিত্র ভাবে থাকিবার জন্য জামিনের প্রয়োজন হওয়ায় মীর মহেব আলী সেই জামিন দিতে না পারায় এক বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছিলেন। এক বৎসর খাটিয়া মীর মহেব আলী এইক্ষণে নীল বিদ্রোহ সময়ে প্রজার দলে মিশিয়াছেন। মা গোলামাজ্জমও প্রজার দলে, প্রজার দলে থাকিয়া ইংরেজ শত্রুর পরম মিত্র মীর মোয়াজ্জাম হোসেন প্রতি পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে সাহেবদিগের

বিপক্ষে, প্রজার সহিত যোগ দিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন জন্য সাধারণ প্রজার প্রদত্ত শক্তি অপব্যবহারে মীর সাহেব প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্যের সূচনা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রকাশ্য কথা, সাহেব পক্ষে যাহারা থাকিবে, যে প্রকার হউক, দৌরাত্ম্য আগুন জ্বালিয়া হউক, কৌশলে মশালে পোড়াইয়া হউক, মিথ্যা প্রবঞ্চনার দপ্তর খুলিয়া হউক, একেবারে বেড়া আগুনে জ্বালাইয়া হউক, যেন তেন প্রকারে তাহাদিগকে সোজা করিয়া প্রজার পক্ষে আনিব তবে ছাড়িব এই কথা বলিয়া প্রজাপক্ষ দল উঠিয়া গেল।

সা গোলামাজ্জম সম্পর্কে ভাইঝি জামাতা। জামাতার ব্যবহার—ইস্তক দলীল চুরি, নাগাএদ শ্বশুরকে গৌরী নদীর ঘাট হইতে তাড়ান ইত্যাদি বিষয় উদাসীন পথিক মনের কথায়, যে সকল চিত্র মনের মত আঁকিয়া দশ জনকে দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই সা গোলামাজ্জম, ইংরেজ নীলকরের বিপক্ষে। মীর মহেব আলী বৃদ্ধ মীর এবরাহিম হোসেনের শেষ জীবনের শেষ পুত্র যাহাকে মীর জোলফেকার আলী আপন এলাকা মধ্যে বাস করিতে দেন নাই, সেই মীর মহেব আলী গোলামাজ্জমের পদলেহনকারী চাটুকার তাহাতেই মহেব আলী নীল বিদ্রোহী প্রজাগণ পক্ষে তহবিলের খাজাঞ্চি। গোলামাজ্জম আর রমাকান্ত রায় নীল বিদ্রোহীর রাজা ও নবাব।

কোন সময় মেঃ টমস কেণী গোলামাজ্জমকে ধার্মিক, সংসারবিরাগী দরবেশ ফকীর ভাবিয়া বিলাত হইতে এক জেলদ কোরাণ শরিফ সোনার পাতে জেলদ করা, চারশত টাকা মূল্যের এবং এক জোড়া সোনার বাঁটওয়ালা অতি উৎকৃষ্ট চশমা সেও একশত টাকার কম হইবে না, ভালবাসিয়া উপহার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন—তার ফল কি হইল? কি কৌশলে টমস কেণীর প্রাণ হরণ করিবেন, কি কৌশলে মিসেস কেণীর সর্বনাশ করিবেন, কি কৌশলে তাহার শাল ঘর মধুয়ার কুঠী ভাঙ্গিয়া কালীগঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিবেন ইহাই চেষ্টা। তাহার পর চশমা জোড়ার ফলে কেণীর অনুগত হিতার্থীর বন্ধুবান্ধবগণের বাড়ী ঘর লুটপাট করিবেন, টাকাকড়ি লুটপাট করিয়া লইবেন, জাতি মান ধ্বংস করিবেন, সাধারণ শক্তির সাহায্যে,—তাহারই চেষ্টায় আছেন। এই সুযোগে আপন শত্রুকে জব্দ করিয়া দাদ উদ্ধার করিবেন ইহাই গোলামজ্জামের ইচ্ছা।

এমন নিমকহারাম বিশ্বাসঘাতক স্বার্থসর্বস্ব লোক, জগতে সে সময় আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। জাল জালিয়াত ত হাতের ময়লা। লুটপাট গলার গামছা, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার তার মাথার পাগড়ী। ফকীরের বংশে

ধার্ম্মিকের বংশে এমন ধড়িবাজ জুয়াচোরের জন্ম হয় ইহা কখন কেহ দেখে নাই—শুনে নাই।

ফরিদপুর অঞ্চলে মাকড়াইল বন মাঝ দিয়া গেঁদা গট্টায় যত ভদ্রলোক এইক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, পাঠক মধ্যে কেহ গোলামাজম অবস্থা কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। লেখক কিছুই অতিরঞ্জিত অথবা অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করে নাই। গোলামাজমের প্রকৃত চিত্র উদাসীন পথিক বিশেষরূপে আঁকিয়া জগত চক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন, আমি আর বেশী কি দেখাইব। তবে জালিয়ত করিয়া যে একটি ঘর মাটি করিয়া দিয়াছেন, সময়ে যদি পারি তাহাই দেখাইব। এইক্ষণে নীল বিদ্রোহীর কথাই বলিতেছি যে সকল কথা উদাসীন পথিক প্রকাশ করেন নাই তাহাই দেখাইতেছি। ভদ্রলোক জোট বান্দিলে কি হয়? জনসাধারণ কৃষক শ্রেণী পণ্ডিত মূর্খে এক জোট না হইলে কিছুই হয় না। দেশে বিদ্যার চর্চা নাই, সংবাদপত্রিকা কাহাকে বলে তাহা কেহই জানে না। রেল টেলীগ্রাফ নাই—স্টীমার যাহা নদী বহিয়া যায় সকলেই জানে যে উহা কোম্পানীর জাহাজ। কোম্পানীর কোন কোম্পানী? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। সাধারণের মনে জাগে এ মল্লুক কোম্পানীর মল্লুক। কোম্পানী কে? কোম্পানী কোথায় থাকে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। কোম্পানী লোকটা কি জাতি, তাহাও জানে না। তবে এইটুকু বিশ্বাস জন্মিয়াছে ইংরেজ লোক ভিন্ন কোম্পানী হইতে পারে না। কোম্পানীর নামে দোহাই ফেরে। মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সময়ে নিস্তেজ পক্ষ অনবরত স্বভাবত বলিতে থাকে দোহাই কোম্পানীর, দোহাই কোম্পানী বাহাদুরের।—কিন্তু কোম্পানী স্ত্রীলোক কি পুরুষ তাহা কেহ জানে না।—একজন কি দশজন তাহা ত কাহার মনে উদয়ই হয় না। কারণ সকলেই জানে রাজা বাদশা একজন হয়, দুইজন হয় না। হয় পুরুষ নয় স্ত্রী যাহাই হউক একজন। কোম্পানী একজন।

এই কোম্পানীর আমলে বাঙ্গলা দেশে দুর্দশার অবধি ছিল না। জমিদারেরাই প্রজার হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। জমিদারের অত্যাচার প্রজার অসহ্য হওয়াতেই যেন তাঁহাদের আর্তনাদে পরম কারুণিক দয়াময় জগদীশ্বর ইংরেজ নীলকরদিগকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। নীলকর ইংরেজগণ যখন এদেশে জমিদারী করা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রায় জমিদারকেই তাঁহাদের নিকট মাথা হেঁট করিয়া সেলাম বাজাইতে হইল। কত জমিদার মেঃ টমস কেনীর সাক্ষাৎলাভ জন্য আপীস ঘরের উত্তরে প্রায় তিন'শ হাত ব্যবধান চটকা তলায় পালকি রাখিয়া

অপেক্ষা করিতেন। দরওয়ান কেফাতুল্লার তোষামোদ কত সেলামী, প্রকাশ্যে, গোপনে মিঠাই খাইতে দিলে পর সাহেব পর্যন্ত সংবাদ যাইত। আপীস ঘর সর্বসাধারণের গমন অধিকার। ঐ কাছারি ঘর ভিন্ন, কেণীর বাসগৃহে যাইয়া কাহার সাক্ষাৎ করার অধিকার ছিল না। প্রজা জমিদার তালুকদার নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে কতই নাজেহাল হইয়াছেন, কত অপমান ভোগ করিয়াছেন,—তাহা উদাসীন পথিক দেখাইয়াছেন। কিন্তু একটি নীলকরের প্রধান অত্যাচার বিষয় একটি ঘটনা লিখিতে বোধ হয় অবসর পান নাই। আমরা সন্ধানে জানিয়াছি, যে উদাসীন পথিক সে ঘটনার বিষয় পূর্বে জ্ঞাত ছিলেন না। মনের কথা প্রকাশ হইলে শুনিয়াছিলেন,—নিজে সে গ্রামে যাইয়া প্রাচীন লোক-দিগের নিকট এই ঘটনার তত্ত্ব লইয়াছিলেন। পুস্তক ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, আর কি করিবেন। এই উপস্থিত সুযোগে সেই আশ্চর্য ঘটনাটি আমরা চিরকালের জন্য আঁকিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

সালঘর মধুয়ার কুঠী টমস কেণীর সদর কুঠী। ঐ কুঠীর অন্তর্গত আরও কয়েকটা কুঠী ছিল। প্রত্যেক কুঠীতেই ইংরেজ কুঠীয়াল নিযুক্ত। মীরপুর নামে এক কুঠী ছিল, ঐ কুঠীতে এক ইংরেজ কুঠীয়াল কেণীর পক্ষে কার্য করিতেন, বোধ হয় ঐ কুঠীতে তাঁহার কিছু অংশও ছিল। কুঠী প্রধানই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক, প্রত্যেক কুঠীর নিকটে ঐ নীলকরের জমিদারী ছিল। নূতন কুঠী নির্মাণ করা স্থির হইলে জলের সুবিধা, স্থানের সুবিধা দেখিয়া তাহার পর ভূ-সম্পত্তি লাভের চেষ্টা হইত। কুঠীর চতুষ্পার্শ্ব গ্রামসকল যেন তেন প্রকারেণ হস্তগত না করিয়া আর কুঠীর পত্তন করিতেন না। ছোটখাট জমিদার তালুকদার হইলে ত কথাই নাই। লাঠির চোটে শুদম ঘরের সহায়ে দেশী লাঠীয়ালগণের সাহায্যে, বিদেশী পাঁড়ে, দোবে চোবে, সিং মিসির রাজপুতগণের ঢাল তরবারির জোরে কত কাণ্ডই যে এদেশে করিয়াছেন তাহার সমুদায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নহে। একটি ঘটনা মাত্র আমি আমার জীবনীতে চিত্র করিয়া দেখাইতেছি।

মীরপুর কুঠীর চতুষ্পার্শ্বই কুঠীয়াল সাহেবের জমিদারী। কার্যকর্তা সাহেব একদিন মাঠে নীল দেখিতে যাইতেছিলেন। কুঠীর কিঞ্চিৎ দূরে একখানি গ্রামের নিকট হইয়া দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক গৌরী নদী হইতে জল লইয়া কলসী কাঁকে করিয়া যাইতেছে।

পাঠক! গৌরী নদীর কথায় আপনাদের মনে একটা খট্‌কা বাধিতে পারে।

কোন্ গৌরী নদী? আর মীরপুর কুঠীই বা গৌরী নদীর নিকটে কোথা? শুনুন! কলিকাতা হইতে পোড়াদহ জংশন, ঐ জংশন হইতে যে লাইন উত্তর দিকে দামুদিয়া ঘাট পর্যন্ত গিয়াছে, দামুদিয়ার নিম্নেই পদ্মা নদী। পদ্মার উত্তর পাড়েই সারা ঘাট। পোড়াদহ জংশন ছাড়িয়া কয়েক মাইল উত্তর মুখে গেলেই মীরপুর স্টেশন। স্টেশন পর্যন্ত না যাইতেই অগ্রে একটা সেতু পাওয়া যায়, ঐ সেতুই পুরাতন গৌরী নদীর উপর সেতু। ঐ গৌরীই গৌরী দাসীর পদচিহ্ন জলস্রোত। উহার কিছুদূর অগ্রেই হুড়িদহ। ব্রীজ উপরে গাড়ী গেলেই ব্রীজের দক্ষিণে, উত্তর পারে গৌরীর তটে বৃহৎ একটি দালান দেখিতে পাইবেন। দালানের সিঁড়ি নদীর জল পর্যন্ত আসিয়াছে। ঐ দালানই মীরপুর কুঠীর সাহেবের বাসগৃহ। ঐ গৃহই আমাদের কথার প্রমাণ ও ঘটনার এক অংশ। নীলকর সাহেব ঐ বাসগৃহ হইতেই নীল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। যে স্ত্রীলোকটির প্রতি সাহেবের নজর পড়িয়াছিল সে জল আনিতে একা যায় নাই। আর কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিল। সাহেব চক্ষে দেখিয়াই আপন কর্তব্য কার্যে আসীন তাগাদগীর দেওয়ান দলবলসহ মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন। সে সময় আর কোন কথা নাই। কুঠীর নিকটস্থ লোকজনই কুঠীর চাকর। সন্ধান জানিতে সাহেবের বেশী সন্ধান করিতে হইল না। দুই একদিন মধ্যেই জানিতে পারিলেন। ঐ যে স্ত্রীলোকটি দেখিয়াছিলেন সে কুঠীর নিকট গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কুমারী কন্যা। একটু বেশী বয়স হইয়াছে এ পর্যন্ত বিবাহ হয় নাই। তখনই তদ্বির তখনি কার্যারম্ভ। কোটনা কুটনী দুই রকম লোকই কুঠীতে আছে, নিযুক্ত হইল। তাহাদের ঘোরাফেরা হাঁটা-হাঁটির পর বাড়ীর লোক পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই সাহেবের দুরভিসন্ধির কথা শুনিয়া কি উপায়ে দুরন্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে কুমারী কন্যাকে রক্ষা করা যায়—তাহারই পরামর্শ হইতে লাগিল। বল প্রকাশে শক্তি নাই, বাধা দিবারও ক্ষমতা নাই। মেয়ে দিব না বলিয়া সাহেবের কোটনা কুটনীকে তাড়াইয়া দিবার সাধ্য কাহারও নাই। এমনি শাসন, এমনি নীলকরের প্রাদুর্ভাব। তাহাদের আদেশ অন্যায় কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কাহারও নাই। কাহার আশ্রয় লইয়া জাতি কুল রক্ষা করার স্থানও আর কোথায় নাই, সেরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষও কেহ নাই। টাকাওয়ালা লোক অনেক আছে,—কিন্তু বল প্রকাশের মধ্যে কুঠীয়ালের কোন কার্যে বাধা দেওয়ার শক্তি নাই। মীরপুর কুঠীর সাহেবের হুকুম অমান্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কোন একটি লোকের সাধ্য নাই। কুঠীর নামেই থরহরি কম্প। সাহেব ত দূরের কথা

কুঠীর নায়েব গোমস্তা আমিন তাগাদগিরী খালাসী পাইক প্যাদার যন্ত্রণাতেই অস্থির। তাহারা চক্ষু রাঙ্গাইয়া এক ধমক দিলেই চক্ষু স্থির। ইহার পর—সিং দোবে চোবে পাঁড়ে বাঁধা-কমরে ঢাল তরবার লইয়া আসিলে ত সে সময় পাড়া-প্রতিবাসীরা দিনে-দুপুরেই আপন আপন ঘর বন্ধ করিয়া জঙ্গলে মাথা দেয়। কেহ গ্রাম ছাড়িয়া পালায়। সচ্ছন্দে তারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে জাতি-কুল-মান রক্ষার পথ কোন পথেই সুযোগ-সুবিধা বোধ হইতেছে না। কোটনা-কুটনীদিগকে কিছু টাকা দিয়া সাহেবের মন হইতে যাহাতে এই অভিসন্ধিটিই সরিয়া যায়, তাহারই যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কোটনা-কুটনীর দল সাহেবকে কি বলিয়া কয়েক দিন নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তাহারাও জানে না। ৪।৫ দিন কোন উৎপাত নাই। হঠাৎ সেই সকল লোক আবার আসা-যাওয়া আরম্ভ করিল। এবার বেশী পরিমাণ টাকা দিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া কত আদর কত যত্ন কত খাতির করিয়া বলিল যে, দেখ ভাই! তোমরা আমাদের দেশের লোক। তোমরাই কুঠিয়াল সাহেবদিগের হাত-পা চক্ষু কর্ণ সকলি তোমরা,—দেখ ভাই। তোমরা একটু চেষ্টা করিলেই রক্ষা পাই। জাতি বাঁচে। এই কাজ হইলে কি আমরা আর এদেশে থাকিতে পারিব। জাতি ত যাবেই লোক গঞ্জনায় এদেশে মুখ দেখাইতে পারিব না।

আজি যা দিলাম তা দিলাম। সাহেবের মত ফিরাইতে পার, এ গরীবের মেয়েটির প্রতি আর নজর না করেন, এই কার্যটা করিতে পার, তাহলে আর কিছু তোমাদিগকে দিব। খুশি করিব। তাহারা বলিল দেখুন! আপনি আমাদের দেশের ধনী মানী ভদ্র বংশের সন্তান। আমরা পারিতপক্ষে আপনার অনিষ্ট করিব না। এতদিন যে সাহেব কিছু বলেন নাই চুপ করে আছেন সে আমাদেরই কৌশল। বলব কি আমার দেশের লোকেই সকল নষ্টের গোড়া আমরা গিয়ে সাহেবকে একরূপ বুঝাইয়া কথাটা মন হতে সরাইয়া দিবার, এ খেয়াল আর না থাকে সেই চেষ্টা করি। কেননা, কোটনা বেটারা গিয়ে উস্‌কে দেয়, কি করি সকল দিক বজায় রেখে কাজ কর্তে হয়। এখনি সাহেবের নিকট গিয়ে যদি বলি যে, তার মা-বাপ ভারি নারাজ, কিছুতেই রাজী হয় না। আরও আমাদিগকে শাসন কর্তে চায়, কি বাড়ীর সীমানায় গেলে অপমান কর্তে চায়। তা হলে কি আর রক্ষা আছে। দেশী সর্দার লাঠিয়ালের অভাব নাই, ব্রজবাসী বরকন্দাজ পশ্চিমে সেপাইদেরও অভাব নাই। কুঠী পোরা রয়েছে। এখনি

হুকুম দিবে যে ওর বাড়া লুট করে ঘর-দোর ভেঙ্গে গৌরী জলে ভাসাইয়া দেও। আর তাকে শূন্যেই উড়াইয়ে নিয়ে এস।

আমরা বলিয়াছি সাহেব ব্যস্ত হবেন না সহজেই আসবে। মেয়েটির জ্বর হয়েছে। শয্যাগত কাহিল। আপনারা ত আজ কয়েকদিন ঘাটে পাঠান না। সাহেব কামরায় বসে দুরবিন হাতে করে থাকে, এবং দেখে যে নদীর ঘাটে আসে কি না? কয়েক দিন দেখেছে, শেষে না দেখে ভেবেছে সত্যই জ্বর হয়েছে। আজ কোটনারা গিয়ে বলেছে, জ্বর হয়েছিল আরাম হয়েছে। তাইতে আজ ভারি তাম্বি। বলেছেন যে ওর বাপবেটা মেয়েটাকে দিবে কি-না তাই আমি শুনতে চাই?

আজ গিয়ে বল্‌ব তারা সকলেই রাজী আছে। হুজুরের যখন নজর পড়েছে তখন তাদের আর রাখিবার সাধ্য নাই। মেয়েটার পেটে আজ তিন দিন হতে কি এক বেদনা হয়েছে। বাড়ীসুদ্ধ লোক তাতেই অস্থির। বাঁচে কি না ভরসা নাই। তা হলে কয়েক দিন স্থির থাকবে। এই কথা বলিয়া কুঠীর লোকজন চলিয়া গেল।

ইহাদের মধ্যে পরামর্শ স্থির হইল যে মেয়েটাকে অন্য কোন স্থানে গোপনে পাঠাইতেও মন সরে না। বড় হয়েছে কোথায় কোন কুটুম্ব বাড়ীতে পাঠিয়ে দিব। কি জানি শেষে কি দাঁড়ায়। কি করি। শেষে সাব্যস্ত হইল নড়াইলের জমিদার রতনবাবুর এলাকায় যে বিবাহ সম্বন্ধ হয়েছিল তারা এখন কি বলে? উত্তর—তারা এখনও খোসামদ কর্‌ছে। যা-যা দিতে চেয়েছিল তার চেয়ে বেশী অলংকার নগদ টাকা ত প্রায় হাজারের কাছাকাছি দিতে চাচ্ছে। খবরটা দোজবরে তাইতে একবার এগুই আবার পিছুই। আর এখন পিছন নাই। আজকেই তাহাদিগকে খবর পাঠাও এই সপ্তাহ মধ্যে তারা বিয়ে করে নিয়ে যাক্‌। এর চাইতে সৎ যুক্তি আর নাই। তবে একটি কথা মেয়েটা যদি ভিন্ন জমিদারের এলাকায় স্বামীর বাড়ী চলে গেল,—শেষে আর কে কি করবে। তুমিও কিছুদিন বাড়ী থেক না। পরিবারদিগকে কিছুদিনের জন্য শ্বশুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেও। জিনিস-পত্র টাকাকড়ি যেখানে রাখবার সেখানে রেখে দেও। মেয়েটা যদি বিয়ে হয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে গেল। শেষে অদৃষ্টে যা থাকে হইবে। এ ভাবে ত আর জাতপাত হইবে না। সকলেই এই পরামর্শে সম্মত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহ স্থির হইয়া অতি গোপনে বিবাহ দিন সাব্যস্ত হইয়া গেল।

বিবাহ দিন উপস্থিত। কোন ধুমধাম নাই, কোন প্রকারের আয়োজন

নাই। বাদ্য-বাজনার নাম নাই—নীরবে গোপনে বিবাহ। পাত্রপক্ষ বাজি বাজনায় আসিয়াছে। তাহাদের কানে এ কথা উঠে নাই। চেষ্টা করিয়া উঠিতে দেওয়া হয় নাই যে মীরপুর কুঠীর সাহেব মেয়েটির প্রতি নজর করিয়াছেন। এ কথা কন্যাপক্ষ হইতে প্রকাশ হইলে, পাত্রপক্ষ ঐ কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া নানারূপ সন্দেহ করিয়া বিবাহ, না-ও করিতে পারে? এই সকল ভাবিয়া পাত্রপক্ষকে ঐ সকল কথা বলা ভাল মনে করে নাই। তাঁহারা দস্তুর মত বাজী পোড়াইতে পোড়াইতে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পাত্রার গ্রামে আসিতেছেন। সাহেব সন্ধ্যার পূর্বেই গুপ্ত সন্ধানী দ্বারা পেটের বেদনা (কুমারী কন্যার) সারিয়াছে কি না সেই সন্ধান লইতেই বিবাহ কথা শুনিয়াছেন। অদ্য রাত্রেই বিবাহ তাহাও শুনিয়াছেন। শুনা মাত্র তিনি ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার মন-পছন্দ জিনিস বিবাহের ভাণ করিয়া অন্য লোকে ভিন্ন দেশে লইয়া যায়। বড়ই লজ্জার কথা। আক্ষেপের কথা, দুঃখের কথা, মন বেদনার কথা। মহা কষ্টের কথা। অপমানের কথা! ক্রোধে কোঠা ঘরের মেঝে পদাঘাতে কাঁপাইয়া তুলিলেন। তখনি বকৃসী জমাদার ডাক পড়িল। বাঙ্গালী সর্দারের চালক বকৃসীবাবু, পশ্চিমে দেশওয়ালী ব্রজবাসাদিগের পরিচালক জমাদার লক্ষ্মণ সিং পাঁড়েজী। বকৃসী জমাদার হাজির হইয়া সম্মুখে খাড়া হইতেই সাহেব হুকুম করিলেন—আমার হুকুম খুন জখম সমুদায় আমার জিম্বা আমি তোমাদের নিকট···গ্রামের অমুকের মেয়েকে আজ রাত্রে চাই। তাহার বিবাহ হইতেছে। তোমরা যাহাতে যে গতিকে পার, বাড়ী লুটতরাজ করে হোক, ডাকাতি করে হোক, মারামারি খুনোখুনী করে হোক, সে মেয়েটাকে আমার কুঠীতে আনিবে। তোমাদের নিকটে সেই মেয়েটাকে আমি চাই। বকশিশ এই ধরা রহিল। পাঁচশত টাকার একতোড়া দেখাইয়া—এই টাকা। এই টাকা এই মেজের উপর ধরা রহিল। আর সেই বদমাস আমার হুকুম মান্য করে নাই। সেই হিন্দু বেটার বাড়ী লুটপাট করে যা নিতে পার তাতে আমার কোন দাবি নাই। এখনি যাও যত শীঘ্র পার চলে যাও। বিয়ে হলেই মেয়েটাকে নিয়ে বরেরা চলে যাবে। আমার এলাকার বাহিরে গেলে আমি হঠাৎ কিছুই করিতে পারিব না। আর বিলম্ব করো না, শীঘ্র যাও। দু'শ হোক, পাঁচ'শ হোক, সেকথা আমি জানি না। তোমরা যে একশ' জন কুঠীতে উপস্থিত আছ তোমরাই সাহস করে কাজ সাবাড় করতে পার তাও আমি শুনতে চাইনে। আসল জিনিস যাতে আমার কামরায় আসে আমি তাই চাই। আমি তাই চাই! টেবিলের উপর আঘাত করিয়া—হা মুখহি মাংতা।

সেলাম বাজাইয়া জমাদার বক্সী চলিয়া গেল।

পাত্রীর বাড়ীতে, বরযাত্রীসহ বর আসিতেছে। সন্ধ্যা রাত্রিই বিবাহের লগ্ন। বেশী রাত্র হলে লগ্ন বয়ে যাবে। কন্যাকর্তারা শীঘ্র শীঘ্র বিবাহের আয়োজনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ছাওনাতলায় বর চেলির জোড় পরিয়া উপস্থিত। পাত্রীও উপস্থিত। দানকর্তা পিতাও উপস্থিত। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবাসী দর্শকগণ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যথাস্থানে উপস্থিত। যথোপযুক্ত বরণডালা ধানদূর্বা নারিকেল সাজাইয়া বাতি জ্বালাইয়া এয়ো স্ত্রীলোকেরা রহিয়াছেন। পুরুত-ঠাকুর মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এমন সময় হো হো মার মার শব্দে মশাল জ্বালিয়া দুইশত লাঠিয়াল ঢাল সড়কি তরবারি লাঠি বল্লম লইয়া একেবারে ছাদনাতলায় উপস্থিত। একপ্রকার বিকট চিৎকারের সহিত দশ-বারজন লাঠিয়াল পাত্রীকে ধরিয়া শূন্যে শূন্যে লইয়া যেন অন্তর্ধান হইল। তাহার পরই প্রহার আরম্ভ—দমাদম লাঠি পড়িতেছে। বিকট চিৎকারে কুঠীর সর্দারেরা হুংকার ছাড়িতেছে, বরযাত্রী বর এবং তৎসহ ঢুলী মালী মারের চোটে অস্থির হইয়া শেষে ঢোল ফেলিয়া ঢুলী, পালকী ফেলিয়া বেহারা, বাজীর ডালি ফেলিয়া মালী পালাইতে লাগিল। বরকে ফেলিয়া বরযাত্রীগণ লাঠির চোটে কে কোথায় পালাইল তাহা লাঠিয়ালেরাও দেখিতে পাইল না। বরের পিতা, আত্মীয়স্বজন মার খাইয়া কেহ মাটিতে পড়িয়া গেল, বরের মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল, লাঠিয়াল সর্দারেরা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া যে যাহা পাইল লইয়া শেষে ডাকে হাঁকে বাড়ীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নওপাড়ার থানা অতি নিকটে। সাধ্য কি দারগা জমাদার বরকন্দাজ নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে মকদ্দমা স্থাপন করে। মকদ্দমা স্থাপন করা দূরের কথা, বিরুদ্ধভাবে একটি কথা বলিবার সাধ্য নাই। থানার দারগা নীলকর সাহেবদিগের মন জোগাইয়া না চলিলে পথে ঘাটে লাঠিপেটা হইতে হয়। শেষ ফল চাকুরীও থাকে না। সে সময় ম্যাজিস্টার সাহেবগণ প্রায়ই নীলকরদিগের কুঠীতে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। নীলকর ভিন্ন তাঁহাদের উঠিবার বসিবার আমোদ-আহ্লাদ করিবার স্থান মফঃস্বলে আর কোন স্থানেই ছিল না। নীলকর ভিন্ন তাহাদের স্বদেশী লোক গ্রামে মহকুমায় জেলাতেও অধিক ছিল না। সে সময় বাঙ্গালী জাতি মনে মনে ভাবিত, সাহেবে সাহেবে প্রণয়, সাহেবে সাহেবে ভালবাসা। তাহাদের বিরুদ্ধে কার সাধ্য কেহ কোন কথা বলে? নালিশ করে—থানায় জানায়? অধীনস্থ প্রজাদেরও সাধ্যও নাই যে, কুঠীর সাহেবের নামে থানায়

এজাহার দেয়, মকদ্দমা চালায়। কাজেই অত্যাচার জুলুমের কথা মুখে আনিবার সাধ্য নাই। যাহা হইবার হইয়া গেল, মুখ ফুটে কাঁদিবার শক্তি কাহারও নাই। সকলি চুপচাপ। দেখার মধ্যে দেখা গেল একমাস মধ্যে কন্যার পিতামাতা ক্রমে ঘরদোর ছাড়িয়া অন্য অন্য পরিজনসহ কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই সন্ধান করিল না। জানিয়া শুনিয়া চুপচাপ। এদিকে মীরপুর কুঠির প্রাসাদ নীলকরের বিলাসগৃহ—যাহা বর্তমান সময় পশ্চিমদিকের বারান্দায় কামরাসকল কাপড়ের দোকান, ভাড়াটিয়ার বাসস্থান হইয়াছে। উত্তর দিকে অন্য অন্য দোকান। স্থানীয় পোস্টাপিস্। অন্য অন্য লোকের কাপড়ের দোকান। মধ্যে হলে স্থানীয় সাবরেজিস্ট্রী আপিস স্থাপিত আছে। এই ঘরে সে সময়ে, সেই হিন্দুর কন্যাহরণ সময়ে, এই ঘর নীলকরের বাসভবন—প্রমোদ ভবন ছিল। এইখানে কি না ঘটিয়াছে! ইংরেজ নীলকর কর্তৃক যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। কয়েক বৎসর পর সাহেব বিলাত যাইতে বাধ্য হইলেন। সেই সময় সেই স্ত্রীলোককে বহুতর টাকা সোনা রূপার আসবাব—কাঠের জিনিস,—টেবিল চেয়ার আলমারী পালঙ্ক ইত্যাদি বহু সামগ্রী দিয়া গিয়াছিলেন। নীল উঠিয়া যাওয়ার পর নীলকর সাহেবরা এদেশ ছাড়িবার পর কুঠী, কুঠীবাড়ী খানে অয়রাণ হইয়া নীলাম হইয়া যাওয়ার পরও সে স্ত্রীলোকটি বাঁচিয়া ছিল। টাকাকড়ি ছিল বলিয়া কোন কষ্ট হয় নাই। বৃদ্ধা হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

এই প্রকার কত অত্যাচার কত দৌরাত্ম্য এই বাঙ্গলা মুলুক স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশের সাধ্য কাহারও নাই। দৌরাত্ম্য, অবিচার, স্বার্থপরতার শেষ সীমা পর্যন্ত না পৌঁছিলে, সাধারণ প্রজার মনে একতার ভাব উদয় হয় নাই। প্রজা নীলকুঠির দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া জোটবদ্ধ হইল। শেষে কার্যও করিল সফলকামও হইল। সমুদায় নীলকুঠি দেউলিয়া। ঋণদায়ে সমুদায় জমিদারী দালান কোঠা নীলাম হইয়া গেল। দেশের লোকেই নীলকরের সম্পত্তি দালান কোঠা খরিদ করিয়া লইলেন।

নীল বিদ্রোহের পরেই আমার পূজনীয়া জননীর পীড়া। বৎসরকাল পীড়ায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেহত্যাগ সম্বন্ধেও উদাসীন পথিক বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার উল্লেখ বিরক্তিমাত্র।

জননীর মৃত্যু সময় আমার বয়স ১৪ বৎসর কয়েক মাস। মহতেসাম হোসেনের বয়স ৭ বৎসর কয়েক মাস। তাহার কনিষ্ঠ মকারম হোসেনের বয়স ৪ বৎসর। সর্বকনিষ্ঠ বজলাল হোসেনের বয়স দেড় বৎসর হইবে। আমার অন্ত

কোন ভ্রাতার জন্মপত্রিকা আমার হস্তগত হয় নাই। ছিল কিনা তাহাও আমি জানিতাম না।

আমার বাল্যজীবন মধ্যে কয়েকটি ঘটনা যাহা আমার মনে আছে সেই কয়েকটি ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করিতে হইতেছে। কারণ এইক্ষণে যে-সকল কথা আসিতেছে তাহার মধ্যে বাল্যজীবনের কথা আর শোভা পাইবে না। আমার মাতৃবিয়োগের পর আমার বিদ্যা-শিক্ষার পক্ষে পিতৃদেবের যেন তত আগ্রহ ছিল না। তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। জগতের কোন বিষয়ে তাঁহার যেন আর মন নাই। আমাদের দেশে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে দুইজন সেতার বাদ্যে বিখ্যাত ছিলেন। আমার পূজনীয় পিতা আর বেলগাছির জমিদার বর্তমান চৌধুরী নিজামদ্দীন ওরফে সূর্য্য মিয়াঁসাহেবের পিতা—চৌধুরী করিমবক্স সাহেব। সময়ে চৌধুরী করিম সাহেবের আশ্চর্য জীবনকাণ্ড এই জীবনী মধ্যেই প্রকাশ হইবে। সেতারবাদ্য মধ্যে আমার পিতা বোল বাজাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। করিমবক্স চৌধুরী সাহেব গৎ বাজাইতে ওস্তাদ ছিলেন। আমার ভগ্নীর মৃত্যু হইলে আমার পিতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেতার বাজাইতেন। কত লোক গোপনে নিন্দা করিত। তাহারা বলাবলি করিত যে, এই সেদিনে কন্যাটির মৃত্যু হইল—আজই দেখ মীর সাহেব সেতার বাজাইতেছেন। কেহ বলিত আরে ভাই, আজ কেন? যেদিন কন্যা মরিয়াছে—কন্যার দাফন-কাফন শেষ করিয়া আসিয়াই সেতার লইয়া বসিয়াছিলেন। সারাটি রাত্রি সেতার বাজাইয়াছিলেন। এমন মায়া-মমতাশূন্য লোক দেখি নাই। কি কঠিন প্রাণ! আপন সন্তানের মৃত্যুর পরমুহূর্তে বলত ভায়া—সেতার বাজাইতে কে পারে?

এইরূপ যত নিন্দাবাদ হইত। সাধারণ লোক বাজনার শব্দ শুনিয়া এই সকল কথার অবতারণা করিত। করিতে পারে। যেরূপ মাথা যেরূপ উপাদানে গড়া, এবং মনের মধ্যে জিনিসপত্রও যেমন, সে-ই তেমনি বিবেচনা। দূর হইতে সেতারের বাদ্যই তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার ভাব, তাঁহার অবস্থা, তাঁহার প্রাণপোরা ভালবাসার ধারা আর তাহারা দেখে নাই। সেতার বাজাইয়াছেন, সেতারের তারে হৃদয়ের প্রত্যেক তার সন্তানশোকে হৃদয়বিদারক ভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। অনবরত দুই চক্ষের জলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া বুক বহিয়া পড়িতেছে। বাহিরের লোকে কি দেখিবে? বাড়ীর লোকে যে স্বচক্ষে তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন।

জননীর মৃত্যুর পর পিতার অবস্থার কথা আমার বেশ মনে আছে। আমার অবস্থার কথাও মনে আছে। যতদিন জননী শয্যাধরা হইয়াছিলেন আমি পায়ের নিকটে বসিয়া পা দুখানি কোলের উপর করিয়া বসিলে বিরক্ত হইতেন না। বরং নজর পড়িলে অঙ্গুলির ইসারায় ডাকিয়া আমার মাথাটা বুকের উপর রাখিয়া গায়ে হাত দিয়া দুই একটি কথা বলিতেন। মহতেসাম হোসেন শিশু, সে খেলা করিয়া বেড়াইত। মকারম হোসেনকে প্রকাশ্য দেখিতে পারিতেন না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেন। স্নেহসহকারে বলিতেন পেটুক আসিয়াছে। আমার খাদ্যগুলি তোমরা সাবধান কর। একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে মাতার পীড়িত-শয্যায় খাদ্য আদি যাহা যত্ন করিয়া মাতামহী প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া দিতেন মকারম চুপে চুপে আসিয়া সমুদায় খাইয়া যাইত। মাতার আহারের সময় দেখা যাইত বাটি-বাসনে কিছুই নাই। হয়ত কোনদিন তাঁহার আহারের অনেক অসুবিধা ঘটিত। আবার কোন কোন দিন আহারের পর মকারমকে কাছে বসাইয়া তাঁহার যে-সকল খাদ্য খাওয়ার পর অবশিষ্ট থাকিত সমুদায় খাওয়াইয়া দিতেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বজলাল হোসেন নিতান্ত শিশু, সে ধাত্রীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইত। মাতার মৃত্যুদিনের ঘটনা আমার স্মরণ আছে। পেটের পীড়ায় এতই জীর্ণশীর্ণ হইয়াছিলেন যে, মাত্র কয়েকখানি দেহকঙ্কাল ছিল। চক্ষু কপাল সেই উজ্জ্বল। তৃতীয়ার চন্দ্রাকৃতি উজ্জ্বল ললাট-তেজ যেন ক্রমেই ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিস্ফারিত চক্ষের কোন অংশ তেজহীন বিবর্ণ। নীলিমারেখায় অঙ্কিত এ-সকল ভাবের চিহ্নমাত্র চক্ষে দেখা যায় নাই। সেই জোড়া-ভ্রূ, উন্নত নাসিকা যেমন তেমনই রহিয়াছে। কৃষ্ণ কেশের বৃহৎ গুচ্ছ যেমন তেমনি রহিয়াছে। উদাসীন পথিক কোন কথাই গোপন করেন নাই। আমি মনের আবেগে এইক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। আর যাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই, তাহারই সংক্ষিপ্ত ভাবমাত্র আমি প্রকাশ করিতেছি।

এমন পুণ্যবতী রমণী! হায়! কি কারণে জানি না, সমুদায় ঈশ্বরের হাত। মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে ক্রমে কমিতে কমিতে একবারে বাক্‌রোধ হইয়া গেল। স্বভাবতঃই কম কথা কহিতেন। এখন আর একটি কথাও বলেন না। হাতের ইঙ্গিতে চক্ষের ইসারায় খাদ্য আদি ও অন্য অন্য বিষয় জানাইতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে পুত্রকয়েকটিকে কাছে বসাইয়া অনবরত চক্ষের জল ফেলিয়া নীরবে ক্রন্দন করিলেন। চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে। দুই একবার হস্ত

উত্তোলন করিয়া ঊর্ধ্বে যেন ঈশ্বরপ্রতি লক্ষ্য করিয়া পুত্রগণের মাথায় পিঠে হাত দিতেছেন। আত্মীয়স্বজন প্রতিবাসী ভদ্র মহিলাগণ ঘর পূর্ণ করিয়া নীরবে চক্ষের জল নিক্ষেপ করিতেছেন।

বেলা এক প্রহর সময় আর আর সকলে আমার পিতাকে বাটীর মধ্যে লইয়া আসিল। মোসলমান সমাজে পর্দার প্রথা সে সময় খুব প্রবল ছিল। শাশুড়ী সম্পর্কে যাহারা ছিলেন, এবং অন্য অন্য ভদ্র পরিবার যাঁহারা আমার পিতার সম্মুখে যাইতেন না, দেখা দিতেন না, তাঁহাদিগকে পিতার আগমন-বিষয় বলা হইলে তাঁহারা গৃহমধ্য হইতে ক্রমে সরিয়া অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইলেন। পিতা ক্রমশঃ মাতার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই হঠাৎ পিতার মুখের দিকে মাতার নজর পড়িতেই কাঁদিলেন, চক্ষের জল নিক্ষেপ করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের চাদর দ্বারা মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পিতাও চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, কতক্ষণ পর বলিয়া উঠিলেন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হইল না। আজ দুইটি বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও আমাকে দেখ নাই অথচ এক বাড়ীতেই দু'জন বাস করি। তবে তুমি অন্দর মহলে থাক, আমি বাহির বাটীতে থাকি। তুমি তোমার মনের ঘৃণায় আমাকে ডাক নাই—আসি নাই। আমিও আমার মনের বলে নিজে ইচ্ছা করিয়া তোমাকে দেখিতে আসি নাই। আজ শুনিলাম তুমি সকলের মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতেছ। তুমিই যদি জগৎ ছাড়িলে তবে আমার অভিমান কার সঙ্গে, কিসের উপরে? মুখের আবরণ ফেলিয়া দেও—জনমের মত তোমাকে দেখিয়া যাই। এখনও তুমি জীবিত আছ বলিয়া আমার দেখিবার ক্ষমতা আছে। তোমার প্রাণশূন্য মুখখানি দেখিবার বিধান শাস্ত্রে নাই, তাই আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, মুখের চাদর সরাও আমি একবার মাত্র তোমার মুখ চক্ষু কপাল জীবনের মত দেখিয়া যাই। আমি তোমার পীড়িত অবস্থায় যত্নের ত্রুটি করি নাই। টাকা ব্যয় করিতে কম করি নাই। যেখানে ভাল কবিরাজ, ভাল হাকিমের নাম শুনিয়াছি সেখান পর্যন্ত লোক পাঠাইয়া টাকা পাঠাইয়া সে চিকিৎসককে আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে যত্নের ত্রুটি করি নাই।

সেই সময় মাতা বস্ত্রমধ্যেই দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আপন ললাটে মৃদু মৃদু স্পর্শ করিয়া সকলকে এবং স্বামীকে বুঝাইলেন। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইল। স্বামীর অনুনয় বিনয়সত্ত্বেও মুখের আবরণ উন্মোচন করিলেন না।

এমন ভালবাসা! স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যে স্ত্রী স্বামীর মুখ পর্যন্ত চক্ষে দেখিতে নারাজ! শেষ জীবনে জীবনান্ত সময়েও সেই মনোমালিন্য ভাব স্ত্রীর অন্তর হইতে অন্তর হইল না! পরস্পর ভালবাসার অভাব ঘটে নাই। তাহা হইলে পরস্পরের চক্ষে জলধারার সৃষ্টি হইবে কেন? হা-হুতাশ দীর্ঘ নিশ্বাসের কথাই বা আসিবে কেন? যাহা হউক, এ বিষয় উদাসীন পথিক মূল কারণ নির্দেশ করিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পিতা নীরবে দুই চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। জননী তাহা অনুমানে বুঝিয়া মুখাবরণ সরাইলেন, চক্ষে জলধারা। আর আর সকলেও কাঁদিতেছে, কথা কাহারও মুখে নাই। মায়ের অবস্থা দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে।

ক্ষণকাল পরেই তাঁহার জীবন শেষ হইল। কোথায় "দাফন", অর্থাৎ গোর দেওয়া হইবে কথা উঠিলে পিতৃদেব বলিলেন, আমার পিতার পদপ্রান্তে ইহার সমাধিস্থান হইবে। মীর এবরাহিম হোসেনের কবর সাঁওতা গ্রামে, সেই স্থানেই গোর দেওয়া সাব্যস্ত হইল। কাফন দাফন শেষ ক্রিয়া সমুদায় নিয়মিত শেষ করিয়া পিতা যে মৃত্তিকার মধ্যে গড়াগড়ি পাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ছিলেন, তাহা বিশেষভাবে আমার মনে আছে। সন্ধ্যার পর সে-রাত্রিও সেতার বাজাইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পূর্বে আমাদের বাটীতে একবার চোরেরা চুরি করিতে আসিয়াছিল। আমি পীড়িত, মাতা মাতামহী এবং আমরা দুই ভাই এক ঘরে শুইয়া আছি। পিতা বাড়ীতে নাই। আমাদের বাড়ীর চিরপ্রথা সারাটি রাত্রি ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিবে। প্রদীপ নিবিয়া গেলেই তৎক্ষণাৎ না হউক কিছুক্ষণ পরে ঘুমও ভাঙ্গিবে। মাতামহী জাগিয়া আমাদের প্রধানা পরিচারিকাকে ডাকিলেন। তাহার নাম ছিল "বিলাতী" আমরা তাহাকে মাতামহীর ন্যায় মান্য করিতাম। কারণ মাতামহ চাকুরীস্থানে ইহাকে খরিদ করিয়া নিজ সেবাশুশ্রূষার জন্য নির্দিষ্টভাবে রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য মাতামহী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমার মাতাকে ক্রোড়ে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছে। আমাদিগকেও প্রতিপালন করিয়াছে, সেই জন্য আমরা তাহাকে মান্য করিতাম। চাকর চাকরানী সকলেই তাহাকে মান্য করিত। এক মাতামহী ভিন্ন তাহার নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না, কোন এক সম্পর্ক উল্লেখে ডাকিত। সকলেই মান্য করিত।

মাতামহী শুইয়া শুইয়াই সেই প্রধানা পরিচারিকার নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠাইয়া বলিলেন "প্রদীপ জ্বালিয়া তেল দেও।" সে সময় বিলাতী দিয়াকাঠির প্রচলন হয় নাই। পাতকাঠির সরু কাঠি, মোটা হইলে দুই খণ্ড কি চার খণ্ডে চিরিয়া গন্ধক লাগাইয়া লইত। কাঠের কয়লা কি ঘুঁটের আগুনের উপরে গন্ধক-সংলগ্ন কাঠির গন্ধকের দিক আগুনের উপর ধরিলেই তুর তুর করিয়া আগুন জ্বলিয়া ঐ কাঠিতে ধরিত। আগুনের তাওয়া ঘরের মধ্যে রাখিলে দুর্গন্ধের সহিত ধুঁয়া হয়। সেইজন্য ঘরের বারান্দায় রাখা হইত। ঐ বারান্দায় বাটীর পাহারাওয়ালা বিশ্বাসী মেলন চৌকিদার শুইয়া বসিয়া রাত্রি কাটাইত। অধিক সময় জাগরিত অবস্থায় থাকিত। মাতামহীর আজ্ঞায় প্রদীপ জ্বালাইতে বৃদ্ধা চাকরানী ঘরের দ্বার খুলিয়া আগুনের তাওয়ায় নিকট পাতকাঠি ধরাইয়া বাতি জ্বালিল। এবং প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে আনিল। সত্যই প্রদীপে অতি সামান্য তেল আছে দেখিয়া তেলপূর্ণ করিয়া দিয়া শয়ন করিল। মাতামহীও একটু ঘুমাইয়াছেন। আবার চক্ষু খুলিয়া গেলেই দেখিলেন ঘর অন্ধকার, প্রদীপ নির্বাণ।

তখন কিঞ্চিৎ রোষভাবে পরিচারিকাকে বলিলেন যে, প্রদীপে তেল দিতে বলিলাম, তাহা বুঝি দেও নাই? তাহা না হইলে এই প্রদীপ জ্বালাইলে আবার নিবিল কেন? চাকরানী বলিল, সে কি কথা! আমি এখনই তেল দিয়াছি। 'কেন নিবিল' বলিতে বলিতে উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া বারান্দায় গিয়া চৌকিদারের শিয়রের দিকে আগুনের তাওয়া হইতে দীপ কাঠি জ্বালাইয়া লইবে, দেখে যে আগুন নাই। নিজে নিজেই বলিতে লাগিল, সে কি কথা? এখনই এত আগুন দেখিয়া গেলাম। এর মধ্যে আগুন নাই সে কি কথা? চৌকিদারের নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে উঠিল। 'আগুন আনিয়া দেও, তাওয়ায় আগুন নাই' বলিলে, চৌকিদার প্রথম রান্নাঘরে গিয়া উননে দেখে আগুন নাই। আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন মাতৃকুলের আত্মীয় মীর গোলাম আলীর বাড়ী। মীর গোলাম আলী আমার মাতার পিসতুত ভাই। জিলা গোয়ালপাড়ার কড়ইবাড়ীর থানার দারগা ছিলেন। বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, জনকয়েক চাকর চাকরানী থাকিত। বুড়ো বিবির ঘরে আগুন থাকিবেই, তাঁহার তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল।*

* স্ত্রীলোকের তামাক খাওয়ার কথায় কথা আসিল তাহাতেই বলিয়া রাখি, আমার মাতামহী মাতা তামাক খাইতেন না। মাতার এমনই তামাক বিদ্বেষ স্বভাব ছিল যে তিনি কোন দিন তামাক ছুঁইতেন না। তামাকের গন্ধ সহিতে পারিতেন না। পিতা তামাক খাইতেন কিন্তু

মেলন চৌকিদার রান্নাঘরে উনানে আগুন না পাইয়া মীর গোলাম আলীর বাটীতে আগুন আনিতে গেল। আগুন আনিয়া বৃদ্ধা পরিচারিকাকে দিল। সে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে শুইয়াছে। চৌকিদারও আপন বিছানায় শুইয়াছেমাত্র, আবার প্রদীপ নিভিয়া গেল। এবার বৃদ্ধা চাকরাণীর মনে সন্দেহ হইল, এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিলাম। নিবিয়া গেল। তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া চৌকিদারের নিকট আগুন চাহিলে, চৌকিদার একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, একি? বার বার প্রদীপ নিবিয়া যায় কেন? এবারেও মীর গোলাম আলীর বাটীতে যাইয়া আগুন লইয়া আসিতেই দেখে যে জলের কূপের চারিদিকে কয়েকজন মানুষের মাথার ন্যায় নড়াচড়া করিতেছে? ফাসফুস্ করিয়া কথা কহা স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। আবার শয়নঘরের পিছনের দিকে একজন মানুষ যেন দাঁড়াইয়া আছে। অমাবস্যার রাত্র, ঘোর আঁধার। চৌকিদার মনে মনে ভাবিল, নিশ্চয় উহারা চোর, ৬। ৭ জন লোক সন্দেহ নাই। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধা পরিচারিকাকে আগুন দিয়া ত্রস্তপদে বাহির বাটী আসিয়া "আলমদী" চাকর যে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিল, তাহাকে জাগাইল। জাগাইয়া বলিল, ভাই আলম। লাঠি লইয়া শীঘ্র আমার সঙ্গে আয়। তোকে এখন কিছুই বলিব না। শীঘ্র শীঘ্র আয়। আলম ভাবিল, বোধ হয় বাটীর মধ্যে কোনরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। উভয়েই তাড়াতাড়ি আসিতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধা চাকরাণী ঘরের মধ্যে গিয়া বাতি জ্বালিয়া চক্ষু বুঁজিয়া শয়ন করিয়াছে, ঘুমায় নাই।

আমার মায়ের নিকট কি বিছানায় বসিয়া তামাক খান নাই। একটু দূরে ভিন্ন আসনে বসিয়া তামাক খাইতেন। আশ্চর্য ব্যাপার আমার ভ্রাতাগণ কেহই তামাক স্পর্শ করে না।

আমার পুত্র কন্যাগণ তামাক স্পর্শ পরের কথা তামাকের গন্ধে তাহারা বিশেষ কষ্ট ভোগ করে। আমার দুইটি পুত্রবধূ তাহারা তামাক খায় না। তামাকের গন্ধ সহিতে পারে না। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বর তাহাদিগকে তামাকে ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ কুমারী কালে তাহার ভগ্নিপতি বলিয়াছিলেন দেখিব বিবাহ হইলে স্বামীর তামাক সাজিয়ে দাও কিনা? সে তখনি তাহার উত্তর করিয়াছিল যে দেখিবেন। খোদার মরজি হইলে আমাকে তামাক সাজিয়া দিতে কি তামাক ছুঁইতেও হইবে না। আমিও জীবনে কখনও হুঁকো কলকের তামাক খাই নাই। বিশেষ ঘৃণা। দাঁতের পীড়ায় একটি ডাক্তার চুরট টানিতে বলেন—তাহাই অভ্যাস আছে। কিন্তু চুরটের ধূম হঠাৎ গলার মধ্যে প্রবেশ করিলে, তখনি মাথা ঘুরিয়া বমি হয়। আমার বাড়ীতে তামাক খাওয়ার সাজসরঞ্জাম হুঁকো কলকে কিছুই নাই। অতিথি আত্মীয়স্বজন আসিলে নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া চুরট দেশলাই দিয়া অভ্যর্থনা করি। যাঁহারা সদা সর্বদা আসা যাওয়া করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে আমার বাড়ীতে তামাকের ব্যবহার নাই।

চৌকিদার আলমকে সঙ্গে করিয়া পূর্বোক্ত কূপের নিকট ক্রমে মৃদু মৃদু ভাবে যাইয়া লাঠির আঘাত করিল। বেদম লাঠি চলিতে লাগিল। তাহারাও কম নহে তাহাদের হাতেও লাঠি ছিল। চৌকিদারের ইচ্ছা চোরকে ধরিব। আলম চোরদের লাঠির হাত দেখিয়া, অথচ দুই চার ঘা খাইয়া পিছে হটিল। মেলন বলিল, ছি ছি! আরে ছি। চেনা চোর ধরিতে ভয় কি? এই কথা যেই মেলনের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, চোরদের মধ্য হইতে একজন হস্তস্থিত কোদালী তুলিয়া বলিল, ওরে জকি! চিনিয়াছে, ওকে রাখা নয়, ওর মাথাটা গর্দান হইতে এখনই নামাইতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের বাঁচা নাই বলিয়াই চৌকিদারের ঘাড়ে বৃহৎ কোদালী দ্বারা পার্শ্ব হইতে সজোরে আঘাত করিল। উভয় পক্ষের লাঠির আঘাত বেড়ায় লাগিতেছে। আক্রমণ, আত্মরক্ষা— দুই চলিয়াছে। এমন সময় কোদালীর আঘাত—মেলন এক লম্ফে ৭।৮ হাত ছুটিয়া বাসঘরের সিঁড়ীর নিকট আসিয়া পড়িতে পড়িতে বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়া গেল। প্রথম অবস্থায় লাঠির ঠকাঠক শব্দে এবং পর মুহূর্তেই মেলনের গলার বিকৃত স্বরে ঘরের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত। স্ত্রীলোক বালক বালিকাদের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ। আরও গোল মেলনের গোঙ্গানী আর্তনাদের সহিত চিৎকার। ঘর অন্ধকার, চোরদিগের মধ্যে একজন ঘরের মধ্যেই ছিল। ঘর হইতে মালপত্র, হাত বাক্স ছোট ছোট তামা কাঁসার জিনিস লইয়া সিঁদের মুখে ধরিতেছিল, কিন্তু যে মাল আসবাব সিঁদের মুখ হইতে কেহই সরায় না—যেখানকার মাল সেইখানেই পড়িয়া থাকে, বাহিরে আসিয়া দেখে যে কেহ নাই। সঙ্গীরা কেহ নাই। খিড়কি দিয়া বাহির হইয়াই দেখিল, দলস্থ লোকেরা অগ্রেই যাইতেছে। দৌড়িয়া তাহাদের পিছনে খাড়া হইতেই তাহারা তাহার মাথা লক্ষ্যে কোদালী উঠাইতেই নাম বলিয়া বলিল, আমি আমি। রক্ষা পাইল, আলম ভয়ে কাঁঠাল গাছের গোড়ায় লুকাইয়া দেখিয়াছিল।

মেলন গোঙ্গাইয়া পড়িতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। আর কোন সাড়াশব্দ নাই। পুনঃ গোঙ্গাইয়া উঠিতেই দ্বার খুলিয়া দেখিল রক্তে বারান্দা লাল হইয়া গিয়াছে। মরে নাই, তখনই মহা গোলযোগ হওয়ায় বাহির বাটীতে যাহারা ছিল তাহারা এবং মুন্সী ফজল্লা দারগা সাহেবের বাটীতে প্রাতঃ উপাসনার জন্য যাঁহারা জাগিয়াছিলেন তাঁহারা আসিয়াই দেখেন চৌকিদার খুন। বারান্দার অর্ধাংশ রক্তে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। ঘরের পিছনে যেখানে চোরদলের সহিত মেলনের ধস্তাধস্তি হইয়াছিল, সেখানে মেলনের বাবরিকাটা চুলের অগ্রভাগ যে বাঁকারি

ছিল, সেই চুলের এক পার্শ্বে বাঁকান চুল সমুদায় কাটিয়া ঐ স্থানে পড়িয়া আছে। ঈশ্বর মেলনকে বাঁচাইবেন, তাহাতেই কোদালীর কোপ চুলে লাগিয়াছিল, বাবরি চুল না থাকিলে মাথা মাটিতে পড়িয়া যাইত, বাবরি চুলেই রক্ষা।

সময়ে দারগা জমাদার বরকন্দাজ আসিল। মেলনের নিকট চোরদিগের নাম শুনিয়া তখনি গ্রেপ্তার।

চুরি করিতে আসিয়াছিল কাহারা? বাড়ীর চৌকিদারকে নিমখুন করিল কাহারা? হায় রে জগত! হায় রে মানুষ! যাহারা চিরকাল মুন্সী জেনাতুল্লার অন্নে প্রতিপালিত এবং পিতার প্রতিপালিত দাসীর পুত্র—কুড়নবাড়ীর লোক।

ইহারা পুরুষানুক্রমে খানেজাদ গোলাম। "কুড়ান" বাল্যকাল হইতে আমার মাতার আদেশমত কার্য করিত। ঘরের সন্ধান জানিত। সেই কুড়ানই সন্ধানী হইয়া এই কার্য করিয়াছে।

কোন জিনিসপত্র চোরেরা নিতে পারে নাই। বাক্স পেঁটারা যাহা ভাঙ্গিয়াছিল তাহার জিনিসপত্র বাহির করিয়া, কত সিঁদের মুখে, কত সিঁদের বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছিল। মাতার একখানি পরিধেয় কাপড়, একটা বিছানার চাদর মাদুরে জড়াইয়া খিড়কির দ্বারের নিকট ফেলিয়া গিয়াছিল। মাত্র ১টা পাথর-বসান অঙ্গুরীতেই গোল বাধিল, আর সাংঘাতিক ঘটনা—চৌকিদারের ঘাড়ে কোদালের আঘাত, যাহাকে সাহরগ বলে, দুই কর্ণের দুই পাশ দিয়া দুইটি রগ মানুষের আছে তাহা কাটে নাই, সে রগ ছাড়াইয়া চুল চামড়া কাটিয়া মাংস তিন অঙ্গুলী পরিমাণ কাটিয়াছিল। কোন হাড় কাটিয়াছিল না। আসামী ধরা পড়িল, "জখমি" পাবনায় ডাক্তারখানায় চালান হইল। দেড় মাসের পর মকদ্দমা, তখনও চৌকিদারের কাটাস্থান জোড়া লাগে নাই। অনেক কমিয়া গিয়াছে, মকদ্দমার বিচার সময় জজসাহেব বলিলেন, মেলন! তুমি বড়ই সাহসের কাজ করিয়াছ। আমি তোমাকে থানার বরকন্দাজী চাকুরী পুরস্কারস্বরূপ দিতেছি। মেলন গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাতে বলিল, হুজুর! আমার মনিব আমাকে বিশ্বাস করেন, ভালবাসেন। আমার বহুকালের মনিব, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন মনিবের চাকুরী স্বীকার করিতে পারি না। হুজুর, আপনি হর্তাকর্তার মালিক—ঐ বিষয়ে আমাকে মাপ করিবেন। জজসাহেব সন্তুষ্ট হইয়া নগদ পঞ্চাশ টাকা বকশিশের আদেশ করিলেন। আসামীরা শাস্তি পাইল। প্রধান দুইজন—ইছা আর জকি। ইছা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, জকি সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর। কুড়নের তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাবাসের আদেশ হইল।

বাল্যজীবনের মধ্যের আর একটি কথা বলিয়াই শেষ করিব। আমাদের দেশের লোক পূর্বে কিরূপ ভীরু, কিরূপ কুসংস্কারাপন্ন অপদার্থ ছিল তাহাই আঁকিয়া রাখা উদ্দেশ্য। ৩০ বৎসর পর আবার কিরূপ হইয়াছে, কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তুলনা করিলে বুঝিতে পারিবেন। কি কারণে জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত কি প্রকারে উন্নতি লাভ করে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের দেশের লোকে, সে সময় সাহেবের নাম শুনিলেই কাঁপিয়া উঠিত, সাহেবের পোষাকপরা অন্যজাতীয় লোক দেখিলেও তাহাকে সাহেব বলিয়া বিশ্বাস করিত। পাটনা, ভাগলপুর কোথায় তাহা ত কেহই জানিত না। গৌরী নদী উজানভাঁটি বাহিয়া কত নৌকা যাতায়াত করিত। স্রোতের মুখে যাহারা ভাঁটিয়া যাইত তাহাদের সম্বন্ধে বেশী কোন কথা ছিল না, উজান নৌকা লইয়াই নানা কথা রটিত। দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, মেড়ুয়াবাদী এক জাতি আছে। তাহারা সকলেই নৌকায় থাকে, নৌকায় শিল, পাটা, তিসি গম, পাথুরিয়া চুন বোঝাই করিয়া পশ্চিম দেশ হইতে উত্তরাঞ্চলে লইয়া যায়, গৌরী নদী হইয়াই যাওয়ার সুগম পথ। মেড়ুয়াবাদীরা বড়ই অত্যাচারী, গৌরী নদী হইয়া বহরে বহরে নৌকা যাইত। কোন বহরে দশ, কোন বহরে বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ, কোন বহরে একশত দেড়শত নৌকা থাকিত। যেদিন মেড়ুয়াবাদীর নৌকার বহর চলিত মেড়ুয়াবাদীরা গুণবাড়ী ঘাড়ে করিয়া শরীরের অর্ধভাগ নোয়াইয়া গুণ টানিয়া যাইত। সার বাঁধিয়া দেড়শত দুইশত নৌকা এক সঙ্গে জলের কিনারা হইয়া গৌরী স্রোতের বিপরীত দিকে উজান জল বাহিয়া যাইবার সময় সেই একপ্রকার নূতন দৃশ্য দেখাইত। যাহা বাঙ্গালা দেশের কোন অংশে বোধহয় কেহ দেখে নাই। কারণ গাছপালাশূন্য ভাঙ্গনবিহীন উঁচুনিচু বাঁকাতেড়া কণ্টকময় দুর্গম বাঁক-বর্জিত নদী গৌরীর কয়েকটি বাঁক ভিন্ন আর কোন নদীতে নাই। এক ভাবে এক রোখে এক দিকে যত দূর জলভাগ চলিয়া গিয়াছে তাহাকেই বাঁক বলে।

যে সময়ের কথা, সে সময় চাপড়া গ্রাম হইতে মাথাভাঙ্গা* পর্যন্ত একই বাঁক বলিয়া বোধ হইত। মেড়ুয়াবাদী অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয় নৌকার বহর উজান-মুখে চলিলে গ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত। স্ত্রীলোকের ঘাটে যাওয়া বন্ধ হইত। কোন স্ত্রীলোক নদীর ঘাটে যাইত না। বাড়ীর পুরুষেরাও জল আনিতে, কি স্নান করিতে নদীর ঘাটে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিত। ঐ সকল মেড়ুয়াবাদী

* যেস্থানে গৌরীদাসীকে দেখিতে না পাইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর পড়িয়া মাথা ভাঙ্গিয়া মরিয়াছিলে· সেই মাথা ভাঙ্গার মাঠ।

লোকের কথা বাঙ্গালা দেশের লোকে বুঝিতে পারিত না। তাহাদের শরীরের গঠন শক্ত সমর্থ বলশালী বুঝিয়া পুরুষেরাও ভয় করিত। আর কয়েকটি ঘটনার জন্ম স্ত্রীলোকেরা মেড়ুয়াবাদীর নাম শুনিলে অস্থির হইত, ভয়ে কাঁপিতে থাকিত। নদীর ঘাট হইতে ক্রমে কয়েকটি স্ত্রীলোককে তাহারা বলপূর্বক আপন নৌকায় উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই ভয়ে পুরুষেরা পর্যন্ত তাহাদের নামে ভয় করিত।

একবারের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বাল্যজীবনের স্মৃতির বাজে কথা শেষ করিতেছি।

মীর গোলাম আলীর নাম পাঠকগণ পূর্বেই শুনিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তাহাও শুনিয়াছেন। মীর গোলাম আলী আমার মায়ের আপন পিসতুত ভাই। তিনি গোয়ালপাড়ার এলাকায়, কড়ইবাড়ী থানায় দারগাগিরির কার্য করিতেন। ছুটি লইয়া বাটী আসিয়াছেন। গোয়ালপাড়া হইতেই নৌকা আনিয়াছেন। সে সময় নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের অন্য কোন সুযোগ ছিল না। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের নৌকা, মাঝিমাল্লাও সেই দেশীয়। নৌকা আমাদের বাড়ীর ঘাটে লাগান আছে, নৌকায় মাঝিমাল্লা ভিন্ন আর কেহ নাই। দারগা সাহেব পুনরায় এই নৌকাতেই গোয়ালপাড়া যাইবেন। প্রায় একমাস বাটীতে আছেন, নৌকাও ঘাটে বাঁধা আছে। কারণ এ দেশের মাঝি-মাল্লারা বেশী পরিমাণ টাকা পাইলেও অত দূর দেশে কখনই যাইবে না। সেই জন্য নৌকা রাখিয়াছেন।

ইহার মধ্যে একদিন মেড়ুয়াবাদীর বহরের নৌকা বেলা এক প্রহর থাকিতে লাহিনীপাড়ার ঘাটে ভিড়া আরম্ভ করিল, একশত বড় নৌকার বহর। ক্রমে ভিড়িতে ভিড়িতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পরেও নৌকা ভিড়া শেষ হইল না। রাত্র এক প্রহর পর্যন্ত নৌকাভিড়ার কার্য শেষ হইল। প্রথম নৌকা লাহিনীপাড়ার সীমার ঘাটে, শেষ নৌকা প্রায় দুই মাইল দূরে চাপড়ার ঘাটে বাঁধা পড়িল। এ সকল নৌকায় মহাজনের মাল বোঝাই নহে। পাথরিয়া চুন, শিল-নোড়া, জাঁতা, চাকতি, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি বোঝাই নৌকা, যাহা হিন্দুস্থান হইতে গৌরী নদী হইয়া উত্তরাঞ্চলে যায়, তাহাও নহে। এ নৌকায় কোম্পানী বাহাদুরের মালামাল। বারুদ গোলাগুলি রসদপত্র খাদ্য সামগ্রী। এই বহরের কর্তা একজন ইংরেজ, তিনি একখানি বড় নৌকায় আছেন। কিন্তু তাঁহার নৌকা বহরের প্রথমে নাই। ১০/১২ খানা নৌকার পর তাঁহার নৌকা। সেপাই সান্ত্রী নেগাহবানও কয়েকজন নৌকায় আছে।

দারগা সাহেবের নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল। আগে পাছে নৌকা ভিড়িতেছে এক নৌকার মাঝি দারগা সাহেবের নৌকার লোকজনকে ডাকিয়া বলিল, গুণ ছাড়াইয়া দেও। লাগান নৌকার মাস্তুল উঠাইয়া রাখিয়াছ কেন? গুণ ছাড়াইয়া দেও। দারগার নৌকার মাঝি। বিশেষ কড়ইবাড়ী থানার দারগা মাঝিরা বোধহয় মনে মনে ভাবিত, দারগা সাহেবের উপর আর কোন ক্ষমতাওয়ালা লোক নাই। পূর্বেও নিজ থানার এলাকায় দারগা সাহেবের উপর আর কাহার হুকুম চালাইতে শুনে নাই। কাহাকে হুকুম করিতে দেখেও নাই। কড়ইবাড়ীতে দারগা সাহেবের নামে বাঘে বকরী এক ঘাটে জল খায় তাহার পর কড়ইবাড়ী হইতে লাহিনীপাড়ার ঘাট পর্যন্ত আসিতে ২০/২৫ দিনের কমে আসিতে পারে নাই। এই ৭/৮টি জিলার মধ্য দিয়া এত দীর্ঘ পথ চলিয়া আসিতেছে, নদীগর্ভে কাহার নিকট তাঁবেদারী করিতে হয় নাই। মাথা হেঁট করিয়া হুকুম বাজাইতে হয় নাই। আসিবার সময় যেখানে একটু গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা বোধ হইয়াছে, অমনি নৌকায় কাটা নিশান উড়াইয়া ডঙ্কায় ঘা দিয়া সোহরত করিয়াছে, সরকারী নৌকা। তাহার পর দুই এক বার বন্দুকের আওয়াজ করিয়াছে, সকল লোক চক্ষের পলকে তফাৎ হইয়াছে পুনরায় জোরে জোরে ডঙ্কা বাজাইয়া বাজি জিতিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপ যাহাদের মনের ধারণা, তাহারা গুন ছাড়াও বলিলে শুনিবে কেন? কোম্পানীর বহরের নৌকার গুণ দারগার নৌকায় বাঁধিয়াই চলিল। তাহারা বারবার বলিতে লাগিল, গুন ছাড়াইয়া দেও—ইহারা কিছুতেই সে কথায় কান দিল না দারগার নৌকার মাঝিমাল্লা নৌকার মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া ভাত খাইতেছিল কেহই উঠিল না, কথার জবাবও দিল না। তখন অধিক পরিমাণ ধুমধাম আরম্ভ হইল। বহরের অন্য নৌকাও আসিয়া দারগার নৌকার পাশে ভিড়িল। গুণ না ছাড়াইয়া দিলে আর আগে যাওয়ার উপায় নাই। কোম্পানীর নৌকার মাঝিরা দারগার নৌকার মাঝিদিগকে গালাগালি দিয়া বলিল, শীঘ্রই গুণ ছাড়াইয়া দেও। দারগার নৌকার মাঝিরাও গালাগালি দিয়া বলিল, নেমে এসে গুণ ছাড়াইয়া লইয়া যা। আমরা কি তোর চাকর যে তোর হুকুম শুনিব ইচ্ছা হয় ছাড়াইয়া লইয়া যা।

· কোম্পানীর নৌকা, তাহার পর পশ্চিমা খোট্টা তেরিয়ার জাত, ঐ কথা শুনিয়াই, দারগার নৌকার উপর ৩/৪ জন লাফাইয়া পড়িয়া বলিল—আয় দেখ, গুণ ছাড়াই কি করিয়া।

খোট্টা মাঝিমাল্লারা লাথি মারিয়া দারগার নৌকার সম্মুখের ঝাঁপ ভাঙ্গিয়া টানিয়া জলে ফেলিয়া দিল। ঝাঁপের সঙ্গে তেলের বাঁশের চোঙ্গা, ডাবা হুকা, দুই তিন জনার গামছা, ছোট একখানা আয়নাসহ ঝাঁপখানা জলস্রোতে ভাসিয়া গেল। আক্রমণকারীরা খোলা দ্বারে স্বচ্ছন্দে নৌকায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেহ লাথি, কেহ কিল, কেহ ঘুসি বসাইয়া দারগার নৌকার মাঝিদের সম্মান রক্ষা করিতে লাগিল। তাহারাও একেবারে গাধা নহে। ভাত রাখিয়া এঁটো হাতেই আরম্ভ করিল।

লাহিনী পাড়া গ্রামের একটু খোলা-মনের তিনজন লোক নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতে প্রতি সন্ধ্যাতেই দারোগার নৌকায় আসিয়া গৌরীর জলের ঠাণ্ডা বাতাস খাইয়া ঠাণ্ডা হইতেন। নিয়মিত তাঁহারাও আসিয়া নৌকার পিছনের কামরায় বসিয়া আছেন। মাড়ুয়াবাদী খোট্টাদিগের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ডংকায় বাড়ি দিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন—এ দারগার নৌকা। যে নৌকার মাঝিরা এই গোলযোগ বাধাইল, তাহাদের নৌকায় গোলা বারুদ বোঝাই। দুইজন সেপাইও সেই নৌকায় হেপাজতে ছিল। গুণ ছাড়ান লইয়া গোলযোগ বলিয়া কান দেয় নাই। যখন ডংকার আওয়াজ কানে প্রবেশ করিল, তখন আর তাহারা বসিয়া থাকা উচিত মনে করিল না। ডংকার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সেপাই দুইজন দারগার নৌকার উপর পড়িল। এবং "কে ডংকা বাজাইল" বলিয়া তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। মাঝিরা ধস্তাধস্তি করিতে করিতে নৌকা কাত হইয়া তাহারা জলে পড়িয়া গেল। ডাঙ্গার দিকে বেশী জল নাই, হাঁটুজলের মধ্যেই জড়াজড়ি আরম্ভ হইল। যাহারা ডংকা বাজাইয়াছিল সেপাই দুইজন তাহাদিগকে নানা প্রকার গালি দিলে তাহারাও তিনজনে দুইজনকে আক্রমণ করিল। নৌকার মধ্যে খুব কিল লাথির গড়াগড়ি আরম্ভ হইল। শেষে গ্রাম্যপক্ষ বলিল, আয় দেখি ডাঙ্গায় যাই। মেড়ুয়াবাদীর মাড়ুয়া বাহির করি। শেষে কোম্পানীর মাঝির দল, আর সেপাই দুইজন একপক্ষ। দারগার নৌকার মাঝি-মাল্লাগণ এবং গ্রাম্য লোক তিন জন একপক্ষ। উভয়পক্ষ যে যাহা হাতে পাইল, তাহাই লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

কেহ জ্বালানী কাঠ, কেহ বাঁশের লাঠি ভাঙ্গিয়া লাঠি করিল। লাঠি ভাঙ্গিয়া লাঠি বানানর বুদ্ধি হিন্দুস্থানীদের হইল না। বাঙ্গালী বুদ্ধিই এই স্থানে জয়ের সূচনা করিয়া লাঠির ব্যবহার আরম্ভ করিল। জ্বালানী কাঠ, গুণটানা গুণ-বাড়ী লইয়া সেপাই দুইজন খাড়া হইল। গ্রাম্য লাঠির ঘায়ে বড়ই বেজার হইল। ডংকার

আওয়াজ কোম্পানীর বহরের কর্তা সাহেবের কানেও প্রবেশ করিয়াছে। অন্য নৌকার মাঝিমাল্লারাও যাইয়া খবর দিল যে, একখানা লাগান নৌকার লোকের সহিত আমাদের গোলাবারুদ-বোঝাই নৌকায় গুণ-ছাড়ান কথা লইয়া ঝগড়া হওয়ায় মারামারি আরম্ভ হয়। ডংকার আওয়াজ শুনিয়া সেপাইরা সেখানে যায়, তাহাদের সহিতও কথার বচসা হইয়া মারামারি বাধিয়াছে। সাহেব খবর পাইয়া আর বিলম্ব করিলেন না। খানা খাইতেছিলেন, খানা টেবিলে রাখিয়াই চার জন শরীররক্ষক সেপাই সঙ্গে করিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহারই সেপাইদ্বয়, নৌকার মাঝিমাল্লারা বাঙ্গালীর লাঠির নিকটেও যাইতে পারিতেছে না। বেদম মার খাইতেছে, গ্রাম্য লোক তিন জন, মাঝিরা পাঁচ জন সাহেব দেখিয়া সকলেই দৌড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। গ্রাম্য তিনজন লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে অন্ধকার মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল, দারগার নৌকার একজন লোক সাহেব দেখিয়া প্রাণভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, দুইজন ডাঙ্গার দিকে দৌড়িল। সাহেব পাকৃড়ো পাকড়ো বলিয়া হুকুম করিতেই একজনকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, দুইজন মাঝি আপন নৌকার পাটাতনের নীচে পলাইয়া রহিল। সাহেব আসিয়া নৌকা দেখিলেন। লোকজন নাই, হাতলণ্ঠন ধরিয়া দেখিলেন ভাত তরকারী ছড়ান, হাঁড়ি পাতিল ভগ্ন। ডংকাটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। নৌকার অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হইয়াছে। নৌকার নিশান দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। কারণ সে নিশান কোম্পানী বাহাদুরের চিহ্নিত কাটা নিশান। তাঁহার প্রত্যেক নৌকাতেই ঐরূপ নিশান। বড়ই ধাঁধাঁয় পড়িলেন। নিশ্চয় এ নৌকা কোন সরকারী কার্যকারকের হইবে। একজন লোক জলে পড়িল আর কয়েকজন পলাইল। তাহাদের সন্ধান করিতে হুকুম করিলেন। যাহারা গ্রামের দিকে পলাইয়াছে তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া ধরিয়া আন। ইহাকে :জমাদারের জিম্মা করিয়া দেও। কাল ইহার তদন্ত হইবে! সাহেব মুখে হুকুম বাহির হইতেই প্রায় পাঁচ শত লোক পলাতক আসামী ধরিতে ছুটিল।

কর্তা সাহেব শেষে বুঝিলেন, এ হুকুম দেওয়া ভাল হয় নাই। হয়ত এই সকল বদ্‌মাইস লোক আমার হুকুমের বলে সম্মুখের গ্রাম লুট করিবে। গ্রামস্থ লোককে মারপিট করিবে। টাকাকড়ি কাড়িয়া লইবে। ঘরদোর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। শেষে বলিবে আসামী পলাইয়াছিল খুঁজিয়াছি সম্পূর্ণ দোষ আমার উপরই চাপাইবে। সাহেব ৫ জন শরীর রক্ষককে সঙ্গে করিয়া দৌড়িলেন, পিছন হইতে "খাড়া রাও খাড়া রাও" শব্দের সহিত হাত লণ্ঠনের আলো দেখাইতে

লাগিলেন। সাহেবের গলার আওয়াজ পাইয়া সকলেই দাঁড়াইল। আসামী একজন যে ধরা পড়িয়াছে, দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া গিয়া ধরা পড়িয়াছে, বন্ধন দশায় সাহেবের নিকট হাজির করিল। সাহেব আপন লোকজনকে হুকুম দিলেন—তোমরা সকলেই যার যার নৌকায় চলিয়া যাও। মাত্র পঞ্চাশ জন আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস। ধৃত ব্যক্তিকে সম্মুখে খাড়া করিয়া লণ্ঠনের আলোতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন—দেখ তুমি ভয় করিও না। তোমার কোন ভয় নাই। কেহ তোমাকে মারিবে না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি সত্য বল। —মিথ্যা বলিও না।

ধৃত ব্যক্তি সমুদায় ঘটনা সত্য সত্য বলিল। সাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন সে দারগার বাড়ী কোথা?

হুজুর, ঐ গ্রাম মধ্যে।—

সাহেব। তিনি বাটীতে আছেন?

ধৃত। বাটীতেই আছেন।

সা। এখন তাঁহার সহিত দেখা হইতে পারে?

ধৃ। হুজুর, সে কথা আমি বলিতে পারি না।

সা। তোমাদের আর চারজন কোথায়?

ধৃ। হুজুর, একজনকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছি। আর তিনজন মরিয়াছে কি বাঁচিয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই।

সাহেব স্বচক্ষে একজনকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছেন। বাকী চার জন তার মধ্যে এই একজন, আর একজন তাঁহার সম্মুখেই গ্রামের দিকে দৌড়িয়াছিল। বাকী দুইজন কোথা গেল। সাহেবের মনে সন্দেহ হইল। সামান্য কারণে তিনজন মানুষ যদি মারা যায় তবে বড়ই বিপদের কথা। বাজে লোক হইলেও বা যাহা হয় হইত। ইহারাও কোম্পানী বাহাদুরের চাকর। থানার দারগার একথা ত গোপন থাকিবে না। আমার লোকজন দারগার নৌকার উপর যাইয়া যে মারপিট করিয়াছে তাহাও গোপন থাকিবে না। একথা কাহারও বিশ্বাস হইবে না যে ৪।৫টি লোক পঞ্চাশ যাট জন লোককে মারিয়াছে। তিনটি লোক মরিয়া যাওয়া প্রকাশ হইলে কি বুঝাইবে? জলে ঝাঁপ দেয় কেন?

এই সকল ভাবিয়া সাহেব গ্রামের দিকে যাইতেই স্থির করিলেন। গ্রাম্য চৌকিদারকে সন্ধান করিয়া তিনটি লোকের সন্ধান করিতে বলিবেন। আর যদি দারগার সহিত দেখা হয় তবে ইহার মীমাংসা হইয়া যাহাতে আপসে মিটমাট

হইয়া যায় তাহাই করিবেন স্থির করিয়া গ্রামের দিকে আসিতে লাগিলেন। সাহেব গ্রামের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখিলেন—লাঠি হস্তে কয়েকজন লোক গ্রামের দিক হইতে আসিতেছে।

পাঠক! এই লোক মধ্যে দুইটি ভদ্র লোক দারগার নৌকায় বসিয়া গৌরী জলের ঠাণ্ডা বাতাস খাইতে গিয়াছিলেন। কোম্পানীর নৌকার লোকের সহিত দারগার নৌকার লোকের হাতাহাতির সময় ডংকা বাজাইয়া সেপাই দুইজনকে নৌকায় আনিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়া লইয়া ঠাণ্ডা গরম হইয়া আসিয়াছিলেন; গ্রামে আসিয়া আর কয়েকজন সাহসী বীর জোটাইয়া খোট্টা মেড়ুয়াবাদীদিগকে শাসন করিতে যাইতেছেন। সাহেবের লোকেরা বলিল।—

হুজুর! এই আসামী—এই আসামী। সাহেব—পাকড়ো—পাকড়ো—বলিতেই একজন ধরা পড়িল; যে ধরা পড়িল—সে ঠাণ্ডা বাতাস খাইতে গিয়াছিল না। এইবারে নূতন যাইতেছিল। আর তিন জনে পলাইল। পাকড়ো—পাকড়ো—সাহেবের গলায় আওয়াজ শুনিয়া চমকে থমকে দাঁড়াইতেই হাতে দড়ি পড়িল। আর তিনজন গ্রামের দিকে দৌড় দিল। তখন আর কি? দুই তিন হাজার লোকের সঙ্গে মারামারি করিতে ইচ্ছা, শেষে কিনা একজন সাহেবের গলার আওয়াজেই দে-পিট। সাহেবরূপে এতই ভয়। তাই বলিতেছিলাম,—শেষে নিরুপায়। সাহেব লোকজনসহ আসিতেছেন আর ধৃত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

দারগার বাড়ী কতদূর? আর এ গাঁয়ের বড় লোক মণ্ডল বাড়ী কত দূর?

ধৃত ব্যক্তি দারগার বাড়ী এবং মণ্ডল বাড়ী, আমাদেরই বাড়ীর কথা বলিয়াছে। নিকটেই বাড়ী বলিয়া সাহেবকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিতেছে। যে তিনজন এবারে পলাইয়াছেন তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া-খাওয়া দুইজন আছেন। একজনার নাম নাজেম আলী আর একজনার নাম গণিমিয়া। নাজেম আলী সমসের আলী কাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র, যে সমসের আলীকে, টমাস কেণী গারদ ঘরে ছয়টি মাস আটক রাখিয়া শুধু ধান খাওয়াইয়া—বিনা পণে সম্পত্তি পত্তনি লিখিয়া লইয়াছিলেন। সেই সমসের পুত্রগণ কেণীর দৌরাত্ম্যে শ্যামপুর গ্রামে টিকিতে না পারিয়া লাহিনী পাড়ায় আমার পিতার আশ্রয়ে* আমাদের আম বাগানের

* বর্তমান সময়ে সেই বাড়ীতে পূর্বোল্লিখিত মেলন চৌকিদারের পুত্রগণ বাস করিতেছে। সমসের আলীর পুত্রেরা নীল বিদ্রোহের পর সম্পত্তি হাতে পাইলে আপন বাড়ীতে চলিয়া গেলে চৌকিদারকে দেওয়া হয়। সেই হইতে তাহারই পুত্রগণ বাস করিতেছে।

উত্তরাংশে বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে। পূজনীয় পিতৃদেব তাহাদিগকে আনিয়া স্থান দিয়াছেন। কাজেই [তাহারা] আমাদের নিতান্তই হিতৈষী। নৌকায় মারামারি করিয়া, প্রাণের ভয়ে পলাতক।

আমার পিতা এশার নামাজ পড়িয়া "তসবি তেলায়ত" নাম জপ করিতেছিলেন। আমি ঐ ঘরের মধ্যে ফরাসের উপর বসিয়া লিখিতেছিলাম। নাজেম মিঁয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দেখিল পিতা উপাসনার্থে নিযুক্ত আছেন। কি করে, কোন উপায় না পাইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল—মিয়াঁ ভাই! দারগা সাহেবের নৌকার মাঝিদের সহিত মাড়ুয়াবাদী খোট্টাদের কি কথা লইয়া বিবাদ হয়। শেষে মারামারি। তাহার পর সমুদায় বহরের নৌকার মাঝিরা প্রায় ৫০০ শত লোক জোট করিয়া দারগা সাহেবের বাড়ী, আর এই বাড়ী লুটিতে আসিতেছে। তাদের সঙ্গে একজন সাহেবও আছে। পিতার কানেও ঐ সকল কথা প্রবেশ করিয়াছে।

তিনি উপাসনা শেষ করিয়া জোড় করে প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ করিয়া খাড়া হইতেই, নাজেম আলী সাহেবের গলার আওয়াজ শুনিয়া পিতার নিকট বলিল—

হুজুর! ঐ আসিতেছে। সাহেব নৌকার সেই ধৃত আসামীদ্বয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে।

কি দার হাই!

হুজুর ঐ বড় বাড়ী।

পিতা বড়ই গোলযোগে পড়িলেন। অনেক লোকের কথার আওয়াজ শুনিতেছেন। রাত্র প্রায় দেড় প্রহর। কি করেন। বাটীর মধ্যে আমার জননী শয্যাধরা—পীড়ার আক্রমণে জরাজীর্ণ, আধমরা। উঠিবার শক্তি নাই। বাহির ঘরের দ্বার সকল শীঘ্র শীঘ্র বন্ধ করিয়া পিতা আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া এক ফুৎকারে প্রদীপ নির্বাণ করিয়া সদর দেউড়ি ঘরে যাইয়া সদর দ্বার আটকাইয়া, আমাকে বাটীর মধ্যের আঙ্গিনায় রাখিয়া দেউড়ির দ্বারে আসিয়া খাড়া হইলেন। তৎসঙ্গে আমিনদ্দীন মিঁয়া নামে আমার সম্পর্কে মামা হইতেন তিনিও দেউড়ি ঘরে পিতার নিকট আসিলেন। এদিকে সাহেব লোকজন লইয়া আমাদের বাটীর উপরেই আসিতে লাগিল। জনকোলাহলে বোধ হইতেছে খোট্টা মাড়ুয়াবাদীয়া বিস্তর লোক। আমাদের বাহির বাটীর আঙ্গিনায় আসিয়া ধুমধামে জোরে জোরে খাড়া হইল। সাহেব তম্বি করিতে লাগিল, বলিল যে, এই মাত্র প্রদীপ

দেখিয়াছি। এখন কিছু নাই। কারো সাড়া শব্দ নাই। একি! খুব ডাক হাঁকা কর। মেড়ুয়াবাদী খোট্টার দল জোর জার করিতে লাগিল। বাটীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা মহা অস্থির। জননী একেবারে শয্যাধরা হইয়াছিলেন সকলে ধরাধরি করিয়া অন্য বাড়ীতে লইয়া যাইবেন স্থির হইল। জোর জবরাৎে ডাকাত দল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিনিসপত্র টাকা পয়সা যা থাকে লউব ক্ষতি নাই। এই রোগে জ্বরা আধমরা কি বাঁচিবে? পায়ের পাড়াতেই মার যাইবে। জাত যাইবে। এই সকল ভাবিয়া প্রাচীনেরা স্থির করিয়াছেন ধরাধরি করিয়া ফজলু মিঁয়ার বাড়ীতে লইয়া যাই। জাত কুল মান বাঁচিবে আর ইঁহার প্রাণ বাঁচিবে। ফজলু মিঁয়ার বাড়ী আমাদের বাড়ীর নিকটে—পশ্চিমে একদিকে গোলাম আলী দারগার বাড়ী, অন্যদিকে দারগা ফজলুল্লার বাড়ী।

আমি পিতার নিকট দাঁড়াইয়া আছি। মায়ের অবস্থা—এই জ্বরাজীর্ণ শরীরের উপর টানা হেঁচড়ায় আরো অস্থির হইবেন। খোট্টা মাড়ুয়াবাদীর দল বাটীর মধ্যে ঢুকিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিবে, ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতেছে। মায়ের চক্ষে জল আর তাঁহার মনঃকষ্টের পরিমাণ মুখে প্রকাশ দেখিয়া আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। পিতা আমার মুখের দিবে একবার দৃষ্টি করিয়াই বাটীর মধ্যে সোরগোল কান্নাকাটির কারণ আর শয্যাধর রোগী লইয়া অন্য অন্য পরিবারেরা কি কষ্টের মধ্যে পড়িয়াছে ভাবিয়া আমার মাতা কি অবস্থায় আছেন কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করায় আমি চক্ষের জল চক্ষে রাখিতে পারিলাম না। একটু বলিতেই পিতা আমিনদ্দীন মিয়াঁকে বলিলেন, তুমি সাহেবের নিকট উপস্থিত হও। আর একটু পরেই উহারা কপাট ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবে। জাত কুল মান সম্ভ্রম থাকিবে না। তাহার পর ভাব দেখি! তোমায় বড় ভগিনীর অবস্থা ভাব দেখি? সে কি আর বাঁচিবে। মানুষের পাড়ায় তাহার অপঘাত মৃত্যু হইবে। তুমি হাজির হইয়া ধনপ্রাণ মান বাঁচাও।

এ দিকে সাহেব হুকুম দিতেছেন, এইবার ডাকিলে যদি কেহ হাজির না হয় ঐ বড় কপাট ভাঙ্গিয়া ফেল।

পিতা আমিনদ্দীন মিয়াঁর হাত ধরিয়া অনেক আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ জন্মাইয়া দেউড়ির দ্বার অল্প মাত্র খুলিয়া, বাহির করিয়া দিয়াই পুনঃ দ্বার বন্ধ করিলেন। আমিনদ্দীন মিয়াঁ বাহির হইতেই ১০।১২ জন খোট্টা ধাইয়া আসিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিতে উদ্যত হইলেই, সাহেব বিশেষ ধমক দিয়া নিষেধ

করিলেন। সাহেব আমিনদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এ বাড়ী কি তোমার? তিনি বলিলেন আমার ভগ্নীর বাড়ী। পুনরায় সাহেব বলিলেন দারগার বাড়ী কি এই বাড়ী?

এই বাড়ীরই ঐ পূর্ব অংশ তাঁহার বাড়ী।

দারগা সাহেবের সঙ্গে এখন দেখা হইতে পারে?

না—এখন দেখা হইবে না।

কাল খুব সকালে হইতে পারে?

হাঁ—তা পারে।

সাহেব বলিলেন—তোমার কোন ভয় নেই। আমি উপস্থিত থাকিতে, তোমার ভয় নাই! তুমি স্থির হইয়া বল চৌকিদারের বাড়ী এখান হইতে কত দূর? সে কোথায় থাকে?

হুজুর! সে এ পাড়ায় থাকে না। ঐ দক্ষিণের পাড়ায় থাকে।

সাহেব বলিলেন—আচ্ছা তুমি আমাকে চৌকিদারের বাড়িটা দেখাইয়া দেও।

আসুন আমার সঙ্গে।

আমিনদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সাহেবের আদেশে কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই। [তিনি] সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। পথে অছিমদ্দীন মিয়াঁর সহিত দেখা হইতেই, অছিমদ্দীন সাহেব দেখিয়া ভয়ে দৌড় দিয়া পলাইতেই সাহেব হুকুম দিলেন পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো ভাগ্‌তা হায়। ভাগা হুয়া আদমী ভাগ্‌তা হায় পাকড়ো!

আর যাবে কোথা! দশ-পা দৌড়ের মধ্যে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর আর একটু যাইতেই কারিকরপাড়ার নিকট ফেলু কারিকর সোর হাঙ্গামা শুনিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া কি ঘটনা দেখিতে আসিয়া সাহেব রূপ দেখিয়াই, বাবাগো মাগো বলিয়া দৌড়িয়া পলাইতেই সাহেবের হুকুমেই সেও ধরা পড়িল। আমিনদ্দীন সাহেবের সহিত কথা কহিতে কহিতে যাইতেছেন। আর মনে মনে ভাবিতেছেন, এক পাড়ার তিন জন হইলাম চিন্তা কি? কোন দূর দেশে ধরিয়া লইয়া যায়—তিন জনই যাইব। মারিয়া ফেলে একা আমাকে মারিবে না।

আমিনদ্দীন জানিতে পারেন নাই। জানিবেনই বা কি প্রকারে? সাহেবের সঙ্গে পাড়ার লোক একজন দারগার নৌকার একজন হাতবান্ধা অবস্থায় আসিতেছে। গলির রাস্তা পার হইয়া মাঠের মধ্যে পড়িতেই সাহেব বলিলেন—

আর কত দূর? চৌকিদারের বাড়ী আর কত দূর?

আমিনদ্দীন বলিলেন—হুজুর, ঐ বাড়ী দেখা যাইতেছে। কিন্তু পথ-ভাল নয় মাঠের পথ জল কাদা পোরা। এখান হইতে চৌকিদারের নাম ধরিয়া ডাকিলে বোঝা যাইবে; সে বাড়ী আছে কি না! বাড়ী থাকিলে অবশ্যই ডাকে উত্তর দিবে। চৌকিদারের নাম মাঙ্গন চৌকিদার।

সাহেবের আদেশে তাঁহার চাকরেরা মাঙ্গন চৌকিদার—চৌকিদার বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। কোন উত্তর পাইল না।

সাহেব বলিলেন—

চৌকিদার বাটীতে নাই।

আমিনদ্দীন বলিলেন—

বোধ হয় অন্য কোন স্থানে গিয়া থাকিবে।

সাহেব বলিলেন—

আচ্ছা! চল আমার সঙ্গে নৌকায় চল। পরে যাহা হয় করিব। সকলেই ফিরিল। যে পথ দিয়া আসিয়াছিল—সেই পথেই চলিল। আমাদের বাড়ীর নিকটে আসিলে আবার আমরা ভয়ে অস্থির হইলাম। মাতাকে আর অন্য বাড়ীতে লইয়া যাইতে হয় নাই। বাড়ীতেই রাখা হইয়াছিল। মাতামহী এবং অন্যান্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের বিবেচনায় ধিক্কার দিয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন। এখন উপায় কি? আবার এখন কি করিয়া বাড়ীর বাহির করি।

আমাদের বাড়ীর নিকট হইয়া যাইতেই আমিনদ্দীন সাহেবের অনুমতি লইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেলেন যে, আমরা নদীর ঘাটে সাহেবের সঙ্গে চলিলাম আপনারা ২।৩ জন লোক পাঠাইয়া দেন। পূজনীয় পিতা একটু স্থির হইয়া পাড়ার প্রধান প্রধান কয়েকজন ভদ্রলোককে নদীতীরে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা যাইয়া দেখেন যে আমিনদ্দীন সাহেবের মুন্সীর নৌকায়, আর আর সকলে জমাদারের নৌকায় বসিয়া আছেন, কথাবার্তা কহিতেছেন। সাহেবের নিকট ইহাদের আগমন সংবাদ গেলে সাহেব নৌকা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; ভদ্রলোক দুইজন সেলাম বাজাইয়া বলিলেন—

হুজুর! আমাদের কর্তা আপনাকে সেলাম জানাইয়াছেন। রাত্র প্রভাত হইলেই দারগা সাহেবকে লইয়া মীর সাহেব, যিনি এই গ্রামের জমিদার তিনি হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

সাহেব—আচ্ছা আচ্ছা ভাল কথা। এ সকল লোকজন, আর ঐ বড় বাড়ীর মালিকের ভাই যে আমার মুন্সীর নৌকায় আছে তাহাদের কি হইবে?

হুজুর তাহাদের কোন অপরাধ নাই।

অপরাধের কথা আমি বলিতেছি না। আপনারা তাহাদিগকে লইয়া যান। কিন্তু প্রাতে সকলকেই লইয়া আসিবেন। না আনিলে ভাল হইবে না।

সকলেই সাহেবকে সেলাম বাজাইয়া বাটীতে চলিয়া আসিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে আমার পিতা, দারগা সাহেব অন্যান্য ভদ্রলোক, রাত্রির ঘটনার ধৃত আসামীরা সকলেই সাহেবের নৌকায় উপস্থিত। সাহেব ভদ্রতার সহিত ইহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। অনেক কথাবার্তার পর শেষে গত রাত্রির ঘটনা আপসে মিটমাট হইয়া গেল। দারোগা সাহেব বলিলেন, আমার নৌকায় পাঁচজন মাঝিই ঐ নৌকায় আছে। উহাদের কার্যে হুজুর যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

সাহেব বলিলেন—

আমার লোকেও যে কিছু অত্যাচার না করিয়াছে তাহাও নহে। আপনিও কিছু মনে করিবেন না। এইরূপ কথাবার্তা হইয়া মিটমাট হইয়া গেল।

সাহেবের জন্য দুধ, কলা, কতকগুলি আতা, আর আমাদের বাগানের বড় বড় গোলাপ ফুল সাহেবের নজরানা দেওয়া হইল। সাহেব ফুল পাইয়া বড়ই খুশী হইলেন। ইহারাও বিদায় হইলেন। সাহেবের নৌকাও ছাড়িয়া দিল।

আমার বাল্যজীবনের কথাও এই পর্যন্ত ইতি হইল।

এখন আর আমি বালক নহি যুবক। জীবনের ভাল মন্দ—দুনিয়ার হালচাল যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারি। বিদ্যাশিক্ষা এইখানেই যেন ইতি বোধ হইতেছে। কারণ দূর দেশে না গেলে আর দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই। কুমারখালীতে ইংরেজী স্কুল হইয়াছে। বাটী হইতে ছয় মাইল ব্যবধান। তাহার পর ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই, আর মরিবার সময় গিডীমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। সরাব খায়। জাবহাঝটকার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক না-পাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানাভাবে ছাঁটে সাহেবি পোশাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদাব তমিজের ধার ধারে না। স্বভাবও যেন একটু উদ্ধত ভাব ধারণ করে। নম্রতার নামগন্ধ থাকে না। এই

প্রকার শত শত দোষ দেখাইয়া মাতামহীর নিকট ইংরেজী পড়ার দোষ কীর্তন করিতে থাকেন। কিন্তু পূজনীয় পিতার নিকট ওসকল কথা বলিতে কেহই সাহসী হন না। তিনি উপযুক্ত স্থান পাইতেছেন না বলিয়া পড়ার কোন যোগাড় করিতে পারিতেছেন না। বিদেশে পাঠাইতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। রাজসাহী ঢাকা নিতান্তপক্ষে পাবনায় রাখিয়া ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষা দেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কাহারো বাসায় রাখিয়া অন্যের গলগ্রহ করিয়া দিতেও পারেন না। রীতিমত বাসা করিয়া চাকর সঙ্গে দিয়া রাখিতেও সাহসে কুলায় না। একা একা বাসায় রাখিতেও ইচ্ছা করেন না। একজন অভিভাবক সঙ্গে রাখাই তাঁহার ইচ্ছা। এই সকল চিন্তাতেই প্রায় বৎসর কাল কাটিয়া গেল। মাতামহীর ধারণা ছেলে খৃষ্টান হইয়া মেম বিয়ে করিবে। মরিবার সময় ইংরেজী কথা বলিয়া মরিবে। খোদা রসুলের নাম করিবে না। মোসলমান ধর্ম প্রতি বিশ্বাস থাকিবে না। এই কথা ভাবিয়াই তিনি অনেক সময় কান্দিতে থাকেন।

এই সময় আমার কার্য বাঙ্গলা চিঠিপত্র আর বাঙ্গলার হেঁয়ালী লিখা। আমার প্রথম হেঁয়ালী যথা—

কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা।
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে
বেছে বেছে খা।

এই প্রকার বিস্তর হেঁয়ালী লিখিয়াছিলাম। যে সকল হেঁয়ালী সমুদায় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ফারসী বিদ্যা গ্রাম্য মুন্সীজি যেটুক জানিতেন সেইটুকু শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন বেশী দূর গেলেই মানে বুঝাতেই মহা গোল বাধিয়া উঠে। হয়ত অনেক শব্দের মানেই তাঁহার মনে নাই। এখন যেমন দেখি বাঙ্গলার অভিধান আছে। ইংরেজীর ডিক্‌সনারী আছে। যে কথার মানে বোঝা না যায়, কি বিদ্যায় না কুলায়, অভিধান গুরুর আশ্রয় লইলেই অর্থবোধ জন্মে। সে সময় আমাদের মুন্সী সাহেবদিগের নিকট ফারসীর অভিধান ছিল না। তাঁহারা মুখে ফারসী অভিধানের নাম করিতেন লোগাত ত,—কিন্তু সে কেতাব আমাদের দেশে কাহারও ঘরেই ছিল না। সুতরাং ফারসী বিদ্যার অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি পত্ত মুখস্থ আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া মুন্সীজিকে সঙ্গে করিয়া আমরা ৫।৬ জন শিশু

অন্য কোন আত্মীয় বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম। পূর্বেই খবরাখবর হইত। অমুক বাড়ীতে আজ অমুক মুন্সীজির ছাত্রগণের সহিত বয়েত বাহাস হইবে।

"বয়েত বাহাস" যে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কারণ তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও বুঝিতে পারি না। পাঠকগণকে কি করিয়া বুঝাই, বিশেষ করে হিন্দু পাঠকগণকে বয়েত বাহাস জিনিসটা কি তাহা বুঝান আমার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইতেছে।

পাঠকগণ শুনুন। বয়েত অর্থ পদ্য পদ। বাহাস অর্থ প্রতিযোগিতা। ঠিক হইল না। বুঝাইতে বুঝি পারিলাম না। আবার শুনুন। ফারসি ভাষায় অনেক পদ্য আছে। যে কেতাবেরই হউক পদ্য হইলেই হইল। এমন কণ্ঠস্থ চাই যে এক পক্ষ মুখে যেই পদ্য পদটি সুরের সহিত প্রকাশ হইয়া শেষ হইল অমনি অন্য পক্ষ তাহার পাল্টা আর একটি পদ্য পদ মুখস্থ সুরের সহিত আওড়াইবে।

বাঙ্গলায় যেরূপ কবির লড়াই হয় তাহা নহে। ছড়া কাটান হয় তাহাও নহে। উত্তর-চাপান গাওয়া হয় তাহাও নহে। গানেও উত্তর প্রত্যুত্তর করা হয় তাহাও নহে। প্রশ্ন উত্তর করা হয়, তাহাও নহে। সওয়াল জবাব করা হয়, তাহাও নহে। যে পদ্য পদ সুরের সহিত বলা হয় তাহার অর্থ কেহই বোঝেন না। কোন পক্ষই তাহার অর্থের প্রয়াসী নহেন। অর্থের সহিত কোন সংশ্রব নাই। তবে বাহাস কি? উত্তর চাপানই বা কি? হারজিতই বা কি? আছে। প্রথম পক্ষ আর দ্বিতীয় পক্ষ। ধরুন—মুন্সী জমিরদ্দীর ছাত্রগণ প্রথম দল। মুন্সী কসিমদ্দীনের ছাত্রগণ দ্বিতীয় দল।

এই দুই দলের ছাত্রদিগের সহিত বয়েত বাহাস হইবে। স্থান নির্ধারিত হইয়াছে। সেই স্থানে অথবা মুন্সী জমিরউদ্দীন সাহেব আপন ছাত্রগণকে সঙ্গে করিয়া, মুন্সী কসিমদ্দীন যে বাড়ীতে থাকেন, যত ছাত্র তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পাড়ার অন্য অন্য ভদ্রলোকও দর্শক শ্রেণীতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুই পক্ষ দুই দিকে মুখোমুখি হইয়া বসিলেন। প্রথমপক্ষে একটি পদ্য দুই পদের বাঙ্গলায় যাহাকে পয়ার ছন্দ কহে, সেইরূপ একটি পদ্য সুরের সহিত আওড়াইলেন। শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় দলের প্রধান ছাত্র মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করিয়া অমনি পিট পিট উত্তর করিল। কি উত্তর করিল? অর্থ ও ভাবের সহিত সংযোগে উত্তর নহে। প্রশ্নের উত্তর নহে। অর্থের সহিত কাহার কোন কথা নহে। তবে আবার উত্তর কি? শুনুন!

উত্তর কি? প্রথম পক্ষ যে পদ্যটি মুখস্থ আওড়াইল ঐ পদ্যের শেষ শব্দের শেষ অক্ষর যে অক্ষর আছে। সেই অক্ষরে প্রথম অক্ষর সংযুক্ত যে শব্দ হয়, সেইশব্দ সংযুক্ত পদ্য মুখস্থ আওড়াইতে হইবে। আবার সেইরূপ দ্বিতীয় দলের উত্তর পদ্যের শেষ অক্ষর যে অক্ষর থাকিবে প্রথম দলকে সেই অক্ষরের প্রথম শব্দ সংযুক্ত পদ্য আওড়াইতে হইবে। এইরূপ অর্থশূন্য উত্তর চাপান, অর্থাৎ শেষ অক্ষরের নির্দিষ্ট শব্দের পদ্যের উত্তর চাপানে যে পক্ষ আর পদ্য না বলিতে পারিবে, সে পক্ষের হার হইবে। এমন কি বিলম্ব হইলেও এক প্রকার অর্ধ হারের মধ্যে গণ্য। আমার এরূপ বলাতেও হয়ত অনেক পাঠক আমাদের সে কালের বয়েত বাহাস বুঝিতে পারেন নাই। দেখি বাঙ্গলা ভাষার বয়েত বাহাস হয় কিনা? ফারসী বয়েত বাহাস অর্থের সহিত কোন সংশ্রব নাই। আর তাহাদের এমন শক্তিও নাই যে পদ্য পদ রচনা করিয়া তখনি মুখস্থ শুনাইয়া দেন। বয়েত বাহাসের নিয়ম রক্ষার সহিত পদ্য রচনা করিয়া মুখস্থ পাঠ করেন। সে শক্তি মুন্সীজির নাই, তার ছাত্রের থাকিবে কি প্রকারে? পনৃ নামা পুস্তকের এক বয়েত (পদ্য পদ) একদল বলিলেন। সে পদ্যের শেষ অক্ষর ফারসীর "তে" অক্ষর আছে। অন্য পক্ষ জেলেখা পুস্তকের এক বয়েত যাহার প্রথম অক্ষর 'তে' —আছে তাহাই মুখস্থ আওড়াইলেন। আবার সেই আওড়ান পদ্যের শেষ অক্ষর "রে" অক্ষর হইল অন্যপক্ষ সেকেন্দার নামার এক পদ্য যাহার প্রথম অক্ষরে "রে" আছে তাহাই সে পক্ষ বলিলেন। নিজের লিখা পদ্য ত নহেই। অর্থের সহিতও কোনরূপ সম্পর্ক কাহারও নাই। কেবল অক্ষরের মারপেঁচই হারজিত। পদ্যের শেষ অক্ষর যে পক্ষের ঘাড়ে চাপিল, সেই অক্ষরের অক্ষর সংযুক্ত প্রথম শব্দের পদ্য মুখস্থ আওড়াইতে না পারিলেই হার হইল। লজ্জার এক শেষ। গ্রাম জুড়িয়া কথা রটিয়া গেল যে জমিরুদ্দীন মুন্সীর ছাত্র, কসিমদ্দিন মুন্সীর ছাত্রের নিকট হারিয়াছে। এখন দেখি বাঙ্গলা ভাষার বয়েত বাহাস হয় কিনা? তাহাতে বুঝাইতে পারি কিনা? অর্থের সহিত ত কোন সংশ্রবই থাকিবে না। কেবল পদ্য আওড়ান মাত্র। দেখি পারি কিনা? আচ্ছা একপক্ষে পাঠক, অন্যপক্ষে লেখক।

১ পক্ষ লিখক।—২য় পক্ষ পাঠক

লি—সালামালেকম্‌, ভাই হাজার সেলাম
তোমাদের ওস্তাদের বল কিবা নাম॥*

* এই পদ্যের শেষ অক্ষর 'ম' হইল। কাজেই ২য় পক্ষ পাঠককে "ম" অক্ষর প্রথম থাকা শব্দ পদ্য আওড়াইতে হইল। যথা—পাঠক পক্ষ বলিতেছেন—মনিরুদ্দী।

পা—মনিরদ্দী মুন্সীজিকে সকলেই চেনে।
বিদ্যার পাহাড় তিনি সর্বদেশে জানে।
লি—নরুদ্দির সুফিজীর দাড়ি সব পাকা।
মেদি দিয়ে লাল করে লোকে দেয় ধোকা।
পা—কামারের মার ফেলে পাঠার ফেলে পা,
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে বেছে বেছে খা।
লি—খামার আমার নয় মামার মামির
ডাঙ্গায় জামির ফেলে পানিতে কুমীর।
পা—রসারসী দড়াদড়ী বঠে দাঁড় হাল্।
নড়েনা চলেছে নৌকা উড়াইয়ে পাল॥
লি—নঙ্গর ফেলিল মাঝি—

লর স্থানে ন হইল দেখিয়া লিখক একটু সামলাইতেই পাঠকদল হো হো করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া—"সাখ্‌তা" "সাখ্‌তা" (ভেস্তা ভেস্তা) ভুল ভুল—নামাঞ্জুর ওটা আর পড়িতে পারিবে না বলিয়া উঠিল। কি করেন লিখক—ঠকিয়াছেন, পুনঃ বলিলেন—

লি—লাঠি বঁঠি দাও খুন্তি খুরপই কাঁচি।
চাচা হল নিজ রক্ত পর হল চাচি॥
পা—চলিতে চলিতে ভেড়া ফিরাইল ঘাড় ;
পাল ছেড়ে দিল দৌড় দেখে কাল ষাঁড়।

লিখকের মাথা ঘুরিয়া গেল। ড় অক্ষর প্রথমে কোন পদ্য পদ তাঁর জানা নাই ; ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিতেই পাঠক দল হাতে তালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন—

মাৎ করেছি 'ড়'র বয়েতে
জিত্‌ আমাদের ভাই।
হাজার খোঁজ হাজার ভাব
'ড়'য়ের বয়েত নাই॥

এই প্রকারে বয়েত বাহাস হইত। আবার দেখি অনেকেই বাঙ্গলা পুঁথি পড়ে। আমার মনে হইল দেখি আমি পুঁথি পড়িতে পারি কিনা? পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ। মাতামহীর হুকুমে কেয়ামত নামা হাজার মসলার পুঁথি পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতাম। আমার গলার আওয়াজ মিষ্ট ছিল।

সুর করিয়া পুঁথি পড়িতে বসিলে পাড়ার মেয়ে ছেলেরা চারদিক ঘিরিয়া বসিত, জৈগুণের পুঁথি শোনাভান স্বামর্থভান, শেষে আমির হামজার পুঁথি পর্যন্ত পড়িলাম। আমার মুরব্বী সম্বন্ধে স্ত্রীলোকেরা পাড়ায় ডাকিয়া লইয়া আমার পুঁথি পড়া শুনিতেন। পুঁথি পড়ার এতদূর অভ্যাস হইল, যে কোন পুঁথি—আর আটকায় না। সকল পুঁথিই যেন আমার পড়া। পুঁথির মানে বুঝিতেও তত কষ্ট হয় না। তবে অনেক কথার অর্থ বুঝিতাম না। অনর্গল পড়িয়া যাইতাম। কেহ আমার নিকট অর্থ করিয়া বুঝিতে চাহিত না। আমিও বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতাম না। কিছুদিন এই প্রকারেই সময় নষ্ট হইল।

এই স্থানে পাঠকগণের নিকট কয়েকটি কথা বলিব। যদিও সে সময় সে সকল কথা কার্যের ব্যবহারের দোষ,—আমার চক্ষে পড়ে নাই। এখন দেখিতেছি, সে সমুদায় কার্য যুবকগণের পক্ষে নিতান্তই অন্যায় ও ভবিষ্যতে মনঃকষ্ট ও দুঃখের কারণ। যাহাদের অনেক দাসদাসী অর্থাৎ গোলাম বান্দী আছে, সে বাড়ীর যুবক ও বালকগণকে পৃথক রাখা কর্তব্য। সর্বদা কোন কার্যে লিপ্ত রাখাও দরকার। কথাবার্তা আমোদ আহ্লাদ করিতে দিলেও নীচ লোক অথবা গোলাম বান্দীর সহিত কথাবার্তা উঠাবসা করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। মানুষ কোন না কোন প্রকারের কার্যে লিপ্ত থাকিতে চায়। লেখাপড়া, গান, বাজনা, গল্প, খেলা। না হয় গোলাম বান্দীর সহিত হাসি রহস্য রঙ্গতামাসা করা ভিন্ন সময় অতিবাহিত করিবার আর কি উপায় আছে? যাহাদের খাওয়াপরার চিন্তা করিতে হয় না, যৌবন কালের প্রারম্ভে, কাহারও তাঁবেদারী করিয়া, কিছুই উপার্জন করিয়া দিন গুজরানের উপায় করিতে হয় না, তাহারাই আমার মত সময় নষ্ট করে। গোলাম বান্দীর দলে মিশিয়া তাহাদের হাবভাব স্বভাবের অনেক অনুকরণ করিয়া মনে মনে সুখী হয়। দাসী বান্দীর কল্যাণেই স্বভাব চরিত্র কুপথে চালিত হইতে থাকে। সকল কার্যেই তাহাদের সাহায্য লইতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকালে শয়ন পর্যন্ত সকল কার্যেই তাহারা এক প্রকার সঙ্গের সঙ্গী। প্রাতে মুখ ধোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান আহার শয়ন, তাহার পরেও হাত পা টেপা। বাতাস দেওয়া। সকল কার্যেই সখিরূপে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। কথা কহিতেছে, হাসিতেছে, সময় সময় চক্ষুও ঠারিতেছে। কেহ বাধা দেয় না। কেহ মন্দও বলে না। ছেলের কাজকর্ম করিতেই তাহারা আছে। তাহাতে আর বাধাবিঘ্ন কি? যুবতী দাসী ছেলের পা দাবিতেছে, পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে ইহাতে আর দোষ কি? বরং ঐ সকল কার্য না করিলে বাড়ীর

কর্তা কর্ত্রীর গালাগালি শুনিতে হয়। কোন কোন সময় বিশেষরূপে শাস্তিও পায়। যাহাদের বাড়ীতে দাসী বান্দীর অভাব নাই সে বাড়ীর যুবক ছেলেরা নিশ্চয়ই তাহাদের হস্তে নানারূপ কথা কার্য শিক্ষা করে। অমন সুযোগ ত আর অন্য কোন স্থানে ঘটে না। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সত্য কথা বলিব। দাসী বান্দী কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্ক রেখায় কলঙ্কিত হয়। তাহাতেই সাবধান করিতেছি। সুখ স্বচ্ছন্দে যে সকল যুবকছেলেরা আপন বাটীতেই নিষ্কর্মা হইয়া বাস করে—কোনরূপ বিদ্যার চর্চা শিক্ষার চর্চা উন্নতির চর্চা ধর্মের চর্চা না করে—বালকদিগের চরিত্র গঠনের দিকে যে সকল অভিভাবকগণের আদৌ দৃষ্টি না থাকে, খেয়াল না করেন, সে সকল বাড়ীর যুবকদিগকে সর্বদা অন্দরমহলে বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। তবে একেবারে আঁটনী বাঁধনী করিয়া বন্দীর মত কয়েদখানায় রাখিলে আবার অন্য অন্য কদর্য কু-অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া একেবারে মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসিতে পারে। সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া যুবকগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। এখন দেখিতেছি বর্তমান অবস্থায় বর্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিতে পাইতেছি, দাসী বান্দী থাকা বড়লোকের ছেলেরা জীবন-মৃত্যু সাংঘাতিক কু-অভ্যাসের দাস হয় না। যাহাদের বাড়ীতে দাসী বান্দী নাই—অর্থের অনাটন, খাওয়া-পরার কষ্ট,—সেই সকল বাড়ীর ছেলেরাই শতকরা প্রায় ত্রিশজন কু-অভ্যাসে মাতিয়াছে। জীবনে মরিয়া রহিয়াছে, কেহ পাগল হইয়াছে, কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে। সংসার সত্যই বড় কঠিন স্থান। মানব জাতিও বেহায়ার একশেষ। এক দ্বার বন্ধ করিলে, পঞ্চদ্বার খুলিয়া পঞ্চদশ প্রকারের পথ খুঁজিয়া বাহির করে। বেশি দিন নয় যৌবনের প্রারম্ভ হইতে নিতান্ত পক্ষে ৭।৮ বৎসর কাটাইতে পারিলেই, নিরক্ষর মোস্‌লেম ধনী সন্তানগণ সুপথে থাকিতে পারে। অনুপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়াও কর্তব্য নহে। তাহাও দেখিলাম। সে ছেলে আর ছেলের মধ্যে থাকে না। গায়ে পড়া মাছি তাড়াইতে কষ্টবোধ করে।

যাক এখন নিজের কান্নাই কান্দিয়া শুনাই। যে গরু একবার বিষ্ঠার সাধ পায়, তাহার পক্ষে বিষ্ঠাই পরম উপাদেয় খাদ্য। ক্রমে পূজনীয় পিতার মনেও যেন কিছু সন্দেহ বসিল। নিষ্কর্মা হইয়া দাসী বান্দীর মধ্যে থাকা ভাল নয় ভাবিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভাল ভাল স্থানে সাহেবদিগের কুঠিতে দেশের বড় বড় লোকের মজলিসে যাওয়া-আসা আরম্ভ করিলেন। যেখানে যাইতেন আমাকে সঙ্গে করিয়া যাইতেন। পিতৃদেবের একবার পদমদী গমনের প্রয়োজন হইল, আমাকে সঙ্গে করিয়াই পদমদী চলিলেন।

যৌবন জোয়ারারম্ভ

প্রথম প্রবাস

জীবনে কখনও জন্মস্থান লাহিনী পাড়া গ্রাম ছাড়িয়া কোন স্থানে যাইয়া প্রবাস করি নাই। পিতার সঙ্গে পদমদী চলিলাম। পদমদী যাইতে নৌকা পথ ভিন্ন সুগম পথ আর নাই। পাল্‌কি এবং ঘোড়ায় যাওয়া যায় কিন্তু আমাদের পক্ষে অসুবিধা। পিতার সঙ্গে যাইতেছি। সকল প্রকার সাওয়ারি অপেক্ষা নৌকাই সুগম, সুখের ও আরাম। সে সময় লোকের তাড়াতাড়ি ভাবটা খুব কম ছিল। সুবিধা ও আরামের সঙ্গে যাওয়া আসা করাই যেন ভাল বোধ হইত। বিশেষ পূজনীয় পিতার স্বভাবসিদ্ধ চির অভ্যাস যে, একটু দূরের পথ যাইতে হইলেই নৌকায় শোয়া বসার সরঞ্জাম, বিছানা বালিশ ইত্যাদি তাহার পর মেটে উনন রাঁধিবার ছোট ছোট পাতিল, শিল-নোড়া হাতা-বেড়ি বাসন বর্ত্তন রেকাবী প্যালা বাটি এক সংসারের যাহা যাহা দরকার সকলি তাঁহার সঙ্গে যাইত। বাবরচি, খানসামা—নেগাহবান সঙ্গে করিয়া লইতেন। বর্ষাকাল, একেবারে পদমদীর বাটীর ঘাটে, (চন্দনানদীর ঘাট নহে) বাহির বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণী মধ্যে নৌকা যাইবে। শুনিয়াছি বর্ষাকালে পদমদীর দৃশ্য বড় চমৎকার। প্রায় লোকের বাড়ীর চতুর্দিকেই জল। এবাড়ী ওবাড়া নৌকা ব্যতীত হাঁটিয়া যাওয়ার সাধ্য নাই। বাড়ীতে আগুনের অভাব হইলে নৌকাযোগে অন্যবাড়ী যাইয়া আগুন আনিতে হয়। হয়ত কোন কোন সময় আগুনের জন্য এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইতে হয়।

পিতার সঙ্গে পদমদী চলিলাম। নৌকার উপরেই রান্না, নৌকাতেই আহার এবং শয়ন। জীবনে বাড়ী ছাড়িয়া কোন স্থানে যাই নাই। আমার চক্ষে সকলি নূতন। গৌরী নদীর উভয় পাড়ই জলে ডুবিয়া কোন স্থানে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কোন স্থানে মাঠ ভাসাইয়া জলস্রোত জোরে অন্যদিকে যাইতেছে। কোন স্থানে বাঁশের আগাসকল জলসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বাঁশের আগা হইতে কতকাংশ ডুবিয়া তরতর করিয়া কাঁপিতেছে। কোন স্থানে প্রাচীন প্রবীণ বট পাকুড়ের গাছের গোড়া ও গুড়ির কতকাংশ ডুবাইয়া জলস্রোত দুই ভাগে চলিয়াছে। কোন স্থানে গৃহস্থের ঘরের ধারী ভাঙ্গিয়া জলে পড়িতেছে। কাহারও কাহারও ঘরের মেজে পর্য্যন্ত ধুইয়া গিয়া ঘরের মধ্যস্থিত হাঁড়ি পাতিল

ভাসিয়া যাইতেছে। কৃষক শ্রেণীর বালকেরা বাড়ীর অঙ্গনের মধ্যে সাঁতার দিতেছে। ডুবিতেছে, কিছু দূরে গিয়া আবার উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে। কত বালক গলা জলের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছে।

কোন কোন স্থানে বাঁশের মাচার উপরে কৃষক রমণীরা রান্না করিতেছে। ধান শুকাইয়া চাউল করিবার উপায় নাই। শূন্যে গাছের ডালে ডালে চাটাই, মোটা কাপড় বাঁধিয়া রৌদ্রে ধান শুকাইতেছে। গরু বাছুর হাঁটু জলে, মাজা জলে দাঁড়াইয়া উর্ধ্বমুখী হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে গৌরী নদী ছাড়িয়া বামপার্শ্বে অন্য এক নদীতে মাঝিরা নৌকা ধরিল। সে নদী বেশী পরিসর নহে। অল্পক্ষণ সে নদী বহিয়া "চত্‌রা" অথবা "চিত্রা" নদীতে পড়িলাম। চত্‌রা বহিয়া কিছুদূর গেলেই চন্দন মৃগীর খালের মুখে নৌকা বাঁধিয়া সেই স্থানে রাত কাটান হইল।

চন্দন মৃগীতে নবাব মীর মহম্মদ আলী সাহেবের নিজের কুঠি আছে। সে সময় মীর মহম্মদ আলী 'নবাব' উপাধিপ্রাপ্ত হন নাই। লেখকের পাঠকের সুবিধার জন্য মীর মহম্মদ আলী নাম বার বার উচ্চারণ না করিয়া নবাব সাহেবই বলিব। যে সনে যে কারণে নবাব উপাধিপ্রাপ্ত হন আমার জীবনীমধ্যে ঘটনাচক্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেই সমুদায় বৃত্তান্ত পাঠকগণ জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। রাত্র প্রভাত হইলে নৌকা খুলিয়া পদমদীর দিকে চলিলাম। চন্দন মৃগী হইতে সোজা পূর্বদিকে পদমদী, নদী নালা ইহার মধ্যে কিছুই নাই। কেবল বিল বহিয়া যাইতে হইল, সমুদায় স্থান বিল—জলা। গুণ টানিয়া যাওয়ার পথ নাই। দাঁড় বাহিয়া যাওয়ারও সাধ্য নাই। কারণ পদমদী পর্যন্ত বিলান জমি, তাহার উপর জল টোপা পানা জলগুল্ম জললতা সেলা, দাম, পদ্ম এবং মৃণালক্ষেত্র। দাঁড় বাহিয়া যাওয়ার সাধ্য নাই। কোন স্থানে টোপা পানার ক্ষেত ঘোর সবুজ বর্ণের মাঠের মত দেখাইতেছে। কিন্তু তাহার নিম্নে ১০।১২ হাত, কোন স্থানে ৫।৬ হাত, কোন স্থানে দুই হাত জল। কাজেই লগী ঠেলিয়া নৌকা লইয়া যাইতে হইতেছে। ঘোর সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীর পূর্বদিকের পুষ্করিণী মধ্যে নৌকা লাগিল। রাত্রে আর কিছুই দেখিলাম না। নবাব বাড়ীর সঙ্গে আমাদের বাড়ী লাগা। নবাব সাহেবের পিতা মীর আলী আসরফ খাঁন বাহাদুর সাহেব জীবিত আছেন।

আমাদের বাটীতে স্ত্রীলোক মধ্যে আমার বৈমাত্র মাতামহী কয়েকজন দাসী চাকরাণী লইয়া বাস করেন। রাত্র প্রভাত হইল। প্রাতে নবাব বাটীর দালান কোঠা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। অমন দালান কোঠা কখনও দেখি নাই।

দোতালা দালান সেই প্রথম দেখিলাম। নবাব সাহেবকে দেখিলাম। হিন্দীতে কথা বলেন, সময় সময় বাঙ্গলা কথাও বলেন। কিন্তু সে বাঙ্গলা কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের কথা হইতে অনেক ভিন্ন। যেমন আমরা বলি—দেখ নাই, পদমদীর লোকে বলে "দেহ নাই" ঘোড়াকে বলে গোরা, ঘর স্থানে ঘড়, আবার খড় স্থানে খের, ভাই স্থানে "বাই" চক্ষে দেখ না "চহি দেহ না" ভাত "বাত" নারকল "নারেল" বেল "ব্যাল", তেল "ত্যাল"। এইরূপ, কাপর, মুরি—ছেরা—নানা কথার পরিবর্ত্তন ভাব দেখিলাম। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে ঐ দেশের কথাই অনেক অভ্যাস হইল। আমাদের গ্রামের কথাই ভাল, কি পদমদী অঞ্চলের কথাই ভাল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

নবাব সাহেব খুব ভালবাসিলেন, সময় সময় ডাকিয়া পাঠান। পূজনীয় পিতার সহিত নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করেন। যদিও সম্পর্কে লঘু গুরু ছিল তত্রাচ নবাব সাহেব প্রবীণ জমিদার বড়লোক, পূজনীয় পিতা মহাশয়ও সরল আমুদে স্বভাব। গান বাজনার মজলিস প্রায় হইত, কিন্তু সে মজলিসে আমার যাওয়ার অধিকার ছিল না। আমাদের বাড়ী বসিয়াই গানের আওয়াজ, বাজনার শব্দ শুনিতে পাইতাম। মন যেন থামে না, স্থির হয় না। গোপনে দালানের অন্য কক্ষে থাকিয়া চুপি চুপি গান বাজনা শুনিতাম। স্ত্রীলোকেরা নাচ করিত তাহা গোপনে গোপনে দেখিতাম।

মাতামহীর নিকট সময়ে সময়ে বলিতাম, নবাব সাহেবরা খুব বড় লোক বড় মানুষ, আমি যেদিন উহাদের বাটীতে খাইয়াছি, সেই সেই দিনই দেখিয়াছি পোলাও কোরমা ভাল ভাল জিনিস উহারা খান। দিনরাত আমোদ আহ্লাদে থাকেন, আমি অমন দোতালা দালান, ছবি, স্ত্রীলোকের উলঙ্গ ছবি, বড় ব গালিচা, বড় বড় আয়না, মানুষ সমান বড় আয়না কথনও দেখি নাই। আ কত রকম ছবি—ছোট ছোট আয়নার মধ্যে দেয়ালের গায়ে ঝুলান। ঝা দেওয়ালগীর, বৈঠকে ঝাড়ে বাতি জ্বলে, এইরূপ কত কথাই বলিতাম। বৈমাত্র মাতামহী কান পাতিয়া শুনিতেন। আমার আপন মাতামহী যে প্রকা আমাকে ভালবাসিতেন স্নেহ করিতেন, এ মাতামহীও ভালবাসিতেন স্নে করিতেন, কিন্তু মাতামহীর সে ভালবাসা, স্নেহ এক প্রকার এ অন্য প্রকার সে কি প্রকার তাহা আমি মনে মনে বুঝিতাম, মুখে বলিবার সাধ্য তখনও ছি না। এখন যে বৃদ্ধ হইয়াছি এখনও নাই, তবে একটু একটু মনে পড়ে হয় আমারই মনের দোষ, কি বুঝিবার ভুল। কি বোধশক্তির ত্রুটি। তিনি মনে

সহিত ভালবাসিতেন, আমার মন সম্পূর্ণরূপে মজিত না, ভালবাসিতেও ইচ্ছা করিত না। আমার মন যেন ঐ ভালবাসা মধ্যে কি চাহিত তাহা পাইত না। আমার মাতামহীর বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িতাম, কতই সুখ কতই আরাম বোধ হইত। কোন সময় যে চক্ষে ঘুম আসিত তাহা জানিতে পারিতাম না। এ মাতামহীর শয়ন-শয্যা ভিন্ন, আমি ঐ শয্যার নিকটই ভিন্ন শয্যায় শুইতাম, যাহা হউক এ মাতামহী ভালই বাসিতেন। একদিন কথায় কথায় বলিলেন, আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, দেখ!—তুমি খাঁ বাহাদুরের বাড়ীঘর ধন-দৌলত দেখিয়া দেখিয়া, আশ্চর্যান্বিত হইয়াছ? দেখ ভাই! খোদাতালা সকলি করিতে পারেন। তিনি কাঙ্গালকে বড়লোক করেন বড়লোককে কাঙ্গাল করেন। আমার চক্ষের উপরেই কত দেখিলাম, তোদের সম্মুখে আমি মরিব—কিন্তু কথাগুলি আমার পেটেই মজিয়া যাইবে। হইতে পারে তোর বাপ্ কোন দিন বলিতেও পারে, নাও পারে। আর সে আমার অনেক ছোট, আমি তাহাদের সকলের বড়। আমি যে তাঁহার শুধু শাশুড়ী তাহা নহি, আর একটি সম্পর্ক খুব নিকট-সম্পর্ক আছে তা তোরা কেউ জানিস না। শুনিস নাই তার জানবে কি? আমি মীর গেরানীর মেয়ে, মীর গেরানী আর মীর খয়রাতী, যাকে তুমি মীর এবরাহিম হোসেন বল। যার জুতার দৌলতে জমিদার কবলাও—যে তোমার "দাদা" (পিতামহ) সেই মীর খয়রাতী আর মীর গেরানী ইহারা দুই ভাই। আমি তোদের পর নহি, আমি সকলি জানি। আর এই পদমদীর বাড়ীই আমাদের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ী। আমি অনেক কথা জানি। ঐ যে অত বড় দোতালা দালান দেখিতেছ—(দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ঊর্ধ্বে তুলিয়া দোতালা দর্শান) ও দালান চিরকাল ছিল না। অতবড় পুষ্করিণী দেখিতেছ,—উহাও পূর্বে ছিল না। এমনকি তোমার দাদার সময়েও ছিল না। তোমার দাদার সময়ে তোমরাই এস্থানে প্রধান, বড়লোক ছিলে। সে সময় দালান কোঠা এদেশে কেহ চক্ষেও দেখে নাই। এই তালুক তোমাদের যাহা ছিল—উহাদেরও তাহাই ছিল। তোমাদের শিষ্য সেবক অনেক ছিল, উহাদের কম শিষ্য সেবক ছিল, বাড়ী ঘরদোর তোমাদেরই বড় ছিল। উহাদের বাড়ী অতি ছোট, বাড়ীতে ছোট ছোট ঘর ছিল, বাড়ীতে জায়গাও বেশী ছিল না। দেশের লোক তোমার পূর্বপুরুষকে যে ভক্তির চক্ষে দেখিত, মান্য করিত পীর বলিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইত, উহাদেরও সেইরূপ ছিল। একই বংশ একই রক্তের রক্ত, ভিন্ন জ্ঞান হইবে কেন? তবে সাংসারিক অবস্থা

তোমাদেরই স্বচ্ছল ছিল, বসত বাড়ীর জায়গা জমি তোমাদের বেশী ছিল। উহাদের বাড়ীতে জায়গা জমি বেশী ছিল না। ক্রমে অবস্থা ভাল হইতে লাগিল, বাড়ীও বড় হইতে লাগিল। উহাদের বাড়ীর দক্ষিণের অংশ যে স্থানে গোল দালান ঐ দালানের অর্ধেক উহাদের বাড়ীর সামিল জঙ্গল ছিল। যেমন তোমাদের বাড়ীর দক্ষিণে বেত বন, কাঁটা বন ঐরূপ, এখনও রহিয়াছে এইরূপ উহাদেরও ছিল। খোদা যখন বাড়াইতে থাকেন তখন চারিদিক হইতে বাড়াইয়া তোলেন, প্রথম বাড়ী-ঘরের প্রতিই নজর পড়িল। তোমাদের বাড়ীর দিকে আর নজর করিতে সাহসী হইলেন না। গরীব সাবের মোল্লা তাহারই বাড়ীর জমির দিকে ঘেঁষিতে লাগিলেন। ঘেঁষিতে ঘেঁষিতে, সাবের মোল্লা আর বাটীতে টিকিতে পারিল না। সে বাটী ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে অনেক দূর সরিয়া গেল। দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃই বাড়ীর সীমানা বাড়াইতে লাগিলেন। উত্তর দিকে তোমার বাপ্-দাদার শক্তি সামর্থ্যে অদৃষ্টের বলে কলেজার জোরে, বাহুবল ও শক্তিতে উত্তরে আর বাড়াইতে পারিলেন না। ঘেঁষিয়াই রহিলেন। উন্নতির কারণ হইল চাকুরী। খাঁ বাহাদুরের বাপ আলী আহম্মদ সাহেব দারগাগিরি চাকুরী লইলেন। তোমাদের বংশে কেহ কখনও চাকুরী করে নাই। মীর আলী আহম্মদ সাহেবই প্রথম চাকুরী আরম্ভ করিয়া বাড়িতে বাড়িতে বহু থানার দারগা, দারগার উপরে বড় দারগা হইলেন। লোকে বলিত এখনও প্রবাদ আছে, যে তিনি বাইশ থানার দারগা ছিলেন। পুত্র মীর আলী আসরফকে ভালমতে লেখাপড়া শিখাইলেন। আর জমিদারী বাড়ী-ঘর দালান কোঠা প্রস্তুত করিলেন। মীর আলী আহম্মদ বিস্তর টাকা উপার্জন করেন। উহাদের জমিদারী মধ্যে প্রধান জমিদারী পরগণা গঙ্গা পথের অংশ। সেই খুব লাভের জমিদারী। তাহার পর আলী আসরফ সাহেব চাকুরী করিলেন। প্রথম মীরমুন্সী পরে ডেপুটী কালেক্টরী তাহাতেই খাঁ বাহাদুর, তাহাতেই আজ পর্যন্ত লোকে খাঁ বাহাদুরের বাড়ী বলে। যে না জানে সে বলে উহারা বুঝি পাঠান্। পাঠান্ না হইলে খাঁ হইলেন কি প্রকারে? আসল কথা খাঁ নহে। কোম্পানী বাহাদুর হইতে খাঁ বাহাদুর খেতাব পাইয়াছিলেন।

তিনি চাকুরী করিয়া বাপের মত টাকা কামাই করিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি মাসে মাহিয়ানা ছিল, কম নহে দুই শত টাকা। মান ইজ্জত খুব বাড়াইলেন। বড় মানুষী চাল্-চলন খুব জোরস্ত রাখিলেন, তিনি জমিদারী খরিদ করিলেন। কি কোম্পানী বাহাদুর হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

ঢাকার এলাকায় "মানওয়াড়ের" চর। খুব বড় জমিদারী। যাঁহাকে আমরা বড় মিঁয়া বলি, খাঁ বাহাদুর সাহেবের বড় ছেলে আসল নাম মহাম্মদ আলী ডাকনাম মীর খয়রাতী। তোমার দাদার নামের নাম। ঐ মীর খয়রাতী বড় হইলে ঢাকায় পড়িতে দিলেন। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া জমিদারী করিতে বসিলেন। তিনি আবার এক পরগণা পত্তনি লইলেন তাহার নাম নসরত সাহী। যখন খোদায় বাড়ায় তখন এইরূপই বাড়িতে থাকে। আমাদের হাল আগেও যেমন মধ্যেও তেমন শেষেও তেমন এখনও তাহাই আছে। এখন তাঁহাদের সম্মুখে আমরা কিছুই নয়। গরীব, নিতান্ত গরীব অতি দীনহীন কাঙ্গাল। এইরূপ অবস্থা ইহা হইতেও হীন অবস্থা, হীন অবস্থা হইতে আরও হীন অবস্থা বহুপূর্বে তাঁহাদেরও ছিল। সময়ে বলিব। আরও অনেক কথা আছে। আলী আসরফ খাঁ বাহাদুর একপ্রকার বুদ্ধিহারা হইলেন কি প্রকারে? ভুল জন্মিল কি প্রকারে? সমুদায় কথা কাজে, ভুল হওয়া পীড়া হইল কি প্রকারে? সমুদায় বলিব। কলিকাতা সহর কোথায় জানি না। সেই সহর নাকি ভারি সহর। ঢাকা হইতে অনেক বড়। সেই সহরে বড়মিঁয়া বড়লোক লইয়া নবাবী করিলেন। শেষে যাহা হইবার হইয়া জিনিসপত্র ফেলিয়া গোপনে বাড়ী আসিলেন কি প্রকারে তাহাও বলিব। ঐ যে খুব বড় দুইখানা মানুষ সমান আয়না দেখিয়াছ, ঐ দুই খানাই কলিকাতার বাবুগিরির নমুনা, তাঁহার ভগ্নীপতি, মৌলবী গোলাম কাদের ঐ আয়না দুইখানি কি প্রকারে পদমদী পর্যন্ত আনিয়াছিলেন, সকলি তোমায় বলিব। তুমি মনে মনে দুঃখ করিও না, ওসকল কিছু নহে। খোদাতালা সকলি করিতে পারেন।

বড়লোক হইয়া আমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও বলিব। তবে তুমি মনে রাখিও যে ফরিদপুরের সা গোলামের মত ব্যবহার করেন নাই। হাজার হউক এক রক্তের রক্ত একই জনের আওলাদ। তোমাকে সকল কথাই বলিব। জানিয়া রাখা খুব ভাল, মনে কোন কথা বলিতে পারিবে না। সমুদায় জানা থাকিলে ধোঁকায় পড়িবে না। অনেক রাত্র হইল ঘুমাও। কল্য একটা দরকারি কথা তোমায় বলিয়া দিব। তোমরা যেখানে যাইতেছ, সেই স্থানের কথার-সকল কথা বলিলে দশ রাত্রিও ফুরাইবে না। অল্পের মধ্যে যাহা বলিলে তুমি সকল কথাই বুঝিতে পারিবে তাহাই বলিব। সে কালের কথা আপন বংশ আত্মীয়স্বজন কুটুম্বগণের কথা শুনিতে তোমার এত ইচ্ছা, আমি দেখিয়া বড়ই খুসি হইলাম। আমি মরিয়া গেলে আর শুনিবার জানিবার লোক

থাকিবে না, পাইবে না। আমি যাহা জানি সময়ে সকল কথাই তোমাকে বলিব। মনে রাখিও। যদি কাগজে লিখিয়া রাখিতে পার তবে বড় ভাল হয়, বহুকাল থাকিবে। তোমার বংশের লোকেরা সমুদায় জানিতে পারিবে।

মাতামহী কয়েকদিন পর তাঁহার কথা তিনি পূর্ণ করিলেন। যেখানে আমরা যাইতেছি তাহার বিস্তারিত বিবরণ বলিয়া কথা শেষ করিলেন। আমরা যাইতেছি। কোথায় যাইতেছি। আমাদের বাড়ীর লোকে কেহ কেহ জানে কেহ জানে না। আমি সমুদায় অবস্থা মাতামহীর নিকট শুনিয়াছিলাম। সপ্তাহকাল পরে পিতার সঙ্গে চলিলাম। চৈত্রমাস পদমদী অঞ্চলে জলের নাম নাই। নদ-নদী খাল-বিল সমুদায় শুকাইয়া গিয়াছে। কোন কোন বিলের মধ্যে, দম্‌দলপচা, জল মধ্যস্থিত গাছগাছড়া পচা দুর্গন্ধময় জল কিঞ্চিৎ পরিমাণ আছে। কিন্তু সে জল, পঁচা কাদাময় অতি কদর্য দুর্গন্ধ নাকের কাছে ধরা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকীট তাহার মধ্যে কিলিবিলি করিতেছে। গ্রামবাসীরা পাত্রের মুখে কাপড় বাঁধিয়া অন্য পাত্রের দ্বারা তুলিয়া ছাঁকিয়া কলসী পুরিতেছে। জলের যেন মহামারী। একপাত্র ভাল জলের জন্য লোকে লালায়িত। বর্ষাকালে জলের এমনি সচ্ছলতা যে, জলময় জল—জল ভিন্ন কথা নাই গ্রীষ্মকালে তেমনই জলাভাব। আমরা যাইতেছি অনেকে। পূজনীয় পিতা যাইতেছেন, আমি তাঁহার আদেশে সঙ্গে যাইতেছি। আমাদের সঙ্গে চাকর নেগাহবান, একজন বাবরচি খেতমদগার যাইতেছে। একজন মুন্সী অথবা কার্যকারক যাইতেছে। তাঁহার নাম পলু সিক্‌দার।

মীর মহম্মদ আলী সাহেবও যাইতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়াদ আবদুস্ সামাদও যাইতেছেন। মোসাহেবগণ তিন চার জন করিয়া কার্যকারক, আরদালী আসাবরদার ছোটাবরদার খানসামা খেদমতগার ইত্যাদি অনেকে যাইতেছে। নিকটে চন্দনা নদীতে জল নাই। পদমদী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৭ মাইল ব্যবধানে গৌরীনদী তীরে নাড়ুয়ার ঘাট। পাঠকগণ আশ্চর্যান্বিত হইবেন না। গৌরীনদী পদমদীর দক্ষিণ পশ্চিম ৭।৮ মাইল ব্যবধানে গড়ই নামে পরিচিতা হইয়া কামারখালী পর্যন্ত গিয়া মধুমতী নাম হইয়াছে। নাড়ুয়ার ঘাট হইতে উত্তরে গৌরী, জলের উজান দিকে গৌরী সেতু পর্যন্ত নৌকায় যাইতে তিন দিনের কমে কিছুতেই যাওয়া যায় না। ভাঁটায় আসিতে এক দিনেই আইসা যায়। এই উজান-ভাঁটার বোধ, যে সকল গ্রাহকগণের বাসস্থান জোয়ার-ভাঁটা নদীর কূলে, কি দেশে, তাঁহাদের বুঝিতে একটু খেজালত বোধ হইবে। তাহাতেই একটা কথা অতিরিক্ত ভাবে কহিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

যে সকল নদীতে জোয়ার-ভাঁটা নাই, যেমন পদ্মা গৌরী যমুনা এই সকল নদীর স্রোত একটানা। এক দিকে বহিয়া যাইতেছে। সে নদীর সৃষ্টি হইতে একই দিকে স্রোত যাইতেছে। আর জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চলে নদীর স্রোত জোয়ারের সময় একদিকে যায় ভাঁটার সময় তদ্‌বিপরীত দিকে ধায়। গৌরী নদীর স্রোত একটানা তাহাতে জোয়ার ভাঁটা নাই। আমরা যেস্থানে যাইতেছি, সে স্থানে যাইতে গৌরী ভাঁটায়া গিয়া অন্য নদীতে পড়িতে হইবে।

নাড়ুয়ার ঘাটে যাইয়া দেখি—যাহা কখনও চক্ষে দেখি নাই। নবাব সাহেব জন্য সর্বপ্রধান একখানি বৃহৎ বজরা, তাঁহার ভ্রাতার জন্য তদপেক্ষা একখানি ছোট বজরা, পিতা সাহেব জন্য এক বজরা, মোসাহেব আমলা কর্মচারী জন্য বড় বড় লাল ডিঙ্গি তিন খানা। নেগাহবান আরদালী খানসামা অন্য অন্য বাজে লোকজন জন্য দিশী বড় বড় পানসী ৫ খানা, খাদ্য সামগ্রী জিনিসপত্র, বড় মানুষী সাজ-সরঞ্জাম, খাসী, বকরী, মুরগী জন্য এক বাঙ্গলা মালবহা নৌকা। প্রত্যেক দলের পৃথক্ পৃথক বাবরচিখানা নৌকা, বারচিখানা নৌকায় চুল্লা চাক্কি ডেকৃচি পাতিল হাতা বেড়ী, শীল ইত্যাদি রন্ধনের সরঞ্জাম সমুদায় নৌকায় উঠান হইয়াছে। মাস্তলে বৃহৎ নিশান উড়িতেছে। প্রত্যেক নৌকাতেই বন্দুক ঢাল তলবার নৌকায় প্রকাশ্য স্থানে শ্রেণীবদ্ধরূপে রাখা হইয়াছে। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট বজরায় আরোহণ করিলাম। আমাদের সঙ্গের বাবরচিখানা আমাদের নৌকার পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। প্রত্যেকের বাবরচিখানা নৌকাই প্রত্যেক প্রধান নৌকার পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সারাটি দিন নৌকায় লোকজন সাজ-সরঞ্জাম উঠিল। রাত্রে নাড়ুয়ার ঘাটে থাকিয়া অতি প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সমুদায় নৌকায় মাস্তলেই নানা রঙ্গের নানা আকারের নিশান উড়িতেছে। নিয়ম হইল বড় বজরা সন্ধ্যার পূর্বে যেখানে ভিড়িবে সেইখানে সকল নৌকা একত্র হইয়া রাত্র বাস করিবে। রাত্রে নবাবের নৌকায় খুব আমোদ প্রমোদ গান বাজনা হয়। গাইয়ে বাজিয়ে সঙ্গেই আছে। রাত্র এক প্রহর, কোন কোন দিন দেড় প্রহর পর্যন্ত আমোদ প্রমোদ হয়। গান-বাজনা শুনিয়া বড় বজরার উপর যাইতে ইচ্ছা করে। হাসিরহস্যের গররা, নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদের বোল চাল শুনিয়া, যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে মজলিশে আমার যাওয়ার সাধ্য নাই। কারণ সেখানে সকলই আমার গুরুজন। পূজনীয় পিতৃদেব, নবাব সাহেব সকলেই আমার গুরুজন, তাঁহাদের আমোদ প্রমোদ স্থানে আমার সাধ্য কি যে আমি প্রবেশ করি।

নবাব সাহেব একদিন প্রাতঃকালে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার বজরায় লইয়া গেলেন। কথাবার্তা শুনা ভিন্ন আর কোন আমোদ আহ্লাদের মধ্যে আমি নই। কিছুক্ষণ থাকিয়াই আমি আমাদের নৌকায় আসিলাম। দুই একদিন পরেই থাকিতেন। শেষে এমন হইল যে দিনের বেলায় নবাব সঙ্গেই আহার করিতাম সন্ধ্যার সময় সকল নৌকা একত্র হইলে নিজের বজরায় আসিতাম। পিতৃদেব ও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। কারণ নবাব সাহেব যদিও তাঁহার সম্পর্কে এবং বয়সে ছোট, কিন্তু অবস্থা গতিকে, সকলই নবাবের অনুগত। নবাবকে শ্রেষ্ঠ পদে বসাইয়া সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী প্রত্যাশী। সুতরাং তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ। ধনে মানে ঐশ্বর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিধায়, একপ্রকারে সকলি তাঁহার আজ্ঞাবহ। সেই নবাব সাহেব আমাকে ভালবাসিয়া কাছে বসাইয়া রাখেন, ইহাতে তাঁহার কোনরূপ আপত্তি বিরক্তি, নারাজী কিছুই হওয়া সম্ভবপর নহে। বরং—সন্তোষেরই অধিক কারণ।

একদিন নবাব সাহেবের বজরার মধ্যে বসিয়া আছি। আহারান্তে নবাব সাহেব তাস খেলিতে ইচ্ছা করিয়া তাস হাতে লইয়া বাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। চারজন না হইলে খেলা হয় না। নবাব সাহেব কি একটা নাম ধরিয়া ডাকিতেই একটি স্ত্রীলোক, পিছনের কামরা হইতে আসিয়া নবাবের বামদিকে ঘেঁষিয়া বসিল এবং নবাবের হাত হইতে তাস কাড়িয়া লইয়া নিজেই ফিটিতে লাগিল। নবাব সাহেব আর একটি লোকের নাম ধরিয়া ডাকিতেই একজন মোসাহেব আসিয়া সেলাম বাজাইয়া নবাবের বিছানার কিনারায় বসিল এবং স্ত্রীলোকটির সহিত হাসি-তামাসা আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোকটি তখন তাস খেলা আরম্ভ করিতেই নবাব বলিলেন আর একজন? স্ত্রীলোকটি বলিল—এইত (আমাকে দেখাইয়া) ইনিই আছেন। নবাব বলিলেন, সে কি তাস্ খেলা জানে? স্ত্রীলোকটি আমার দিকে একটু নজর করিয়াই বলিল—হাঁ ইনি তাস খেলা জানেন। নবাব আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, তুমি তাস্ খেলা জান? আমি কি উত্তর করি, মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা হইল না। আবার, জানি বলিতেও সাহস হইল না। প্রাণের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। কারণ নবাব সাহেব গুরুজন, তাহার পর স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাস খেলা যাহা আমার জীবনে কখনও হয় নাই। এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে এরূপ একত্র এক বিছানায় কখনও বসি নাই। প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। কোন উত্তর না করিতেই স্ত্রীলোকটি বলিল, তিনি অবশ্যই জানেন। নবাব সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তাস্ খেলিতে জান যদি, তবে খেল। ইহাতে দোষ

কি ? আমার সঙ্গে খেলা করিবে তাতে কোন কথা নাই। তবে নিতান্ত ছোট-লোক নীচ জাতি বদ্‌লোকের সঙ্গে খেলা করা তা যে খেলাই হউক এমন কি—বসা ওঠা করাই নিতান্ত অন্যায়। খেলা করা দেল বাহলান ইহাতে কোন দোষ নাই। জানত, খেল। আমি উত্তর করিলাম তাস রকম জানিনা। তাসের ছবি আর রঙগুলি চিনি।

স্ত্রীলোকটি বলিল তবেই বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবে না। আসুন আপনি আর আমি একদিকে—আর ওঁরা একদিকে। মোসাহেবটি বলিলেন তবেই হয়েছে। আজ আর ধরিতে পারিবেন না। নবাব বলিলেন, ধরা দিতে হবে। আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ। কথাবার্তা তাঁহাদের তিন জনেই চলিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি বলিল—আচ্ছা একহাত খেলিলেই বুঝিতে পারিব। চক্ষের চাউনি আর মুখের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, শুধু ছবি চেনা, আর রঙ চেনা, কথাটা ঠিক নহে, উনি একজন ভাল খেলোয়াড়। আচ্ছা ধর ত। এই কাগজ চার ভাগ হইলে তাঁহারা তিন জনে কাগজ উঠাইলেন আমার ভাগের কাগজ আমার সম্মুখেই পড়িয়া রহিল। স্ত্রীলোকটি বলিল, আপনাকে আমি চিনিনা কি বলবো? নবাব সাহেব বলিলেন লজ্জা কি, কাগজ উঠাও আমি হুকুম দিতেছি। তখন আস্তে আস্তে কাগজ উঠাইয়া খেলিতে আরম্ভ করিলাম। তাস্ খেলা আমার অভ্যাস ছিল। তত্রাচ অত বড় বড় লোক সঙ্গে খেলা করিতে আমার কলিজা কাঁপিতে লাগিল। সমবয়সী সমান সমান দরের লোকের সঙ্গে হাসি-তামাসা করিয়া খেলা করিয়াছি, এ নীরবে আদব তমিজের সঙ্গে মাথাটি নীচু করিয়া খেলিতে হইল। সে খেলাও আবার বিবি ধরা। স্বপক্ষীয় খেলোয়াড় সহিত কথাবার্তা না চলুক কথা বলা আকার ইংগতে ইসারা করা—মনের ভাব ব্যক্ত করা, তাহার মনের ভাব জানা, খেলা নীতির বিরুদ্ধ হইলেও অতি সাবধান সতর্ক ভাবভঙ্গী আকার ইঙ্গিতে, চক্ষের চাউনিতে, পরস্পর হাতের খবর যথাসাধ্য জানাইতে হয়, জানিতেও হয়। তাহা না হইলেও বিবি-ধরা খেলা হয় না। আমি আমার খেলোয়াড়কে চিনি না, এই প্রথম দেখা সেও আমাকে চেনে না জানে না এই প্রথম দেখা,—তবে সে পাকা পোক্ত খেলোয়াড়। খেলিতে খেলিতে দুই এক বার আমার হাতের খবর জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার হাতের খবর আমাকে দিতে উড় উড় বাজে কথা, কত কথা নিজে নিজে কহিয়াছেন, আমি বুঝিয়াছি কিন্তু লজ্জার খাতিরে, তাঁহার সম্মানের খাতিরে, মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহি নাই। সে সঙ্কেত বুঝিয়াও একটি কথা মুখে ফুটে নাই। নিঃশব্দে খেলিয়া

যাইতেছি। তাঁহারও এমনি মুখের ভাব যে, আমারই হাতে রঙের বিবি আছে। নবাবের মোসাহেব সাহেব একপক্ষ—তাঁহারা টিপাটিপি, চক্ষু ঠারাঠারি করিয়া পরস্পর হাতের খবর বেশ ভাল রূপেই জানিয়াছেন। খুব হাসাহাসি জোর-জবরে খেলা করিতেছেন, তাস পিটিতেছেন বিবি ধরিবেন। তাঁহারা মনে মনে আঁচিয়াছেন, স্ত্রীলোকটির হাতেই রঙের বিবি রহিয়াছে। বিবি পাকড়াইবে স্থির নিশ্চয়। স্ত্রীলোকটি আমার খেলা দেখিয়া কি ভাবিতেছেন বলিতে পারি না। কিন্তু মোসাহেব সাহেব অস্থির চিত্তের লোক, তিনি বলিতেছেন—বা আপনি নাকি খেলা ভাল জানেন না? আর একহাত খেলিতেই আমি বিবি বাহির হইয়া চলিয়া গেলাম। আমার সঙ্গিনী খেলোয়াড় আমার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ স্থির নয়নে থাকিয়া বলিলেন হাঁ—বিনা সাহায্যে? মোসাহেব সাহেব বলিলেন—কি চালাক! নবাব বলিলেন চক্ষে ধুলি দিয়া পার! আমার সঙ্গিনী খুসিতে ভরিয়া গিয়াছেন।

ফিরে খেলা—সে বারেও আমার ভাগ্যে রঙের বিবি। প্রথমেও বিবি দ্বিতীয় বারেও বিবি। করি কি?—তাঁহাদের ধারনা আমার সঙ্গিনীর হাতেই বিবি রঙের উপর বাহির হইয়া গেলাম।

তৃতীয় বারেও আমারই হাতে বিবি। এবারে আমার সঙ্গিনী সহিত ইসারা ও ইঙ্গিতে জানা শুনা হইয়াছে। তাঁহার হাতে রঙের টেক্কা। নবাবের পক্ষ হইতে রঙ খেলা হইলেই আমি বিবি দেখাইলাম। মোসাহেব সাহেব, সাহেব দেখাইলেন। আমার সঙ্গিনী টেক্কা দেখাইতেই সাহেব পলাতক—আমার বিবি আমার সঙ্গিনী টেক্কার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। ক্রমেই আমার সাহস বাড়িতে লাগিল। সঙ্গিনীও পাকা খেলোয়াড়—নবাব এবং মোসাহেব এখনও অনেক অংশে কাঁচা। কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। এক দুই করিয়া ৭ বার আমরা বিবি ধরিলাম। তাহার পর খেলা বন্ধ করা হইল। স্ত্রীলোকটি নবাবের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কে? নবাব সাহেব স্পষ্টই পরিচয় দিলেন—আমার ভাই! ছোট ভাই মীরসাহেবের বড় ছেলে। স্ত্রীলোকটি বলিল চাচার ছেলে? আমি ত এতদিন দেখি নাই। নবাব বলিলেন তিনি তাঁহাদের নৌকায় থাকেন, আমিই সময় সময় দিনের বেলা ডাকাইয়া আনি—আর ওর বাঙলা কথা শুনি। পদমদীর কথার চাইতে সাঁওতা লাহিনী পাড়ার কথা ভাল। সন্ধ্যা হইল আমি আমার নৌকায় আসিলাম। একদিন পর আবার আমার তলব হইল—যাইয়া দেখি তাস বণ্টন শেষ। আমার সঙ্গিনী

আমার অপেক্ষায় আছেন। আজ আর পূর্বভাব নাই। যেন কত কালের আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

এই প্রকার সময় সময় তাস খেলা হয়। ক্রমে ১০ দিনের দিন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। এখন আর কথা গোপন নাই। আমরা বরিশাল অন্তর্গত বামনা জমিদার বাটীতে যাইতেছি। আজ বামনার ঘাটে নৌকা লাগিল। জমিদারবাটী সংবাদ গেল। এদিকে সাজ সজ্জা আরম্ভ হইল। এই অবসরে এত ধুমধামে আসিবার কারণ সংক্ষেপে বলিয়া রাখি।

বামনার জমিদার হোসেনদ্দীন চৌধুরী। হোসেনদ্দীন চৌধুরী এখন জীবিত নাই। তাঁহার কন্যা ফকরননেসার সহিত নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়াদ আবদুস্ সামাদের বিবাহ হইয়াছে। দশ হাজার টাকা নগদ পণ দিয়াছে, আর সকল মুরব্বিগণের সেলামী ১০০ শত টাকা হইতে ৫০০ শত টাকা পর্যন্ত দিয়াছে। কিন্তু পাত্রীকে পদমদী লওয়া হয় নাই। বিবাহের পর এই প্রথম লইয়া যাইবার কথা। ২য়, হোসেনদ্দীন চৌধুরীর পুত্র আফসারদ্দীন চৌধুরীর বিবাহ উৎসব উপলক্ষে আমাদের সকলের আগমন। আমাদের সকলের যাওয়া আসার খরচ সমুদায় বামনার স্টেট হইতে দিয়াছেন, এবং আফসারদ্দীন চৌধুরীর বিবাহে আবার সেলামী নজরানা সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে দিবেন কথা আছে। আফসারদ্দীন চৌধুরীর বিবাহে ধুমধাম যথেষ্ট হইবে। বাইনাচ, খেমটার নাচ, যাত্রার গান রোশনাই বাজী পোড়ান ইত্যাদিতে খুব ধুম হইবে। আমরা আফসারদ্দীন চৌধুরীর বিবাহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া মীর আবদুস সামাদের স্ত্রী লইয়া আপন আপন দেশমুখ হইব। পদমদী যাইব।

আসাবরদার ছোটবরদার আমাদের সঙ্গেও ছিল। বামনার জমিদার বাড়ী হইতেও আসিল। মহাধুমধামে আমরা কেহ পালকি কেহ হস্তী কেহ ঘোড়া কেহ পদব্রজে ঘাট হইতে চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে চলিলাম। অর্ধ মাইল পথ যাইতে বেশীক্ষণ হইল না। আদর অভ্যর্থনায় আমরা গৃহীত হইলাম। নবাবের স্থান হইল উদ্যানবাটীর রঙ্গমহলে, আমাদের স্থান হইল বসতবাটীর বৈঠকখানা ঘরের এক কক্ষে। নবাব সাহেবের নানা প্রকার সঙ্গী, কাজেই তাঁহার বাসস্থান অতি উৎকৃষ্ট নির্জন স্থানে হওয়া আবশ্যক তাহাই হইল। অবশ্যই সর্বাপেক্ষা তাঁহার আদরই বেশী।

সকলেই উপযুক্ত ও মর্যাদানুসারে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। আহারাদির ব্যবস্থার কথা বলাই বাহুল্য। কারণ বিবাহ ব্যাপারে এত ব্যয়, ব্যাপারের শ্রেষ্ঠ অংশই

আহার, সে সম্বন্ধে ক্রটী হইবার কোন কথা নাই। রন্ধন ব্যাপারের একজন প্রধান কার্যকারক আছেন। তাহার উপাধি হাজী সাহেব, নাম নুর মহম্মদ, তিনি বঙ্গদেশীয় নহেন। খাস দিল্লী নগরে তাঁহার বাস। পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে ঐ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে লক্ষ্ণৌ ঢাকা দিল্লী, নানা দেশীয় প্রধান প্রধান বাবরচি নিযুক্ত আছে। বাবরচিদের অধীনে মোট বাবরচি ৪।৫ জন। জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদির যোগানদার, বহুলোকজন নিযুক্ত রহিয়াছে। কুটুম্ব-স্বজন, সংখ্যা যেমন বিস্তর আয়োজনও ততোধিক বিস্তার।

একদিন আহারান্তে বসিয়া আছি কথা উঠিল, বাইজী আসিয়াছে। বাইজী, খেমটা ওয়ালীদিগের নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে। ইংরেজী বাজনাওয়ালারাও তিন নৌকা ভরিয়া আসিয়াছে। সকলেই খুসি, মহা আনন্দিত, বাজনাওয়ালার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আমাদের দেশে যে ঢুলিরা বিবাহ ব্যাপারে বাজাইয়া থাকে তাহাই হইবে, কিন্তু মনে একটা খটকা বসিয়া গেল,ইংরেজী বাজনাওয়ালা কিরূপ? আমি আমার জন্মস্থান ছাড়িয়া এই প্রথম বিদেশে বাহির হইয়াছি। দেশে যাহা আছে তাহা ছাড়া কিছুই দেখি নাই। কানেও শুনি নাই। বাইজী কি? খেমটাওয়ালীই বা কি? বুদ্ধি খরচ করিতে করিতে খেমটাওয়ালী সম্বন্ধে একটি বোধ জন্মিল, কিন্তু বাইজী সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সকলেই যেন কি একটা আনন্দের সংবাদ শুনিয়াছেন ইহাই ভাবে বোধ হইল।

কাহার সহিত আলাপ নাই যে জিজ্ঞাসা করিয়া মনের ধাঁধা ঘুচাই। আবার ভাবি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? সে মনে মনে কি ভাবিবে? চুপ করিয়া রহিলাম। "বাই" কথাটা সে সময় আমার পক্ষে বড়ই বিতিকিচ্ছি ভাবের অর্থবোধক ছিল। যাহা হউক একদিন পর বাইজী দেখিলাম, আমাদের নবাবই বাইজীর সহিত আলাপ করিতেছেন। বাইজী মানুষ, স্ত্রীলোক ঘাগরা পরা, উর্দু কথা কহে। ভাগ্যে যৎকিঞ্চিৎ উর্দুবোধ ছিল। ফারসী পড়িলে উর্দুবোধ সহজেই হয়, মুন্সীজীর কল্যাণে বাইজীর কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম। হাসি-তামাসা, রঙ্গরসের কথা ভিন্ন অন্য কোন রকমের কথা শুনিলাম না। সকল কথাতেই যেন রসিকতার আমেজ। সময়ে খেমটাওয়ালীকে দেখিলাম। ঐ নবাব সাহেবই তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। আর আর সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কি বাইজী, কি খেমটাওয়ালীর সহিত কথা কহিতে নবাব সাহেবই সকলের অগ্রগণ্য। বাইজী-খেমটাওয়ালীদিগের কথাবার্তা সময়ে বৃহৎ বৈঠকখানা ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পিতা-পুত্র জামাতা-শ্বশুর মামা-

ভাগ্নেয় ভাইপো-খুড়ো পিতৃব্য পরম্পর সকলেই সে স্থানে আছেন। কোন বাধা প্রতিবন্ধক দেখিলাম না। সকলেই স্ত্রীলোক কয়েকটির মুখের দিকে চক্ষু দুটি স্থিরভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে ইংরেজী বাজনাওয়ালাদের বাজনাও শুনিলাম।

সকলেই বলিতেছে, আজ রাত্রেই বাইজীদের মুজরা—নাচগান হইবে। মধ্যে মধ্যে খেমটাওয়ালীদের নাচও হইবে। বিশ্রাম সময়ে ইংরেজী বাজনা বাজিবে। সত্য সত্যই বৃহৎ বৈঠকখানা সজ্জিত হইল। ঝাড় লণ্ঠন দেয়ালগীর জ্বলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পরেই সকলের আহার শেষ হইল। সকলেই যেন মহাব্যস্ত, ভাল ভাল কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইলেন। নাচের মজলিসে নাকি খুব জাঁকাল জমকাল কাপড় পরিয়া যাইতে হয়। তাহা না হইলে নাচগান ভাল লাগে না—ভাল শুনা যায় না। নাচও ভালরূপে দেখা যায় না। আমার জাঁকাল জমকাল কাপড় দূরে থাকুক, সাদা একটা চাপকান আছে তাহাও ময়লা, সর্বদা যে স্থানে বাস করা যায়, সে স্থানের ব্যবহার উপযোগী কাপড়ই লোক ব্যবহার করে।

বোধ হয় সেই নীতিরীতি অনুসারেই আমার অভিভাবকগণ আমাকে জমকাল কাপড় প্রস্তুত করিয়া দেন নাই। আমাদের দেশেই জাঁকাল জমকাল কাপড় পাওয়া যায় না। অথবা আমাদের কাপড়ের দিকে পিতার মনোযোগই আকর্ষণ করে নাই। শেষ কথা বোধ হয় অবস্থায় কুলায় নাই। এই সকল কারণেই হউক কি আরও কথা আমাদের দেশে এরূপ বড় মানুষ কেহ নাই। বাইজী খেমটাওয়ালীর নামও কেহ জানে না। এরূপ দেয়ালগীর ঝাড় লণ্ঠন কাহার বাড়ী জ্বালাইয়া মজলিস হয় না। মুজরাও দেখা যায় না। জমকাল কাপড়ও কেহ পরে না। কাজেই আমার নাই। মাত্র একটি নয়ানসুক কাপড়ের চাপকান একটা পায়জামা আছে, তাহাও ময়লা। ধুতি পিরান আছে। আমি কি প্রকারে মজলিসে বসিব, বড় লোকের আত্মীয় বড়লোক সঙ্গে আসিয়াছি। বাড়ীর প্রধান প্রধান কার্যকারকগণ আমাকে বিলক্ষণ চিনেন, খোদ চৌধুরী আফসারদ্দীন সাহেবও ভালরূপেই চিনেন। কোন একস্থানে বসিলে কেহ উঠাইয়া দিবেন না কিন্তু দেখিলে কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া দেখাইবে! বিশেষ পিতার অনুমতি না হইলে নাচগানের মজলিসে যাই কি প্রকারে? আহার করিয়া আপন কামরায় বসিয়া আছি। আমাদের কামরার সম্মুখেই বৈঠকখানার বৃহৎ কামরা। জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে জরির পোশাক পরা—নিমন্ত্রিত

ভদ্রলোকসকল ক্রমে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া সুবিধামত স্থানে স্থানে বসিতেছেন। যাঁহারা মান্যমান তাঁহাদিগকে বাড়ীর প্রধান কার্যকারক মুন্সী ছমিরদ্দীন সাহেব আদর অভ্যর্থনা করিয়া এক এক বালিশ ঠেস লাগাইয়া বসাইয়া দিতেছেন। আমরা আমাদের কামরায় আছি—শুইয়া শুইয়া বৈঠকখানার মজলিস দেখিতেছি। পিতা তাহার শয়ন শয্যায় বসিয়া গুড়গুড়ী টানিতেছেন, আর কি যেন চিন্তা করিতেছেন। আর আর ভদ্রলোক আমার বয়সী, আমাপেক্ষা বেশী বয়সের—পুত্র পৌত্রকে লইয়া মজলিসে আসিতেছেন। সকলের পরণ পরিচ্ছদ সত্যই জাঁকাল জমকাল। অতিরিক্ত বাতির আলোতে চমক দিতেছে। টুপির উপরে সোনার কাজ, জোব্বার চকমকিতে ঝলমল করিতেছে। পিতা মনে মনে দুঃখিত হইয়াছেন মুখের ভাব আর নির্বাকেই তাহার প্রমাণ করিতেছে। আমার ভাল কাপড় নাই—মজলিসে যাওয়ার উপযুক্ত কাপড় নাই। সাধারণ পায়জামা চাপকানও নাই। তাঁহারা দেন নাই আমার নাই। আমি আমার বিছানায় যাইয়া শুইতেই, পিতা বলিলেন—শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পার গান বাজনা শুন। মজলিসে যাওয়া যায় না। আমিও যাইব না। আমার প্রাণ যেন ছাঁত করিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে হইতে কি যেন একটা সরিয়া কোথায় গিয়া লাগিল। আমি ডাকি নাই, কোথা হইতে কে যেন পাঠাইয়া দিল।

দুই চক্ষুতেই জল—শীঘ্র শীঘ্র কোঁচায় কাপড় দিয়া মুছিয়া শয়ন করিলাম। সে জল কেহই দেখিল না। বোধ হয় পিতা যেন কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এ কথাটা বলিবেন কেন ?—এখানে কাপড় তৈয়ারীর কোন উপায় নাই। ঢাকায় গিয়াই তোমার কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিব। খোদা বাঁচাইয়া রাখিলে কত বাইজীর নাচগান দেখিবে শুনিবে, এরা ত ঢাকার ওছা বাই। নজমন আর মহবুবন্‌ কথা শুনিয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণকাল পরেই দেখি—রঙ্গমহল হইতে রূপার চাপরাস বাঁধা নবাবের আরদালী আসিয়া পিতৃদেবকে চুপি চুপি কি বলিল, তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরেই আসিয়া পুনরায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

বাইজীরা কেহই মজলিসে আইসে নাই। কেবল তবলা সারেঙ্গী আনিয়া রাখিয়াছে। ক্রমেই লোকের আমদানী হইতেছে। ইতিমধ্যে নবাবের সেই আরদালী আসিয়া আমাকে ডাকিতেছে, বলিতেছে হুজুর! বড় হুজুর! নবাব সাহেব আপনাকে তলব করিয়াছেন। আমি যাইব কি না ভাবিতেছি। পিতার

হুকুম না পাইলে যাই কি প্রকারে? পিতা বলিলেন যাও। ডাকিতেছেন শীঘ্র শীঘ্র যাও—চলিলাম। রঙ্গমহলে যাইতে যাইতে মনে নানা কথা উলট পালট করিতে লাগিল। মনের মধ্যে যে কথা সে কথা মানুষে জানিবে কি প্রকারে?

মনের কথাটা কি? এখন বুঝিতেছি দোষী অন্তরের প্রতিকথাতেই ভয়। কোন কথা নাই—তবু ভয়। নির্দোষ হৃদয় সদাসর্বদা নির্ভয়, সুস্থ ও সবল। সেই বজরায় যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কয়েক দিন তাস খেলা করিয়াছি তাহার চক্ষে চক্ষে চক্ষু মিশাইয়াছি, ভ্রূর টান সেও দেখাইয়াছে, আমিও দেখাইয়াছি। কপাল কুঞ্চন ও তাহাই। সময় সময় খেলার ভাবে, নয়নবাঁকা ভ্রূবাঁকা সেও দেখাইয়াছে আমিও বাধ্য হইয়া দেখাইয়াছি। ঈষৎ হাস্যভাব দুইয়েরই দেখাদেখি হইয়াছে। মুচকি হাসি তাহাও ঐ খেলার জন্য, এক কথার দুই অর্থ প্রকাশ্য আর গুপ্ত। তাস নিক্ষেপ চটাপটি—বল পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে মনে নানা ভাবের উদয় হইয়াছে।

সেই বজরায় দেখিয়াছি আর দেখি নাই কারণ তিনি রঙ্গমহলে, আমরা অন্দরমহলের সংলগ্ন খাস মহলের বৈঠকখানায়। যদি এখন দেখা হয়—কি ভাব প্রকাশ হইবে? জাঁকাল জমকাল কাপড় নাই, জরির পোশাক নাই। হীরা ফিরোজার অঙ্গুরী নাই। বড়মানুষীর কিছুই নাই। এ অবস্থায় ঘৃণার আভাস ভাবই বেশী সম্ভাবনা। কারণ এ খেলার সময় নয়, বিবি ধরার মজলিসও নয়। কি জানি যদি, হঠাৎ চক্ষে পড়ে। ঘৃণার ভাবে বড়ই কষ্ট বোধ হইবে, এইটি মনের কথা—রঙ্গমহলে যাইয়া দেখি—ও গাজী! একি? মজলিস গুলজার।

নবাবের বাম পার্শ্বে সোনার ভূষণে জরির বসনে জড়িতা আমার খেলার দোহার বজরাবাসিনী। আনন্দ মুখচন্দ্রিমা, দুই গণ্ডে গোলাপী আভা; অপরূপ রূপ নজমন্ আর মহবুবন্। (বোধ হয়) নর্তকীর সাজে নবাবের সম্মুখে। বসন্ত আর হেমী খেমটাওয়ালী নবাবের দক্ষিণ দিকে, মধ্যে একটি বোতল। ৬টি স্থানে ২টি গ্লাস খালি, আর চারটি গেলাসেই লালরঙের জলে পূর্ণ নয়, সিকি ভাগ পোরা! আমি নবাবকে ঘাড় নোয়াইয়া সেলাম করিয়া খাড়া হইতেই তিনি উঠিলেন—আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অন্য কামরায় যাইয়া বলিলেন ঐ কাপড় পর—দেখি। আমি একটু অসম্মতির ভাব প্রকাশে বিলম্ব করায়, কাপড় হাতে করিয়া পাজামা পর, আমি সরিয়া যাইতেছি। পায়জামা পরিলাম। জরির চাপকান গায়ে দিলাম। জরির অথচ মধ্যে মধ্যে পাথর বসান টুপি মাথায় দিলাম। নবাব দেখিয়া বড় খুশি হইলেন, মুখে

বলিলেন বেশ লাগিয়াছে। তোমার বয়সের সময়ের আমার কাপড় বেশ লাগিল। আমি পিছনে পিছনে আসিয়া ঐ গুলজার মজলিসে বসিলাম। সকলের দিকেই চাহিয়া দেখিলাম আমার দিকেও সকলে চাহিয়া দেখিল, দেখিতেছে কিন্তু বজরাবাসিনী মহোদয়া ফিরিয়াও চাহিলেন না। নবাব সাহেব, বাইজীরা বসন্ত, হেমী সকলেই ঢালাঢালি করিয়া ঢোকে ঢোকে গলাধঃকরণ করিলেন।

নবাবের সঙ্গিনী আদরিণী,—মহোদয়া গ্লাসটা হাতে করিয়া মুখে ছোঁয়াইলেন মাত্র।

নবাব বলিলেন চলো সময় হইয়াছে। নবাব আদরিণীও উঠিলেন। তিনি নাচের মজলিসে বসিবেন না। আমাদের শয়ন কামরায় বসিয়া নাচ গান দেখিবেন শুনিবেন; আর নবাবের খাদ্য জিনিসপত্র বোতল গ্লাস আমাদের কামরায় থাকিবে তিনি পাহারা দিবেন। এই বন্দোবস্ত করিয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। পিছনে পিছনে নারীদল আসিতে লাগিল।

আমরা তাহাদের আগেই বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। নবাব সাহেবকে দেখিয়া শশব্যস্তে সকলেই খাড়া হইলেন। নবাব সাহেব বাম হস্তে আমার দক্ষিণ হাত ধরিয়াই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বসিবার স্থান পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট ছিল। আমার হাত ধরিয়াই সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। আমি সেলাম করিয়া তাঁহার বাম দিকে একটুকু সরিয়া বসিলাম। বাইজীর হাত নাড়া, পা নাড়া, চোখ ঠারা, মাথা কাঁপান, দেহ দোলান, বক্ষস্পন্দন, কটিচালন যাহাকে নাচ বলে, তাহা দেখিলাম—গান শুনিলাম। আমি কিছুই বুঝিলাম না, খেমটাওয়ালী দুইজন কোমর বাঁধিয়া মজলিসে আসিল,—তাহারা বেশীক্ষণ থাকিল না। আমি বাজনা বুঝি না, নাচের ভাল মন্দও বাছিয়া বাহির করিতে পারি না। আমার চক্ষে সকলই ভাল—সকলই মন্দ। কি করি নবাব বাহাদুর না উঠিলে কাহারও উঠিবার শক্তি নাই—ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই। আফসারদ্দীন চৌধুরী সাহেব উপস্থিত আছেন। তাঁহার বয়স সে সময় ২০।২২ বৎসর। তিনি বেহুঁস হইয়া নাক ডাকাইয়া গান শুনিতেছেন, নাচ দেখিতেছেন। এই ঘুম ভাঙ্গিবে পরদিন বেলা তিন প্রহরের সময়। উঠিতে বসিতে তামাকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে অন্যান্য ক্রিয়াদি সাঙ্গ করিয়া হাত মুখ ধুইতে ধুইতে প্রায় সন্ধ্যা—তাহার পর তেল মর্দন, তদপরেই স্নান। স্নান করিতে করিতে দুই এক দণ্ড রাত্রি হইত। তাহার পর প্রাতরাশ, যাহাকে "নাস্তা" বলে। নাস্তার পর

রাত্র ১২টার সময় দুই প্রহরের আহার। তাহার পর আমোদ-আহ্লাদ আরম্ভ। রাত্রি গত হইতে প্রভাত শুকতারার উদয়, শয়ন-শয্যায় গমন ও নিদ্রা। এই তাঁহার দৈনিক কার্য বিবরণী। তিনি শুইয়াই রহিলেন। নবাব সাহেব উঠিয়া গেলেন। আমরাও নিজ নিজ স্থানে গিয়া শয়ন করিলাম।

কয়েকদিন গত হয়। একদিন শুনিলাম সায়েস্তাবাদের মীর সাহেবগণ নিমন্ত্রণে আসিতেছেন। বামনার চৌধুরীবাড়ী আসিলেই পাঁচশ টাকা সেলামি ধরা আছে। তাহার পর ভাগিনেয় মীর আবদুস সামাদ (নবাবের ছোট ভ্রাতা) সহিত আফসার চৌধুরীর ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে সেও এক সম্বন্ধ। এ বিবাহে আসিবারই কথা। তাঁহারা দুই ভাই আসিলেন। বড় মীর সাহেব ও মধ্যম মীর সাহেব। দুই ভাই মোসলমান সমাজের আদর্শ। মোসলমানের মাথার মণি। জাতি-গৌরবে, মান-সম্রমে বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ, মান্যগণ্য। নবাবের মামা, না জানি কত বড়ই যেন কি? তাঁহারা আসিলে দেখিলাম, তাঁহারা মানুষ। খোলা প্রাণ, আমোদপ্রমোদের সম্রাট। নাচ গানে আমোদে, প্র-মো-দে মত্ত—ভাগ্নের নবাব সহিত একত্র আমোদ-প্রমোদ তাঁহাদের উদার মনে দোষণীয় নহে। সকল সময়ই ইংরেজীতে কথা কহেন। আর নিমন্ত্রিত মহাশয়গণ? "হংসমধ্যে বকো যথা।" —মামা ভাগ্নে কথাবার্তা হয় ইংরেজীতে আর আর সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। কান পাতিয়া শুনেন। মন খুলিয়া যে সময় তাহাদের মন খোলা ময়দানের মত হয়, সে সময় আর কোন কথা কোন কিছুতে কাহার মনে—গুরু-লঘু সম্বন্ধ জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা মাথার মণি তাঁহাদের আচার ব্যবহারই সাধারণ জনগণের অনুকরণীয় এবং আদর্শ। আর কি বলিব!

বামনার বিবাহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আমরা ঢাকায় চলিলাম। নবাব সাহেব এবং আর আর সকলে পদমদী রওয়ানা হইলেন। ঢাকায় গিয়া মৌলবী ওয়াহেদ আলীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ওয়াহেদ আলী আমার পিতৃব্য মীর জোলফেকার আলীর কন্যা খয়রননেসার গর্ভজাত কন্যা আবেদননেসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ওয়াহেদ আলী—ঢাকার বিখ্যাত প্রবীণ জমিদার মৌলবী আবদুল আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আবেদননেসা আমার ভাগিনেয়ী, পিতার নাতিনী ওয়াহেদ আলী তাঁহার নাতিজামাই। আমরা খুব আদর আহ্লাদে ঢাকায় রহিলাম। ওয়াহেদ আলীর মেজাজ ঠিক ছিল না। বারুণী ঠাকুরাণীর কল্যাণে চব্বিশ ঘণ্টা উল্টে পাল্টে উথলে উঠত। আর বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না—

জামাই। রাধিকাবাবু জমিদার, ঢাকায় ছিলেন। তাঁহার সহিত ওয়াহেদ আলীর বন্ধুত্ব ছিল। কারণ মনের মিল কাঁদের মিল, গেলাসের মিলেই সে সময় বন্ধুত্বের বাজার খুব সরগরম—বিশেষতঃ ঢাকা। ঢাকার মোসলমান জমিদারের অধঃপতনই ঐরূপ কাঁদের মিলের কল্যাণে। ওয়াহেদ আলীর বাড়ীতেও রাধিকাবাবু আসিতেন, রাধিকাবাবুর বাটীতেও ওয়াহেদ আলী যাইতেন। এইরূপ যাওয়া আসায় পিতৃদেব সহিতও রাধিকাবাবুর আলাপ হইয়াছিল। পিতৃদেবের অনেক কার্যের ফলে এখন দেখিতেছি বিবেচনার ত্রুটি ছিল; বলিতে পারি না—অমনোযোগ ছিল। কার্য করিয়া ভাবিতেন। ভাবিয়া করিতেন না। ঢাকায় অলংকার ভাল পাওয়া যায়। কতক টাকার অলংকার পলু সিকদার দ্বারা খরিদ করাইয়া ছিলেন। ঢাকায় সর্বদা তাঁহার আসা যাওয়া ছিল। ঢাকার বিখ্যাত কর্মকার সহিত পলু সিকদারের আলাপ থাকায় তাহারই দ্বারা তিনশত টাকার সোনার অলংকার আনাইয়া ছিলেন। টাকা হাতে নাই। অলংকার খরিদ না করিলেই হইত। হয়ত পিতৃদেব ভাবিয়া ছিলেন, পলু সিকদার দ্বারা লইলে টাকা এইক্ষণে না দিলেও চলিবে বাটী যাইয়া পাঠাইয়া দিব, এই ভাবিয়াই, বোধ হয় লইয়াছিলেন। শেষে কর্মকার টাকার জন্য বিশেষ তাগাদা আরম্ভ করিল। ওয়াহেদ আলীকে বলিলে সে বোধ হয় কোন উপায় করিতে পারিত। নিতান্ত পক্ষে তাঁহার বিবি আবেদননেসার নিকট বলিলেও বোধ হয় অন্য কোনরূপ উপায় হইতে পারিত। তাহা না করিয়া তাঁহাদিগকে গোপন করিয়া কর্মকারের তাগাদার দায়ে টিঁকিতে না পারিয়া রাধিকাবাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা কর্জ করিয়া কর্মকারের দেনা শোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিশোধ হইল না। দেনাও পরিশোধ হইল না, অথচ রাধিকাবাবুর নিকট হাত পাতিয়া কর্জ করিতে হইল। বিদেশে আসিয়া পরের বাটী অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাটীতে থাকিয়া সেই আত্মীয়ের বন্ধুর নিকট টাকা কর্জ করা সঙ্গত নহে। রাধিকাবাবু যদি তাঁহার নিজের পরিচিত হইতেন, ঢাকা আসিবার পূর্ব হইতেই যদি তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তত দোষ ছিল না। তাহাও নহে। ওয়াহেদ আলীর বাটীতে থাকিয়া ওয়াহেদ আলীর বন্ধুর নিকট টাকা কর্জ করাটা সদ্‌বিবেচনার কার্য হইয়াছিল না। তাহার পর টাকা কর্জ করার দরকার কি ছিল? অলংকারের দায়ে? অলংকার আবশ্যক কাহার? স্ত্রীর জন্য অথবা কন্যার? স্ত্রীও নাই, কন্যাও নাই। অলংকার পরিবার লোক

কেহই নাই, তবে অলংকার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ওয়াহেদ আলী অথবা আবেদননেসা একথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর নাই ভাবিয়াই বোধ হয় তাহাদের নিকট টাকার কথা বলেন নাই। কিন্তু ওয়াহেদ আলীর নিকট রাধিকাবাবু বলিয়াছেন দুই শত টাকা দিয়াছেন। তাহাতেই ওয়াহেদ আলী বিশেষ রাগান্বিত হইয়া আমাদিগকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন। রাত্রি প্রভাতেই আমরা ওয়াহেদ আলীর বাড়ী ছাড়িয়া নৌকা ভাড়া করিলাম। পদ্মনদীতে আসিব ইচ্ছা।

ঢাকায় ওয়াহেদ আলীর একজন হিন্দু মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। কথাবার্তা প্রতিদিনই হইত। লেখাপড়ার কথাও হইত। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনাকে আমি একখানা বাঙ্গলা পুস্তক দিব। সেই পুস্তকখানা আপনি মনোযোগের সহিত বুঝিয়া পাঠ করিবেন। সে পুস্তকখানির লেখা আপনি বুঝিতে পারিবেন না। আর একখানি কেতাব তাহার সঙ্গে খরিদ করিয়া দিতেছি। যে কথাটা আপনি বুঝিতে না পারেন সে কথাটা সেই পুস্তক মধ্য হইতে বাহির করিয়া পড়িলেই তাহার মানে বুঝিতে পারিবেন। কি কৌশলে মানে বাহির করিতে হয় দেখাইয়া দিব। আপনি সহজেই শিক্ষা করিতে পারিবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি যাহা বুঝিয়াছি—তাহা বুঝিয়াছি। আপনি আমার কথা শুনুন। দুইখানি পুস্তকের মধ্যে একখানি আপনাকে আমার ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ দিব। আর একখানি আপনাকে টাকা দিয়া কিনিতে হইবে। তাহার দাম ৩৲ টাকা। আমি পিতার নিকট হইতে টাকা লইয়া মাষ্টারবাবুকে দিলে তিনি সেইদিন সন্ধ্যার সময় দুখানি বাঙ্গলা পুস্তক আমার হাতে দিয়া পুনরায় বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যেরূপে কোরাণশরীপ পাঠ করে, নামাজের উপাসনার মন্ত্র পাঠ করে, খোত্‌বা পাঠ করে সেরূপ পড়িবেন না; প্রত্যেক শব্দের মানে বুঝিয়া পাঁচ ছয় ছত্র করিয়া পড়িতে পড়িতে পুস্তকখানি শেষ করিবেন। যে শব্দের মানে বুঝিতে পারিবেন না, এই বড় পুস্তকখানি খুলিয়া শব্দটা বাহির করিয়া তাহার মানে পড়িয়া তাহার পর আবার পড়িবেন, পড়িতে পারেন পড়িয়া যাইতে পারেন, আমি জানি সে পড়া কোন কার্যের নয়। মানে বুঝিয়া পড়িবেন। আর সেই শব্দটা কি ভাবে লেখা আছে—কি কি অক্ষর দ্বারা লিখিয়াছে তাহাও মনে রাখিবেন। আপনি মোসলমানি পুঁথি পড়িতে পারেন জানি। কিন্তু এ কেতাব সেভাবে অনর্গল পড়িতে পারিবেন না। পারিবেন না বলিয়া ফেলিয়া রাখিবেন

না। না হয় এক ছত্র করিয়া পড়িবেন। বার বার পড়িবেন। আর শব্দের মানে এইরূপ দেখিবেন। যেমন এই একটি শব্দ বাহির হইল। চন্দ্রাপীড় সমুদায় পুস্তক খুঁজিতে হইবে না। প্রথম চ অক্ষরের শব্দ বাহির করুন। ঠিক নিয়মমত সাজান আছে। এই দেখুন, সমুদায় ক অক্ষর। আমি বলিলাম বুঝিয়াছি। ঙ অক্ষরের পরেই চ অক্ষর হইবে। এই দেখুন! চ চ সমুদায় চ।

মাষ্টারবাবু বলিলেন এখন দেখুন চন্দ্রাপীড় শব্দ। আমি চন্দ্রাপীড় শব্দ বাহির করিয়া তাহার মানে পড়িলাম। রাজপুত্র বিশেষ। মাষ্টারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কি বুঝিলেন? আমি বলিলাম। এক রাজপুত্রের নাম। মাষ্টারবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—এই পুস্তক পড়িবেন। আর এই শিক্ষকের নিকট অর্থ জিজ্ঞাসা করিবেন। একটু খুঁজিলেই পাইবেন। আমি ছোট পুস্তকখানির নাম পড়িয়া দেখিলাম,—কাদম্বরী,—আর বড় পুস্তকের নাম পড়িয়া দেখিলাম শব্দার্থ প্রকাশিকা। সেই দিন হইতেই আমি কাদম্বরী পুস্তক চুপি চুপি পড়িতে লাগিলাম। আর পুস্তক-গুরুজীর সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমার নিকট কাদম্বরী বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইল। সুর করিয়া পড়া যায় না। পদে পদে মিল নাই। অক্ষরে অক্ষরে শেষে মিল নাই। প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তিবোধ হইত। তিন পাতা পড়িলেই কিছু কিছু ভাল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ষোল আনা বোধ হইল না। যাহা পড়ি, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারি না। এক একটু ভাব মনে বসিতে লাগিল। পিতৃদেব একদিন কাদম্বরী পড়িতে আদেশ করিলেন, আরও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বাঙ্গলা বিদ্যাকে বিদ্যাই মনে করিতেন না। অক্ষরগুলি আঁকিয়া বানান যোগ করিতে পারিলেই বাঙ্গলা বিদ্যা শেষ হইল। কথা ত বাঙ্গলাতেই আছে। আমার পিতৃদেব বাঙ্গলা অক্ষর পর্যন্ত আঁকিতে জানিতেন না। কাদম্বরীর কি বুঝিবেন? আর আর সকলেও সেই প্রকারই বুঝিলেন। আমিও প্রায় ঐ প্রকার। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধারণা এই যে, যে বাঙ্গলা, না বুঝিতে পারেন, সেই অতি উৎকৃষ্ট লেখা। বাঙ্গলা ভাষা বুঝিতে না পারিলেই সে সকল মোসলমানগণ মধ্যে প্রায় লোকে বলিতেন, আচ্ছা পণ্ডিতের লেখা। কি বৃত্তান্ত কি কথা তাঁহারাও বুঝিলেন না, আমি বুঝিলাম না তবে আমি তিন পাতা বার বার পড়িয়া প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, শব্দার্থ প্রকাশিকা দেখিয়া ভাব অর্থটা কথঞ্চিৎভাবে বুঝিয়াছিলাম, তাহাই বুঝিতাম। কিন্তু কথাটা কি তাহা কাহাকেও বুঝাইতে

পারিতাম না। সেই তিন পাতা বাদ দিয়া পড়িলে,—সকলেই সমান! যাহা হউক আমি বিরক্ত হইয়াও কাদম্বরী আর অভিধান ছাড়িলাম না। ঐ দুইখানি পুস্তক আমার সঙ্গের সাথী হইল। কয়েক মাস পদমদীর বাটীতে থাকিয়া কার্যবশতঃ পিতা লাহিনী পাড়ায় আসিলেন। আমিও সঙ্গে আছি। প্রায় ছয়মাস মাতামহী-চরণ দর্শন করি নাই। জীবনের মধ্যে এই প্রথম প্রবাস। মাতামহীকে এতদিন না দেখিয়া মন বড়ই আকুল হইয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র লাহিনী পাড়ায় যাইতে পারিলেই যেন রক্ষা পাই। গ্রীষ্মকাল। বিল ঝিল নালা খালে জল নাই, চন্দনা নদী হইয়া যাইতে হইবে। সামান্য একখানি নৌকায় আমরা দুইজন। সঙ্গে দুইটি চাকর আর নৌকার মাঝি মাল্লা তিন জন মাত্র। চন্দনার ঘাটে নৌকায় উঠিলাম। উজান জল বাহিয়া যাইতে হইবে। অনুকূল বায়ু বহিতেছে, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা টানার ভার পবন ঠাকুরের ঘাড়ে চাপাইয়া তাহারা কেহ কাঁথা সেলাই, কেহ জাল বুনানীর কার্যে বসিয়া গেল। বাটী হইতে দুই প্রহরে আহার করিয়া নৌকা ছাড়া হইয়াছে। রাত্রির আহার আমাদের সঙ্গেই আছে। ভৈরব মাঝিও বলিয়াছে, আমরা আহার করিব না। নৌকা ভিড়াইব না। একই পালে চলিয়া যাইব। যদি সারারাত এইরূপ পালে সুবাতাস পাই, তবে ঈশ্বর ইচ্ছায় দুই প্রহর হইতে হইতে লাহিনী পাড়ার ঘাটে নৌকা লাগাইতে পারিব। মদাপুর পর্যন্ত আসিলেই সন্ধ্যা ঘোর হইয়া গেল। পদমদী অঞ্চলে চিরকাল বাঘ শূকরের ভয়। যে সময়ের কথা সে সময়ে শূকর অপেক্ষা বাঘের ভয় বেশী ছিল। সময় সময় বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী হয়।

নৌকা পালে যাইতেছে। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। চন্দনার এপার ওপার সম্মুখের অন্ধকার দূর হইয়া বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ভৈরব মাঝি বলিল ঐ যে সম্মুখে "থরাপাতা" দেখিতেছেন। থরা পাতিয়া আমাদের মালো জাতিই নদীর মধ্যে মাছ ধরিয়া থাকে। ঐ দেখুন! জাল হইতে মাছগুলি একত্র করিয়া নিম্নস্থ ডিঙ্গি নৌকায় ঝাড়িয়া লইয়া, জাল ফেলিবার সময় ক্রমে ঐ জাল-বাঁধা বাঁশের গোড়ায় বসিয়া উপরে উঠিতেছে। জাল উঠাইবার সময়, ঐ দেখুন জাল-বাঁধা বাঁশ সহিত কি প্রকারে নিচে নামিতেছে। জাল ফেলিবার সময় ঐ দেখুন উহার নৌকা এবং নদীর জল হইতে সে ১০ হাত ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। জালযুক্ত দুই বাঁশের গোড়ায় চাপিয়া বসিলেই জাল জল হইতে উঠিতেছে। আবার ছাড়িয়া দিলেই জাল জলে পড়িতেছে। যে মাছ ধরিতেছে

তাহাকে একবার উপরে উঠিতে হইতেছে, আবার জাল জড়ান বাঁশের সহিত নিচে নামিতে হইতেছে। কয়েকদিনের কথা আমারই পিস্‌তোত ভাই, এই মদাপুর নিকটেই বাড়ী, তাহার নাম শ্রীকণ্ঠ। সে ঐ ঘাটের নিকটেই খরা পাতিয়া রাত্রে মাছ ধরিতেছিল। দিন অপেক্ষা রাত্রেই বেশী মাছের আমদানি হয়। রাত্র দুই প্রহর সময় নদীর এপার ওপার দুই পারেই বাঘের ডাক শুনিল। এই বাঁকের আগে নারায়ণপুর গ্রাম। তাহার আশপাশ পাংসা, মাধবপুর রূপট, মালঞ্চি প্রভৃতি গ্রামে বাঘের উপদ্রব কিছু বেশী হইয়াছিল। বাঘমারা শিকারীরা,—সেই মানুষ-খেকো বাঘের অনেক তালাস করিয়া বেড়াইল, কোন জঙ্গলেই খোঁজ পাইল না। হুজুরের ত জানাই আছে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে বন্দুক বারুদ গুলি দিয়া বাঘ মারে না। ফাঁদ বসাইয়া তীর পাতিয়া বাঘ মারে। ফাঁদ বসাইয়া বাঘ মারা তত আশ্চর্য নয়, কিন্তু তীর পাতিয়া বাঘ মারাই বড় আশ্চর্য। হুজুর! আমাদের বড় মিঞা (অর্থাৎ আমি) কখনও বাঘ দেখেন নাই। শিকারীরা মারে কিরূপে তাহাও শুনেন নাই। আগে আমার ভায়ের অবস্থাটা বলি, তাহার পর বাঘমারার কথা বলিব।

নৌকা পাল ভরে যাইতেছে, কিন্তু বাতাসের গতি বড়ই মন্দা। কাজেই নৌকা ত্রস্তে যাইতেছে না। জ্যোৎস্না ফুটিয়া রাত্রের অন্ধকার একবারে দূর করিয়াছে। ডাঙ্গা হইতে নৌকা অনুমান দশ হাত তফাত জলস্রোত কাটিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে।

নৌকার মধ্যে সকলেই জাগিয়া আছে। আমিও জাগিয়া ভৈরবের কথা শুনিতেছি। ভৈরব আমাদের প্রজা। ভৈরব বলিল, হুজুর! আমার ভাই খরা পাতিয়া মাছ ধরিতেছিল। একবার উপরে উঠিতেছে, নিচে নামিতেছে। বাঘের ডাক কানে শুনিতেছে ভয়ের কোন কারণ নাই। যদিও খরার একপার্শ্ব ডাঙ্গার অতি নিকটে, তত্রাচ ডাঙ্গা হইতে ৩।৪ হাত তফাত। আর খরার বাঁশ একটি দুটি ত নয় পঞ্চাশটা বাঁশের কম হইবে না। খাড়া বাঁকা আড়ভাবে পাশাপাশি নানাভাবে জলের মধ্যে পোঁতা, আর কয়েকটা মোটা দড়ি দিয়া বাঁশে-বাঁশে বাঁধা। বাঘ গ্রামের মধ্যে ডাকিতেছে। কিন্তু সে ডাক গ্রামের মধ্যের নহে। গ্রামের পূর্বে নদীতীরের মাঠে ডাকিতেছে।

শ্রীকণ্ঠ একা মাছ ধরিতেছিল। রাত্র প্রায় দুই প্রহর। পাড়া প্রায় নিস্তব্ধ। কোন সাড়া শব্দ নাই, নীরব। মধ্যে মধ্যে বাঘের ডাক আর শ্রীকণ্ঠের যেরূপ কণ্ঠই হউক সে কণ্ঠে গ্রাম্য গানের সুর বায়ুর সহিত মিশিয়া বহুদূর লইয়া

যাইতেছে। শ্রীকণ্ঠ একবার উপরে উঠিয়া হাতের কৌশলে জাল ঝাড়িয়া মাছগুলি নৌকায় ফেলিতেছে। এমনি অভ্যাস যে একস্থানে বসিয়া জাল জলে ফেলিতেছে, নিচে নামিয়া দীর্ঘ দুইটি বাঁশসহ জল হইতে উঠাইতেছে। ঐ নিচে থাকিয়াই মাছ ঝাড়িয়া নৌকার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। হঠাৎ ডাঙ্গার দিকে নজর পড়িতেই দেখে, প্রবীণ এক বাঘ জানু পাতিয়া বসিয়া একদৃষ্টে থরার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। থরার উপরে তাহার খাদ্য জীব, নড়া চড়া করিতেছে, নিচে নামিতেছে, কি উপায়ে ঐ শিকার ধরা যায়, তাহারই ভাবনা ভাবিতেছে। চক্ষের তারা একদলা আগুনের মত জ্বলিতেছে। জ্যোৎস্না রাত্রি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, চক্ষু দুইটি যেন আগুনসহ ফুটিয়া বাহির হইয়া তাহারই দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ লেজ উর্ধ্বে উঠিতেছে। লেজের অগ্রভাগ নাড়া দিতেছে। কখনও পৃষ্ঠের উপর হইয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। শ্রীকণ্ঠ একবার উর্ধ্বে উঠিতেছে। আবশ্যক হেতুই আবার নিচে নামিতেছে। বাঘটা চুপ করিয়া আছে। ডাক হাঁক নাকসাট মারা নাই। গেঙ্গড়াইয়া রাগ প্রকাশ করাও নাই। কেবল একবার মাথা উঁচু করিয়া শ্রীকণ্ঠের নামা ওঠা দেখিতেছে। কখনও এক পার্শ্বে মাথাটা কাত করিয়া শ্রীকণ্ঠ কোথা গেল সন্ধান করিতেছে। শ্রীকণ্ঠ উপরে উঠিতেই বাঘ মহাশয়ও মাথা উঁচু করিয়া শ্রীকণ্ঠের উচ্চ মাথার দিকে লক্ষ্য করিতেছে। আবার শ্রীকণ্ঠের সহিত মাথা নিচু করিতেছে। শ্রীকণ্ঠ বাঘ দেখিয়াছে, ভয় হইলেও, বাঘের যে আর কোন ক্ষমতা নাই তাহা সে বুঝিয়াছিল। তাহার শ্রীকণ্ঠের উচ্চ স্বরের গানটিও বন্ধ হইয়াছিল। বাঘ মহাশয় অনেকক্ষণ এইরূপ নীরবে নিঃশব্দে থাকিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না, কি প্রকারে শ্রীকণ্ঠের কণ্ঠে দাঁত বসাইয়া রক্তপাত করিবে তাহার কোন সুযোগ করিতে পারিতেছে না। শ্রীকণ্ঠও নীরবে আপন কর্তব্য কার্য করিয়া যাইতেছে। বাঘ বেটা মহা চিন্তায় পড়িল। সম্মুখে দশ হাত তফাতে তাজা শিকার চক্ষের উপর নাচিতেছে, একবার উঠিতেছে আবার চক্ষের উপরেই নিচে নামিতেছে। একি আর সহ্য হয়? লম্ফ দিয়া শ্রীকণ্ঠের ঘাড়ে পড়িতে ত সাধ্যই নাই, কি কল-কৌশল করিয়া ছোট বড় বাঁশ নানাপ্রকারে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। ফাটকা কলে আটকা পড়িয়া প্রাণও যাইতে পারে; কাজেই লম্ফ দিয়া শ্রীকণ্ঠের ঘাড়ে পড়িতে সাহস হইতেছে না। গুঁড়ি মারিয়া নিকটে যাইয়া ঘাড় মাথা ধরিয়া রক্ত শোষণ করাও বাঘের স্বভাব নহে, এবং তাহা পারিবারও ক্ষমতা নাই। জলের স্রোতে সাঁতার কাটিবার সময় লক্ষ্য স্থির থাকিবে কেন? পায়ে জোর না বাঁধিলে লম্ফই বা আসিবে কেন? তাহার

পর শ্রীকণ্ঠ বাঁশের আবরণ মধ্যে রহিয়াছে ধরিবার উপায় নাই। তত্রাচ চেষ্টার ক্রটি হইতেছে না। এক পায় দুই পায় জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া আবার ফিরিয়া যেস্থানে বসিয়াছিল সেই স্থানে গিয়া বসিতেছে। একবার সজোরে খাড়া হইয়া মাটিতে মুখ ঠেকাইয়া এমনি ডাক ছাড়িল যেন মাটি ফাটিয়া গেল। বোধ হয়, বাঘ বাবু মনে করিয়াছিল হঠাৎ ডাকিয়া উঠিলে খাস্তটা বাঁশের উপর হইতে ডাঙ্গার দিকে ভুম করিয়া পড়িয়া যাইবে—উপর্য্যুপরি তিন ডাক। শ্রীকণ্ঠ পূর্ব হইতেই সতর্ক ছিল। চুপ করিয়া নিচেই রহিল উপরেই উঠিল না, বাঘ বেটা ভাবিল উপরে নাই, ডাঙ্গায় পড়ে নাই কোথা গেল? কি হইল? ঘাড় নওয়াইয়া দুই এক পদ সরিয়া জলের কিনারায় যাইয়া চার দিক খুঁজিতে লাগিল, জলের দিকেও চাহিয়া দেখিল কোথাও নাই। ছাড়িয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না, যাইতেও পারে না। মানুষের গন্ধ নাকে লাগিতেছে খুঁজিয়া হায়রান হইল।

যদিও শ্রীকণ্ঠ নির্ভয়ে আছে যে, বাঘ বেটা কিছুতেই আমার নিকটে আসিতে পারিবে না। তত্রাচ বাঘের এমনি রব গর্জনের এমনই ভয়ঙ্কর শব্দ যে মানুষের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। একটু স্থির হইয়া নৌকার মধ্যে আসিয়া ভাল করিয়া এক কলিকা তামাক সাজিয়া মনের মত খাইয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল বাঘ বেটা বসিয়াই আছে। জিহ্বা বাহির করিতেছে। মুখ চাটিতেছে, বোধ হয় ফিরিয়া যায়-যায় ভাবটা দেখাইতেছে—শ্রীকণ্ঠ তখন আবার যেরূপ কৌশলে উপরে উঠে জলে জাল ফেলে, সেইরূপ জলে জাল পড়িতেই পতনের শব্দ আর খরায় বাঁশের কোঁ কোঁ শব্দ শুনিয়া বাঘ চাহিয়া দেখে ঐ ত আমার শিকার (শ্রীকণ্ঠ) বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে উপরে উঠিল। এবারে দেখিয়া রাগে সম্মুখে দুই পদ দ্বারা মৃত্তিকা পশ্চাৎ দিক ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। লেজ ঘুরাইয়া গর্জন করিতে লাগিল। কখনও মাটিতে মুখ ঠেকাইয়া ভয়ঙ্কর রবে গর্জিতে লাগিল। শ্রীকণ্ঠের তখন মনে আনন্দ। সে শীঘ্র শীঘ্র জাল উঠাইতে লাগিল, জাল ফেলিতে লাগিল। গান ধরিয়া মাছ মারিতে থাকিল। ডাঙ্গায় যে তাহার মহাশত্রু নরখাদক যমসদৃশ ব্যাঘ্র মূর্তি গর্জিতেছে সে কথা আর মনেও করিল না। এদিকে রাত্রও প্রভাত হইয়া আসিল। কতক্ষণ কোন সময় বাঘ বেটা নাজেহাল হইয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা শ্রীকণ্ঠ দেখে নাই টেরও পায় নাই। বামে, সম্মুখে, নদীর জলে চাহিয়া দেখিল বাঘ নাই চলিয়া গিয়াছে। কতক্ষণ পরে ডাঙ্গার দিকে নজর পড়িতেই দেখে নিঃশব্দে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। শ্রীকণ্ঠ বুঝিল তাহার চালাকি। সূর্য উদয় না হইলে আর আমি খরা হইতে নামিতেছি না।

দেখিতে দেখিতে রাত্র ফরসা হইয়া সূর্য উদয় হইল। ক্রমেই সূর্য উপরে উঠিতে লাগিল, কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া মাঠে আসিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর বেলা দেড় প্রহর হইলে শ্রীকণ্ঠ মাছ লইয়া বাড়ী আসিল। সেই দিনই ঐ ঘাট হইতে খরা উঠাইয়া লইয়া গেল। আর এ পারে খরা পাতিল না। ১৫।১৬ দিন পরে নদীর পশ্চিম পারে এক ক্রোশ ভাটিতে খরা পাতিল। আমাদের এ অঞ্চলে তিন প্রকারে বাঘ মারে—১। বাঁশ পাতা (ফাঁদ) ২। খোয়াড়, ৩। তীর পাতিয়া মারা।

বাঁশপাতা ফাঁদ, খুব বড় একটা বাঁশ বেশ পরিষ্কার করিয়া চাঁছিয়া গায়ের গিট-সকলের ধার মারিয়া বাঁশ প্রস্তুত করে। ঠিক মাছ ধরা বঁশের ছিপের আকৃতি করিয়া সোজা করিয়া লয়, সেই বাঁশের গোড়ার দিকে পুঁতিতে হয়। আর ঐ বাঁশের অগ্রভাগে ফাঁসির দড়ির ন্যায় মজবুত রসি বাঁধিয়া সেই রসির সঙ্গে রেশমের সূতার নিতান্ত পক্ষে সোনের সূতার ফাঁদ তৈয়ার করিয়া খুঁটা পুতিয়া খুটার আঁকড়ার এক পাশে ফাঁস আটক করে। আর একটা ছোট কাঠের বাক্স যাহার মধ্যে বাঘ অনায়াসে মাথা দিয়া প্রবেশ করিতে পারে, সেই প্রবেশ দ্বারে ফাঁসের দড়ি ঝুলিতে থাকে। ঐ বাক্সের পিছনের খোপে ছাগল কি ভেড়া বাঁধা থাকে, বাঘ তাহা ধরিতে পারে না, কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিতে পায় মাত্র। বাঘের এক নিয়ম আছে যে, বাঘ গ্রামের কি মাঠের যে পথ দিয়া হাঁটিয়া যে দিকে যায়, প্রতিদিন সেই পথে সেই নিয়মে একই সময়ে যাইবে। পুষ্করিণী বা যে ঘাটে যেখানে জল খাইবে, প্রতিদিন সেই ঘাটে সেই সময়ে জল খাইবে, যেখানে যেভাবে ডাকিবে, ঠিক সেইখানে আসিয়া ডাক ছাড়িয়া গম্যস্থানে চলিয়া যাইবে। কখনই নিত্য নূতন পথে যায় না। নিয়মের বহির্ভূত কোন কার্যই করে না।

বাঘের সেই গম্য পথকে বাঘের নাসি বলে। নাসি দেখিয়া শিকারীরা কিছুদিন রাত্রে পরিশ্রম করিয়া বাঘের অবয়ব কত বড়, বাঘ চক্ষে দেখিয়া শেষে বিবেচনা মত ফাঁদ পাতে। ফাঁদ পাতিলে সে পথে যথাসাধ্য মানুষ চলা বন্ধ করিয়া দেয়। গাঁয়ের মানুষের চলা বন্ধ করিতে বেশী শ্রম স্বীকার করিতে হয় না। বিশেষ রাত্রে সহজেই বন্ধ করা যায়। যদি ফাঁদ ঠিকমত পাতা হয় তবে, বাঘ ছাগলের লোভে কাটরা বা বাক্সের দ্বারে মাথা দিবামাত্র বাঘ বেটা কম হইলে ১৫।১৬ হাত উর্ধ্বে উঠিয়া ফাঁস গলায় ঝুলিতে থাকে। বড় বাঘ হইলে মাটি ছাড়া শূন্যে না ঝুলিলেও প্রথম বাঁশের জোরে শূন্যে উঠিয়া দেহ ভারে শেষে নিচে নামিয়া পড়ে তাহাতেই মরিয়া যায়।

২য় বাঘ মারা খোঁয়াড় প্রস্তুত করে। কাঠের মজবুত তক্তা দ্বারা ছোট একখান ঘরের আকৃতি, অথবা একটা বড় সিন্দুকের মত—লোহার পেরেকে তক্তা আঁটিয়া প্রস্তুত করে। পিছনে একটা ছোট খোপ করিয়া দরজা রাখে। সেই পিছন দিক হইতেই ছোট খোপে ছাগল ভেড়া রাখিয়া দেয়। বড় খোপের দ্বারে কপাট ঝুলান থাকে। বাঘ ছাগল ধরিতে যায়, কোন দিকে প্রবেশের পথ না পাইয়া বড় খোপের দ্বার দিয়া যেই মাথা দেয়, মাথার সামান্য আঘাতে ঝুলান কপাট পড়িয়া দ্বার বন্ধ হইয়া, বাঘ খোঁয়াড়ে আটকা পড়ে। এইরূপ খোঁয়াড়ে আটকা বাঘকে, হয় বন্দুক না হয় বর্শা দ্বারা মারিতে হয়। আর তীর পাতিয়া যে বাঘ মারে সে বড়ই চমৎকার।

বাঘের নাসি না জানিতে পারিলে এ সকল উপায়ে বাঘ মারা যায় না। বাঘের নাসি চলাচল পথ জানিয়া বাঘের দেহ পরিমাণ দেখিয়া তীর পাতিয়া এক গাছা দড়ি বহুদূর লম্বা করিয়া খুঁটা পুঁতিয়া সটানভাবে মৃত্তিকা হইতে এরূপ উচ্চ করিয়া রাখে যে বাঘের বুক সমান উঁচু হয়। বাঘ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিবার পথে ঐ দড়ির এক সীমা—আর গোড়া একশ হাত কি দুই শত হাত দূরে থাকে। গোড়ার সঙ্গে বিষ সংযুক্ত সুতীক্ষ্ণ লৌহ তীর এমন কৌশল করিয়া পাতিয়া রাখে যে বাঘ চলিয়া আসিতে ঐ দড়ির গায়ে কোন স্থানে আঘাত কিম্বা সামান্যভাবে স্পর্শমাত্র পাতা তীর বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া দড়ি বহিয়া আসিয়া বাঘের বক্ষস্থলে বিদ্ধ হয়। কোন কোন তীর দেহ ভেদ করিয়া পার হইয়া যায়। কোন তীর দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীরে ঝুলিতে থাকে, হয়ত শেষে কোন কারণে খুলিয়া যায়। কিন্তু বিষ থাকা হেতু ২।৩ দিন মধ্যে বাঘ মরিয়া যায়। যে গ্রামে তীর পাতা হয় সে গ্রামেও মরে, অথবা তাহার থাকিবার জঙ্গলে মরিয়া থাকে। হুজুর! আজ মাস দুই হইল প্রবীণ এক বাঘ বড় তামাসা করিয়া মারা পড়িয়াছিল। এদেশে বাঘও যেমন বেশী, মরেও বেশী। এ অতি আশ্চর্য তামাসার মরা।

করাতীরা এক গৃহস্থের বাড়ীতে খুব বড় এক শালকাঠ চিরিতেছে। সন্ধ্যা হওয়ায় সেই ফাড়ার মধ্যে কাঠের গোঁজ মারিয়া ফাঁক করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। নিশীথ রাত্রে বাঘ বেটা সেই বাটীতে শিকারের লোভে আসিয়া ঘরের কানাচি খুঁজিয়া বোধ হয় ঐ উঁচু কাঠের অর্ধ ফাড়া তক্তার উপর বসিয়াছিল। হুজুর মজার কথা, না বলিলেও হয় না। বাঘটা পুরুষ বাঘ, শাল কাঠের উপর বসিতেই তাহার কোষ দুটি চেরা তক্তার ফাঁক দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। বাঘের

সে দিকে খেয়াল নাই, সম্মুখের খুঁটা জোরে জোরে নড়াইতে নড়াইতে খুঁটা খুলিয়া গিয়া দুই তক্তার ফাঁক বন্ধ হইয়া এক তক্তা হইল। তক্তার চাপনে যতই বাঘ নড়াচড়া করিয়াছে—টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছে, টানাটানিতে আরও আঁটিয়া গিয়াছে। বাঘ ফাড়া কাঠের উপর আহম্মক সাজিয়া বসিয়া আছে। বেদনার চোটে শেষে গেঙ্গাইতে আরম্ভ করিয়াছে; রাত্রিকালে বাঘের গর্জনে পাড়া সমেত অস্থির। রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্যোদয় হইলেও বাঘ শালকাঠের উপর হইতে নামিয়া জঙ্গলে যায় না। মানুষের উপরেও হুঙ্কার ছাড়িয়া লাফাইয়া পড়ে না। একি আশ্চর্য! এক দুই করিয়া বিস্তর মানুষ জুটিয়া গেল। বাঘের মুখে কথা নাই। ডাক হাঁক নাই, তর্জন গর্জন নাই, চক্ষু রাঙ্গান নাই, নড়া-চড়া নাই, ধীরগম্ভীর চক্ষে জল। সারারাত নড়াচড়াতে একেবারে বিষের টুকরা হইয়াছে। লোকে ভাবিল একি ব্যাপার! শেষে কথা গোপন থাকিল না। তক্তার চাপে পড়িয়া বাঘ মহাশয়ের নড়িবার শক্তি নাই। আর যাবে কোথা। লাঠি ঝাঁটা বাড়ুন, খোলাখাপরা লইয়া ছোঁড়া বুড়া, মেয়েরা পর্যন্ত ঝাঁটা পেটা করিয়া মারিয়া বাঘের প্রাণ বাহির করিল।

নৌকার মধ্যে সকলে হাসিয়া অস্থির।

আমি সে সময় পর্যন্ত জ্যান্ত বাঘ দেখি নাই মরা বাঘ দেখিয়াছি কিন্তু সেও ছাগল ভেড়া ধরা বাঘ, যাহাকে গো-বাঘ বলে। মাঝে মাঝে গরু বাছুরও ধরে। মানুষখেকো বাঘ আমি কখনও দেখি নাই বাঘের কথা ভাবিতেছি। নৌকা পালের জোরেই চলিয়াছে। চাঁদের আলোও পূর্ব হইতে যেন দ্বিগুণ ফুটিয়াছে। পিতার তামাক খাওয়া অভ্যাস ছিল। তাঁহার সম্মুখের কাজ কাম যে করিত তাহার নাম কাজেম মিঁয়া। কাজেম মিঁয়া ভদ্রসন্তান কিন্তু লেখাপড়া জানিত না, পাহলওয়ান ছিল। লাঠি মারিতে দেশ বিখ্যাত ছিল। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় ষোড়শ তরঙ্গে নীলকর মেঃ কেণীর গারদে যে সামসের আলীকে বন্দী করিয়া রাখার চিত্র উদাসীন পথিক দেখাইয়াছেন, সেই সামসের আলী কাজীর তিন পুত্র, নাজেম, কাজেম, বেলাল। নাজেমের বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় ইতিপূর্বে কড়ই বাড়ী থানার দারগা মীর গোলাম আলীর নৌকার মাঝিদিগের সহিত কোম্পানীর গোলা-বারুদ বোঝাই নৌকার মাঝিমাল্লার লাহিনী পাড়ার ঘাটে বিবাদকাণ্ডে দারগার নৌকাস্থিত ডংকায় ডংকামারা কার্যে দেখিয়াছেন। সেই নাজেম মিয়াঁর মধ্যম ভ্রাতা কাজেম মিয়াঁ নিরক্ষর ভদ্রসন্তান। অন্য কাহার নিকট চাকুরী করে না। আমার পিতার নিকটেই কার্য করে। আমরাও কাজেম

ভাই বলিয়া ডাকি। সেই কাজেম মিয়া জাগিয়া আছে। পিতার তামাকু সাজিয় দিতেছে, ভৈরব মাঝির গল্পও শুনিতেছে। কাজেম মিয়া টিকায় আগুন ধরাইতে নৌকার বাহিরে যাইয়া হঠাৎ ডাঙ্গার দিকে নজর করিতেই যাহা দেখিয়াছে। টিক না ধরাইয়া পিতার নিকট আসিয়া চুপি চুপি বলিল, খুব বড় বাঘ। ঐ দেখুন নৌকার পিছনে পিছনে চলিয়া আসিতেছে। পিতা নৌকার পিছনের দিক চাহিয় দেখিলেন, সত্যই প্রবীণ মানুষখেকো বাঘ। একটা দেশী দল চরি [দলছাড়া ?] ঘোড়ার মত, নৌকার পিছনে পিছনে আসিতেছে। পিতা ভৈরবকে ডাকিয় বলিলেন ভৈরব! পিছনে দেখিয়াছ? ভৈরব বলিল, আমি অনেকক্ষণ দেখিয়াছি শ্রীকণ্ঠের সেই উঠা-নামার সময় হইতে দেখিয়া আসিতেছি। কখনও দূরে পড়িয়া থাকে, কখনও নিকটে আসিয়া পড়ে। আপনারা ভয় পাইবেন বলিয় আমি গল্প করিতে করিতে যাইতেছি। নৌকা এমনভাবে ধরিয়াছি যে উহার বাপেরও সাধ্য নাই যে আমাকে ধরিতে পারে। যখন নৌকার নিকটে আইসে তখন ভাল করিয়া দেখিতে পাই। বাতাসের জোর হইলে ও কোথায় পড়িয় থাকে। এমনই লোভ যে সাধ্য নাই তবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। প্রায় দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ পথ আমাদের পিছনে লাগিয়া আছে। কোন ভয় নাই আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকুন। বড় মিয়া (আমি) যদি জাগিয় থাকেন, তবে তাঁহাকে তাজা বাঘ দেখিতে বলুন। তাজা বাঘের কথা শুনিয় বড়ই ভয় হইল। বাঘের গল্প শুনিতে শুনিতে বাঘই যেন খেয়ালের উপরে ছিল, মনেও বাঘের কথাই জাগিতেছিল। আমি আর উঠিলাম না। মাথা উঠাইয় নৌকার পশ্চাৎ হাল বাঁধা দিকে চাহিতেই দেখিলাম, দূরে একটা গরু কি ছোট রকম ঘোড়া চলিয়া আসিতেছে। তাহার গায়ে অনেক জোনাকি পোকা লাগিয় চকমক করিতেছে। বাতাসের গতি ক্রমে কমজোর হওয়ায় নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে। সে দুরন্ত জানোয়ারটা যেন স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে এরূপ হইল যে নৌকার মাঝির সমসূত্রে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। নৌকা এমনই ধীরভাবে চলিয়াছে, যে জানওয়ারটা ইচ্ছা করিলে নৌকা ছাড়াইয়া বহু আগে চলিয়া যাইতে পারে। তাহা সে গেল না। তাহাতেই বোধ হইল, যে ভৈরবের প্রতি উহার লোভ হইয়াছে। দৈববশতঃ বাতাস এমনি পড়িয়া গেল যে, স্রোত কাটিয়া নৌকা আর উজাইতে পারে না। স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতে ভাসাইয়াও পিছনে হঠাইয়া লয় না, এক অঙ্গুলী পরিমাণও আগে বাড়িতে পারে না। পিতা কাজেম মিঁয়াকে বলিলেন, নৌকার

ঝাঁপ জানালা মজবুত করিয়া বাঁধিয়া নৌকার ছইয়ের (ছাদ) উপর লগী হাতে করিয়া ভৈরবের নিকট যাইয়া বসো, দেখ কি হয়। এখন পাড়ি দিয়া ওপারে যাইতে হইলে অনেক দূর ভাটিয়া পিছনে পড়িতে হইবে। যেই বাতাসের জোর হইবে অমনি পাড়ি ধরিবে। এপারে আর থাকিব না। বালাই- যখন পাছে লাগিয়াছে তখন শীঘ্র ছাড়িবে না। রাত্র প্রভাত না হইলে আর আমাদের পাছ ছাড়িবে না। কাজ কি? ভয়ে ভয়ে রাত জাগরণ করিয়াই বা লাভ কি? ভৈরবও বলিল হুজুর! তাহাই করিব, একটু বাতাসের জোর হইলে পাড়ি দিয়া ওপারে যাইব। নদীর মধ্যে কোন কোন স্থানে দুই প্রকার স্রোত আছে। তাহাকে রায়ভাঁটা বলে। যেমন এই চন্দনার স্রোত উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। বাঁকের বক্রতা অনুসারে স্রোত বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। যেখানে স্রোত বাঁকিয়া গিয়াছে প্রায় সেই সকল স্থানেই রায়ভাঁটা জন্মিয়া থাকে। স্রোত দক্ষিণে যাইতেছে, আবার বাঁকের স্থান হইতে একটা ধার দক্ষিণ মুখে না যাইয়া বাঁকের কিনারার শক্ত মাটিতে বাধা পাইয়া দুই তিন হাত পরিসর হইয়া নদীর কিনার হইয়া বিপরীত দিকে—উত্তর দিকে বেগে ছুটিয়া কিছু দূর যাইয়া বহু জলে মিশিয়া স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণের স্রোত সহিত মিশিয়া যাইতেছে। দৈব ঘটনায় আমাদের নৌকা রায়ভাঁটার গতিতে একেবারে পাহাড়ীর কিনার ঘেঁসিয়া ঠেকিয়া পড়িল। ওদিকে বাঘও হুংকার ছাড়িয়া ভৈরবের নিকটে আসিয়া পড়িল। নৌকা রায়ভাঁটার ধাক্কা খাইয়া উলটা স্রোতে একেবারে কিনারে আসিয়া ঠেকিয়া পড়িয়াছে। বাঘেরও সুবিধা হইয়াছে। বিকট গর্জনে সাদা মূলার মত দাঁত বাহির করিয়া আসিতেই ভৈরব হাল কাচাইতে লাগিল। নৌকা ধাক্কা খাইয়া মড় মড় করিয়া উঠিতেই আমরাও ভয়ে হাউ মাউ করিয়া সোরগোল করিয়া উঠিলাম। ভৈরবও সোর করিতেছে দূর দূর করিয়া হাল নাড়িতেছে। কাজেম ভাই বৃহৎ এক লগী লইয়া ভৈরবের নিকট দাঁড়াইয়া দমাদম মাটিতে আঘাত করিতেছে। অন্য মাল্লা দুইজন তাহারা লগী লইয়া নৌকা ঠেলিয়া ভাসাজলে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ নৌকার ছাতের থামে বাড়ি দিয়া খট্ খট্ শব্দ করিতেছে। বাঘ নৌকার পিছনের নিকট আসিয়া আর আগে বাড়িতে পারিল না। কিন্তু কাজেম মিঁয়ার লগীর দুই এক ঘা খাইতেই যেন বাঘ মহা গর্জন করিয়া লেজ ঘুরাইয়া লাফ দিয়া ছইয়ের উপরে কাজেম মিঁয়ার ঘাড়ের উপর পড়িবে, ঈশ্বরের মহিমা নৌকা ছুটিয়া রায়ভাঁটার কল্যাণে তীরবেগে মধ্য নদীতে আসিয়া পড়িল। বাঘের গর্জনে যেন

চার দিক কাঁপাইয়া তুলিল। তখন মাঝিরা দাঁড় ধরিয়া জোরে জোরে দাঁড় টানিয়া নদী পাড়ি দিয়া এপারে আসিল। বাঘ নদীর দিকে মুখ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমরা বাঘকে পূর্ব পারে রাখিয়া চন্দনার পশ্চিম পার ধরিয়া চলিলাম। বাতাস মন্দ মন্দ বহিতেছে। নৌকা ধীরে চলিল। আমাদের আর ঘুম হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে হইতে আমরা চন্দনার মুখের নিকট অর্থাৎ পদ্মা-চন্দনার সংযোগ স্থানে উপস্থিত হইলাম। পদ্মার সুশীতল সুমিষ্ট বায়ু শরীরে লাগিয়া বড়ই সুখ বোধ হইল। বেলা আড়াই প্রহরের সময় ডাকদহ-র মোহনায় আসিয়া নৌকা বাঁধা হইল। স্নান আহার সমাধা করিয়া ডাকদহ হইতে নৌকা ছাড়িলাম। দেখিলাম, ডাকদহের উন্নতি হইতেছে। বাজার বসিয়া গিয়াছে। সরকারী ঘর দরাজা উঠিতেছে। রেল চলিবে পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহার জন্য সাবেক গৌরীর মোহনা যেখানে পদ্মার সহিত সংযোগ হইয়া পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। মঙ্গলবাড়ীয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে রেলওয়ে স্টেশনের গাঁথনা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বের সে ডাকদহ যেন আর নাই, ৭।৮ মাসের মধ্যেই গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। ডাকদহ-র মোহনা হইতে লাহিনী পাড়ার ঘাট বেশীদূর নহে। দেড় ক্রোশেরও কিছু কম, নৌকা ছাড়িয়া দিলেই ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার ন্যায় গৌরী স্রোতে নৌকা চলিতে থাকে। আমাদের ঘাটে পিতার আদেশে ঢাকা হইতে যে কাপড়, জরির টুপী নূতন তৈয়ার করিয়া আনা হইয়াছিল তাহাই পরা হইল। এখন পর্যন্ত সে টুপীটার আকৃতি ও রঙ্গের বিষয় আমার মনে আছে। সবুজ রঙ্গের মখমল সাবেক ফ্যাসানের গোল টুপী পাল্লাদার। উপরের পাল্লায় জরির কাজ করা। প্রতি পাল্লায় একটি বড় ফুল তোলা। বাটীতে গিয়া মাতামহীর পদসেবা করিলাম। কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ কাছে আসিল। ডাকদহের মোহনা হইতে মেঠাই বাতাসা খরিদ করিয়া আনা হইয়াছিল। ছোট ছোট ভাইদিগকে দেওয়া হইল। আমার প্রথম প্রবাস এই স্থানে শেষ হইল।

সপ্তাহ মধ্যে সংবাদ আসিল যে আমার বৈমাত্র মাতামহী আমার জন্য সর্বদা কান্নাকাটি করেন। আমাকে কয়েক দিন না দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়াছেন। কিছুতেই তিনি আমাকে না দেখিয়া পদমদীতে একা একা থাকিতে পারিবেন না। হয় তাঁহাকে এখানে আনুন, আর না হয় বড় মিঁয়াকে (আমাকে) পদমদী পাঠাইয়া দিন। আমার মাতামহী আমার পদমদী গমনে নিতান্তই নারাজ হইলেন। বৈমাত্র মাতামহীকেই আমার জন্য লাহিনী পাড়ার বাটীতে আসিতে হইল।

৪।৫ দিনের মধ্যে পালকি বেহারা যোগে তিনি লাহিনী পাড়ার বাটীতে আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে চুমা দিয়া বলিলেন; সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যে সময় ইহার মুখের প্রতি আমার প্রথম নজর পড়িয়াছে আমার বোধ হইয়াছে যেন আমার কন্যার পেটের সন্তানই বুঝি বিদেশে ছিল ফিরিয়া বাড়ী আসিল। আমার চক্ষে সেই মুখ সেই নাক সেই চোখ সেই যেন আসগার আলী। হামিদন্নেসা, আর দৌলতননেসা এ দুই আমার নিকট একই বোধ হইতেছে, কিছুই তফাৎ নাই। তারা বেহেস্তের মানুষ বেহেস্তে চলিয়া গিয়াছে—আমরা দুই বুড়ি দুনিয়ার চাপনে পড়িয়া আজাবে রহিয়াছি। কপালের দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছি—ইহাকে দেখিলে কলিজাটা ঠাণ্ডা হয় বলিয়া আমি ছুটিয়া বাহির হইয়াছি। হামিদন মরিয়া গেল—মনে করিয়াছিলাম যে, পদমদীর এই বাড়ী হইতে আর বাহির হইব না। হামিদনের কবর ছাড়িয়া আর কোন খানেই যাইব না। খোদাতালার মরজি তাহা নহে। এই আমার হামিদনের পেটের সন্তান এই আমাকে ঘরের বাহির করিল। দোয়া করি আমার ৫ গুণ পরমায়ু তুমি পাও। সুখে থাক, দিন-দুনিয়া ভাল হউক, পরকালে বেহস্ত নসীব হউক। বৈমাত্র মাতামহী আমাদের লাহিনী পাড়ার বাটীতেই রহিলেন, আদর যত্নের ক্রটি হইল না। আক্ষেপ ইহাই রহিল—যে আমার মাতার জীবিত কালে বহু যত্নেও লাহিনী পাড়ায় আইসেন নাই। ঈশ্বরের মহিমা এইক্ষণ ইচ্ছা করিয়া উপযাচক হইয়া না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঈশ্বর চক্ষে অহঙ্কার নিতান্তই বদ।

পিতা সিরাজগঞ্জের অধীন পরগণে বড় বাজুসৌলী গ্রামে যাইয়া আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান মীর মহতেসাম হোসেনকে লাহিনী পাড়ায় লইয়া আসিবেন এবং দুই ভগ্নীকেও আনিবেন। এ বয়সে তাদের আর দূরদেশে থাকা ভাল দেখায় না—মনে করিলেন। আরও কথা ডাকদহের মোহনার উন্নতির সহিত মহকুমা স্থাপন, রেল গাড়ী, একটি ইংরেজী স্কুল হইবে। সেই স্কুলে আমাদিগকে পড়িতে দিবেন। যদি অসুবিধা হয় তবে ঐ স্থানে একটি বাসাবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আমরা সেখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িব ইহাই স্থির হইয়াছে। বামনা ঢাকা মোসলমান সমাজে, সায়েস্তাবাদের মীর সাহেবদিগের মুখে ইংরেজী শুনিয়া ইংরেজী ভাষার প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ঘৃণা ছিল তাহা অনেক পরিমাণ ছুটিয়া গিয়াছে। বিশেষ আমাদিগকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মনে মনে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। এদিকের কার্য শেষ হউক বা না হউক স্কুল খুলিলেই আমাদিগকে,

ভর্তি করিয়া দিবেন, এই ইচ্ছাটা বড়ই প্রবলের সহিত খাঁটিরূপে অন্তরে জাগিয়াছে।

পিতা সৌলী চলিয়া গেলেন। আমরাও স্কুল বসিবার আশায় থাকিলাম। বাড়ীতে কাজ-কর্ম কিছুই নাই। বড় বড় লোকে তাস খেলা করে। আমরা গোপনে কানাচি গোয়াইল ঘরে ঢেকসালায় মধ্যে তাহা কেন খেলিব? কত বড় বড় লোক প্রকাশ্য মজলিসে, কত লোকের সম্মুখে, বোট বজরায় তাস খেলা করে দেখিয়াছি। ও খেলায় কোন দোষ নাই। বিশেষ নবাব সাহেব বলিয়াছেন, দেল বাহলান মাত্র কোন দোষ নাই। তবে ছোট লোকের সঙ্গে খেলিতে বারণ। আপন আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব সহিত খেলা করিতে কোন দোষ নাই।

এই মূলমন্ত্র সার করিয়া এই উপদেশ প্রতি নির্ভর করিয়া আমরা প্রকাশ্যভাবে তাস খেলা করিতে লাগিলাম। দিনরাত তাস খেলা হইতেছে। খেলা সেই—বিবিধরা—গোলামচোর। এই সকল খেলা ভিন্ন তখন তাসের আর কোন খেলা শিক্ষা হয় নাই—নামও জানি না। সকালে খেলা আরম্ভ হয়। দু প্রহরে ভাঙ্গে। খাওয়া-দাওয়ার পর আরম্ভ হয়, সন্ধ্যায় ভাঙ্গে। সন্ধ্যার পর রাত্রে আহার করিয়া খেলা আরম্ভ হয়, কোন কোন দিন রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্য উঠিয়া রৌদ্র ছাইয়া পড়ে।

বৈমাত্র মাতামহীর লক্ষ্য চারদিকে। তিনি দেখিলেন তাস খেলায় এরা বড়ই মাতিয়াছে। দুই তিন দিন পরে একদিন আহারের সময় বলিলেন। আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, তোমার সে কথা মনে আছে? আমি বলিলাম কোন্ কথা? তিনি বলিলেন—ছি ছি, এই বয়সে এত ভুল! কাজের সময় কাজ করিবে কি প্রকারে? মাতামহীর কখনই এরূপভাবে আমাকে কোন কথা বলেন না। তাঁহার মনে একটু লাগিয়াছে বলিয়াই একটু মিঠেকড়ার আমেজের আভাষে বলিলেন। পুনরায় বলিলেন মনে হল না? সেই পদ্মনদীতে কি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? আমি মাথা হেঁট করিয়া বলিলাম, মনে হইয়াছে।

তিনি বলিলেন, মনে যদি হইয়া থাকে তবে শুনিবার এই উপযুক্ত সময়। তোমারও অবসর আমারও অবসর। তোমার পিতা সিরাজগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমাদিগকে স্কুলে দিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সময় পড়িবে—না, পূর্ব কাহিনী গল্প শুনিবে? তাহার পর আমি কোন সময় চলিয়া যাই দম বাহির হয়, জানিনা। আমার বড়ই আক্ষেপ রহিয়া যাইবে যে কথাগুলি দুনিয়ায় রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। তোমার যেরূপ ভাব আমি দেখিয়াছি, দেখিতেছি তাহাতে

তোমার মনেই আক্ষেপ হইবে যে হায়! সময় সুযোগ পাইয়া মাতামহীর নিকট শুনিয়া রাখিলাম না। আমি আশীর্বাদ করি আমার বলায় আর তোমার শুনা বিফল হইবে না। খোদাতালা মঙ্গল করিবেন। আমি আজিকার রাত্র হইতে কথা বলা আরম্ভ করিব। সন্ধ্যার পরে আহার করিয়া তোমরা সকলেই একত্র হইয়া আমার কাছে আসিবে। আমি কথা বলিতে আরম্ভ করিব। তোমার পিতা সিরাজগঞ্জ হইতে আসিলেও যদি শেষ না হয় খোদাতালা কোন সুযোগ করিয়া দিবেন, আর তিনি বাড়ী আসিলেই যে তোমরা বিদেশে চলিয়া যাইবে তাহাও নহে। যাহা হয় হইবে পরে দেখা যাইবে, এইক্ষণে ইহাই স্থির হইল। আজ রাত্র হইতে আমি কথা আরম্ভ করিব।

আমি মাতামহীর মুখে শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলাম। যাহা শুনিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা—সময়ে ঐ সকল কথা বলিতে আমি উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট অনুরোধ করিব—না তিনিই আগ্রহ করিয়া শুনাইতে ইচ্ছা করিলেন; আর কি কথা আছে। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া মাতামহীকে ঘিরিয়া বসিয়া আমরা পুরাণ কথা শুনিতে বসিলাম।

বংশ পুরাণ

শুন আগে তোমাকেই কয়েকটি কথা বলি। পদমদীর বাটীতে তুমি যাহা যাহা বলিয়াছিলে, আক্ষেপও করিয়াছিলে, টাকা কড়ি ধন দৌলত দেখে, কাঁপিয়া গিয়াছিলে, তাহাও বলিয়াছ—যাহা কখনও দেখ নাই—তাহা আবার বামনায় গিয়া দেখিয়াছ। যাহা কখনও খাও নাই তাহা খাইয়াছ। বাইজী দেখিয়াছ, খেম্‌টাওয়ালী দেখিয়াছ। নাচ দেখিয়াছ, গান শুনিয়াছ। কত অলংকার, কত জরির কাপড় দেখিয়াছ তাহার অন্ত নাই। আফ্‌সার চৌধুরী একরাত্রে পাঁচবার পাঁচরকমের কাপড় বদলায় তাহাও দেখিয়াছ। সোনা খায়, মতি চিবয়—সুখের সীমা নাই, তাহাও বলিয়াছ। এত টাকা! বাপরে বাপ! কোথা হতে টাকা পায়—কি করে এত টাকা হলো? ভাবিয়া স্থির করিতে পার নাই—তোমার বুদ্ধিতে আইসে নাই—একথাও বলিয়াছ। আমার এই কথাটা তুমি খুব মনে রেখ। যাহাদের টাকা নাই, খাওয়া পরাতে খেজালত নাই, কোন ঝঞ্ঝাট নাই, সত্য সৎ পথে থেকে যাহারা যা পায়, তাহাতেই খোদাতালা "বরক্কাত" দেয় তাহারাই সুখে থাকে। অন্যায় অত্যাচার চুরি ডাকাতির টাকা, যে পথে আসে সেই পথে যায়, মনে রেখ যে টাকা যে পথে আসে সেই পথে যায়। যে টাকা সহজে হাতে আসে ঘরে উঠে, সে টাকা সহজেই বাক্স সমেত চলিয়া যায়। যে বাড়ী বসিয়া বিনা পরিশ্রমে টাকা পায়, সে টাকা বাড়ী বসিয়াই, বিনা মেহনতেই চলিয়া যায়।

বিনা মেহনতে এক দণ্ডে যে টাকা পাওয়া যায়, সে টাকা এক দণ্ডের মধ্যেই চলিয়া যায়। মেহনত পরিশ্রম দেহের খাটুনীতে যে টাকা ঘরে আসে সে টাকা শীঘ্র যায় না। ঐরূপ দেহের খাটুনী মেহনত পরিশ্রম না করিলে সে টাকা অন্তের হাতে পড়ে না। যে টাকা যত দিনে কত সময়ে হাতে আসে, সে টাকা ততদিনে তত সময়ে হাত থেকে চলিয়া যায়।

বুঝিলে আমার কথা। বাম্‌নার ঘরের টাকা!—যেমন ছালা ভরিয়া আসিয়াছিল—নৌকা ভরিয়া চলিয়া গেল। আরও যাইবে। আমি দেখিতে পারিব না। খোদা তোমাকে দেখাইবেন। বেশী বাড়িলেই ঝড়ে ভাঙ্গে। টাকা খরচ করিয়া সৈয়েদের ঘরে আসিয়াছে। টাকা দিয়ে সৈয়েদের ঘর হইতে মেয়ে নিয়েছে। তুমি দেখিও ওঁর সময়েই ওঁর শেষ। যে সৈয়েদ টাকার

লোভে জাত বেচিলেন তাঁহারও শেষ। টাকা কয় দিনের? আপন সমাজে সমান সমান ঘরে বিবাহ করা এবং দেওয়া দুই ভাল। বড় ঘর দেখিয়া উঠিতে গেলেই পা পিছলে পড়ে যায়। দিতে গেলেও উছট খেয়ে ছটকে পড়ে। বংশে বাতি দিতে কেউ থাকে না। সে ঘরে মানুষের বাস হয় না, চাম্‌চিকে, মাকড়সা, তেলাপোকা, ছুঁচো, ইন্দুর আর বাদুড়েরই অধিকার জন্মে। দুই একটা অন্ধকার ঘর পেঁচা দখল করিয়া বসে। আমি যা যা জানি, বলিতেছি। আমার অজানা আরও আছে। তুমি এই স্বত্র ধরিয়া খোঁজ নিও—সন্ধান করিও—আরও কত জানিতে পারিবে। দেখ! চোর, ডাকাত, জালিয়াত, জালেম, দারগা, কবিরাজ, ডাক্তার ইহাদের টাকা যে পথে আয়, সেই পথেই প্রায় ব্যয় হয়। একশ জনাব মধ্যে পাঁচজন কিছু দিন টিঁকে যায়। এখন বুঝিতে পারিবে না,—যত বড় হবে, যত বুদ্ধি বেশী হবে, ততই আমার কথার ভাব—মানে বুঝিতে পারিবে।

ঐ যে বামনার চৌধুরী, যার বিবাহে গিয়েছিলে—ওর সকল খবর ত তোমরা জান না। ওর বিয়ে ওর বোনের বিয়ের খরচের কথাটা বলি। ওর বোনের বিবাহ খয়রাতী মিয়ার ছোট ভাই, আবদুস সামাদ সঙ্গে দশ হাজার টাকা পণ দিয়ে দিয়েছে। পণ কাকে বলে জান? ছোট জাত বড় জাতের ঘরে যেতে হলেই বড় জাতের কর্তাকে টাকা দিতে হয়। বড় ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে হলেই টাকা দেয়—সেই টাকাকে পণ, অর্থাৎ মর্যাদা বলে। এ মর্যাদা কেবল বংশ মর্যাদা—জাতের মর্যাদা। অবস্থার মর্যাদা নহে। ফকরণনেসার বিবাহে বামনার পর পদমদীর ঘরের মর্যাদা দিয়াছে দশ হাজার টাকা। আর যে সকল ভদ্রলোক ঐ বিবাহে বরযাত্রী হইয়া বরের সঙ্গে পদমদী হইতে বামনা গিয়াছিলেন, যে যেমন বংশ মর্যাদার মান্য, তাঁহাকে সেইরূপ নজর সেলামী দিয়াছিল। ৫০০ শত টাকার উপর নহে। এক শত টাকারও কম নহে। ইহার পর যাওয়া আসার বারবরদারী খরচা দিয়াছিল। সেই বিবাহে এক লক্ষ টাকার কম খরচ হয় নাই। তাহার পর আফসরদ্দীন নিজে বিবাহ করেন, তোমাদের এই দেশেই এখান হইতে বেশী দূরে নহে। কুমারখালির নিকটে এদরাকপুর তাহার নিকটেই গোপালপুর। গোপালপুরের, মাঙ্গন মিয়াঁর মেয়েকে বিবাহ করেন, সাত হাজার টাকা পণ, আর ঐরূপ মর্যাদা। সে বিবাহে নাচ গান বাদ্য বাজনাতেও বিস্তর খরচ হইয়াছিল, সে স্ত্রী বিবাহের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে মরিয়া যায়। তাহার পর শেষ বিবাহ জোকাগ্রামে মৌলবী হামিদউদ্দীনের তোমারই চাচাত ভগ্নীর কন্যা—

মেয়ে, তোমার ভাগিনেয়ী—বদরুণনেসা। যাহার বড় বোন আবেদননেসা ঢাকার ওয়াহেদ আলীর স্ত্রী। আফসারের এই দুই বিবাহে ঘুষ পণের বাবত মর্যাদায় প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ভগ্নীর বিবাহেও এক লাখের উপর ছাড়া কম ব্যয় হয় নাই। আর বামনার বাড়ীর খরচ ত নিজ চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছ। জমিদারীতে প্রায় ৩০।৪০ হাজার টাকা আয়। আফসার চৌধুরীর বাপের নাম হোসেনদ্দী চৌধুরী। হোসেনদ্দী চৌধুরী মন্দ লোক ছিলেন না। এ সকল জমিদারীর বেশী অংশই তাঁহারই সময়ে হইয়াছে। হোসেনদ্দী চৌধুরীর পিতা বড়ই জবরদস্ত লোক ছিলেন। তিনিই টাকা মজুদ করিয়া রাখিয়া যান। কত টাকা সে কথা কেহই বলিতে পারে না। তাহার সময়ে বরিশাল, বামনা অঞ্চলে অনেক ডাকাতের দল ছিল। কোন কোন জমিদার ঐ সকল ডাকাত দলের হর্তাকর্তা—একরূপ বিধাতা ছিলেন। আপন প্রজা ডাকাত। তাহাদের সাহায্য সহায়তা, রক্ষা সকলই জমিদার করিতেন। লোকে বলে, বামনার ঘরের, পূর্বপুরুষগণও ডাকাতের সর্দার ছিলেন। ডাকাতগণ তাহাদের মিলনের দিনে সকলে জঙ্গলে মিলিত হইত। সে জঙ্গল মধ্যে নাকি কালী ঠাকুরাণীর প্রতিমা ছিল। সত্য মিথ্যা খোদা মালুম। অমাবস্যায় ঐ কালীর পূজা করিয়া ডাকাত দল, দলপতির পায়ের ধূলা মাথায় এবং তাঁহার আশীর্বাদী সিন্দুরের ফোঁটা কপালে লইয়া মা কালী! মা কালী! বলিয়া যাত্রা করিত। এই সকল ডাকাতের দল নৌকা পথে ডাকাতি করিত। এক এক দল ৩।৪ খানা নৌকা সঙ্গে করিয়া বড় বড় নদীর মধ্যে চলিয়া যাইত। মহাজনী নৌকা, কোন ভদ্রলোকের, যাত্রীর নৌকা, জমিদারের নৌকার উপরে সুযোগ মত পড়িয়া সর্বস্ব লুট করিয়া আপন নৌকায় তুলিত। এইরূপ তিন চার মাস নদীপথে ডাকাতি করিয়া বাড়ী আসিত। লুটের মাল সমুদায় জমিদার দলপতির নিকট ঐ কালী বাড়ীতে হাজির করিত। তিনি যাহার যেরূপ পাওনা ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়া তাঁহার নিজ অংশের পাওনা লইতেন। ডাকাতি করিবার সময় কত মানুষের মাথা কাটিত, বন্দুকের গুলিতে জীবন শেষ করিত। মানুষ খুন তাহাদের মতে উপস্থিত মত কর্তব্য কার্য। সে সময় এখনকার মত, রাজশাসন ছিল না। জমিদারেরাই, প্রায় সকল বিষয় আপন আপন প্রজার মধ্যে বিচার করিয়া মীমাংসা করিতেন।

শুনিয়াছি একবার এই দলের ডাকাতের এক দল যে কুকাণ্ড করিয়াছিল, তাহা শুনিলে কলিজার রক্ত পাণি হয়। সে ঘটনা শুনিয়া অপর লোক আমরা,

আমাদের প্রাণ কান্দে, কিন্তু বাপের প্রাণ কান্দিল কি না দেখা গেল না—মা—ত আসল খবর জানিতেই পারিল না। মায়ে শুনিল, কন্যা জামাতা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিল। অলংকার জিনিসপত্র ডাকাতেরা লুট করিয়া লইয়াছে। কোথাকার ডাকাত তাহা শুনিবেন কার মুখে ?

নতুন জামাই। বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে প্রথম লইয়া যাইতেছে। দান, দোহেজ জিনিসপত্র অলংকার আদি লইয়া স্ত্রী স্বামীর ঘর করিতে যাইতেছে। অলংকার জিনিসপত্র কত কিছু দিয়া মাতা, কন্যা জামাতাকে বিদায় করিলেন। আপন হাতের একটা বহু মূল্যবান অঙ্গুরী কন্যার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। স্ত্রীর ইঙ্গিতে কর্তাও আপন হাতের সাঙ্কেতিক নিজ নাম খোদা অঙ্গুরী জামাইয়ের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। আর আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র দিয়া দুইখানি নৌকা সাজাইয়া কন্যা জামাইকে বিদায় করিলেন। নৌকার উপর বন্দুক গুলি বারুদ, তরবার, বল্লম, বর্শা সকলি দিলেন। সর্দার লাঠিয়াল খেলোয়াড় লোক ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সঙ্গে দিলেন। পথে ডাকাতের ভয় আছে। ইহাদের পালা পোষা ডাকাত দলও আছে। সাতদিন সাতরাত গেলে তবে জামাতা আপন বাটীতে যাইতে পারেন। খাদ্য সামগ্রী, দাসী, বান্দী, চাকর, চাকরানী, নেগাহবান, সর্দার লাঠিয়াল লইয়া জামাইবাবু, শ্বশুর বাটী হইতে রওয়ানা হইলেন। দুই দিনের পথ আসিলেন। কোন কথা নাই। নিরাপদে আসিতেছেন। তিন দিনের দিন বাদাবনের মধ্যের খাঁড়ী (কম পরিসর নদী) বাহিয়া আসিতেছেন। সার ভাঁটা। জলস্রোত বেগে ছুটিয়াছে। সময় প্রভাত সূর্যের উদয়। জামাইবাবুর সঙ্গে তিন খানি নৌকা। বড় নৌকা দুইখানি, একখানি বাবরচিখানা নৌকা, প্রাতে তিন নৌকা একত্র ছাড়িয়াছেন, বাবরচিখানা নৌকা অনেক পিছনে পড়িয়াছে। নদীর বাঁকের আড়ালে পড়ায় আর দেখা গেল না। খাড়ির মধ্য হইয়া নৌকা সার ভাঁটায় তীরবেগে ছুটিয়াছে। তাহার দুই পাশে জঙ্গল ভিন্ন, জনমানব বসতীর নাম নাই। ক্রমাগত দুই প্রহর গেলে দক্ষিণ সাবাজপুর পাওয়া যায়। জামাইবাবুর নৌকার আগে সঙ্গী লোকজনের নৌকা। বাবরচিখানা নৌকার খোঁজখবর কিছুই নাই। জামাইবাবু নৌকার মধ্যে নিদ্রিত। দুই এক জন চাকর নৌকার ছাদের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছে। মাঝির সহিত কথাও কহিতেছে।

এ নৌকায় চার দাঁড়। স্রোতের উপরে চার দাঁড়ই যথেষ্ট। তীরের বেগে নৌকা ছুটিয়াছে। মাঝি অন্যমনস্কেও হইতে পারে, কি বাবরচিখানা নৌকা

কতদূর পিছনে পড়িল, ঘাড় ফিরিয়া পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিতেই দেখিল, একখানি বড় পানসী আট দাঁড় বাহিয়া অতি ত্রস্তে পিছনে পিছনে আসিতেছে। মাঝির মনে সন্দেহ হইল। কাহার নৌকা? দেখিতে দেখিতে দেখিল আর একখানি ছয় দাঁড়ের নৌকা। আগে পিছে হইয়া আসিতেছে। আসিতেছে—যথাসাধ্য দাঁড় বাহিয়া আসিতেছে। মাঝিও ঐ দেশী। চোরই চোরকে চেনে। সাধুই সাধুকে জানে। মাঝিও আপন দাঁড়ীদিগকে বলিল—সাবাস মোর ভাই। সকলে জোরে জোরে টান দেখি। জাগ বলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড় টান দেখি। ডাকে হাঁকে নৌকা চালাও দেখি। ভাই সকল! বাবা সকল! এ মনিবের লবণ বহুদিন খাইয়াছ, মনিবেরই একমাত্র মেয়ে, তাহারই স্বামী, দুইজনকে লইয়া যাইতেছি। ভাই সকল আমাদের হাতেই এখন তাহারা। পিছনের খবর ভাল নয়, সুবিধামত চাহিয়া দেখ—ওরা ভাল ভাবে আসিতেছে না। আমি ওদের হাব-ভাব নৌকার উপরের সাজ সরঞ্জাম দেখে যাহা বুঝিবার বুঝিয়াছি। ভাইরে! মনিরদ্দী চৌধুরীর নাম ডুবাস না। কুলে যেন কালি পড়ে না। গায়ের জোর পরাণের জোর, কলিজার জোর এ তিন জোর এক সঙ্গে করে, নৌকা উড়াইয়া লইয়া চল। পিছনের দুই নৌকা তীরবেগে ছুটিয়াছে। ইহারাও কম নহে, তাহারাও কম নহে। সর্ব পিছনের নৌকা অনেক দূরে পড়িয়া গেল। জামাই বাবুর দুই নৌকাই জোরে ছুটিয়াছে। পিছনে আট দাঁড়ের নৌকার দাঁড়ীরাও যেন প্রাণপণ করিয়া নৌকা চালাইয়াছে। চার দাঁড় আর আট দাঁড়। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই জামাইবাবুর নৌকার পঞ্চাশ হাত তফাত, পিছনে থাকিতেই সাঁ সাঁ করিয়া দুইটি তীর জামাইবাবুর নৌকার মাঝির কানের নিকট হইয়া সম্মুখের নৌকার মাঝির পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইতেই, মাঝি বাপরে বাপ—শব্দ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। নৌকার মধ্যস্থিত সর্দার লাঠিয়ালেরা সোর গোল করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে মাঝি হাল ছাড়িয়া জলে পড়িয়া গিয়াছে। নৌকা ঘুরিয়া আড়ভাবে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বন্দুকের শব্দ। ক্রমাগত চার আওয়াজ। জামাইবাবুর নৌকার মাঝি খুব পাকা, চার আওয়াজে ভড়কে নাই। এখন কৌশলে নৌকা ধরিয়াছে যে, তাহাদের সঙ্গী নৌকা পিছনে ফেলিয়া বহুদূর চলিয়া গেল। আট দাঁড়ের নৌকার সম্মুখে, জামাইবাবুর সঙ্গীর নৌকা, যে নৌকার মাঝি জলে পড়িয়াছিল। সে নৌকাতেও বন্দুক, তরবারী বল্লম বর্শা ছিল ব্যবহারের লোকও ছিল। লোক থাকিলে কি হইবে? শিক্ষিত ডাকাতের হাতে পড়িলে কতক্ষণ, অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই জামাইবাবুর সঙ্গী নৌকার

মাঝি মাল্লা লোক জনকে অস্ত্রাঘাত, কাহাকে বন্দুকের গুলি মারিয়া জলে ফেলিয়া দিল। ডাকাতদল এইসকল কার্য করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গী ছয় দাঁড়ের পানসী আসিলেই, খালি নৌকা তাহাদের জিম্বা করিয়া দিয়া চুপে চুপে কি কথা বলিয়া ডাক ছাড়িয়া জামাইয়ের নৌকা উদ্দেশ্যে ছুটিল। এদিকে ডাকাত দলের ২য় নৌকার ডাকাতদল জামাইবাবুর সঙ্গী নৌকা, যাহার মাঝি মাল্লা ঘেরিয়া জাল ফেলিয়াছে। নৌকার মধ্যে টাকা পয়সা খাদ্য সামগ্রী যাহা নৌকায় ছিল তাহা ডাকাতেরা আপন নৌকায় উঠাইয়া নৌকার তলায় কুড়াল মারিয়া চিরিয়া ফাঁক করিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে নৌকা জলমগ্ন হইল।

নৌকা ডুবাইয়া দিয়া ডাকাতেরা—ভাসিতে ভাসিতে চলিল। ওদিকে ডাকাত দলের বড় নৌকা মুহূর্ত মধ্যে জামাইবাবুর নৌকা ধরিয়া প্রথমে মাঝিকে দূর হইতে বন্দুকের গুলিতে জলে ফেলিল। মাঝি না থাকিলে যাহা হয় তাহাই হইল। নৌকা স্রোতের উপর ঘুরিয়া বেড়াতেই আর একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া হাল ধরিয়া নৌকা সোজা করিল বন্দুকের গুলিতে সেও পড়িল। এই অবসরে ডাকাত দল নৌকায় আসিয়া দাঁড়ী, কয়েকজন চাকর-চাকরানী যাহারা ঐ নৌকায় ছিল তাহাদিগকে দড়ি-দড়া দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া নৌকার "গুর" কাঠের সহিত বাঁধিল। জামাই মেয়েকে প্রাণে মারিল না—হাত পা মুখ চোখ বান্দিয়া আপন নৌকায় আনিয়া বান্দিয়া রাখিল। নৌকার জিনিসপত্র যাহা ছিল সমুদায় আপন নৌকায় তুলিয়া জামাইবাবুর নৌকার তলায় কুড়াল মারিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ত হইলই, সঙ্গে সঙ্গে দশ বার জন জীবন্ত মানুষ হস্ত পদ বাঁধা অবস্থায় নৌকার সঙ্গে জলে ডুবিয়া গেল। ডাকাতের নৌকা চলিয়াছে, সন্ধ্যা ঘোর হইলে বর কন্যার হাতের বাঁধ ছাড়িয়া দুইজনের চক্ষু খুব জোরে বাঁধিয়া ডাঙ্গায় নামাইয়া ডাকাত দল স্রোতের মুখে নৌকা ভাসাইয়া চলিয়া গেল। ডাকাতের দ্বিতীয় নৌকা, বাবরচিখানায় নৌকার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। শেষে শেষ বেলায় তাহাদের দেখা পাইলে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেই তাহারা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যথেচ্ছা সাঁতার কাটিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া গেল। ডাকাতদল নৌকায় যাহা পাইল লইয়া পূর্বমত কুঠার মারিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। জামাই মেয়ে প্রাণে মারিল না ছাড়িয়া দিল—কারণ কি? মারিয়া ফেলিলেই পারিত, কিন্তু মারিল না। কারণ তাহাদেরই দলের প্রধান ডাকাতের অনুরোধে প্রাণে মারে নাই, চোখ বান্দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। সে সর্দার ডাকাত শেষে চিনিতে পারিয়াছে, কাহার জামাই, কাহার কন্যা। ডাকাত

সর্দার আসল কথা ভাঙ্গে নাই। দয়া করিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, এইমাত্র দলের লোকের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। সর্দার ডাকাত জানে যে, সত্য পরিচয় দিয়া প্রাণ রক্ষার অনুরোধ করিলে ডাকাত দল কখনই সম্মত হইত না। এ একেবারে ধরাবাঁধা কথা। উপরোধ-কর্তার প্রাণ রক্ষা ভার। জামাতা কন্যা নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া পুনরায় নৌকা করিয়া শ্বশুরবাড়ীতেই আসিয়াছিল। ডাকাত সমুদায় জিনিসপত্র ও অলংকার লুটিয়া লইয়াছে। সঙ্গের লোকজন বাঁচিয়াছে কি মরিয়াছে কিছুই জানি না। আমাদের নৌকায় যাহারা ছিল তাহাদিগকে নৌকায় "গুর" কাঠের সঙ্গে বাঁধিতে দেখিয়াছি তাহার পরে কি হইয়াছে জানি না। কারণ সেই সময় আমাদেরও চোখ বাঁধিয়া অন্য নৌকাতে লইয়া গেল—সন্ধ্যার পর একটা বাজারের নিকট আমাদিগকে নামাইয়া দিয়াছিল। প্রাণে মারিল না কেন বুঝিতে পারিলাম না। কর্তা শুনিয়া কিছু কিছু বুঝিলেন। কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিলেন না। মুখে আনিলেন না। মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন। কয়েক মাস পরে ডাকাত দল দলে দলে ফিরিয়া আসিল। নির্ধারিত রাত্রে কালী বাড়ীর আঙিনায় কালীর সম্মুখে যখন লুটের মালসকল স্তূপাকার করিল, তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ডাকাত-কর্তা দেখিলেন যে, তাঁহারই দেওয়া জিনিসপত্র, জামাই মেয়েকে দেওয়া জিনিসপত্র সকলই ঐ লুটের মালের মধ্যে আছে। কি করিবেন! মুখে সে কথা বাহির করার সাধ্য নাই। তখনি ডাকাত দল বিগড়িয়া বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিবে। কি করিবেন উপায় নাই। ডাকাত দলের প্রতিজ্ঞানুসারে সে কথা মুখে আনিতে পারিলেন না। নির্ধারিত নিয়মানুসারে ভাগ বণ্টন হইল। এই প্রকারই টাকা জমিদারীর মূল। কত টাকা যে মজুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে হোসেনদী চৌধুরী খুব সৎ শান্ত ধীর ছিলেন। উহাদের ঘরের টাকা কখনই থাকিবে না। শেষ ফল বড় ভয়ানক।

সেই ঘরের সঙ্গে মীর খয়রাতী (মহম্মদ আলী) টাকার লোভে সম্বন্ধ করিয়া ছোট ভাইকে বিবাহ দিয়া ডাকাতের টাকা ঘরে আনিলেন। সে টাকায় তাঁহার কখনই উপকার হইবে না। অধর্মের টাকা, পাপের টাকা, খুনের টাকা যে ঘরে প্রবেশ করে সে ঘরের পতন। নিশ্চয় পতন। আর একটা কথা বলি জাত বেচা টাকায় কখনই কাহার 'ওফাই' করে না। জাউনপুর কোথায় জানি না। মৌলানা কারামত আলী সাহেব জাউনপুরী। তিনি হোসেনদীর বাড়ীতে দলবলসহ গিয়াছিলেন। ওয়াজ নসি হাত করিয়া তাহাকে সৎপথে ধর্মপথে আনিয়াছিলেন।

মুসলমানি কাজকর্ম সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মৌলানা সাহেবের উপদেশ মতে হোসেনদ্দী সকলি করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে খোদার মর্জ্জিতে আফসারদ্দীনের সময়ে, সকলি বিগড়িয়া গেল। অল্প বয়সে বিস্তর টাকা জমিদারী হাতে পাইয়া খুব টাকা পয়সা উড়াইতেছে। পরিণামে ফল সকলই দেখিবে। খোদাতালার নিকট চুল পরিমাণও তফাত হইবে না।

এই এক কথা শুনিলে। আর একটি কথা বলিব আজ আর বলিব না। মীর খয়রাতীর বড়মানুষী দেখিয়া তুমি অবাক হইয়াছ। এখন তাঁহার বাবুগিরি বড়মানুষির কিছুই নাই বলিলে হয়। তিনি ঢাকা কলেজ হইতে ইংরেজী পড়িয়া আসিয়াই জমিদারীর কাজ আরম্ভ করিলেন। নীলের কারবারে খুব টাকা পাইতে লাগিলেন। নীলকার্যের ভার, সমুদায় জমিদারীর ভার—তোমার বাপের হাতে দিয়া, তিনি কলিকাতায় গেলেন। এখানে তোমার বাপ্ নীলকার্যে এতই আয় করিলেন যে, একবার ১২৫ মণ নীলের উপর কলিকাতায় পাঠাইলেন। মীর খয়রাতী নিজে যে কয়েক বৎসর নীলকার্য দেখিয়াছিলেন, তাহাতে বছরে বিশ মণ পঁচিশ মণ নীলের উপর হয় নাই। একবার মাত্র পঞ্চাশ মণ মাল হইয়াছিল। তোমার বাপ্ মেহনত করে বছরে বছরে ৮০।৯০ মণ নীল কলিকাতায় পাঠাইতেন। মৃগীর কুঠীর নীল সাহেবদিগের নীলের সমান দরে বিক্রী হইত। শুনিয়াছি নীল বিক্রী করিয়া মীর খয়রাতী কোন বছর বিশ হাজার কোন বছর পঁচিশ হাজার একবার পাইয়াছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। এ টাকা কলিকাতাতেই খরচ হইত। জমিদারী হইতেও মাস-মাস হাজার টাকা করিয়া কলিকাতায় যাইত শুনিয়াছি। ছয় বৎসরের বেশী কলিকাতায় থাকিতে পারেন নাই। ৬০।৭০ হাজার টাকা দায়ী হইলে, প্রথমে নালিশ আরম্ভ হইয়া ডিক্রি—পরে মাল ক্রোক দস্তক আরম্ভ হইতেই সামান্য অবস্থায় অতি কষ্টে গোপনে বাড়ী আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছোট ছোট মহাজন ত কিছুই করিতে পারিল না। জিনিসপত্র যাহা ছিল একপ্রকার লুট হইয়া গেল। মৌলবী গোলাম কাদের, হায়াতনের স্বামী খয়রাতীর ভগ্নীপতি, সে সময় কলিকাতায় ছিলেন, তিনি কৌশল করিয়া বৈঠকখানার উপরে যে সকল জিনিসপত্র ছিল তারই কতক কতক নৌকা করে আনিয়াছিলেন। ঐ যে বড় আয়না দেখিয়াছ, সে দু'খানি কলিকাতার নবাবীর চিহ্ন। কলিকাতার লোকে খয়রাতীকে নবাব মীর খয়রাতী বলিয়া জানিত। কলিকাতার নবাবীর ধাক্কা শেষে পদমদী পর্যন্ত আসিল। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের মধ্যে যে টাকা কর্জ করিয়াছিলেন, সেও কম নহে—প্রায় ত্রিশ হাজার।

সেই টাকার জন্য ডিক্রি জারি হইয়া পদমদীর জমিদারী পর্যন্ত ক্রোক। বাপ বর্তমান—সমুদায় জমিদারী আলী আসরাফ খান বাহাদুর নামে, ডিক্রিদার কিছুই করিতে পারিল না। টাকার দায়ে ধরপাকড় করিবে? কার সাধ্য পদমদী আসিয়া ধরপাকড় করিতে পারে? আর কিছুই হইল না। এখনও খয়রাতী মিয়া বাড়ী ছাড়িয়া কোনখানে যান না। এইবার কেবল প্রথম বাহির হইয়াছিলেন। পাওনাদারেরাও এখন আর কোন চেষ্টা করে না।

মীর খয়রাতী দাদা হইতেই বড়লোক। পূর্বে পদমদীতে তোমাদের যে অবস্থা ছিল, তাহা অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা মন্দ ছিল। তোমরা সে সময় গরীব এখনও গরীব। কিন্তু এই গরীবের ঘরে এখনও উহাদের ঘরের একটা কাঠের দীপগাছা যাহাকে চেরাগদান বলে—বন্ধক আছে। তুমি এবারে পদমদী গেলে আমি দেখাইব। যখন উহারা বড়ই বাড়াবাড়ি করে,—স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঝগড়া হয়। আমার সঙ্গেই ঝগড়া হয়, আমি সেই কাঠের চেরাগদান দেখাইয়া দেই। যদিও কথাটা ভাল নয় কিন্তু সময় সময় টাকা জমিদারীর গরমিতে বড়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ঘৃণা করে,—বড়মানুষী দেখায়—আমার বরদাস্ত হয় না।

ঐ যে বাড়ীর সম্মুখে বড় পুষ্করিণী দেখিয়াছ। পুষ্করিণী কাটিবার সময় উত্তরের দিকে তাঁহাদের জায়গা নাই। পুষ্করিণীর চার কোণ মিল হয় না। তোমার বাপের নিকট হইতে উত্তরের পাহাড়ী জন্য, জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন, এখনও তাহার খাজনা দিয়া থাকেন। তোমার বাপও দেখিলেন যে, দেশের উপকার—পানির বড়ই কষ্ট। বিশ পঁচিশখানা গ্রামের মধ্যে আর ভাল পুষ্করিণী নাই। কোন আপত্তি করিলেন না। জমি দিয়া দিলেন। পুষ্করিণী হইল। উহাদের বাড়ীর কর্ত্রী বিবিদিগের কাপড় ঐ পুষ্করিণীতে কাচা হয়। তোমার সৎমার কাপড় একদিন একটি ছুকরী না জেনে ঐ পুষ্করিণীতে ধুইতে গিয়াছিল। কাপড় পানিতে ডুবাইয়া উঠাইয়াছে, সর্দার লাঠিয়ালগণ দেখিয়া গরজিয়া পড়িয়া কাপড় কাড়িয়া লইল। ছুকরী কাঁদিয়া পড়িল। সেই পিটপিটই একটা লোক কাপড় আনিয়া দিয়া বলিল—ঐ ছুকরীটাকে বারণ করিলেও শুনিল না—কাপড় ধুইতে লাগিল। শেষে গালাগালি দেওয়ায় কাপড় ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তোমার পিতা সকলের কথাই শুনিলেন। কোন কথা বলিলেন না। মনে মনে কি ভাবিয়া তাহার পরদিনই তোমাদের বাড়ীর সম্মুখের পুষ্করিণী কাটাইতে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পুষ্করিণী হইল। দৈববশতই হউক কি তাহার মনের গতিতেই হউক তোমাদের বাড়ীর পুষ্করিণীতে সকলের উপকার

হইল। কারণ ঐ বাড়ীর পুষ্করিণী পূর্ব পশ্চিম রোখে কাটা। উত্তর দক্ষিণ দিক কম পরিসর। তাহাতে হিন্দুরা ঐ পুষ্করিণীর পানি লইত না খাইত না ছুঁইত না। আর তোমাদের বাড়ীর পুষ্করিণী হইল উত্তর দক্ষিণ লম্বা, হিন্দু মুসলমানে ইহার পানি লইতে আরম্ভ করিল। আর তোমার বাপ্ সকলকে বলিয়া দিলেন, এই পুষ্করিণীর পানিতে তোমরা গোসল কর। পানি খাও গরুবাছুরকে খাওয়াও কিন্তু ক্ষার দিয়া পাটে আছড়াইয়া কাপড় কাচিও না। বর্ষার পানি তোমাদের পুষ্করিণীতে কৌশল করিয়া আনিতে হয় না। উত্তরের মাঠের সঙ্গে যোগ আছে। বর্ষার পানি মাঠে পড়িলেই পুষ্করিণীতে নতুন পানি পড়িতে থাকে। বড় পুষ্করিণীতে পানি লইতে হইলে তোমাদের পুষ্করিণী হইতে নালা কাটিয়া পানি লইতে হয়। এখনও ঐ উপায়ে বর্ষার পানি লইয়া থাকে, আজ অনেক রাত হয়েছে। কাল অন্য কথা বলিব।

আমরা কয়েক জনে নিতান্ত আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমরা একটা কথার ধোকায় পড়িয়া আছি, মীর খয়রাতা হইলেন বড়, আর সামাদ মিঁয়া হইলেন ছোট, বড়কে রেখে, ছোটর বিয়ে হল কেন? আমার আপন মাতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? বাপ মা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে এরূপ উল্টো কাজ হল কেন? বড়ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে ছোট ছেলের বিয়ে দিলেন কেন?

আপনারা বড় শক্ত কথা উঠিয়েছেন। আমার মাতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আপনার মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইতে পারে। ছেলেরা সোজা-সুজি বুঝিয়াছে যে বড়ছেলে থাকতে ছোট ছেলের বিয়ে আগে হল কেন? আর সে বিয়ে কি হয়? বিয়ে হয় না তা নয়, কিন্তু কথাটা বড় শক্ত কথা। সে কথা শুরু করিলে আপনারা ঘুমাইতে পারিবেন না। কাল রাত্রে আল্লা চাহে ত বলিব। সঙ্গে আরও কথা আছে তাহা না বলিলে ইহার আসল ভেদ বুঝিতে পারিবেন না।

পরদিন সন্ধ্যার পর পূর্বমত বিছানা পাতিয়া সকলেই মাতামহীকে ঘিরিয়া বসিলাম। তিনি পানের সঙ্গে আলপাতা খাইতেন, পাতা ছিঁড়িয়া মুখে দিয়াই বলিতে লাগিলেন—বড় ভাইকে রেখে ছোট ভায়ের বিয়ে আগে কেন হল? এই বিবাহ দেয় কে? দিল কে? সে কথাতো তোমরা কেউ জান না। আসল খবর বাহিরের লোকে জানিবেই বা কি করে। বাপ মা বেঁচে আছেন, মায়ের কথা শেষে বলিব, বাপের কথাটাই আগে বলি।

আমি সত্য ছাড়া মিছে বলিব না।—হতে পারে কেউ ভাবিতে পারেন, আমি আমার বংশের লোকের, আত্মীয়স্বজনের নিন্দা করিতেছি। এ নিন্দা নহে, ভবিষ্যত লোকশিক্ষা। তোমরা সর্তক হয়ো তোমাদের জ্ঞান জন্মাবে, এইরূপ করিলে এই হয়, এইরূপ ব্যবহারে এই ফল হয়। কেবল তোমাদের নয় তোমাদের বংশানুবংশ এমন কি শত সহস্র পুরুষের সাবধান শিক্ষার জন্য আমি এই গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতেছি। যাহাদের ঘটনা তাহারা জানে, আর আমি জানি, আর কেহই জানে না। যাহারা জানিত তাহারা মরিয়া গিয়াছে। কথাটা মনে হইয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেছে। তোমাদের বাড়ীর কথা যে এই কথায় আসিবে তাহা আমি ভাবি নাই। এক স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে আর এক স্ত্রী করার ফলই এই,—দেখত এই সেই দিনের কথা দৌলতন্‌নেসার কি অবস্থা হইল। যদি তোমার বাপ অন্য স্ত্রীলোক ঘরে না আনিতেন, যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবে কেন? এইটুকু বলিতেই আমার আপন মাতামহী হু হু করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। যে আগুন চাপা ছিল তাহাই আবার জ্বলিয়া উঠিল। [বৈমাত্র] মাতামহী, মাতামহীকে অনেক প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি আমার মন দেখুন। আমার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখুন আমার হামিদন নাই, আপনার দৌলতনও নাই। তাহারা বেহেস্তে গিয়াছে। স্বামী, মা, পেটের সন্তান রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা হতভাগিনী তাহাতেই দুনিয়ার মায়ায় পড়িয়া আছি। আপনি কান্দিবেন না। সতীনের যন্ত্রণা-আগুনে পীর পয়গম্বরের মেয়েরা পর্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারে খারে গিয়াছেন, আমরা ত কোন ছার। বিবি হনুফার জন্য বিবি ফতেমা জ্বলিয়াছেন। তাহার পর এমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জায়নাবের কথা কি শুনেন নাই? তার পরে হিন্দুদের মধ্যেও ঐ কথার কথা আছে। রামের মা কৌশল্যা আর কৈকেয়ীর কথা কি আপনাদের প্রতিবেশিনী গোলক ঠাকুরাণীর মুখে শুনেন্ নাই? এই ত সেদিন রামায়ণের কথা মহাভারতের কথা কত কথাই বলিলেন। পূর্ব হইতেই ঘরে ঘরে চলিয়া আসিতেছে। এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইলেই সে সংসারে আর সুখশান্তি থাকে না। যাঁহাদের ঘরে খাবার পরবার ভাবনা নাই, সে ঘরে আরও থাকে না। অমঙ্গল দুর্ঘটনা জ্বালা-যন্ত্রণা, মারামারি কাটাকাটি, বেশী পরিমাণেই হইয়া থাকে।

আলী আসরাফ খান বাহাদুরের ঘরেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এক স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে তিনি সায়েস্তাবাদ মীর এমদাদ আলীর কন্যা, সৈয়াদ তজম্মাল

আলী, সৈয়দ আবুদল মজিদ, সৈয়াদ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন (তোমার বাপের নামে নাম) সৈয়াদ আবি আবদুল্লার ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন। চার ভায়ের নাম করিলাম কেন? ইহারা চার ভাই চারটি রত্ন, জাতীয় গৌরব সেইজন্য চার ভায়ের নাম করিলাম। আলী আসরাফের প্রথমা স্ত্রীও কম নহেন, তিনি মৌলবী নুরজ্‌জমার ভগ্নী। বড় স্ত্রীর গর্ভে যে কন্যা জন্মে সেই কন্যার বিবাহ মৌলবী গোলাম কাদের সঙ্গে হয়। পদমদীর নিকটে কুরসী গ্রাম। সেই কুরসী গ্রামে মৌলবী গোলাম কাদেরের বাড়ী। গোলাম কাদেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মৌলবী মকবুল আহ্‌মদ। আলী আসরাফ্‌ খান বাহাদুরের ২য়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানই, মীর মহাম্মদ আলী, মীর আবদুস সামাদ, কন্যা হায়াতন্‌নেসা। মৌলবী গোলাম কাদেরের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে হায়াতন্‌নেসাকে শেষে বিবাহ করেন।

যাক,আলী আসরাফ খান বাহাদুরের দুই স্ত্রী। দুই স্ত্রী এক ঘরে আর কথা কি? ক্রমে আগুন জ্বলিল। স্বামী বশীকরণ জন্য তুকতাক্‌ মন্ত্রতন্ত্র ঔষধপত্র চলিল। ফলে ইহাই হইল। আলী আসরাফ খান বাহাদুরের বুদ্ধি জ্ঞান লোপ হইয়া গেল। কিছুই মনে থাকে না। ভ্রম মহাভ্রম। কাণ্ড জ্ঞান রহিত হওয়ায় বড় পুত্রের আধিপত্য ক্ষমতাই দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শেষে এরূপ হইল যে, খান বাহাদুর নামেমাত্র জীবিত, মীর খয়রাতীই সর্বেসর্বা। ঢাকার শিক্ষার গুণে সকলি হইল। বিবাহ করিবেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পাত্রী কোথা? এদিকে তাঁহার স্বভাবই হইল আমোদ আহ্লাদে জড়ান মাখান একেবারে একাকার; স্ত্রী-স্বামী সম্বন্ধ পাতাইতে কিছুতেই ইচ্ছুক নহেন। তাঁহার উপরে ত আর কর্তা নাই। নিজেই স্বাধীন নিজেই সর্বেসর্বা, মাতাপিতা বর্তমান অথচ না থাকার প্রায়, মাতা-পিতাই তাহার অধীন। বিবাহ বাঁধনে বাঁধা পড়িলেই আমোদ-প্রমোদ গান-বাজনা হাসি-রহস্য এবং মনের সুখে—বিশেষ বাধা জন্মে। স্ত্রীর মুখের দিকে ত চাহিতে হয়, তাহার পর তাহার মনমত বড়লোক এদেশে কোথা?—কৈ? কে আছে? কার কন্যা আছে?

কিছুদিন পরে এক কন্যার কথা লইয়া ঘটক আসিল। কথা পাড়িল। সম্মত হইলেন, হ্যাঁ এই বিবাহ করিব। হায়! সে কি স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ করিয়া সংসার ধর্ম রক্ষা করার জন্য সম্মত হইলেন! তোবা আস্‌ তাগ্‌ফার করিয়া পাপ কার্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য সম্মত হইলেন! তাহা নহে। —যাঁহার কন্যা তিনি প্রবীণ জমিদার, সাত পরগণার দোহাই ফেরে। ঘরে বিস্তর টাকা মজুত।

দিগ্‌বিজয়ী নাম। ফাটা কপাল। বাঙ্গলাদেশে জোড়া মেলা ভার। পীলখানায় গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি, আস্তাবলে রঙ-বেরঙের ঘোড়া, সোনার আশা, রূপার সোঁটা, হীরের পাট্টা, এয়াকুত ফিরোজা বসান, পান দান, আতর দান, গোলাব পাস, জরির চাঁদওয়া, জরির বিছানা, সোনার খাট, রূপার পালঙ্ক আরও কত আরও কত আছে, শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া নাচিয়া উঠিলেন। সম্মত হইলেন। মীর খয়রাতী বিবাহ করিতে রাজী হইলেন।

মানুষের লোভ লালসার সীমা নাই। যার যত আছে সে তত চায়। হয়, আরো চায়। আশা মেটে না। লোভ কমে না। ধনদৌলত জমিদারী দেখে, মহাসুখী হয়ে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। বেশী দূর নয়, অজানা অচেনা নয়, দেশের মধ্যে। পদমদী হইতে একদিনের তফাত। নিজের স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার কয়েকদিন ধামা চাপা দিয়ে রেখে, খুসীর সঙ্গে বড় আশা করে বিবাহে রাজী হইলেন। যার মেয়েকে বিবাহ করতে রাজী হলেন, তাঁহারই পিতা কোন বিবাহ উপলক্ষে বড় ধুমধামে, হাতি ঘোড়া আরদালী আশাবরদার সোঁটাবরদার লোক লস্কর সঙ্গে করে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য পদমদী এসেছিলেন। বড়লোক, সকলেই খুব খাতির করিলেন। কিন্তু মজলিশ করিয়া কেহই তাঁহার সহিত খাদ্য খাওয়া করিলেন না। একসঙ্গে এক দস্তর খানায় খাইলেন না। চৌধুরী রহিমউদ্দীন সকলি বুঝিতে পারিলেন। ইহারা জাত্যংশে আমা হইতে খুব বড়, তাহাতেই আমার সঙ্গে খানাপিনা করিলেন না। আচ্ছা আমি দস্তর মত সেলামী দিতেছি, আমার প্রতি নেকনজর করে এক সঙ্গে আহারাদি করেন; কেহই রাজী হইলেন না। কয়েকদিন পর্যন্ত এই কথার জন্য খোসামদ, শেষে গলায় কাপড় নিয়ে প্রার্থনা, সকলেরই ঐ এক কথা, টাকার লোভে জাত বিক্রি করিব না। যাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল তাহারা ত বলিলেনই,মন্দ অবস্থা যাঁহাদের, তাঁহারাও বলিল কখনই হইবে না। এখনও গায়ের গন্ধ যায় নাই। ও হইবে না। শেষে রহিমদ্দীন চৌধুরী, বিরক্ত হয়ে পদমদী হইতে ঢুলাই চলিয়া গেলেন। হাতিতে চড়িলেন। আর দুই হাতে টাকা মোহর ছিটাইতে ছিটাইতে চলিলেন, যাঁহারা এক দস্তরখানায় খাইতে অস্বীকার হইলেন, তাহারাই হাতির পিছনে পিছনে সোর হাঙ্গামা করিয়া টাকা মোহর কুড়াইতে কুড়াইতে দক্ষিণ বাড়ীর হাট পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। অবস্থার গতিকে টাকা মোহরের লোভ সামলাইতে পারিলেন না। কিন্তু এক দস্তরখানায় খানাপিনা করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। এখন সেই রহিমদ্দীন চৌধুরীর পুত্র আজীমদ্দীন চৌধুরী, তাহারই কন্যা বিবাহ করিতে, আলী আসরাফ খান

বাহাদুরের পুত্র রাজি হইলেন। বিবাহের লগন, পান চিনি সকলি হইল, দিন ঠিক হইতে বাকি। আজীম চৌধুরী পাত্রের গুণানুগুণ শুনিয়া বিবাহের নাম আর মুখেও আনিলেন না। তাহার পর ইনিও আর বিবাহের নাম করিলেন না। আসলে বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছাই নাই। বাঁধাবাঁধি হইয়া ভদ্র ঘরের মেয়ের সহিত একত্র স্বামী-স্ত্রী ভাবে উঠা বসা খাওয়াপরা হাসিখুসি করার ইচ্ছাই তাহার নাই। তিনি চান আমোদ। বাঁধাবাঁধি কার্যে বড়ই নারাজ। এদিকেও নিজেই নিজের কর্তা আর বলিবার লোক কেহ নাই। সেই সকল জাতের গৌরবীঘরের ছেলে তাহারা কি করিল। নগদ পণ দশ হাজার আর জিনিসপত্র অলংকার ইত্যাদিতেই দশ হাজারের কম হইবে না। তাহার পর সেলামী বারবরদারীতেও ৫।৬ হাজার টাকার কম, বামনার ঘর হতে লন নাই। বড় ভাইকে বিয়ে দেয় কে? আর সে বিয়ে করে কে? তাহার পর কিছুদিন পরে মৌলবী মকবুল আহমদ, উহারই ভগ্নীপতির ছোট ভাইয়ের অন্য আর এক কন্যা সাধারণ নাম আক্কিবিবি (ওয়াজেদন্নেসা নহে) তাহারই সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া আসিতেছি। কত কাল হইবে কে বলিতে পারে। হয় কি না হয় তাহাই বা বলি কি প্রকারে? বড়কে রেখে ছোটর বিয়ে, শুনিলেন কথা। নিজে বিয়ে না করে ছোট ভাইকে বিক্রি করিলেন।

তোমাদের শুনিবার কত উপযুক্ত কথা আমার মনে অনেক আছে। যদি সময় পাই তবে অনেক কথা শুনাইয়া যাইব।

এইরূপ প্রতিদিন রাত্রি মাননীয়া মাতামহী "বংশ পুরাণ" কহিতেন আমরা শুনিতাম। সে সকল ঘটনা সময়ে বলিব, সে সকল কথা প্রকাশের সময় এখনও হয় নাই। এক রাত্রে বৈমাত্র মাতামহী আমার আপন মাতামহীকে বলিলেন আপনারই আত্মীয় মুন্সী আস্‌লাম দারগা যিনি পাংসার থানায় বহুদিন ছিলেন তাহারই মুখে শুনিয়াছি। আপনাদের পূর্বপুরুষ এদেশের বাসিন্দা নহেন। কি প্রকারে তাঁহারা এদেশে আসিলেন সেই কথাগুলি শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা আছে। সা গোলাম আমার নিকট বোধ হয় অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আজ পর্যন্ত আপনাদিগকে সা গোলাম ভাল চক্ষে দেখে না। দেখুন, পুরাণ কথা আমার বলিতেও যেমন খুসি শুনিতেও আনন্দ। ভাল কথা শুনিলে মন ভাল থাকে, যদি আপনি জানেন তবে বলুন। মাতামহী বলিলেন—আমি অত কথা বলিতে পারিব না। আপনার মত কথা বলিবার শক্তিও আমার নাই। আপনি গোলে বকাঅলী তাজেল মুলুকের কেচ্ছা তিন রাত বেঁধে বলেন,—আমার অত কথা

মুখে আনিবার সাধ্য নাই। আর আমার কিছুই মনে থাকে না। তবে আপনি যাহা শুনিতে চাহিতেছেন; আমার চাচাত ভাই মীর আজহার আলী সমুদায় কথা কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁকে বিজনগর হইতে আনাইয়া শুনাইয়া দিব। কাল সকালে লোক পাঠাইলে সন্ধ্যার আগেই আসিতে পারে। নিতান্ত পক্ষে কাল রাত্রি না শুনাইতে পারি তার পরের রাত্রে খোদার মরজি হইলে অবশ্যই শুনাইব।

পরদিন মীর আজহার আলীর লিখিত কথা সকল আসিয়া পৌছিল। আমার প্রতিই পাঠের আদেশ হইল। আমি পড়িতে লাগিলাম। মীর আজহার আলী আমার মাতামহীর খুড়ত ভ্রাতা। তাহার হস্তলিপি হইতে এই কথা প্রকাশ হইল, যথা—(অবিকল)

"বোগদাদ নিবাসী হজরত সা নেয়ামতউল্লার পুত্র সৈয়াদ সা আব্দার রহিম তাঁহার পুত্র সৈয়াদ সা আবদুর রজ্জাক তদ্‌পুত্র সৈয়াদ মহেব আলী।

সৈয়াদ মহেব আলী তিন পুত্রসহ বোগদাদ নগর হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। আলিবর্দ্দী খাঁ তৎকালে মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন। সৈয়াদ সাহেবের তিন পুত্র মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম উল্লেখ নাই। জ্যেষ্ঠ সৈয়াদ আতাউল্লা, মধ্যম সৈয়াদ বোরহানউল্লা। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সৈয়াদ মহেব আলা মুর্শিদাবাদ আসিয়া কিছুকাল পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ পুত্রও পিতার পরেই পরলোক গমন করেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পরলোক গমনের পর নবাব সিরাজদ্দৌলা নবাব হইলেন। তাহার পর পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধে ইংরাজের জয়লাভ হইল। নবাবের কর্মচারীরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। মীর আতাউল্লা, বোরহানউল্লা, মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া অতিথিরূপে, বিজনগর গ্রামে, সেখ জালালদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখ জালালদ্দীন সাহেব অবস্থাপন্ন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা সাধারণ পথিক নহেন। অবশ্য কোন ভদ্রবংশজাত হইবেন। সুতরাং যথোচিত সমাদরের সহিত তিনি তাঁহাদিগকে বাড়ীতে রাখিলেন এবং অল্পকালে মধ্যেই তাঁহাদের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়া বিজনগর গ্রামে বসবাস করিতে অনুরোধ করিলেন। মীর সাহেবেরা সেখ সাহেবের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। নবজীবনে পদার্পণ

করিয়া কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, মীর আতাউল্লা সাহেব মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাব মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করায় নবাব মীরজাফর দিনাজপুরের দেওয়ানী কার্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এই সময় হইতেই মীর আতাউল্লা দিনাজপুরে, মীর বোরহানউল্লা বিজনগরে বাস করিতেন। মীর আতাউল্লার সন্তান সন্ততি হয় নাই। মীর বোরহানউল্লা সেখ সাহেবের কন্যা ভিন্ন আর এক বিবাহ করেন। সেখ সাহেবের কন্যার গর্ভে মীর রহমতউল্লা এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে মীর নজিবউল্লার জন্ম হয়। আতাউল্লা বৃদ্ধ বয়সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সহোদর মীর বোরহানউল্লাকে সংবাদ দিলেন। মীর বোরহানউল্লা ভ্রাতৃ অসুখ সংবাদে দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া দ্বিতীয় পুত্র নজিবউল্লাকে দিনাজপুর প্রেরণ করিলেন। মীর নজিবউল্লা দিনাজপুর পৌঁছিলে, মীর আতাউল্লা বাড়ী আইসার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদৃষ্টে বাড়ী আইসা ঘটিল না। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, চেহেল গাজী আউলিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছে, "বৎস আমি তোমাকে বড় ভালবাসি তুমি আমার নিকটে থাক। তোমার বাড়ী যাওয়া হইবে না।" মীর সাহেব রাত্রে যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃকালে তাহা সকলকে বলিলেন। পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদনন্তর তাঁহার কবর চেহেল গাজী আউলিয়ার কবরের পার্শ্বে হইবে এইরূপ আদেশ করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। মীর নজিবউল্লা পিতৃব্যের আদেশানুসারে কার্যাদি সমাপণ করিয়া নিজালয় প্রত্যাগমন করিলেন। মীর আতাউল্লার পরলোক গমনের পর মীর বোরহানউল্লা অধিক দিন জীবিত ছিলেন। মীর নজিবউল্লা মুর্শিদাবাদ নবাবদিগের অধীনে চাকুরী করিতেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। তাহার বিবাহ গোপালপুরে হইয়াছিল। মীর রহমতউল্লার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ মীর তরিকউল্লা, মধ্যম মীর এজ্জাতউল্লা এবং কনিষ্ঠ মীর দেরাছতউল্লা। মীর এজ্জাতউল্লার পুত্র মীর কমর আলী। মীর কমর আলীর পুত্র মীর উম্মেদ আলী। মীর এজ্জাতউল্লার প্রথম পক্ষের কন্যা, বিবি ফাথেরা খাতুন। একা এক মায়ের গর্ভজাত। মীর এজ্জাতউল্লার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মীর সামসের আলী, আর এক কন্যা সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান আমিনদ্দীন মিয়া। রহমতউল্লার কনিষ্ঠ পুত্র দেরাছতউল্লা তাহার পুত্র মীর আজহার আলী।"

আমার মাতামহী বলিলেন—মীর এজ্জাতউল্লার প্রথম পক্ষের কন্যাই আমি। আমার বৈমাত্র ভ্রাতা মীর সামসের আলী। সামসের আলীর পুত্রগণ মধ্যে

এক পুত্র আমার এখানেই থাকে। আমিনদ্দীনকে ত সর্বদাই দেখিতেছেন; বাটীর মধ্যে কথাবার্তা কাজকর্ম জন্য প্রায়ই বাটীর মধ্যে আসিয়া থাকে; তাহাকে চিনিলেন? আর মীর কমর আলীর পুত্র মীর ওম্মেদ আলী সেও এখানেই থাকে বিষয়াদির কার্য দেখে।

"হাঁ এখন ত খুব চিনিলাম। আমিনদ্দীন আপনার বৈমাত্রেয় ভগ্নী-পুত্র, খুব ভাল ছেলে।"

"সে ছোট কাল হতে আমার এখানেই। আমাকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে চাহে না। যাইবেও না।"

এক প্রকার প্রতি রাত্রেই পুরাণ কথা শুনিতে শুনিতে অনেক কথা শুনিলাম। সময় মত সে সকল কথা পরে প্রকাশ্য। কিছুদিন পরে পিতা সিরাজগঞ্জ হইতে লাহিনীপাড়ায় আসিলেন। আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম, ইংরেজী আর বাঙ্গলা পড়িতে হয়। আমাদের থাকিবার জন্য মুন্সী দেয়ানতউল্লা মক্কার সাহেবের বাসার পূর্ব-উত্তর কোণে একখানি ঘর উঠাইয়া দিলেন। রন্ধনাদি করার জন্য একজন চাকর নিযুক্ত হইল। আমরা কুষ্টিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিলাম। হেডমাষ্টার উমেশচন্দ্র সরকার। পণ্ডিত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য। হেডমাষ্টার মহাশয় যুবা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ শ্যামকায়। পরণপরিচ্ছদ সাদাসিদে। সাদা থান ফাড়া ধুতী, লংক্লথের পিরাণ, তাঁতের বুনান খুব পাতলা চাদর। জুতা জোড়া, বকলস লাগান কালো চামড়া। পণ্ডিত মহাশয়—যাকে বলে খাঁটি গৌরবর্ণ, হাড়ে মাসে জড়িত, মাথায় সিক্কা—বয়স ২০।২২ বৎসর। পরণপরিচ্ছদ একেবারেই সাদাসিদে। থানফাড়া ধুতী, মলমলের চাদর, পায়ে পাতুলা চটি। বর্তমান সময়ে সেইরূপ চটি চক্ষেই পড়ে না। চটির রং হলদে, বাঁকান মাথাটুকু একটু লাল। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে কখনও পানের দাগ দেখি নাই। দাঁতগুলি একেবারে সাদা ধব্‌ধবে। দাড়ী গোঁপ কামান। গলায় সাদা রঙ্গের দুই সার মালা জড়ান, পৈতে রীতিমত। আমি ইংরেজী এ বি সি পড়ি—বাঙ্গলা ছোট একখানি কেতাব প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা। বাঙ্গলা শিশুশিক্ষা চটি বহি,—দুই তিন দিন পড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, আমি এ পুস্তকের সকলি পড়িয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় পরীক্ষা করিলেন। পড়ায় আট্‌কিল না। বানান করায় ভুল হইল। বেশ ভুল গেল, স আর ণ, পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, তুমি আর কোন খানে পড়েছিলে? আমি উত্তর করিলাম,—পড়ি নাই, পাঠশালায় লিখেছিলাম। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন আচ্ছা তুমি বোধোদয় পড়। কাল হতে বোধোদয়

আনিও। বোধোদয় পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বোধোদয় আমি কিনিয়াই পড়িলাম। কিন্তু বুঝিলাম না। বুঝিলাম না কি? যেমন ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কথা। আর বেশী ধোঁকা হইল ত্বক্ শব্দে। আর রামধনু এবং তাহার রঙ্গের বিষয়ে। যাহা হউক বোধোদয় পড়িতে লাগিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে বেত থাকিত। মাষ্টার মহাশয়ের হাতেও বেত।

একখানি বাঙ্গালা চালা ঘরের মধ্যে স্কুল। ভিন্ন ভিন্ন বেঞ্চে বসা হয়। মাষ্টার মহাশয়ের বেতের শপ্‌শপানী শুনি, দেখি, পণ্ডিত মহাশয়ের তত নহে। অন্য অন্য বালকগণের পিঠে দুই এক ঘা পড়ে দেখি। মাষ্টার মহাশয়ের বেত্‌কাণ্ডে বেত্ যেন চমক্ মারে, দেখা যায় না। আর সেই শপ্ শপ শব্দ। পণ্ডিত মহাশয়ের বেতের ব্যবহারে খট্ করিয়া উঠে,—কাপড়ের উপর লাগিলে ধুপ্ করিয়া একটি শব্দ হয় মাত্র। কিন্তু দাঁত কিড়মিড়ি, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণে বিকট শব্দে আর পণ্ডিত মহাশয়ের গোল মুখ পরিষ্কার দাঁতের সহিত ঠোঁট দুখানির ভাব দেখিয়া ভয় হয়। আমার পিঠে পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্ পড়েনি, মাষ্টার মহাশয়ের বেত্ দুই তিন দিন অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, পড়ার জন্যে নহে। দুষ্টমি আর গোল করার জন্যে। প্রথম কয়েক দিন মাষ্টার মহাশয়ের শিস্ দেওয়ার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমি জানি যে শিস্ দিয়া শিসের সহিত লোকে গান গায়। মাষ্টার মহাশয় ঘড়ি ঘড়ি শিস দেন কিন্তু গানের সুর শুনি না। ঐ একরূপ টানা শিস্। তাহার পর শিস্ দেওয়ার মানে বুঝিলাম। বোধোদয় পড়ার, আরো সঙ্গী ছিল। ১০।১২ জন আমরা বোধোদয় পড়িতাম। আমি সকলের বামে বসিলেও পড়ার সময় ভুল ধরিয়া ক্রমে, সঙ্গীদিগকে বামে ফেলিতে ফেলিতে সকলকেই বামে ফেলিতাম, এতে যে কি সুখ, কি মর্যাদা বৃদ্ধি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, বোধও হইত না। পণ্ডিত মহাশয়ের এক অভ্যাস ছিল, যেই বোধোদয় মধ্যে কানের কথা শ্রবণেন্দ্রিয়র কথা আসিত আর যেস্থানে লেখা আছে, যে কর্ণকুহরে পটহের মত এক পাতলা চর্ম আছে। এদিক ওদিক বেশ সোজা কথা হইয়া ঐ যায়গাটা এমনই কঠিন বোধ হইত যে দশমন পাথরের একখণ্ড পাথর সম্মুখে বাধিয়া যাইত। প্রতিদিনই প্রায় ভুল হইত, পড়ায় নহে অর্থবোধে। পণ্ডিত মহাশয় যেই পটহে আঘাত করিতেন, মুখে বলিতেন, অমনি হাতের বেত্ দিয়া সম্মুখের বাঁশের খুঁটিতে এক আঘাত করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখখানি বেশ হাসো-হাসো দেখাইত। আর মাষ্টার মহাশয় যেন জেন্ত, মানুষ-বাঘ। আমি কখনও সে মুখে হাসি দেখি নাই। চক্ষু তেড়াই আছে।

বেঞ্চের নিকট হইয়া চলিয়া গেলেই প্রাণের মধ্যে কাঁপ্‌তে থাকিত, মুখ চোখ বাঁকা করিয়া যখন বলিতেন, কাম এণ্ড-কোয়াইট্‌। কোয়াইট বলিয়া মাথায় এক ঝাঁকি মারিতেন, সে সময় চক্ষু নিচে, ঘাড় নিচে করিতাম।

আমরা মুন্সীজীর নিকট যখন পড়িয়াছি, তখন যাহা যাহা ভয়েতে করি নাই, স্কুলে দেখি তাহাতে কোন দোষ হয় না। খালিমাথায় সাধ্য কি গুরুজনের নিকট যাইতে, ওস্তাদের সম্মুখে বসিতে, কি কোন কেতাব পড়িতে কি দশজনার মধ্যে উপস্থিত হইতে আমরা পারি নাই। ওস্তাদের সম্মুখে সর্বদা পা নাচাইয়া দেখাইতে পারি? কথাবার্তা কহিতে তুই তোকার, হারে ওরে বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি নাই? খালিপায়ে-ধূলামাটি পায়ে করিয়া পা দিয়া ঘরের মেজে খুঁড়িতে পারি নাই। আমাদের পড়িবার সময়, খাইবার সময়, কোন স্থানে যাইবার সময়—আল্লার নাম করিয়া যাইতে পারি না। কেতাবে মুখ ঢাকিয়া ওস্তাদের মুখ ভেঙ্গচাইতে পারি? এতদিন পড়িলাম—আল্লা রসুলের নাম কোন স্থানে পাইলাম না। কাহারও মুখে শুনিলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরেজী কেতাব মধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম। তিনের নম্বরের পাকসাফ্‌ পবিত্রতার নাম গন্ধ পাইলাম না। প্রস্রাব করিয়া জলের কারবার নাই। হিন্দু মুসলমান ছাত্র কাহারও জল ব্যবহার করিতে দেখিলাম না। আল্লাহ্‌ রসুলের নাম কেতাবে নাই কিন্তু রাম শ্যাম হরি কালী দুর্গা বানর শূকর কুকুর শৃগালের নাম অনেক স্থানে পাইলাম। ছেলেরা সকলেই দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, একদিন দেখি আমাদের ইংরেজী শিক্ষার গুরুঠাকুর সরকার মহাশয়ও দাঁড়াইয়া ওকর্ম করিতেছেন। গুরুর চলন, গুরুর চাল, গুরুর হাত নাড়া, কথা কহার কেতা, অনেক ছাত্রই ভালবাসিয়া অভ্যাস করে, আমি গুরুর হাঁটার কেতা, পা ফেলিবার ভঙ্গি অভ্যাস করিয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের ট্যাঁকে এক আস্ত শামুকের খোলে নস্যির গুঁড়া থাকিত। পণ্ডিত মহাশয় অল্প একটু নস্যি লইয়া নাকের দুই ছিদ্রে টিপিয়া দিতেন। ভাবিতাম ইহা বুঝি, বিদ্যা তাজা রাখিবার, কি বিদ্যা বাড়িবার কোনরূপ ঔষধ। আর বিশ্বাস হইল বিদ্যা বুদ্ধির থাকিবার স্থান মাথাই সত্য সঠিক স্থান, পেটের মধ্যে যাইয়া যখন ক্ষুধা নিবারণ করে না, নিশ্চয়ই বিদ্যাবুদ্ধি বাড়িবারই ঔষধ। তবু পণ্ডিত মহাশয় নিকট একদিন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—

"দূর পাগল! এটা সর্দির ঔষধ।" আমি ঐ পিটপিটই, বলিলাম, সর্দি ত আপনার এখন নাই। ঔষধ কেন? "হতে পারে, সেই আশংকায় এটা ব্যবহার

করি। পীড়া হওয়ার পূর্বে যাতে না হতে পারে তাই করাই ভাল। হলে পরে আর কিছু হতে পারে। বিপদ একা আসে না, একটি বিপদ হলে, পর পর আরও দুই দশটা হয়ে দাঁড়ায়। বেম পীড়া একটা কিছু হলে পর পর আরও দু দশটা একে একে আসিয়া জোটে। যাহাতে না হয় তাহার জন্য, আগে সতর্ক থাকাই ভাল। অপরাধ করিলে, কি ভালরূপ না পড়িলে এই বেতের বাড়ি খাইতে হইবে। সে সময় বাপ্‌রে মারে গেলেম রে, মলুমরে বলে কান্দাকাটি না করে, মার যাহাতে না খাইতে হয়—তার উপায় করে রাখাই ভাল"।

আজ সকালেই ছুটি হবে। ঐ দেখ কত লোক রেল আপিসের ধারে, রাস্তার দুই ধারে মানুষ জমা হয়েছে। আজ রেলের গাড়ী আসিবে। সে সময় সপ্তাহে একদিন গাড়ী আসিত, প্রাতে কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কুষ্টিয়ায় গাড়ী লাগাইত। টিকিট হয় নাই। রেলের কাজকর্মের লোকজন, আর সাহেব, বিবিরা অমনি চড়িয়া আসিতেন। স্কুল ছুটি হইল, ভালভাবে স্কুল হইতে বাহির হওয়া কাহারও অভ্যাস নাই। হো হা করিয়া ধর-পাকড়, মার, ধাক্কাধাক্কি কাপড় টানাটানি করিতে করিতে গুরুমহাশয়দিগের সম্মুখেই চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইতাম। স্কুল ছুটি হইলে নাকি ছাত্রদের উপর গুরু মহাশয়দিগের কোন ক্ষমতা নাই। আমরাও গাড়ী দেখিতে চলিলাম, রেলের রাস্তার তারের বেড়া ধরিয়া অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গাড়ীর ধূম দেখিলাম। চক্ষের পলকে আপিসের ধারে আসিল, সে সময় কুষ্টিয়ার স্টেশন (পুরাতন) প্রস্তুত হয় নাই। গাড়ী হইতে যাহারা নামিল তাহাদের দেখিয়া বোধ হইল যেন, ইহারা অন্য কোন লোক হইতে এই লোকে আসিয়াছে। কলিকাতা কোথায় কে জানে? বাসায় আসিলাম। চাকরের নাম "নবু"। নদীর ধারে বাসা, ঘরের মধ্যে চৌকির উপর শুইয়া শুইয়া নদীর-জলস্রোত দেখা যায়। একদিন নদীর স্রোত দেখিতেছি, আর কলিকাতার কথা ভাবিতেছি, না জানি কলিকাতা কেমন সহর। আমার বাসায় মাজাল মাদার তলার কৃষকশ্রেণীর কারবারী মহাজন ফৌজদার সাহা। সে সময় কৃষক সমাজে ফৌজদার সাহার নাম খুব জাঁকাল। সাধারণ লোকে প্রায়ই ফৌজদার সাহাকে চিনে, কারণ সে দেড়শত নৌকায় কেবল সরিষার চালান দিত। অর্থাৎ নিজের দেড়শত বড় বাঙ্গলা নৌকায়উত্তরাঞ্চল হইতে কেবল সরিষা খরিদ করিয়া আনিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিত। সে সময় মহাজনের মাল চালান হইত নৌকাপথে। রেল স্টীমার কিছুই ছিল না। ধান চাউলের ব্যবস্থা অপেক্ষা সরিষায় কারবার অধিক টাকার প্রয়োজন।

দেড়শত নৌকায় সরিষা বোঝাই করিয়া কলিকাতা পাঠান, যে সে মহাজনের কার্য নয়। সেই ফৌজদার সাহার ভাগ্নে আর ভ্রাতুষ্পুত্র আমার বাসায় থাকিত। তাহারা টাকাআওলা, নিজ খোরাকী করিয়া খাইত, থাকিত আমার বাসায়। কথায় কথায় কলিকাতার কথা উঠিলে তাহারা বলিল—কলিকাতায় আমাদের আড়ত আছে। কলিকাতা দেখার পক্ষে খুব সুবিধা। তখনি মনে এক কুবুদ্ধির উদয় হইল, আমি বলিলাম, চল আমরা কলিকাতা দেখিয়া আসি। ৭ দিনের পর গাড়ী যায় অতদিন অপেক্ষা করা হইবে না। হাঁটিয়া যাইব, যেখানে গাড়ী পাই সেইখান হইতে গাড়ীতে চড়িব। তাহারাও সম্মত হইল, কলিকাতা দেখার কথা বাড়ীতে বলিলে মাতামহী কখনই যাইতে দিবেন না, বাসার চাকরের কানে গেলে সেও গমনে বাধা দিবে। কাহাকেও বলা হইবে না। গোপনে চলিয়া যাইব, রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে আমরা চলিয়া যাইব, কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। পরামর্শ স্থির করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম। রাত্র এক প্রহর থাকিতে উঠিয়া আমরা তিনজন কুষ্টিয়ার বাসা হইতে কলিকাতা দেখিতে চলিলাম। রেলের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাইব, আমার পরনে একখানা ধুতি গায়ে একটা চাদর, এইমাত্র সাজপোশাক। তাহাদেরও ঐরূপ পোশাক। রেলের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম, পোড়াদহ যাইতে যাইতে রাত্র প্রভাত হইয়া গেল। মনের আনন্দে যাইতেছি। ভবিষ্যতে দুঃখ কিছুই মনে হইতেছে না।

দিনের বেলা পথের ধারের এক দোকান হইতে চিড়ে আর দধি খরিদ করিয়া কলাপাতে আহার করিলাম। সন্ধ্যা হইতে হইতে আলমডাঙ্গায় পৌঁছিলাম। আলমডাঙ্গার নিকট রাস্তায় বিস্তর কুলি কাজ করিতেছে। পুলের কার্য শেষ হয় নাই। বিস্তর কুলি সন্ধ্যার পরও কাজ করিতেছে। আমরা আলমডাঙ্গার বাজারে গিয়া এক মুদির ঘরে আশ্রয় লইলাম, দাইল চাল হাড়ী জ্বালানী-কাষ্ঠ লইয়া সঙ্গীরা খিচুড়ি পাক করিল। কলাপাত বিছাইয়া আহার, ঘটিতে জলপান। সামান্য মাদুরে বিনা বালিশে শয়ন। প্রভাতে চলিলাম—আমার সঙ্গে যাহা খরচ ছিল ১৸৴৹ আনা সঙ্গীদের নিকট কত ছিল জানি না। আমার তহবিলে মাত্র আর ।৵৹ আনার পয়সা আছে। দিনের বেলা কাহারও বাটীতে অতিথি হইয়া উদরান্নের জোগাড় করিব ইহাই সকলের ইচ্ছা। বেলাও দুই প্রহর কাহার বাটীতে যাই? লোকের মুখে শুনিলাম চুঁয়াডাঙ্গার জর্দার বাটীতে গেলে খাইতে পাইবে। তাহারা জমিদার বড়লোক।

ঐ যে বড় বড় বটগাছ দেখা যাইতেছে ঐ চুঁয়াডাঙ্গা গ্রাম। একপোয়া পথ

গেলেই পাকা মসজিদ দেখিতে পাইবে, তাহার পরেই জমিদার জর্দারদিগের পাড়া। ক্ষুধায় মাথা ঘুরিতেছে। প্রাণের দায়ে কি করা? যথাসাধ্য দ্রুতপদে কিছুদূর হাঁটিতেই মসজিদের সাদা রঙ নজরে পড়িল। ক্রমে গ্রামের মধ্যে যাইয়া অনেক ঘুরা ফেরার পর এক বড় বাড়ীর বাহির বাটীতে তিন মূর্তি দণ্ডায়মান হইলাম। বাহিরের বৈঠকখানা ঘরের সানবান্দা বারান্দার উপর পাটির বিছানায় স্থূলকায় সুন্দর সুপুরুষ একজন বসিয়া আছেন, কয়েকজন বাজে লোকও অন্য বিছানায় বসিয়া আছে। আমরা আসিয়া খাড়া হইলেই পরিচয় আরম্ভ হইল। কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি অনেক সওয়াল করিলেন। উত্তরও শুনিলেন। আমরা দুটি ভাতের কথা বলিলে মুখখানি বাঁকা করিয়া বলিলেন, ওহে বাপু! বাজার আছে যাহা ইচ্ছে সেখানে গিয়ে খাও। এখানে তোমাদের জন্য রান্না করিয়ে রাখা হয় নাই।

আমি সঙ্গীদের পিছনে ছিলাম, অমনি সরিয়া পথের ধারে আসিলাম। বেটার বাড়ীতে ২০।২৫টা গোলা বোঝাই ধান, কত ধানের পালা অন্য আঙ্গিনায়। বাড়ী ঘরদোরের শ্রী ভাল। দেখিতেও সুপুরুষ। কিন্তু কঞ্জুসের একশেষ। আর এক বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর উপর উঠিতেই, না না এখানে হইবে না। তাহার পর বড় একখানি আটচালা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, ভাতের কথা বলিলে, কর্তাটি ভাগ্যে দংশন করিলেন না। যাচ্ছেতাই বলিয়া গালাগালি দিয়া বিদায় করিলেন। আরও বলিলেন—কফিলদ্দী জর্দার জমিদার বড়লোক। সে দুটো ভাত দিতে পারিল না, আমি দিতে পারি! বাজার আছে, দু-কদম গেলেই সকলি পাবে। আর কি করি, নিরুপায় হইয়া বাজারে যাইয়া দধি চিড়ে গুড় খাইয়া একটু বিশ্রামের পর, আবার চলিলাম। বাজার ভিন্ন কোন বাড়ীতে রাত্র প্রবাস, কি দিবসে আহার আমাদের ভাগ্যে জুটিল না। বগুলা আসিয়া সরকারী ঘর বোধ হয় রেল কোম্পানীর হইবে সেই ঘরের চাপরাসীর সহিত আলাপ করিয়া এক রাত্র সেই ঘরে বাস করিলাম। এখনও সে ঘরের ভিটাটা বর্তমান আছে। কয়েকদিন হাঁটিয়া চাকদহ আসিলাম। দুইদিকে বেত কাঁটার জঙ্গল মধ্যে সরু একটা পথ। পথ ধরিয়া যাইতেছি। হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। সন্ন্যাসীর মাথায় দীর্ঘ জটা। সমুদায় অঙ্গে ভস্মমাখা। দাড়ি লম্বা। একখানি উত্তরীয় মাত্র, একপ্রকার উলঙ্গ; কপ্‌নী আঁটা কিন্তু স্থান বিশেষে লোহার পেরেক বসান। তাহার সঙ্গে লোহার সরু জিঞ্জির বাঁধা। এক হাতে কমণ্ডলু অন্য হাতে অন্যূন লোহার ২০টা আংটা লাগান বড় চিম্‌টে। রক্তবর্ণের একখানি উত্তরীয়

স্কন্ধে ঝুলিতেছে। গায়ের রং চক্‌চকে কাল। ভয়ঙ্কর মূর্তি, পথে যাইতে মুখোমুখি হইতেই কি একটা শব্দ করিয়া আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া "সুখে থাক" বলিয়া আশীর্বাদ করিল। আমাদের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতে করিতে বলিল "আও হামারা সাত আও, ভালা হোগা খোশ রহোগে।"

কি করি, সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে চলিলাম। ঐ জঙ্গলের মধ্যে একটি স্থান পরিষ্কার দেখিয়া সন্ন্যাসী সেইখানে বসিল। আমরাও তাহার সম্মুখে বসিলাম সন্ন্যাসী তাহার মাথার জট খুলিয়া আমাদের তিনজনার মাথায় ছোঁয়াইল। পরে প্রত্যেকের করকুষ্ঠি দেখিয়া গণিয়া বলিতে লাগিল—তোমারা এই হুয়া আর এই হোগা। ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া আমাদের মন, বিশেষ করিয়া আমার মন এতই আকৃষ্ট করিল যে সন্ন্যাসী যাহা বলে তাহা আর অবিশ্বাস হয় না। গণনা করিয়া দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জটার অগ্রভাগ নীচমুখে ধরিবামাত্র ধার বাঁধিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া অবাক। যাহা কখনও দেখি নাই দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত ভাবে অবাক হইয়া রহিলাম। কথা বলিতে বলিতে জঙ্গলের শুষ্ক খড় একগাছা ধরিয়া হাতে করিতেই খড়ে আগুন ধরিয়া গেল। আমার সঙ্গী দুইজন সন্ন্যাসীর পায়ের উপরে পড়িয়া রহিলেন। আমি অবাক হইয়া মাথা হেঁট করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসী এক হুংকার ছাড়িয়া বলিল, "বাবা কো পূজা দেও, ক্যা হায় দেখ্‌লাও"। আমরা যেন অজ্ঞানের মত হইয়া যাহার নিকট যাহা ছিল সমুদায় খুলিয়া সম্মুখে ধরিলাম। আমার নিকট এক আনা, সঙ্গীদের নিকট সিকি আধুলিতে চারি টাকা চারি আনা। দেখিয়াই বলিল—"দে দেও ঝোলামে ডাল দেও"। তৎক্ষণাৎ ঢালিয়া দিয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসী আগেই শুনিয়াছিল আমরা কলিকাতায় যাইব। আমাদের নিকট আর একটি পয়সাও নাই। সন্ন্যাসী অস্ফুট স্বরে কি যেন পড়িয়া কোমরের কাপড়ের পেঁচ হইতে তিনটি সিকি বাহির করিয়া তিন জনার হাতে দিয়া বলিল—"যা। কল্‌কাতা মে যা"। এই বলিয়া সন্ন্যাসী ত্রস্তে উঠিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সূর্য অস্তমিত হইয়াছে ঘোর অন্ধকার হয় নাই। আমরা ক্ষণকাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঐ স্থানে বসিয়া থাকিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া অতি মৃদু মৃদু পদে জঙ্গল হইতে বাহির হইলাম। কাহারও মুখে কথা নাই।

কি ঘটিল কি করিলাম! লাভ কি হইল। হাতের পয়সাগুলি খোয়াইলাম। আর দুঃখ করিয়া কি করিব। চাকদহের বাজারে রাত্রি থাকিয়া পরদিন সারাদিন

হাঁটিয়া রাত্রে এক কৃষকের বাটীতে অতিথি হইলাম। পরদিন চানকের মসজিদে রাত্রে অতিথি হইলাম। শুইয়া আছি, রাত্রি ১২টার সময় একটি লোক আসিয়া আমাদিগকে জাগাইল। তিন থালা ভাত, দাইল, মাছের ব্যঞ্জন, কি মাছ চিনিতে পারিলাম না। একেবারে ঘণ্ট করা। লাউ তরকারীর সহিত ঘণ্ট। ক্ষুধায় পেট পুড়িতেছে,—তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া শয়ন করিলাম। প্রভাতে উঠিয়াই কলিকাতা দিকে চলিলাম। বারাকপুরের বান্দা রাস্তা হইয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। ক্রমেই সহরের নমুনা চক্ষে পড়িতে লাগিল। বেলা দেড় প্রহর সময় দেখি গাছ তলায় দোকান সাজাইয়া একটি স্ত্রীলোক পানের খিলি বিক্রয় করিতেছে। কিছুদূর যাইয়া দেখি অন্য একটি গাছের তলায় সরবতের দোকান। আরও এক প্রকার ফল দেখিলাম, তাহার নাম জানি না দেখিতে ভাল দেখায়—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে এই ফলের নাম "জামরুল", খাইতে বড়ই সাধ হইল। এক পয়সার জামরুল খরিদ করিয়া খাইয়া দেখি,—মিস্টিও নয় টকও নয়, তবে খুব রসাল। যেন কতকটা জল ফলের মধ্যে রহিয়াছে। যতই সহরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, নূতন নূতন জিনিস, যাহা চিনি না—দেখিতে লাগিলাম। একবার দেখি একখানা পালকির নীচে চাকা জুড়িয়া দিয়া ঘোড়া দ্বারা টানিয়া লইতেছে। শুনিলাম ইহারই নাম ঘোড়াগাড়ী। দেখিতে দেখিতে দশখানা দশরকমের দেখিলাম। ইহারা যায় কোথা? কেহ পূর্বে কেহ পশ্চিমে কেহ অন্যদিকে ছুটাছুটি করিয়া যাইতেছে। অনেক দেখিলাম। থাকিব কোথা? সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল, যে আমার চাচার বাসাবাটীতে গিয়া থাকিব। যাইতে যাইতে রাত্র ১১টার সময় আমার সঙ্গীর চাচার বাসাবাটীতে উঠিলাম। চাচা বাসাতেই ছিল। মাথায় বাবরি চুল, লাল রঙ্গের তসরের ধুতি পরণে, গায়ের উড়নি মাথায় জড়ান। ১৮টা সোনা রূপার তাবিজ লাল সূতায় গাঁথা, হাতে বাঁধা তাহার সঙ্গে একগাছা রূপার তাগা। মাজার উপরে রূপার গোট চক্ চক্ করিতেছে। দাঁতে মিসি। একশ কথার পর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বিশেষ দিব্বি দিয়ে বারণ করেছি যে· আমার পরিচয় দিও না। বলিও কুষ্টিয়া স্কুলের একটি ছাত্র। কুষ্টিয়ার নিকটই বাড়ী। ইহার বেশী আর একটি অক্ষরও পরিচয় দিও না। সঙ্গীরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। ছোট একখানি খাপরা ঘরে মেজের একটি স্ত্রীলোক আধবয়সী—চাচার বয়সের অনেক বড়, দাঁত আছে কিনা অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই। চুলগুলি সম্পূর্ণ কাল নহে বোধ হইল। শেষে জানিতে পারিলাম চাচাজি এই রূপসীর ভালবাসার খাতিরে আর

দেশে যান্ না। বাগবাজারেই থাকা হয়, বেপারীদিগের মাল বোঝাই নৌকা, ফৌজদার সার আড়তে এবং একজন হিন্দু মহাজনের আড়তে আনিয়া দেওয়া হয়। তোষামদ করিয়া হউক,—জবরানে হউক মাল বোঝাই নৌকা আনিয়া আড়তে দিলেই চাচার কার্যসিদ্ধি। বহুদিন হইতে এই কার্য করায় অনেক বেপারীর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। চাচার উপার্জনও বেশ আছে। চাচার সঙ্গে চাচির প্রায় কথায় কথায় ঝগড়া হয় আবার তখনি মিটিয়া যায়। ঝগড়ার মধ্যের কথা আর প্রতিজ্ঞা শুনিলে বোধ হয় একি? এখনি এত কথা এত ভালবাসা—আজ ১২ বছরের ভালবাসা এক কথায় মিটিয়া গেল। মুহূর্ত না যাইতেই আবার মুখে হাসি দেখা দিল। হাসি রহস্যের দুটি কথা হইল সকলি মিটিয়া গেল। চাচিই উনুন জ্বালিয়া রান্না করিলেন। সোল মাছ আর সরু চালের ভাত। সে চাউল আমাদের দেশে বড়লোক জমিদাররাও আহার করিতে পান না। পাইবেন কোথায়? পাইলেও চলতি নাই। যাক আহারের পর মেঠাই খাওয়া হইল। তাহার পর শয়নের ব্যবস্থা। চাচা বাটী ঘর ছাড়িয়া কোথায় কাহার ঘরে ঢুকিলেন বলিতে পারি না, আমরা মেজেয় মাদুর পাড়িয়া শয়ন করিলাম। কলিকাতা দেখিতে আসিয়াছি, ৩।৪ দিন থাকিব এবং দেখিব। যে দিন রেল গাড়ী কুষ্টিয়া যায় সেই গাড়ীতে চড়িয়া যাইব।

আমরা আর কি দেখিব? ঘোড়ার গাড়ী, তেল শলিতা বিনা লণ্ঠনের মধ্যে আলো, গড়ের মাঠ, গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, আর দেখিলাম দালান কোঠা। চাচা চাচির নিকট হইতে বিদায় লইয়া কুষ্টিয়া চলিলাম। যাইবার সময় চাচা আমাদের তিনজনকে ছয়টি টাকা দিলেন, তাহার দ্বারা কিছু কেনাবেচা করিয়া কুষ্টিয়া চলিলাম। পাগল আহাম্মকের মত আসিয়াছিলাম, আহাম্মকের মত চলিলাম। যাইয়া শুনি বাড়ীতে কান্দাকাটি, আজ কয়েক দিন পর্যন্ত কান্দাকাটি, খোঁজ নাই কোথায় গিয়াছে।

আমার বৈমাত্র মাতামহী শুনিতেই বলিয়াছিলেন ঠিক হইয়াছে। আমাদের বক্সু মিয়াঁ ঐ বয়সে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল এও দেখি সেইরূপ করিল। ক্রন্দন ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য উপায় কি? পিতৃদেব পর্যন্ত সংবাদ গিয়াছে। তিনি হতাশ হন নাই কিন্তু বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। বলিয়াছেন হয়ত কাহার সঙ্গে কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়া কি কোন কারণে ভুলাইয়া কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না। ইচ্ছাপূর্বক গিয়াছে—দেখি আরও কয়েকদিন দেখি। এই সকল কথা কুষ্টিয়ার বাসায় শুনিয়া তখনই বাটীতে চলিলাম।

বাটীতে উপস্থিত হইলে পাড়ার লোক বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া আমাকে দেখিতে আসিল।

মাতামহী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। আমি স্থির করিলাম আমার আগাগোড়া অন্যায়। অনর্থক মনের কষ্ট, শারীরিক কষ্ট, অপমান আর ইহাদিগকে কষ্ট দেওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। বৈমাত্র মাতামহী আমার মুখে চুমা দিয়া বলিলেন, দেখ! এত অল্প বয়সে নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া হঠাৎ কোন কার্য করিও না। পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। আমার সন্দেহ হইয়াছিল, আমাদের বংশে এরূপ ঘটনা পূর্বে একবার হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যে কেলেঙ্কারী, শেষে মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত হইয়া আজ পর্যন্ত সে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। শুন বলি—তোমার পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্যামগঞ্জের বক্স্ মিয়াঁ ১৮।১৯ বৎসর বয়সের সময় নিরুদ্দেশ হয়। ১২।১৩ বৎসর পর হিন্দুস্থানী একজন লোক শ্যামগঞ্জে আসিয়া প্রকাশ করে, আমি বক্স্ মিয়াঁ। সে সময় বক্স্ মিয়াঁর মাতা বাঁচিয়াছিলেন। পিতার অভাব হইয়াছিল। বাড়ীর লোকে বক্স্ মিয়াঁর কথা শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিল। কিন্তু কথা, মুখের চেহারা হাবভাব একেবারে পরিবর্তন। কেহ বিশ্বাস করিল। কেহ সন্দেহ করিল। কিন্তু বক্স্ মিয়াঁর মাতা গোপনে দেখিয়া বলিলেন এই আমার পুত্র। শেষে তোমার পিতৃব্য মীর জোলফেকার আলি, তোমার পিতা ইহারা বলিলেন, কখনই বক্স্ মিয়াঁ নহে। বক্স্ মিয়াঁর মাতা এবং তাঁহার স্বপক্ষীয় ভদ্র-অভদ্র সকলেই বলিল সাঁওতার মীরসাহেবদ্বয় আপন লাভের জন্য অস্বীকার করিয়াছেন। বক্স্ মিয়াঁ হইলে এখানকার সম্পত্তি বক্স্ মিয়াঁরই হয়। তাহা না হইলে শাস্ত্রানুসারে সমুদায় সম্পত্তি তাঁহারাই প্রাপ্ত হন, লোকের মনে ধোঁকা বসিয়া গেল। অনেকেই ভাবিল, হইলেও হইতে পারে। লোভ—মানুষের লোভ বড় ভয়ানক। যাহা হউক বক্স্ মিয়াঁর মাতার কথায় বক্স্ মিয়াঁই সাব্যস্ত হইয়া গৃহীত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণের মনে সন্দেহ রহিয়া গেল। তাঁহারা একেবার নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না।

সে সময় জাত্যংশের ভারি গৌরব। বক্স্ মিয়াঁ আপন সমাজে বিবাহ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সঙ্গে কেহই মেয়ে বিবাহ দিতে স্বীকার হইল না। অনেক চেষ্টা অর্থলোভ দেখাইয়াও আপন সমাজ মধ্যে বিবাহ করিতে না পারিয়া পাবনার এলাকায় ভাড়ারা গ্রামে খাঁদিগের ঘরে বিবাহ করিলেন। দাদআলী খাঁর ভগ্নীকে বক্স্ মিয়াঁ বিবাহ করিলেন। বক্স্ মিয়াঁর কন্যাই বিবি আসিরন্নেসা।

আসিরন্নেসাকে সৈয়াদবংশের কোন পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পারিলেন না। মনের দুঃখে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বক্সু মিয়াঁর মৃত্যুর পর নাটরের দোস্ত মহম্মদ খাঁর পুত্র মহম্মদ আলী খাঁ তাঁহার পুত্র রসীদ খাঁ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইল। আসিরন্নেসার কপাল ফাটিয়া পড়িল, বড় জমিদারের পুত্রবধূ হইলেন। এখন শুনিতে পাই কত সৈয়াদ সাহেব আসিরন্নেসার একটু অনুগ্রহ লাভে লালায়িত। নাটরের ঘরের মালিকই হইলেন আসিরন্নেসা। স্বামীর ভালবাসার জন্যই আসিরন্নেসার এত মানসম্ভ্রম ক্ষমতা জন্মিয়াছে। মামা দাদ আলী খাঁকে লইয়া অত বড় জমিদারীর মালিক করিয়া দিয়াছে শুনিয়াছি।

এখন একথা এই স্থানেই ইতি করিলাম। যৌবন কালে আমি কুষ্টিয়া হইতে হাঁটিয়া ভাত ভিক্ষা করিয়া খাইয়া চুঁয়াডাঙ্গা জওয়ারদের বাড়ীতে দুই প্রহরের সময় ভাত চাহিয়াও পাইয়াছিলাম না। বুদ্ধির দোষে সকলি ঘটিতে পারে। পাকাপোক্ত না হইয়া সংসারে স্বাধীনতা যন্ত্র খাটাইতে গেলেই এইরূপ দুর্দশায় পতিত হইতে হয়। যৌবন জোয়ারে স্ফীত উদ্ধত স্বভাববশে, মনে হয়, এই ত সংসার। ইহাতে আর আছে কি? আমরা বুঝিতে পারিলাম না কি? এ ত বাঁধা গত, চিন্তার কোন কারণ নাই। চক্ষু বুজিয়া চলিয়া যাও। ইহাতে চলাফেরা করিতে আবার পরামর্শ কি? চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া আগ-পাছ ভাবিয়া পদ নিক্ষেপ করার কারণ ত কিছুই দেখি না। তবে আহাম্মকের সকল অবস্থাই কঠিন। "এই ধারণা যাহার, শীঘ্র অধঃপতন তাঁহার।"

পিতৃদেব, আমার বৈমাত্র মাতামহীকে লিখিয়াছেন যে, পদমদীতে এক ইংরেজী-বাঙ্গালা স্কুল হইয়াছে। মাষ্টার পণ্ডিত খুব ভাল, আপনি ছেলেদিগকে সঙ্গে করিয়া পদমদী আসিবেন।

আমার মাথা খাওয়া হইল। শিক্ষার শেষ ইতি এইখানেই হইল। বোধোদয়ের শেষ পর্যন্তই বোধ হয়, শিক্ষায় বোধ জন্মিয়া বিদ্যার ইতি হইল। কুষ্টিয়ায় নূতন মহকুমা বসিয়াছে, দিন দিন উন্নতি হইতেছে। যে মাঠের মধ্যে দিনে ডাকাতি হইত, সেই মাঠের মধ্যে মেঃ টি আই কেণীর দালান কোঠা বসিতেছে, নূতন বাজার হাট বসিতেছে। নদীর ঘাটে বোট বজরার আমদানী, স্টিমার আমদানী হইতেছে। রেলের গাড়ী নিয়মমত চলিবে। কুষ্টিয়া হইতে, সিরাজগঞ্জ ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, কাছাড়, মীর্জাপুর ইত্যাদি স্থানে প্রত্যহ স্টিমার যাইতেছে। দিন দিন স্কুলের উন্নতি, স্থানের উন্নতি হইবে, এই স্থান ছাড়িয়া জঙ্গলময় গণ্ডগ্রামে যাইতে হইল। নবাবের স্কুল, মাষ্টার পণ্ডিত নবাবের চাকর।

লেখাপড়াও নবাবী ধরনের হইবে, বুঝিতে পারিতেছি। তাহার পর বড়লোকের হুকুমবরদারী করিতে হইবে। হুকুমে উঠিতে হইবে, হুকুমে বসিতে হইবে, উঠিতে হইবে। সর্বোপরি আর এক মহাবিপদ, আমোদ-প্রমোদের লোভ, আরও নানা প্রকারের প্রলোভন সেখানে মজুত রহিয়াছে, নিত্য নূতন আমদানি। সেই জঘন্য স্থানে কি বিদ্যাশিক্ষা সম্ভব? বিশেষ করে আমার মত আমোদপ্রিয় লোকের। গান বাজনা শুনিতে আমার স্বভাবজাত বাসনা। গান বাজনার আওয়াজ শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। সে স্থানে উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। যৌবনের অঙ্কুরে, বয়সদোষে নূপুর অথবা জোড়ামলের ঝন্‌ঝনী, মতিচুরের কন্‌কনি শুনিলেই দুই কান পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা করে। সে আওয়াজ আমার কানে যেন মধুমিষ্টি সহিত মিশ্রীর শিরে ঢালিয়া দেয়। হাঁটিয়া হউক, দৌড়িয়া হউক, হামাগুড়ি দিয়া হউক, সেই মন-মাতান প্রাণ-মজান, শব্দের খোঁজে যাইতে ইচ্ছা হয়। এমন কলুষিত দূষিত জঘন্য অন্তরের লোকের ওরূপ ভরপুর আমোদের স্থানে থাকা কখনই সঙ্গত নহে। তাহার ত্রিসীমায় যাওয়া উচিত নহে। সকলি বুঝি, অথচ উপস্থিত সময় কিছুই মনে থাকে না। সে সময় ভাল-মন্দ জ্ঞান মাথায় আসে না। পদমদীর স্কুলে ছাত্রবেশে বিদ্যাভ্যাস জন্য গেলে বিদ্যা যাহা হইবার তাহা হইবে। অবিদ্যার লীলাভূমি মধ্যে ভ্রমণ করিলে, বায়ু সেবন হাওয়া খুরী করিলে যাহা হইবার হইবে। যাইতে মন সরিল না। আমার মন নড়াচড়া সরান সরানে কাহার কি পায়? চলিলাম—বিদ্যা উপার্জন জন্য পদমদী চলিলাম।

পদমদী যাইয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম। নূতন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। আমার সঙ্গী আরও ১০।১২ জন ছাত্র ছিল। আমি আর মদনমোহন চক্রবর্তীর বয়স সকল হইতে বড়। মাষ্টারের নাম বাবু নবীনচন্দ্র মহিন্তা—ঢাকা বিক্রমপুরে বাড়ী। পণ্ডিতের নাম শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খাস ঢাকায় বাড়ী। মাষ্টারবাবু যেমন খর্বাকৃতি তেমনই দেহে মাংসবিহীন হাড়ের পাজা। পণ্ডিত মহাশয় যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই দীর্ঘাকৃতি স্থূলকায় সুস্থদেহ। ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্র। মাষ্টারবাবু অপেক্ষা পণ্ডিত মহাশয় বিদ্বান। মাষ্টারবাবুমাত্র ইংরেজী ভাষা জানেন। পণ্ডিত মহাশয়ের হাতের অক্ষর খুব ভাল। অন্যান্য বিষয় অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল খুব ভাল জানেন। তিনি আরও অন্য অন্য বিষয় পড়াইতেন। মাষ্টারবাবু কেবল ইংরেজী পড়াইতেন।

[তিনি] গান গাইতে জানিতেন। শিক্ষিত গায়ক ছিলেন। গলাটাও মিষ্টি ছিল। বাঙ্গালা টপ্পাগান অনেক জানিতেন। পণ্ডিত মহাশয় কিছুই নহে। আমোদের

মধ্যেই নহেন। নবাবের বাটী হইতে স্কুলে আধক্রোশের কিছু কম। স্কুলঘরেই তাঁহাদের বাসা। স্কুলঘর বৃহৎ আটচালা। পাকা সান-পেটা। চারদিকে পাকা গাঁথনির দেয়াল, চুনকাম করা। উপরে উলুখড়ের ভাল ছাউনি। ঘরটি যেমনি বৃহৎ তেমনি পরিষ্কার। মাঠের মধ্যে খোলা জায়গায়। পূর্বে চন্দনা নদী, দক্ষিণে বহুদূর খোলা মাঠ,—উত্তরেও মাঠ। পশ্চিমে পদমদী গ্রাম। নবাবের নীলকুঠি, পদমদীর নীলকুঠি ঐ কুঠিই আটচালা। ইতিপূর্বে কোন সময় নীল কার্যের জন্য দেশী-জন্মা সাদা মুখ সাহেব সপরিবারে নীলকুঠির প্রধান কার্য-কারকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই সাহেব ঐ আটচালা ঘরে সপরিবারে বাস করিত। ভাল হওয়ারই কথা, সেই কুঠি বাড়ী হইতে নবাবের ক্ষুদ্র প্রাসাদে যাইতে আমাদের আমবাগানের সম্মুখে প্রায় দুইশত হাত রাস্তা ভাঙ্গা। বর্ষার জলে সে স্থানে ৫।৬ হাত গভীর জল হইত। মাষ্টার পণ্ডিতকে কুঠি বাড়ী হইতে হাতিতে চড়াইয়া আনা হইত। হাতি ঐ ভাঙ্গা স্থানে পিঠে হাওদা সাওয়ার মাহুতকে লইয়া সাঁতার দিয়া পার হইত। আবার রাত্রি দুপ্রহর সময় সাঁতার কাটিয়া কুঠি বাড়ীতে লইয়া যাইত। এই সামান্য স্থানটুকু নবাব সাহেব বাঁধাইতে মনযোগী হইতেন না। গ্রামের উন্নতি দেশের উন্নতির জন্য স্মরণীয় কোন কীর্তি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না। সে সকল সংকার্যপ্রতি তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, কিসে লোকে বড় লোক বলে। কিসে সাধারণ চক্ষে বড়লোক দেখায়। বাড়ীর উপরে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কত খাদ খন্দকে মানুষের চলাফেরার মহা কষ্ট। বর্ষাকালে নবাবের বাটীতে আসিতে সে সময় শুষ্ক পথ ছিল না। পাংশা হইতে সরকারী কাঁচা রাস্তা বালিয়াকাঁদী হইয়া ফরিদপুর পর্যন্ত গিয়াছে, সেই রাস্তা হইতে সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য মৌলবী গোলাম কাদের সাহেব নিজ গ্রাম কুরসী হইতে ঐ সরকারী রাস্তা পর্যন্ত আবার সরকারী রাস্তার উপর হইয়া, পূর্বদিকে নবাবের বাটী পর্যন্ত একটি রাস্তা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পর নবাবের বাটীর পিছনে সেও প্রায় দুইশত হাত রাস্তা ভাঙ্গিয়া জল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সরকারী রাস্তা পাংশা হইতে দাক্ষিণ দিকে যাইয়া দক্ষিণে কুরসী, বামে পদমদী গ্রাম রাখিয়া সোজা দক্ষিণে চালয়া গিয়াছে। মৌলবী গোলাম কাদের কুরসী হইতে পূর্বদিক, সোজা রাস্তা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই রাস্তা নবাব বাড়ীর পিছন হইয়া বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব ঘেঁষিয়া, পুষ্করিণীর পশ্চিম ও উত্তর পাহাড়ী হইয়া আমাদের আমবাগানের পশ্চিম হইয়া পূর্বদিকে চন্দনা নদীর দিকে গিয়াছে। রাস্তার পূর্ব সীমাই নবাবের

কুঠিবাড়ী, নবাবের বাড়ীর পিছনের রাস্তাও ভাঙ্গা, সম্মুখের রাস্তাও আমাদের আমবাগানের নিকটেও ভাঙ্গা। যাহাতে হাতি দিয়া পারাপারের কার্য চলে। আমি দুই বর্ষা হাতির দ্বারা মাষ্টার পণ্ডিতকে পারাপার করিতে দেখিয়াছি। কারণ দুই বৎসরই পদমদীর স্কুলে ছাত্র সাজিয়া ছিলাম।

মাষ্টারবাবু প্রতি রাত্রেই নবাবের মজলিসে আসিতেন, গান করিতেন, তাস খেলিতেন, পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া থাকিতেন। নবাবের সহিত এক দস্তরখানাতে কোন কোন দিন টেবিলে, কাঁটা চামচ অথবা হাতের কার্য দেখাইয়া চলিয়া যাইতেন। কোন কোন দিন মাষ্টারবাবুকে ধরিয়া তুলিয়া হাতির উপর চিৎপাত করিয়া শোয়াইয়া রাখা হইত। কারণ নবাবের মজলিসে পঞ্চম মকারের পূর্ণমাত্রায় অধিকার ছিল। ওষুধপত্রের গতিকে-বেগতিকে পাত্রের তারতম্য যাই হউক গুরুর কথা আর কি বলিব। মাষ্টারবাবুর গলার আওয়াজ সহিত বামা কণ্ঠের স্বর শুনিলেই আমি আর আমাতে থাকিতাম না। কোন স্থানে দৌড়, কোন স্থানে পায়চারি কোন স্থানে হামাগুড়ি দিয়া অতি গুপ্তস্থানে বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ নাচ-গান, রগড়-রহস্য দেখিতাম। কোন কোন দিন বমি—কোন কোন দিন অবিদ্যার সহিত বিদ্যার কলহ, কোন কোন দিন কমলিনীর সহিত অলির বিবাদ। কোন কোন দিন নবীনে প্রবীণে ঝগড়া। কোন দিন মাধবে শিবে মহা তর্ক। আমাদের মজলিসে তর্ক কিসের? তর্ক মানুষের আদি জন্ম লইয়া। মাধব বলেন, স্বভাবের ভাবে ক্রমশঃ রূপান্তর। উন্নতির সহিত রূপান্তর। প্রথম অন্ধকার বায়ু জল তাপ ধূম মাটির সৃষ্টি, মাটির গুণে তৃণ নানাবিধ গাছগাছড়া পরিবর্তন উন্নতির সহিত পরিবর্তন, বৃক্ষ তরুলতা পত্রের পরিবর্তন, প্রাণীর সৃষ্টি রূপান্তরে, কীটপতঙ্গ রূপান্তরেই মানব পশুর আকার গঠন। নূতন জীবের সৃষ্টি। শিবের তর্ক, তাই বটে একটু সোজা ভাবে আগুন। "প্রাণীর আবির্ভাব" কথা হইতে শ্রেণীমত আগুন। কীট পতঙ্গ পশুর সৃষ্টি, পশু হইতে উন্নতির সহিত পরিবর্তন মানবের সৃষ্টি সম্ভব,—দেখা যাউক কোন পশু হইতে। যাহার নিরপেক্ষ চক্ষু আছে সেই বলিবে—নর বানর একই কথা—ডারউইন সুপণ্ডিত। আমাদের মজলিসে কোন কোন দিন বড় মজা। সেই দিন বড় মজা। এলোকেশী আর নবীনে, পাল্লা গানের—যাকে লড়াই বলে। ঢাল তলওয়ারে নহে। হাতাহাতিও নহে। উত্তর-চাপানে লড়াই। পুরুষ নিন্দা নারী মুখে, নারী নিন্দা হতভাগা পুরুষের মুখে। কোন দিন মোসাহেব বসির মোল্লা আর মেহের খাঁর ভাঁড়ামির উত্তর-চাপান। মধ্যে মধ্যে বিদে পাগলের সং।

দ্বিতল বৈঠকখানার দক্ষিণ কামরায় রাত্রে বসা উঠা খোশগল্প আমোদ আহ্লাদ স্থান। তার পাশে বড় হল কামরা সাজান। সেই সাজান হলের, দক্ষিণ দিকে নবাব মনমোহিনীর শয়ন শয্যা। ঐ শয়ন শয্যায় বসিয়া প্রমোদ কুঠরির সমুদায় ঘটনা দেখা যায় শুনা যায়। আমি গুরু মহাশয়ের গলার আওয়াজ শুনিয়া বাড়ী হইতে এক দৌড়ে নবাবের বৈঠকখানায় ঢুকিতাম, পা টিপিয়া উপর তলায় যাইয়া অতি সাবধানে গায়ের ভর গায়ে রাখিয়া মনমোহিনীর শয়ন শয্যার এক পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া প্রমোদ কুঠরির সমুদায় অবস্থা দেখিতাম। সময় সময় কার্য গতিকে শয্যার মালিক ঐ বড় কামরায় আসিয়া আবশ্যকীয় কাজকর্ম সারিয়া আবার তখনি মজলিসে যাইয়া নবাবের বামদিকে গায়-গায় মিশাইয়া বসিতেন। তাঁহার শয্যায় বসিয়া আমি চুপে চুপে গান শুনিতেছি তাঁহাদের আমোদ-আহ্লাদ দেখিতেছি, তাহাতে তিনি বিরক্ত হইতেন না। বরং আমায় সাহায্য করিতেন। মাথা নওয়াইয়া মুখে দেখিয়াই আমার কানের কাছে মুখখানি আনিয়া কানে কানে বলিতেন, কোন ভয় নাই। তুমি এখানে বসিয়া বসিয়া মজা করে দেখ, কেউ টের পাইবে না। দেখ ভাই, সাবধান! মজলিস ভাঙ্গিবার পরে এক মুহূর্তও এখানে থাকিও না। ঠিক সময় বুঝিয়া আমি সঙ্কেত করিব। আমার সঙ্কেত "হাইতোলা" "হাতে তুড়ি দেওয়া" অথবা আমার ফেনী কুকুরকে সোহাগ করিয়া "যা যা বলিব" সেই কথার মানে বুঝেই, তোমার কর্তব্য কার্য বুঝিয়া লইও। এই প্রকারে গান-বাজনা শুনিতাম, নাচ দেখিতাম। গুরুমহাশয়দিগের আবদারী আমি আর সহ্য করিব কি? তাঁহাদের কেলেঙ্কারী ঝকমারী স্কুলের সেকরেটারি দেখিতেছেন, সহ্য করিতেছেন।

যে দিন মাষ্টার পণ্ডিত না আসিতেন কি সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহারা জানাইতেন, যে শরীর অসুখ, সেদিন তাস খেলার বন্দোবস্ত করা হইত। অথবা যেদিন মনমোহিনীর অভিমত না হইত, নারাজীর ভাব নবাব চক্ষে পড়িত সেদিন আর গান-বাজনার নামও হইত না। তাসখেলা হইত, তাসখেলার পালা পড়িলে আর কি কথা আছে—ডাক হতভাগাকে। ডাকরে পোড়াকপালেকে, ডেকে আন— ডেকে আন নবাবের হুকুম। গোপনে হুকুম মোহিনীর, প্রকাশ্য হুকুম নবাবের। ডাক্ ডাক্। শীঘ্রই ডেকে আনরে। লোকের পর লোক, তাহার পর দোতলার উপর হতে ডাক।

যাইতে ইচ্ছা হয়। মনের মধ্যে যাই-যাই ইচ্ছা—মজা করে তাস খেলিব কিন্তু প্রকাশ্য নারাজীর ভাব প্রকাশ করিতেই পিতা পর্যন্ত খবর,—তখনি আদেশ।

তাড়াতাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে দোতলায় উঠিতাম। যাইয়া দেখি তাস ভাগ করা সারা। নবাব আর মণি, আমি আর তিনি। কোন দিন নবাব আর বামি, তিনি আর আমিরে—তিনি আর আমি। এই প্রকার তাস খেলা হয়। এই তাসখেলার ফল ভবিষ্যতে মহাবিষময় ফল ফলিল। ক্রমে সপ্তাহে দুই এক রাত্রে গানবাজনা। আর বাকি রাত্রেই তাসখেলা। সর্বদা মেলামেশাঁর গুণ অতি চমৎকার। নিজে ভুগিয়া ভোগ করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বুঝিলাম, সর্বদা মেলামেশা একত্র বসাউঠা একত্র আহার একত্র আমোদ-প্রমোদ খেলা গল্প, পুস্তক পাঠ ইত্যাদি কার্যে যাহাদের সহিত একত্র মেশা যায়, অর্থাৎ যে মিশিতে যায়, সে যদি কাঁচা মন, কচি মাথা, দুর্বল হৃদয় লইয়া মিশিতে যায়, তবে সে পাকা মন, সুদৃঢ় মস্তক এবং সবল হৃদয়ের অনেক গুণ মস্তকের বহুভাব, পাকা মনের অনেক গুণ সঞ্চয় করিতে পারে। স্বাভাবিক টানে আসিয়া পড়ে। পাকাপোক্তর কিছু হয় না; মরণ হয় কাঁচার। স্কুলে প্রতিদিনই যাইতাম, পড়িতে ইচ্ছা হইত না। যাওয়া-আসা মাত্র। গুরু নিন্দা করিতে নাই আমিও করিব না। মনে দুঃখ হইত এই যে, ঢাকা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, একগোছা পরিষ্কার পৈতে গলায়। রান্না ঘরের ছায়া পর্যন্ত মোসলমানকে পাঁড়াইতে দেন না। মোসলমানের সঙ্গে এক বিছানায় বসিতে চাহেন না। তামাক খাচ্ছেন, হঠাৎ কোন কারণে ছোঁয়াছিত হইলে, যেমন তিনি এক বেঞ্চের উপর বসিয়া তামাক টানিতেছেন, হঠাৎ আমার পরিধেয় বসনের একটু বাতাস বেঞ্চের পায়ায় লাগিলেই, রামকুমার! রামকুমার বলে হাঁক্‌রাতেই রামকুমার উপস্থিত। বলে উঠলেন হুঁকর জল বদ্‌লে দেও; মুখখানি বে কেতা করে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন।

একি? এত কৃত্রিমতা গুরুর মনে। গুরুকাণ্ড যাহা যাহা দেখি তাহাতে ভক্তি হয় না। তাহাতে আর ভক্তি হয় না। কতদিন ভয় ভক্তি টানিয়া রাখিলাম, থাকল না, ছুটিয়া পলাইল। যখন নবাব দস্তরখানায় আহার করিতে দেখি শতপদ খাইলেও আমার মনে কিছু হয় না। যখন তাঁহাদের মা ভগবতীর মাংসের কাবাব ক্ষিরি কাবাব খাইয়া পোড়ামুখে প্রশংসা করেন। কি চমৎকার মাংস, গো-মাংস জানিয়াই প্রশংসা করিতেছেন। বিসানবোয় (স্বাভাবিক বিকৃত গন্ধ) যাহা ছাগল, পাঁঠা, খাসির মাংসে আছে, গো-মাংসে তাহা নাই। সেই হইল প্রশংসার কারণ। হিন্দু বামুনের মুখে গো-মাংসে গন্ধ নাই খুব মিষ্টি। প্রশংসার কথা। হায়! যে গোজাতির দ্বারা আমরা এত উপকার পাইতেছি, দুধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, সেই গরুর মাংসের কাবাবের প্রশংসা

আমার গুরুমহাশয় মুখে, আমি তাঁহার ছাত্র আর কি করিব ? কি করিতে পারি ? স্কুলে পড়িতে যাই, বর্ষাকাল জুতা পায় দিয়া যাইবার পথ নাই। আমাদের বাটীর পুষ্করণীর মধ্যে কলাগাছ গায়ে গায়ে বাঁধিয়া ভেলা প্রস্তুত করা হয়, সেই ভেলা ঠেলিয়া কতকদূর গেলে ভাঙ্গা রাস্তা যেখানে পণ্ডিত মাষ্টারকে হস্তী খেয়ার পার হইতে হয়, সে স্থান আমরা ভেলা ঠেলিয়া পার হইয়া পথে নামিলে হাঁটিয়া যাওয়া যায় কিন্তু খালি পায়ে যাইতে হয়, প্রায় সমুদায় পথেই জল আর কাদা।

স্কুলে যাইয়া দেখি গুরুমহাশয় নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। আহারান্তে নিদ্রা, বেলা ১টা। জাগাইতে নিষেধ, ঘরের দ্বার বন্ধ। ঘরের মধ্যে সাপ বেঙ যাহাই থাকুক দ্বার বন্ধ—কে দ্বার খোলে, আর কে জাগায় ! ছাত্রগণের সোর-গোলে বোধ হয় জাগিয়া কিছুক্ষণ পরেই স্কুল মধ্যে কোচার খুট গায়ে জড়াইয়া আসিলেন। চারটা পর্যন্ত স্কুল গুলজার। তারপর ছুটি। আবার বাটী আসিবার সময় ভেলায় চড়িয়া ভাঙ্গা স্থান পার, মাঠ পার। বাড়ী আসিয়া দেখি আমার বিছানা বালিশ উলটপালট। হাত মুখ ধুইয়া জলযোগের পর জলযোগের ব্যবস্থা কি ? দুধ চিড়ে খেজুরের গুড়, কোন কোন দিন বাগানের পাকা কলা। বিছানা বালিশের এদশা কে করিল ? তাহার পর একটি প্রয়োজনীয় জিনিসের আবশ্যক হইলে খুঁজিতে খুঁজিতে আর একটির কথা মনে পড়িল। যে স্থানে থাকিবার নিয়ম সে স্থানে নাই। ক্রমে দেখি আরশী চিরুণী ব্রাশ রিং সমেত চারটা চাবি—কলম কাটা ছুরি, একটু আতর সমেত সুন্দর একটা শিশি, এক জোড়া নূতন তাস, কে যেন লইয়া গিয়াছে। অনেক খুঁজিলাম পাইলাম না, শেষে সোর সার করিয়া বাড়ীর চাকরকে গালাগালি দিতেই বাড়ীর মধ্য হইতে মাতামহী দেউড়ী পর্যন্ত (পিছনের দেউড়ী) আসিয়া আমাকে ডাকিয়া চুপিচুপি কয়েকটি কথা কহিতেই, আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মুখে কথাটি নাই। নির্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। উপায় কি ? এত বড়লোক তাঁহার এই দশা না হাসি-তামাসা ?

সন্ধ্যার পর বসিয়া ভাবিতেছি। কত কথা কত ভাবনা মনে উদয় হইয়াছে। ইতিমধ্যে নবাব বাড়ীর আরদালী উপস্থিত। বলিল "আসুন। আপনাকে ডাকিতেছেন।" আমি কি করি যাই কি না যাই, পীট পীট আর এক লোক। চলিলাম দেখি কি হয়। যাইয়া দেখি, আজ বড় জাঁকাল জমকাল পোশাক পরে নবাবমোহিনী খোসমেজাজে যথাস্থানে বসিয়া আছেন। নবাবের মনও

সে সময় প্রফুল্ল একেবারে হাসি রহস্য গল্প চলিয়াছে। আমি চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলাম, নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার শরীর কি আজ ভাল নয় অসুখ হইয়াছে? আমি বলিলাম অসুখ কিছু নয়। মোহিনী বলিলেন—অসুখ নয়, তবে মুখ উস্কখুস্ক কেন? ভাবে বোধ হচ্ছে যেন কোথায় মার খেয়েছে? যদি তাহা না হয়, গরু হারিয়েছে?

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমার কি গরু আছে? হারাবে কি? চক্ষু নীচে করিয়া মোহিনী মাথা নাড়িয়া নীরব রহিল। আর আমার মুখের দিকে তাকিয়া মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিল। এদিকে কর্তার আদেশে অন্য দুই জন সুশ্রী স্ত্রীলোক গান আরম্ভ করিল। দুই এক পদ গান বাহির হইতেই "বাহবা বাহবা" "বহুত আচ্ছা" শব্দের আঘাতে কক্ষস্থিত বায়ুর ঘাত-প্রতিঘাতে সুরের জমাট বাঁধিয়া গেল। সুর স্বর লয়ে শ্রোতাগণের প্রাণ মোহিত করিয়া তুলিল। রাত্র ১০টা পর্যন্ত গান-বাজনা আমোদ প্রমোদে কাটিয়া পরে আহারের ব্যবস্থা হইল। আহারান্তে তাসখেলা হইবে কর্তার আদেশ। মোহিনী আহার করিতেছেন। সকলের আগে তিনি উঠিয়া হস্ত ধৌত জন্য ভিন্ন কামরা হল—কামরা তাঁহার শয্যার নিকট (যে স্থানে বসিয়া আজ ৪৭ বৎসর পর ১৩১৬৷১০ই শ্রাবণ সোমবার প্রাতে ৮টার সময় মোহিনীর সেই শয়ন শয্যায় চিহ্নিত স্থানে বসিয়া এই প্রুফ কাটিতেছি। পরিবর্তন বিষয় পরিবর্তন। সে দ্বিতল নবাবপ্রাসাদ আছে। সে সকল আসবাব নাই কিছুই নাই। সে কালের একটি লোকও নাই। কার্যগতিকে সেই দ্বিতল কোঠায় বাস করিতে হইতেছে। স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে, চিহ্নিত স্থানসকল দেখিয়া কত কথাই মনে হইতেছে, সকলই ঈশ্বরের মহিমা) গমন করিলেন। সকলেই সেখানে হস্ত ধুইয়া থাকেন। কেবল কর্তা নহে। কর্তার যেখানে খাওয়া সেইখানেই হাত ধোয়া। হাত ধোয়ার সরঞ্জাম আনিয়া চাকরেরা হাতে জল ঢালিয়া দেয় তিনি হস্ত ধৌত করেন। আমরা সকলে উঠিয়া হাত ধুইতে গিয়াছি, হাত ধুইয়া বড় কামরা হইয়া বৈঠক-কামরায় আসিতে হয়। হল কামরায় প্রায়ই বাতি থাকেনা। থাকিলেও এক কোণে সামান্য একটি বাতি টিপি টিপি করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের মধ্য হইয়া আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী মূর্তি। সেই এক প্রকার স্নেহে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুকে স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই অতি মোলায়েম সৌগন্ধিযুক্ত গণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটি কথা চুপি চুপি বলিলেন—এবং আমার হাতে কয়েকটা পানের খিলি দিয়া বলিলেন, ফেলিও না—মার খাইবে। বেত

লাগাইব। আমি দেখিব। ওখানে বসিলেই দেখিতে পাইব। তুমি ফেলিয়া দিয়াছ কি না?

আমি বলিলাম আপনি দিয়াছেন ফেলিব কেন? খুশী হইয়া নানা ভাবে সন্তোষের ভাব প্রকাশে ছুটিয়া আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁবেদার হুকুমবরদার দলও আপন আপন স্থানে বসিলে খেলা আরম্ভ হইল। খেলার মধ্যে ঠারে ঠোরে উনিশ-বিশ, দাদার কড়ী দিদিকে দিস্,—কথা চলিল। আমার খেলোওয়াড় আপন মনেই বলিতেছেন—বিবি ধরিতে ভয় কি? অপর পক্ষের একজন বলিলেন—"পাল্লে হয়"। মোহিনী বলিলেন, কেন পারবো না? যা মনে আছে তাই করিব, ঠেকায় কে? সাধ্য কার? কর্তা বলিলেন, সত্য কথা। বিবি কোথা? কার হাতে? কিছুইত বুঝিতে পারিতেছিনা। মোহিনী বলিলেন, তুমি বুঝবে কি? বিবির ভাব বোঝা সহজ কথা নয়।

কর্তা মোহিনীর গায়ে সুমিষ্টমধুর একটি ধাক্কা দিয়ে বলিলেন—গেল কোথা? কার ঘাড়ে চাপলে হে? এই ত আর তিনখানি কাগজ হাতে আছে। এর মধ্যে উড়ে যাবে? মোহিনী দক্ষিণ হাতের কনুই দিয়া মিষ্টিমধুর ধাক্কার পরিশোধ অতি মোলায়েম, অতি কোমল ভাবে কর্তার মখমল বিজড়িত বাহুতে ধাক্কা নয়, সোহাগে অতি সোহাগে একটু স্পর্শ করিয়া বলিলেন, চেপেই আছে, এখন চেপে বসবে। হাসিতে হাসিতে মোহিনী আবার বলিল এইবারে, এখন দেখি—দেখাই। কর্তার হাতেই রঙ্গের বিবি। তিনি বিবিকে বাহির করিয়া দিতে পারিতেছেন না। আর কি করিবেন? তাসের পড়তা উপায় কি?—বিবি দিতে হইল। না দিয়া আর উপায় নাই। বিবি ফেলিতেই আমি হাতের কাগজখানা উলটা করে চাপা দিয়া রাখিলাম। আমার খেলোয়াড় তাসখানা টানিয়া হাতে লইয়াই বিবির উপর আচ্ছা জোরে মারিতেই উপস্থিত নরনারী সকলেই হাসিয়া কুটিকুটি। মোহিনী বলিলেন এই নমুনা। কর্তা সহযোগী খেলোয়াড় দিকে লক্ষ্য করিয়া তাস বাটিতে বাটিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন। বুঝলে? নমুনার মানে বুঝলে? তুমি এখন বুঝবে না। যখন ধরা পড়বে তখন বুঝবে। এইরূপ কথা, সঙ্গে সঙ্গে আরেক কথা, কর্তার কথা—দেখা যাবে এইবার কে কাকে ধরে? উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেই মোহিনী বদ রঙ্গের বিবির উপরে সাহেব মারিয়া এই দেখ আর এক নমুনা। কর্তার পক্ষের খেলোয়াড় বলিলেন এ ধরাধরি কিছু নয়।

মোহিনীর মুখে খৈ ফোটে, অমনি উত্তর—এ ধরাধরি কিছু নয় তবে কি?

আমোদ-আহ্লাদে রাত্র ১২টা পর্যন্ত খেলা হইয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে যাইতে প্রস্তুত। কর্তাও আদেশ করিলেন; সকলেই চলিয়া আসিলাম। হল কামরার শেষ দ্বার পর্যন্ত আসিতেই দেখি, মোহিনী উগ্রমূর্তিতে দণ্ডায়মানা, বিস্ফারিত চক্ষু হইতে যেন জ্যোতিঃকণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অভ্যাস দোষে, সঙ্গদোষে এরূপ হইল যে—আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে হাসি রহস্য—তাস খেলিতেই ইচ্ছা করে। একটি বৎসর এইভাবে খেলা আমোদ-প্রমোদে ভালবাসায় কাটিয়া গেল। শেষফল—লোকলজ্জা, বদ্‌নাম, পাপতাপ কতদিন, কয় দিন গোপন থাকে? মনে কিছু না থাকিলেও, কেহ না জানিলেও ব্যবহার কার্যে নানাপ্রকার লক্ষণে মানুষের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। শেষে মত্ততায় বেশী বাড়াবাড়ি হইলেই হাটে হাড়ি ভাঙে। বাধ্য হইয়া পদমদী পরিত্যাগ করিতে হইল। লাহিনী পাড়ায় আসিলাম, পিতৃদেবের আদেশ—কৃষ্ণনগর যাইয়া কলেজে পড়। আমি সমুদায় ঠিক করিয়া দিতেছি, এই মাস পরে কৃষ্ণনগর যাইতে হইবে, একমাস কাটিয়া গেল। কৃষ্ণনগর চলিলাম। কৃষ্ণনগর কোথায় আমাদের দেশে কেউ জানিত না। কুষ্টিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইলে, কিছুদিন পাবনার অধীনে থাকিয়া পরে নদীয়া জিলার অধীন হয়। পাবনা নিকটে থাকিতে নদীয়ার সামিল হওয়ার কারণ? —লোকের সুবিধা। বর্ষাকালে পদ্মানদী পার হওয়া জীবন সংশয়। দক্ষিণ পার নদীয়ার সামিল হইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছে। বগুলা স্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর নদীয়া জজ-কাছারী এগার মাইল ব্যবধান। এ এগার মাইল পথেও ঘোড়াগাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। কুষ্টিয়া অঞ্চল হইতে কৃষ্ণনগর যাওয়া-আসায় কোনপ্রকার অসুবিধা নাই। কৃষ্ণনগরে যাইতে রওনা হইলাম। টিকিট কিনিয়া যাত্রীবেশে রেলগাড়ীতে কখনও চড়ি নাই। এই প্রথম আরোহণ ইচ্ছা। সঙ্গে দুইজন লোক—একজন চাকর আর একজন কৃষ্ণনগরের চেনা লোক। কোন পথে কি প্রকারে যাইতে হয় সকলি তাঁহার চেনা ও জানা আছে। কুষ্টিয়ার স্টেশন হইতে চতুর্থ শ্রেণীর গাড়িতে চড়িলাম। ভাড়া কম দিকেই তখন সকলের লক্ষ্য ছিল। আরও কথা, সকলের মনে বিশ্বাস যে সাহেবদিগের জন্য নির্দিষ্ট ঐসকল ভাল ভাল গাড়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণী আর চতুর্থ শ্রেণীতে কিছু প্রভেদ নাই। আর চতুর্থ শ্রেণীই আমাদের পক্ষে আরাম ও সুবিধা? —তৃতীয় শ্রেণীতে দুই পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, চতুর্থ শ্রেণীতে আপন মতলব মত বিছানা করিয়া আরামের সঙ্গে শুয়ে বসে যাও কোন কষ্ট বা খেজালত নাই। সর্বোপরি খরচ কম এইটিই বেশী লাভ মনে করিয়া অনেকেই

চতুর্থ শ্রেণীতে যাওয়া আসা করিতেন। রেলের গাড়ীর শ্রেণীভেদে যে মান মর্যাদার ইতর বিশেষ আছে, গাড়ী চলার প্রথম অবস্থায় এ প্রদেশে কথাটা গ্রাম্য লোকের মাথায় প্রবেশ করে নাই। বগুলা স্টেশনে গাড়ী লাগিল। টিকিট দিয়া স্টেশনের বাহিরে যাইতেই ঘোড়ার গাড়ীর সইস কোচওয়ান হাঙ্গামা করিয়া সকল যাত্রীকেই ধরপাকড় আরম্ভ করিল। গাঁঠুরি ব্যাগ ইত্যাদি ধরিয়া টানাটানি একপ্রকার জবরানে ধরিয়া আপন গাড়ীতে উঠাইল। কুলি, মজুর, সইস কোচম্যান মুখে বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আমি ত অবাক। যে এইসকল লোক এত ভাল কথা বলে, আমাদিগকে যে কথা সন্ধান তালাস খুঁজিয়া মুখে আনিয়া বলিতে হয়, এরা স্বভাবতই অনর্গল বলিয়া যাইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে আর রাস্তায় দোধারী মাঠ, গ্রামের নূতন ভাব নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হাঁসখালির ঘাটে আসিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়াই এক নূতন কাণ্ড-কারখানা দেখিলাম। আমাদের দেশে ডাকিয়া একটি লোক পাওয়া যায় না। গাঁঠুরি বোচকা ব্যাগ মাথায় করিয়া লইয়া যাইবার জন্য, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও একটি লোক পাওয়া যায় না;—এ দেখি! বিনা ডাকে এক জন বলিতে দশ জন আসিয়া টানাটানি করিতে থাকে। আর অতি আশ্চর্য চুর্নী নদীর খেয়াঘাট। কি আশ্চর্য! খেয়া নৌকা এপার হইতে ওপার যাইতেছে। লোক বোঝাই করিয়া যাওয়া আসা করিতেছে। দাঁড় নাই বটে, নাই হাল। এক গাছা দড়া টানিয়া নৌকা লইয়া যাইতেছে। নৌকা আরও আশ্চর্য। লোহার নৌকা জলের সঙ্গে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। দুই-তিন জন লোক উঠিলেই বুঝি নদীর জল নৌকায় উঠিবে। তার পর আমাদের দেশের খেয়া নৌকা যে ঘাটে লাগে, সে ঘাট হইতে নৌকায় উঠিতে মানুষের মহা কষ্ট। অতি উঁচু পাহাড়ী হইতে ধীরে ধীরে লাঠি কিংবা মানুষের কাঁধে ভর দিয়া নামিতে হয়, কতজন পা ফসকে পড়িয়া যায়। এ কেমন নৌকার সমান ঘাট কাটা। মাটি কাটিয়া নৌকার সমান করিয়া দিয়াছে। নৌকার কিনারে যাইয়া এসকল কথা ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে ঘোড়াসমেত একখানা গাড়ী মাটির উপর চলাচল করার ন্যায় একেবারে খেয়া নৌকার উপর চলিয়া গেল। ধরাধরি নাই, সোরাসোরি নাই, লোক ডাকা হাঁকা নাই। যেমন রাস্তার উপর ঘোড়ারা অনায়াসে গাড়ী টানিয়া লইয়া যায় সেইপ্রকার নৌকার উপরেও আনায়াসে গাড়ী টানিয়া লইয়া গেল। অতি আশ্চর্য! আমরাও ঐ নৌকায় উঠিলাম, দড়া টানিয়া পার করিল। ওপারে যাইয়া নৌকা হইতে নামিতেই মুটিয়া মজুর

আপন এলাকা নিজের জমিদারীতেও এমন সুশৃঙ্খলার সহিত

লোকজনের সুবিধা হয় না। কি সুন্দর বন্দোবস্ত! নৌকা ভিড়িতেই গাড়োয়ান মুটে মজুর সকলেই হাজির। আর তাহাদের কথাবার্তা এমনই সুন্দর, শুনিতেই ইচ্ছা করে। এতই মিষ্টি, এতই মর্যাদাপূর্ণ যে পূর্বে কখনই ওরূপ কথা কানে ওঠে নাই। ডাঙ্গায় উঠিলেই দেখি সারি সারি মেঠাইয়ের দোকান। নানা রকমের মেঠাই বড় বড় থালে সাজান রহিয়াছে। আমাদের দেশে খেয়াঘাটের আশেপাশের দুর্গন্ধে মানুষ নাকে কাপড় না দিয়া থাকিতে পারে না, আর এদেশে এ কি দেখি! ঘাটের উপরেই সুমিষ্ট খাদ্য সামগ্রীর দোকান। আবার গাড়ীতে উঠিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখি রাস্তার দক্ষিণ বামে ধানের খোলা—যেস্থানে ধান মাড়াই করে আমাদের দেশে সে স্থানকে খোলা বলে। খোলাতে সকলি আশ্চর্য। ধানের 'বাইল' শিষ সমেত গরু দিয়া মাড়াই করিতেছে না। একখানি কাঠের তক্তার একদিক মাটিতে লাগান, সেই তক্তার উঁচুদিকের নিকট দাঁড়াইয়া, ধানের গাছের গোড়ার দিকে ধরিয়া তক্তার উপর আছড়াইতেছে। ধোপাদের ন্যায় কাপড় কাচা গোছের ভাবেই আছড়াইতেছে। ধানসকল শিষ হইতে আছাড়ের চোটে পাটের সম্মুখে খসিয়া পড়িতেছে। যে দিকে লক্ষ্য করি সেই দিকেই আমার চক্ষে নূতন ভাব, নূতন দৃশ্য। গোয়ালিনীরা দুধ দই বাটি পুরিয়া বড় থালা, বা পাথরের থালায় সাজাইয়া গ্রামের মধ্যে বিক্রয় করিতে রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে। হাঁটার কেতাই অন্যরূপ। এক এক দলে ৫।৬ জন করিয়া মাথার চুল পিঠে ফেলিয়া কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে। বোধ হয় যাহার চুল সুদীর্ঘ নহে, তাহারাই চুল ঢাকিয়া অর্ধ উলঙ্গ শিরে যাইতেছে। কাপড় পরার ভাব, কাপড়ের পেঁচ আমার চক্ষে নূতন। সামান্য কাপড়েই সুশ্রী দেখাইতেছে। একি? এত ছোট বিড়াল, গাছের গোড়া হতে উপরে উঠছে কেন? একটি দেখিতেই আর একটি কোথা হইতে দৌড়ে ছুটে এসে গাছে চড়ে বসলো। বসলো কোথা? গাছের মুড়ির উপরে। বোধ হয় ইহারা গাছে অথবা মাঠেই থাকে। যে পরিসর মাঠ দেখিতেছি দুই তিন ক্রোশের মধ্যে বসতি নাই। বিড়াল আসিবে কি প্রকারে। শেষে গাড়োয়ানের কাছে শুনিলাম যে, ওগুলা কাঠবিড়াল। গাড়ী চলিয়াছে, যাইতে যাইতে এক লেংড়া ফকিরের আস্তানার নিকট গাড়ী থামিল। যে কয়েকখানা গাড়ী কৃষ্ণনগরের দিকে যাইতেছিল, সকল গাড়ীই ফকিরের আস্তানায় থামিল। সকল আরোহীরা গাড়ী হইতে নামিয়া কেহ মাটিতে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন, কেহ তামাক ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, দেখিলাম ফকির দশ বারটা হুঁকা সাজিয়াই রাখিয়াছে, শীঘ্র শীঘ্র আগুন দিয়া

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে লাঠি বগলে, লাঠির ভরে চলিয়া আসিতেছে। সকলকেই তামাক জল দিয়া পরিতুষ্ট করিল। যাহার যাহা ইচ্ছা হইল তিনি তাহা ফকিরকে দান করিলেন। আমি ফকিরের কোনরূপ সেবা গ্রহণ করিলাম না। ফকিরকে একটু দু'আনি দিয়া বলিলাম বাবাজি! আশীর্বাদ করিবেন।

ক্রমে সকল গাড়ীই আগ-পাছ হইয়া কতদূর চলিয়া যাইতেই মাইল পোষ্ট প্রতি চাহিয়া দেখি যে কৃষ্ণনগর অতি নিকট, মাত্র দুই মাইল। সকল গাড়ীই জোরে চলিতে লাগিল। আধঘণ্টা সময় গত হইতে না হইতে গুহদের বাড়ীর নিকট আসিলাম। গাড়োয়ানের নিকট শুনিলাম, ইহারা খুব টাকাওয়ালা। বিস্তর টাকা ঘরে মজুদ।

কৃষ্ণনগর সহরে এমন টাকাওয়ালা ঘর আর নাই। কথা শুনিতে শুনিতে সহরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে রাজবাড়ীর চিহ্নসকল নজরে পড়িতে লাগিল। ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের নির্মিত রাজবাড়ী। রাজার চক্ অতি সুন্দর। মেরামত নাই বলিয়া ভগ্ন চূড়া ভগ্ন গবাক্ষ ইত্যাদি চক্ষে পড়িল। এই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরোধী ছিলেন। এই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই মাননীয় বঙ্গ কবিগুরু ভারতচন্দ্র জীবনের শেষ অংশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজসরকার হইতে মাসিক ৪০ টাকা বেতন পাইতেন। কৃষ্ণনগরের রাজার আদেশেই অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়া "গুণাকর" উপাধি লাভ করেন। এই কৃষ্ণনগরের হাসি রহস্যের আদি জন্মদাতা মহোদয় গোপালভাঁড় রাজানুগ্রহে বৃত্তিভোগী হইয়া জীবন কর্তন করিয়াছেন। মান্যবর রসরাজ ঠাকুরও এই কৃষ্ণনগরে রাজার দরবারে আদরের সহিত সভাসদ্ পদে ছিলেন। এই সেই কৃষ্ণনগর যেখানে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। অধিবাসীগণ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কথাবার্তা কহিয়া থাকে, এ কথা ভারত বিখ্যাত।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাখা। যেমন পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা তেমনি লালিত্যপূর্ণ। যেমনি কণ্ঠস্বর তেমনি রসপোরা—এই কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর নিম্ন হইয়া পবিত্র গঙ্গার শাখানদী খড়ে নবদ্বীপের পাদধৌত করিয়া পূর্ব দক্ষিণ বহিয়া গিয়াছে। জগতবিখ্যাত পবিত্র নাম নবদ্বীপ। সরস্বতীর কমলাসনে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপ স্থাপিত রহিয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় জগৎ নিলয় না হওয়া পর্যন্ত নবদ্বীপের মহাপবিত্র গৌরব প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত রহিবে। বঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার আদিগুরু স্থান নবদ্বীপ। কত মহামহিম পণ্ডিত সুধী মহাবিদ্বানের জন্মভূমি। এই নবদ্বীপে

মহা-মাননীয় হিন্দুধর্ম সংস্কারক সর্বজীবে সমদয়া, দয়ার অবতার, সর্বজীবে সমস্নেহ, জাতিভেদে বৈরক্তি, প্রেমের উৎস প্রেমের প্রস্রবণ, সত্য সৎ প্রেমবশে দুষ্কৃতিদলন, নিবারণ প্রেমরসে দুশ্চরিত্র নির্দয় পাষাণ হৃদয় মানবগণের চরিত্র সংশোধক! শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মহোদয়ের জন্মস্থান লীলাস্থান। ঐ নবদ্বীপে জগাই মাধাই ডাকাতের সর্দারদ্বয়কে শুধু প্রেম অস্ত্রে সোহাগের ফাঁদে আবদ্ধ করিয়া গৌরাঙ্গদেব মহাকীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ কুসংস্কার মূলচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষের জন্ম ঐ নবদ্বীপে। ঐ নবদ্বীপে বঙ্গাধিপ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। বখতিয়ার খিলজী ১২ জন মুসলমান বীর সঙ্গে লইয়া বঙ্গাধিপের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপ মুসলমানের প্রথম রাজ্যস্থাপন, প্রথম পদার্পণ, প্রথম বীরত্ব প্রকাশ, প্রথম জয়স্থান। নবদ্বীপ কৃষ্ণনগরের অধীন। সেই কৃষ্ণনগরে আসিলাম। আজ আদালতের নাজির মুন্সী আওসাফ্ আলীর বাটীতে স্থান পাইলাম। তাঁহার পুত্র নজমলহাক, ভ্রাতুষ্পুত্র মাতকাফ্ সাহেবের সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। ক্রমে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

কলেজে ভর্তি হইলাম। কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম ও ক্লাসের মাষ্টার বিখ্যাত গুরুদাসবাবু—দি উমেশচন্দ্র দত্ত সে সময় প্রিন্সিপাল —বাঙ্গালা পড়া আর হইল না। যে পড়া সে নামমাত্র পড়া—ইংরেজী পড়িতে লাগিলাম। কলেজের পণ্ডিতগণের দশা সকল স্থানে একপ্রকার—কৃষ্ণনগর কলেজেও সেই প্রকার।

কৃষ্ণনগরের চাল-চলন দেখাদেখি ক্রমে আমার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল। দশজনের আচার ব্যবহারই আমার অনুকরণীয় হইল। কৃষ্ণনগরে মুসলমানের গৌরবমাত্র নাই। হিন্দু প্রধান দেশ। ধুতি পরিতে শিখিলাম। চাদর বা উড়নী গায়ে দেওয়া অভ্যাস হইল। মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাসানেবল করিলাম। হায় হায়! বাউরী চুল কাটিয়া থাক্ থাক্ করিলাম, পিছনের দিকে কিছুই নাই। সম্মুখভাগে সিঁথি কাটার উপযুক্তমত থাকিল। পাজামা চাপকান বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। টুপিটাও ক'দিন পরে সহপাঠিরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল। মুসলমান যাহারা কৃষ্ণনগরে আছেন (আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি) পরণ-পরিচ্ছেদ ত হিন্দুয়ানী, চাল-চলন হিন্দুয়ানী, রাগ-ক্রোধ হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী, মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী যথা—সামসুদ্দীন, সতীশ, নজমালহাক্—নজু, বোরহান—বিরু, লতিফ—নতু, মশারাফ—মশা, দায়েম—

ডাঁশ, মেহদি—মাছি, ফজলল করিম—ফড়িং এই প্রকার নামে ডাকা হয়। স্নান করিবার সময় সকলেই তেল মাখিয়া বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া হয়। মাথায় তেল মাখিয়া গামছা মাথায় দিয়াই হউক আর কাঁধে ফেলিয়াই হউক ঘাটে যাইয়া খড়ের জলে ডুব দিয়া স্নান করিতে হয়। ভিজে কাপড়ে বাসায় আসিয়া কাপড় বদলাইতে হয়। শিখিলাম, সমুদায় শিখিলাম। আরও শিখিলাম কি? শিক্ষা হইল কি? নামাজ রোজা ভুল। মুসলমানি আদব কায়দা সমুদায় ভুলিয়া কিভুতকিমাকার রূপ ধারণ করিলাম। আমার বাটী হইতে যে সকল খাবার জিনিস আসিত অনেক জিনিস মুসলমান ব্যতীত অন্য জাতির খাওয়া শুদ্ধ নহে। কিন্তু শুদ্ধ নহে কথাটা সে সময় ছাত্রসমাজে ছিল না। কাড়াকাড়ি করিয়া সকলে খাইয়া ফেলিত। একবার যেমন, অন্যদিকে ধাইয়াছে, যে রস একবার পাইয়া রসিক নাগর সাজিয়া রসের সাগরে হাবুডুবু খাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়াছে, সে কি আর সে রস ছাড়িতে পারে? না নীরস শিক্ষার পথে স্থিরভাবে দৌড়াইতে পারে? মন আমোদ চায়, মন মধুমাখা কথা চায়, প্রেমের নিমন্ত্রণ চায়, খোস গল্পের মজলিস চায়, খেলা-ধূলার আড্ডা চায়। আর চায়—মন মজান মনের মত ভালবাসা, আর রূপসী ললনার চাঁদমুখখানি সদা দেখিতে। কিছুদিন কৃষ্ণনগরে থাকিয়া সোজা সিঁথি কাটা, মিহি ধুতি পরা শিক্ষা করিয়া শ্রীযুত—আমি আমার কলিকাতা যাইতে ইচ্ছা হইল। আজ চক্ষে জল আসিতেছে, আজ মহাদুঃখে অন্তর ফাটিতেছে, সময়ের মূল্য বুঝি নাই। অনর্থক কাজে দিন গত করিয়াছি, রাত্রি কাবার করিয়াছি। এখন আক্ষেপ করিলে হইবে কি? যাঁহাদের বাটীতে বাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা কলিকাতায় যাইবেন। তাঁহাদের কলিকাতা যাওয়ার কথা শুনিয়া আমারও যাইতে ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, আমিও যাইব। সকলেই মহা খুশী। আগামী রাত্রে ৭।৮ টার মধ্যে আহার করিয়া রওয়ানা হইব। প্রাতের গাড়ীতেই কলিকাতা যাইতে পারি। ৯ টার মধ্যে কলিকাতা পৌঁছিব। আমি আমার চাকরকে বলিলাম যে কলিকাতা যাইতেছি, তুমি এখানেই থাক। খবরদার বাড়ী যাইও না। রাত্র প্রভাত হইল। দিন কাটিয়া গেল। সকাল সকাল আহার করিয়া আমরা এক গো-শকট ভাড়া করিয়া ধীরেসুস্থে বগুলায় চলিলাম। ১০।১২ জন এক গাড়ীতে যাইতেছি, কেহ হাঁটিয়া, কেহ গাড়ীতে। সারাটি রাত পর পর গান গাহিতে গাহিতে বেশ আমোদে আমোদে চলিলাম। রাত্র চারটার সময় বগুলা ষ্টেশনে উপস্থিত। বাজারের এক মুদি দোকানের নিকট গাড়ী থামাইয়া মুখ হাত ধুইলাম। সাড়ে সাতটার সময় গাড়ী ছাড়ে। এই

সময়টুকুর মধ্যে কেহ কেহ একটু ঘুমাইয়াও শরীর সুস্থ করিলেন। হিন্দু মুসলমান একত্রে যাইতেছি কিন্তু আকার-প্রকার পরণ-পরিচ্ছদ কাহারই মুসলমানের মত নহে সকলেই বাবু। নির্ধারিত সময়ে গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল। টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছুটিল। দীন দুঃখী বেশে একবার কলিকাতা দেখিয়াছি,—এই দুইবার। যতই কলিকাতার দিকে আসিতে লাগিলাম, ততই যেন উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। এখনই চক্ষের ধাঁধাঁ ছুটিয়া পূর্বে যে সকল স্থান দেখিয়াছি, দালান কোঠা দেখিয়াছি, সে সকল গতদৃশ্য যেন নূতন দৃশ্যে চাপা পড়িয়া গেল। বারিকপুরের স্টেশন দেখিয়া ভাবিলাম, এত বড় দালান কতদিনে প্রস্তুত করিয়াছে! মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মনে মনে বলিতেছি আর ভাবিতেছি। ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার নিকটে খাল পার হইতেই রেলগাড়ীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল। চারদিকে চাহিয়া দেখি হায় একি কাণ্ড! এত দালান এত উচ্চ চূড়া, উচ্চ চিম্‌নী দ্বারা অনর্গল ধূম বাহির হইতেছে চারদিকেই কলকারখানা। দেখিতে দেখিতে সেলদহ স্টেশনে গাড়ী থামিল। টিকিট দিয়া বাহির হইলাম। যাহা দেখি তাহাই নূতন। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই শত শত নূতন দৃশ্য আমার চক্ষুর গোচরে দূরে নিকটে নূতনত্ব দেখাইয়া সরিতে লাগিল। আমারা পদব্রজেই চলিয়াছি কিছুদূর যাইতেই দুই তিন জন সঙ্গী তাঁহাদের পরিচিত স্থানে চলিয়া গেলেন। ক্রমে আরও কেহ কেহ অন্য পথ ধরিলেন। আমরা তিনজন এক বাড়ীর লোক একসঙ্গেই রহিয়াছি একত্রই যাইতেছি। মৌলা আলী দরগার নিকটে আমার পরিচিত বাল্যবন্ধু মুন্সী কারাম মৌলার সহিত দেখা হইল। কারাম মৌলা কে? বলিতেছি। বিস্তারিতরূপে সঙ্গীদের পরিচয় দিতেছি।

মুন্সী নাদের হোসেন-পুত্র মুন্সী কারাম মৌলা। কোন মুন্সী নাদের হোসেন? যিনি পাবনায় ফৌজদারী আদালতের নাজির ছিলেন। যাঁহার সহিত পিতৃদেবের খুব প্রণয়, এবং আমার সহোদরা ভগ্নী সামসন্নেসার বিবাহ কথা, যাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র মুন্সী কজলেহাক সহিত হইয়াছিল। পূজনীয়া জননীর অনিচ্ছা, এবং সামসন্নেসার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই মুন্সী নাদের হোসেনের ২য় পক্ষের পুত্র কাবাম মৌলা। মুন্সী নাদের হোসেন যে সময় পাবনা জিলার নাজির ছিলেন, সেই সময় কারাম মৌলার মাতাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করেন। মুন্সী নাদের হোসেনের বসতবাটী যশোহর জিলার অন্তর্গত মক্তারপুর গ্রামে। পাবনায় চাকুরী করেন। চাকুরী স্থানে ২য় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া পাবনার বাড়ীতেই রাখিয়াছিলেন। পূজার সময় কাছারী বন্ধ হইলে ২য় স্ত্রী সহ নিজ বাটী মক্তারপুর গমন

করেন। ২।৩ দিন পরেই বুঝিতে পারিলেন যে, বড় স্ত্রীর সহিত ছোট স্ত্রীর বনিবনাও হইবে না। ছুটীর পর ২য় স্ত্রীসহ চাকরী স্থানে আসিয়া ২য় স্ত্রীর জন্য একটি বাড়ী প্রস্তুত করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিয়া খলিসাদহ গ্রামে বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। খলিসাদহ গ্রাম মহকুমা কুষ্টিয়ার অন্তর্গত পদ্মানদীর দক্ষিণ পারে। গৌরী নদীর পূর্ব পারে। কিন্তু লাহিনী পাড়া যে পারে সে পারে, নহে। লাহিনী পাড়ার নিকটে খলিসাদহ গ্রাম। আমার সহিত ছোট বেলা হইতে কারাম মৌলার আলাপ পরিচয়। আর একটি কথা এই স্থানেই বলিয়া রাখি, মুন্সী নাদের হোসেনের দুই স্ত্রী। এক স্ত্রী কারাম মৌলার মাতা। প্রথমা স্ত্রীর পক্ষে এক পুত্র কাজলেহাক আর তিন কন্যা, কারাম মৌলার আর ভ্রাতা ভগ্নী ছিল না। তিনি মায়ের এক পুত্র। কারাম মৌলার আর এক নাম ওরফে চাঁদ মিঁয়া। আমরা এখন হইতে চাঁদ মিঁয়া বলিয়াই উল্লেখ করিব! চাঁদ মিঁয়ার কলিকাতা আসিবার কারণ কি ?

মেঃ টীফোর্ট নামে একজন সাহেব উর্দু ভাষা শিক্ষার জন্য একজন মুন্সীর দরকার হয়। মুন্সী নাদের হোসেন চাকুরির ওমেদারী করিতে কলিকাতায় আইসেন। সে সময় তাঁহার বাড়ী বীরভূম জেলার অন্তর্গত মাড়গ্রামে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের চাকুরী করিতেন। মাড়গ্রাম অঞ্চলে ফারসী বিদ্যার বিশেষ চর্চা ছিল। মুন্সী নাদের হোসেন ফারসী বিদ্যায় খুব পরিপক্ক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট চাকুরির জন্য মুর্শিদাবাদ আসিলেন। ভ্রাতা আদর যত্নে বাসায় রাখিলেন কিন্তু ভ্রাতৃবধূর সহিত বনিবনাও হইল না। তিনি দেবরকে হিংসার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ভ্রাতার মন হইতেও কিছু কিছু সরিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে তাঁহাকে ভ্রাতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষার্থে কলিকাতায় আসিয়া চাকুরীর অন্বেষণে বেড়াইতে হইল। দীন-দরিদ্র অবস্থা, নির্দিষ্ট থাকিবার স্থান নাই। আজ এক মসজিদে, কল্য আর এক মসজিদে থাকিয়া চাকুরীর তলাশে সহরময় ঘুরা ফেরা করিতে লাগিলেন। কত লোকের নিকটে চাকুরীর ওমেদারী করিলেন। অদৃষ্টে নাই, হইবে কেন? দু মাস তিন মাস এইরূপ কলিকাতার পথে পথে ঘুরাফেরা করিলেন কিছুই হইল না। একদিন ক্লান্ত হইয়া গড়ের মাঠের ধারে একটি রাস্তার উপর গাছ তলায় বসিয়া দুঃখ করিতেছেন। লেখাপড়া শিখিয়াও এই দশা। কপালে না থাকিলে কিছুই হয় না। এমন সময় একটি ইংরেজ ঐ পথে যাইতেছিলেন। তিনি ঐ গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সী নাদের হোসেন ত্রস্তে খাড়া হইয়া সাহেবকে বিশেষ সম্মানে

সেলাম সারিয়া সম্মুখে খাড়া হইতেই সাহেব উর্দু ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? তিনি "ওমেদার চাকুরী প্রার্থী" এই কথা বলিয়া নিজের কষ্টের কথা জানাইলেন। সাহেব তাঁহার উর্দু কথা শুনিয়া বলিলেন, যে তুমি উর্দু পড়াইতে পার? উত্তর করিলেন, হাঁ পারি। সাহেব বলিলেন, আচ্ছা আমাকে তুমি উর্দু পড়াও এইক্ষণ মাস মাস ২০ টাকা মাহিয়ানা পাইবে। আর যদি আমার বাটীতেই থাক তবে তোমার থাকিবার স্থান খোরাকী ইত্যাদির বন্দোবস্ত আমিই করিয়া দিব। কোন বিষয় তোমার কষ্ট হইবে না।

আমার বাটীতে তোমাকে থাকিতে বলিতেছি কেন? আমার বাটীতে থাকিবার স্থান স্বচ্ছন্দে আছে। আর একটি সুবিধা হইতেও পারে, যে সকল সাহেব নূতন বিলাত হইতে বাঙ্গালা দেশে আইসে, এখানে আসিয়া তাহাদের উর্দু না শিখিলে কোন কার্যই চলে না। আমার বাটীতে সর্বদা থাকিলে আরও দুই একটি সাহেবকে পড়াইতে পারিবে। সে পড়ানোর জন্য তুমি যাহা পাইবে সে তোমার লাভ। আমি শখ করিয়া উর্দু পড়িতেছি। যে লোকটা পড়াইত সে একটা চাকুরী পাইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতেই আমার মুন্সীর প্রয়োজন। যদি তুমি ইচ্ছা কর তোমার জিনিসপত্র বিছানা ইত্যাদি যাহা থাকে তাহা লইয়া অদ্যই আমার বাটীতে আসিতে পার। এখনি আমার সঙ্গে চল, বাড়ী ঘর, তোমার থাকিবার স্থান দেখাইয়া দিব।

মুন্সী নাদের হোসেন সজল নয়নে বলিলেন, হুজুর! আমার জিনিসপত্র কিছুই নাই। সাহেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন তাহা হইলে তোমার অন্য কোন স্থানে যাইবার দরকার নাই। নাদের হোসেন উত্তর করিলেন, হুজুর! কোন স্থানে আমার কোন দরকার নাই।

সাহেব—আমার সঙ্গে আইস।

সাহেবের সঙ্গে সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন প্রকাণ্ড বাড়ী। দরওয়ান, খানসামা খেদমতগার লোকজন বিস্তর। সাহেবের মা বাপ সকলি আছে। সাহেবের পরিবার ছেলে মেয়ে বাটীতে অনেক। সাহেব তাহার থাকিবার স্থান দেখাইয়া দিয়া তাঁহার নিজ কামরায় চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে সাহেবের থাকিবার বারান্দায় ডাকিয়া নাদের হোসেনকে ২০টি টাকা দিয়া বলিলেন—এই তোমার এক মাসের মাহিনা। এ টাকা তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়া শোধ করিও। এই টাকা দ্বারা তোমার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বিছানা বালিশ, যাহা তোমার নিতান্ত প্রয়োজন বাজার হইতে খরিদ করিয়া আন। আর

পরনের কাপড় প্রস্তুত করিয়া লও। নাদের হোসেন সাহেবের আদেশমত কার্য করিলেন। দিন দিন সাহেবের ভালবাসার পাত্র হইলেন। আর পূর্ব মুন্সী হইতে ইহার নিকট পড়াও ভাল হইতে লাগিল। সাহেবের মা বাপ এবং অন্য অন্য পরিবারেরাও সকলেই নাদের হোসেনকে ভালবাসিতে লাগিলেন।

সাহেবের বাটীতে একদিন অন্য সাহেবদিগের নিমন্ত্রণ। সাহেবের বাড়ীতে একজন মোসলমান ভদ্রলোক থাকে। নিমন্ত্রিত সাহেবগণ দেখিলেন যে লোকটি খানসামা খেদমতগার নহে। বাড়ীর কর্তা, সাহেবের মেম, ছেলেরা, সাহেবের মা বাপ পর্যন্ত ভদ্রতার সহিত কথা কহে। উর্দ্দু ভাষায় কথা কহে। আরও তাঁহারা শুনিলেন—কানে শুনিলেন, সচরাচর সাহেবরাও যেরূপ উর্দ্দু কথা কহে—এ বাড়ীর সাহেব, মেম, ছেলে, মেয়ে সে প্রকার উর্দ্দু বলে না। খুব ভাল উর্দ্দুতে কথা বলে। সাহেবেরা কথায় কথায় লোকটি কে? কি করে? জিজ্ঞাসা করায় কর্তা সাহেব বলিলেন, আমার উর্দ্দু মাষ্টার—আমরা সকলেই উহার নিকট উর্দ্দু শিক্ষা করি, উর্দ্দু ভাষা ভাল জানে। নিমন্ত্রিত সাহেবদিগের মধ্যে ২।৩ জন উর্দ্দু মাষ্টারের নিকট উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করার কথা বলায় বাড়ীর কর্তা সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সচ্ছন্দে আপনারা শিখিতে পারেন। একটা কথার খটকা আছে, যিনি উর্দ্দু শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমার বাড়ী আসিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহারা সম্মত হইলেন। শিক্ষার একটা সময় নির্দিষ্ট হইল। ৩।৪ জন সাহেব শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে বাফোর্ড সাহেবও ছিলেন। উর্দ্দু মাষ্টারের বেতন তাঁহারা নিজে নিজে মাষ্টার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। মাসে ৫০ টাকার উপর আয় হইল। সকল সাহেব অপেক্ষা বাফোর্ড সাহেব নাদের হোসেনকে বেশী ভালবাসিলেন। ৭।৮ মাস পর বাফোর্ড সাহেব নাদের হোসেনকে বলিলেন, দেখ মাষ্টার! আমি শীঘ্রই চাকুরী করিতে মফস্বলে যাইব। আমি ম্যাজিস্টার। উর্দ্দু পরীক্ষা দিয়াই আমি মফস্বলে যাইব। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে তোমাকে আমি ভাল চাকুরী দিব। তোমার ভাল হইবে। আমি তোমাকে বড় লোক, খুব টাকাওয়ালা করিয়া দিব। চলো আমার সঙ্গে।

নাদের হোসেন বলিলেন, সাহেব! আমি যাইতে রাজি আছি, কিন্তু আমার মনিব সাহেবকে নারাজ করে, কি তাঁহাকে না বলে কিছুতেই যাইতে পারি না। সাহেব বলিলেন, আমি কি না বলে গোপনে যেতে বলছি? তা ত নয়? তাঁকে বলে যেতে হবে। তিনি তোমাকে যখন ভালবাসেন—তোমার ভাল হওয়ার কথা,

শুনে তিনি অবশ্যই যেতে বলবেন। তোমার উন্নতির কথা শুনে খুব সুখী হবেন। তুমি আজকেই তাঁর কাছে বলে, কাল আমাকে বলিও। নাদের হোসেন সমুদায় কথা মনিব সাহেবকে বলিলে তিনি খুব খুশী হয়ে বললেন, বাফোর্ড আসিলে তাঁকে আরও ভাল করে বলে দিব।

নাদের হোসেন বাফোর্ড সাহেব সঙ্গে যাইবেন স্থির হইয়া গেল। সপ্তাহ কাল অতীত না হইতেই বাফোর্ডকে যশোহর যাওয়ার আদেশ হইল। নাদের হোসেন সাহেব সঙ্গে যশোহর আসিলেন। বাফোর্ড তাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। ১৫ দিন অতীত হইতে না হইতে নাদের হোসেনকে নাজিরী কার্য দিলেন। সামান্য অপরাধে সাবেক নাজিরকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের লোককে সেই পদে বহাল করিলেন। সে সময়ের নাজির তায় আবার ফৌজদারীর। তার উপর সাহেবের নিতান্তই ভালবাসা। খুব রোজগার হইতে লাগিল। ২।৩ বৎসরের মধ্যে নাজির নাদের হোসেন টাকার জোরে ফাঁপিয়া উঠিলেন।

সেই সময় গরীবপুরের তরফদারদিগেরও খুব জাঁক। হাতি-ঘোড়া জোত-জমা নগদ টাকার কারবার খুব চলিতেছে। তাঁহারা প্রায়ই যশোহরে গমন করেন কার্যগতিকে নাজিরের হাতে পড়িতে হয়। টাকাও দিতে হয়। নাজিরের বাসায় আসিলেই পোলাও কোরমা খাইতে হয়! এই প্রকারে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। সে সময় ফকির মামুদ তরফদারই গরীবপুরের বাড়ীর মালিক ও কর্তা। যশোহর হইতে গরীবপুর প্রায় ৭।৮ ক্রোশ ব্যবধান। নাজিরকেও একবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গরীবপুর আসিতে হইয়াছিল। ক্রমে যাওয়া আসা, ক্রমে আঁটাআঁটি শেষে ফকির মামুদ তরফদারের বড় কন্যার সহিত নাদের হোসেনের বিবাহ হইল। বড়লোকের কন্যা বিবাহ করিলেন তিনি আর যশোহরে স্বামীর বাসায় আসিলেন না। নাজিরই প্রতি শনিবারে শ্বশুর বাড়ীতে আসিতেন। বিবাহের কিছুদিন পরেই নাজির সাহেব শ্বশুর বাড়ীতে পরিবারসহ থাকা সঙ্গত মনে না করিয়া গরীবপুর হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধান কপতাক্ষ নদীর ধারে মক্তারপুর গ্রাম চৌগাছার তারিণীচরণ ঘোষ জমিদার নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিলেন এবং স্ত্রী লইয়া ঐ নূতন বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে কজলেহাক্ নামে পুত্র আর তিন কন্যা জন্মিল। এদিকে বাফোর্ড সাহেবও যশোহর হইতে পাবনা জেলায় বদলি হইলেন। নাজিরকে বলিলেন আমি চিঠি লিখা মাত্র তুমি পাবনায় চলিয়া আসিও। তিন মাস অতীত না হইতেই সাহেবের পত্র আসিল। নাদের হোসেন ছুটি লইয়া পাবনায় আসিলেন।

আসিবামাত্র পাবনায় নাজিরী কার্য পাইলেন। প্রায় ১০।১২ বৎসর পাবনায় থাকিয়া নাজিরী করিলেন। ইহার মধ্যে বাফোর্ড সাহেব বিলাত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবার তাঁহাকে আর পাবনায় যাইতে হইল না। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেই জেলা ২৪ পরগণার আলীপুরের জজিয়তী পদে নিযুক্ত হইলেন। নিযুক্ত হইয়াই নাদের হোসেনকে লিখিলেন আলীপুরে চলিয়া আইস। পাবনায় নাজির পদে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কজলেহাক্‌কে একটিং দেও। মনিবের আদেশ মত তাহাই করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পাবনায় নাজির হইলেন, নাদের হোসেন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া সাহেব সহিত দেখা করিতেই সদরআলার সহিত দেখা করিতে হুকুম দিলেন। কৈলাস বাবু সদরআলার সহিত দেখা করিতেই নাদের হোসেনকে এক প্রবীণ স্টেটের ওয়াশিলাতের আমিন নিযুক্ত করিলেন। যেমন তেমন আমনি নহে। তিন চার লক্ষ টাকার জমিদারী লইয়া মকদ্দমা—বিলাত আপীল পর্যন্ত বিচার। সেই স্টেটে ডিক্রিদার পক্ষে ৭।৮ বৎসরের ওয়াশিলাতে নির্ধারণ জন্য স্পেসাল আমিন নিযুক্ত হইলেন। প্রধান স্ত্রী ত কখনই স্বামীর চাকুরী স্থানে আইসেন নাই! ২য় স্ত্রীই সঙ্গে সঙ্গে আছেন। খলিসাদহের বাড়ীতে চাকর গোমস্তা রহিয়াছে। সেখানেও অনেক জমিজমা রাখিয়াছেন। ধানের কারবার করিতেছেন। আলীপুরে আমিনি অবস্থায় বাসা, চেতলা হাটের পশ্চিম দিকে। চাঁদ মিঁয়ার কলিকাতা আইসা ও থাকার কারণও তাহাই। পিতা আলীপুরে কার্য করেন, পিতা মাতা দুই কলিকাতা চেতলায়—তিনিও কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মৌলা আলীর দরগার নিকটেই আমার সঙ্গে দেখা। কিছুতেই ছাড়িলেন না। বাসায় লইয়া যাইবেন। কি করি, দায়ে ঠেকিয়া চাঁদ মিঁয়ার সঙ্গে তাঁহাদের চেতলার বাসায় যাইতে হইল। আমার সঙ্গীরাও চাঁদ মিঁয়ার অনুরোধে চেতলায় চলিতে হইল। আমার সঙ্গী দুইজন, আর আমি এই তিন অতিথি চাঁদ মিঁয়ার সঙ্গে চলিলাম, বাসায় পৌঁছিলে আমাদের আদর-অভ্যর্থনা হইল। নাদের হোসেন সাহেব আমিনি কার্য করেন, কিন্তু বাসার লোকজন সকলেই তাঁহাকে নাজির সাহেব বলিয়াই ডাকে। আমরাও নাজির সাহেবই বলিব। নাজির সাহেব স্বয়ং আসিয়া আমাদের নাস্তার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নাস্তা করার পর ১১ টার সময় আহার করিয়া সহর দেখিতে কলিকাতায় চলিলাম। চাঁদ মিঁয়া এবং নাজির সাহেবের প্রিয় বিশ্বাসী খানসামা "যাদু" আমাদের সঙ্গে আছে। যাদুর আসিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গীরা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাঁহাদের একটি আত্মীয় ধর্মতলায় থাকেন

তাঁহারই বাসায় যাইবেন বলিয়া বিদায় হইলেন। কথা হইল আগামী কল্য ৩টার পর স্টেশনে উপস্থিত হইতে হইবে, তিনটার পর যে ট্রেন পাইব সেই ট্রেনেই বগুলা যাইব। তাহার পর যতই রাত্রই হউক কৃষ্ণনগর।

কথা স্থির করিয়া তাঁহারা উত্তরে আমরা দক্ষিণে চলিলাম। রাত্র ৮টা বাজিতে বাজিতে চেতলার বাসায় পৌঁছিলাম। আমি চেতলার বাসায় যাইতেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় উহাদের পরামর্শ কানকথা নাজির সাহেব সঙ্গে চাঁদের, কখনও যাদুর, কখনও আমিন সেরাস্তায় কাল মুন্সীর কখনও মক্তারপুরের আর একটি ভদ্রলোকের হইতে লাগিল। কি পরামর্শ তাহা ঈশ্বর জানেন। পরের বাসায় আছি পরের কথা লইয়া আমার মগজ ক্ষয় করার দরকার কি? রাত্রে আহার করিয়া বসিয়া আছি। নাজির সাহেব আমাদের নিকটে আসিয়া বসিলেন। চাঁদ মিঁয়াও আমার নিকটে বসিয়া উর্দু কেতাব ফ্যাশানে আজায়েব পাঠ করিতে লাগিলেন। আমি এবং আর কয়েকজন শুনিতেছিলাম—ইতিমধ্যে নাজির সাহেব আসিয়া আমার সহিত নানারূপ আলাপ আরম্ভ করিলেন। কোথায় পড়ো? সেখানে মাসে মাসে কত খরচ পড়ে? তোমার পিতা পদমদী বেশী দিন থাকেন—না লাহিনী পাড়ায় বেশী দিন থাকেন? তোমরা কয় ভাই? লাহিনী পাড়ায় তোমার নানী কেমন আছেন? ইত্যাদি—

এ-কথা সে-কথার পর শেষে বলিলেন যে, আমার বাসা এখানেই আছে, কায়বম মৌলাও কালীঘাটের স্কুলে পড়ে, আমার ইচ্ছা যে আপনিও আমার এই বাসায় থেকে কালীঘাট স্কুলে পড়ুন। আপনার বাপের নিকট আমি লিখিয়া পাঠাইতেছি। তাঁহার নারাজির কোন কারণ নাই। তিনি বরং খুশী হইবেন।

"আপনি আমার পিতার নিকট লিখুন। তিনি আদেশ করিলে অবশ্যই কলিকাতায় আপনার বাসায় আসিব"।—এই সকল কথা আর অন্য অন্য কথা কহিয়া নাজির সাহেব চলিয়া গেলেন, আমরাও তাস লইয়া বসিলাম। যাদু খানসামা আমার পিঠের নিকটে বসিয়া খেলা দেখিতেছে। কতক্ষণ খেলা করার পর নিদ্রার ব্যবস্থা হইল। যাদু খানসামার বয়স ২০।২২ বৎসর। আমি আবশ্যকীয় কার্য জন্য ঘরের বাহিরে গিয়াছি—দেখি, যাদু আমার পিছনে পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাহির বাটীতে একটা ফুলের বাগান আছে, যাদু আমার হাত ধরিয়া ফুলের বাগানের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, আপনি শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা করেন ইহাই কর্তার ইচ্ছা। আর একটি

ইচ্ছা আছে, তাহা আমি আপনাকে গোপনে—আরও গোপনে বলিব, আর একটু সরিয়া আসুন।

আমার প্রাণের মধ্যে কাঁপিতেছে। কি কথা? আমার সঙ্গে যাদুর এত গোপনীয় কথা কি? যাদু অতি ধীরে ধীরে কথা কয়েকটি বলিল। আমি হাঁ-না-কি কোন উত্তর করিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে আসিয়া শুইয়া রহিলাম। কিন্তু ঘুম হইল না। চিন্তা যেন চারদিক হইতে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া লইল। ছোটবেলা হইতেই চিন্তা করা অভ্যাস, কোন কথা, কার্য, কি কোন ঘটনা ঘটিলে, কি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ভাল মন্দ ভাবিয়া কি প্রকারে ঘটিবে, ঘটিলেই বা কি হইতে পারে—এই সকল বিষয় যতদূর সম্ভব চিন্তা করিয়া, অনেকটা স্থির করিতে ও বুঝিতে পারিতাম। প্রায় ২০ বৎসর বয়স হইয়াছে, বয়োবৃদ্ধির সহিত চিন্তাশক্তিও বাড়িয়াছে, এটা বেশ বুঝিতে পারিতাম। যাদুর কথায় কত কথাই মনে উঠিতেছে। ভাল মন্দ দুই উঠিতেছে, কোন্ সময় চক্ষে ঘুম আসিয়াছে—জানি না। প্রভাতে নাজির সাহেবের গলার আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি প্রভাতীয় উপাসনার পর কোরাণ শরীফ উচ্চ রবে পাঠ করিতেন। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া নিত্য নিয়মিত কার্য ইত্যাদি সমাধা করিয়া বসিয়া আছি। নাজির সাহেব আসিয়া বলিলেন, বাবাজী, আমি তোমার পিতার নিকট পত্র লিখিয়াছি। যাহা হয় জানিতে পারিবে। কলিকাতায় আসিলে আমার সহিত দেখা করিও, আর যদি তোমার পিতার অনুমতি পাও তবে আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই আসিও। আর অনেক অনেক কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমরাও আহারাদি করিয়া নিয়মিত সময়ে স্টেশনে আসিয়া সঙ্গীদিগের সহিত একত্র হইলাম। চাঁদ মিঁয়া আমার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, গাড়ীর সময় হইলে আমরা সকলেই চাঁদ মিঁয়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গাড়ীতে চড়িলাম। নিয়মিত সময়ে বগুলায় আসিয়া বাসায় আসিলাম।

কয়েকদিন পরেই কলেজ একমাসের জন্য বন্ধ হইল। চাকরটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে আসিলাম। লাহিনী পাড়ার বাটীর লোক আত্মীয়স্বজন মাতামহী আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কথা ফিরিয়াছে, ভাব-ভঙ্গি ফিরিয়াছে, বেশ ফিরিয়াছে; পরন পরিচ্ছদে আর পূর্ব ভাব নাই, চুলে নানা রকম কেতা বসিয়াছে। দিব্বি যেন একজন ফুলবাবু। তাঁহারা বলিলেন—সহবাসেই দোষ গুণ জন্মে, মানুষের স্বভাবই এইরূপ। যে স্থানে যে দলে যে সর্বদা মিশামিশি উঠা-বসা করে নিশ্চয়ই স্থানীয় দলের, সহবাসীদিগের দোষগুণ অনেক পরিমাণে

মাথায়, মজ্জায়, হৃদয়ে, অন্তরে, বাহিরে নির্ভর করে। কয়েকদিন পর পিতৃদেব লাহিনী পাড়ায় আসিলেন। আমার হাবভাব দেখিয়া তিনিও আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না, ও-সকল দিকে যেন লক্ষ্যই করিলেন না। চিকন ধুতি পরিয়া, কোঁচা ঝুলাইয়া, সিঁথি কাটিয়া, খোলা মাথায়, জীবনে তাঁহার সম্মুখে যাই নাই। এই প্রথম গমন। আমি যে এক নূতন সাজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছি, সে কথা আমার মনে উদয় হয় নাই, কৃষ্ণনগরে যে প্রকার থাকিতাম সেই ভাবেই উপস্থিত হইলাম, তিনি কিছুই বলিলেন না। কলিকাতায় গিয়াছিলাম—নাজির সাহেবের বাসায় গিয়াছিলাম, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিলেন, আহারাদি কিরূপ? আদর অভ্যর্থনা কি প্রকার? খুঁটিয়া খুঁটিয়া এক কথা দু বার তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন। আর কৃষ্ণনগরের কথায় কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিনদ সেখ দ্বারা তোমার খাওয়ার জন্য গোমাংসের ঝুরি পোরা, সমশা। পিঠে,—আর মুরগীর ডিম, মাংসের কাবাব, আর আর খাদ্য যাহা পাঠান হইয়াছিল,—এ বাড়ী হইতেও সেই সঙ্গে যে সকল খাদ্য সামগ্রী পাঠান হইয়াছিল, তোমার বাসায় লইয়া যাইতেই নাকি অনেক ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল?

আমি বলিলাম, হাঁ তাহারা সকলেই খায়। আমার সঙ্গে একত্র বসিয়া খায়, কোনরূপ বাচবিচার করে না। হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোনরূপ ভিন্ন ভেদ মনে করে না। আমাদের দেশের মত নহে যে, একটু ছোঁয়াছিত হলেই এ নষ্ট, তা নষ্ট হইল; সেরূপ হিংসার ভাব, ঘৃণার ভাব, তাহাদের মনে নাই।

পিতা বলিলেন—আমি বড়ই খুশী হইলাম। হিন্দু মুসলমান এরূপ প্রণয় ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন যত সুখের সে সুখ আর কোন সুখে নাই। কলিকাতা হইতে নাজির সাহেব পত্র লিখিয়াছেন, তোমাকে তাঁহার বাসায় রাখিয়া লিখাপড়া শিখাইবেন, সমুদায় খরচপত্র তিনি দিবেন। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন। তা তুমি ইচ্ছা করিলে যাইতে পার, তবে একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে—ভাবিতে গেলে সে সন্দেহ কিছুই নহে। নূতন কোন কার্য করিতে হইলে, আমার অভিমত জানিয়া করা কর্তব্য, একালে ছেলেদের যেরূপ মতি গতি দেখিতেছি—তাহারা ভাবে যেন কতই বুঝিয়া বসিয়া আছে। নিত্য নূতন কথা শুনিতেছে, নিত্য নূতন দেখিতেছে, আমরা যাহা দেখি নাই, যাহার নাম শুনি নাই, তাহারা চক্ষের উপর দেখিতেছে। আমাদের মুরব্বিয়ানার আর তাল পাইতেছে না। সেদিনের ছোঁড়া দ্বারি চোবে—দেবী চোবের ছেলে, সে বলে কি যে

আমাদের এই গৌরী নদীর উপরে পুল হবে—শুধু পুল নয়, রেলের গাড়ী চলিবে কি কথা! গৌরীনদী এত জোরের নদী, যে কত নৌকা মারা যাইতেছে, ক মানুষ ডুবাইয়া মারিতেছে, একটা হাতি পার হইতে হইলে আধ ক্রোশ এক ক্রো ভাসাইয়া লইয়া যায়, বর্ষাকালে স্রোতের দিকে তাকান যায় না, মাঝে মা দুই একখানা ধূমকলের নৌকা যায়, গৌরীর স্রোত কাটিয়া উজানে উঠিতে পা না, হয় স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে, নয় স্রোতেই ভাসাইয়া লইয়া যায়—কিছুতেই উজাইতে পারে না। তাহার মধ্যে, সেই স্রোতের মধ্যে লোহার থ পুঁতিবে কি প্রকারে? আমার ত বিশ্বাস হয় না। যদি সত্য হয় তবে ঐ ছোঁড়াট কথাই সত্য হইবে, কাজেই তাহাদের নিকট আমরা পরাস্ত, তাহাদের জিত, মুরু বলিয়া বেশী বুদ্ধি রাখি, বেশী বুঝি বলিয়া যে একটা গুমর ছিল তাহা চটকি যাইবে, আমরা আহাম্মক সাজিব। কাজেই ছেলেদের কান আর আহাম্মকদে কথা শুনিতে চায় না, মান্যও করিতে চায় না। অন্য অজ্ঞ ছেলেরা বাপ মাকে বোঝে বুঝুক, তোমরা মুরব্বিদের উপর মুরব্বি সাজিও না। ইহা নিশ্চয়ই জানি কোন কোন বিষয় তোমাদের চাইতে তোমাদের গুরুজনেরা অধিক পরিমা পরিজ্ঞাত। আমি আগামী কল্যই পদমদী যাইব, নাজির সাহেবের বাসাতে লোকজন বিস্তর আছে, সেখানে তোমার নিজের লোকের দরকারই হইবে না নাজির সাহেবের সহিত ভালরূপ জানাশুনা হইলে জিজ্ঞাসা করিও নড়াইলের বা হরনাথ রায় জমিদারের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় আছে কি না? শুনিয়া কলিকাতার নিকটেই কাশীপুর, সেই কাশীপুরেই নড়াইলের বাবুদিগের এক বা গঙ্গার ধারে আছে। আমার বিশেষ দরকার, সে দরকারের কথা এখন বলি না। শেষে জানিতে পারিবে।

বিষয়াদির কথা তোমার নিকট আজ এই প্রথম বলিলাম। সকল ক বলিলে তোমরা সে কথার মধ্যে প্রবেশই করিতে পারিবে না। এই খবরটা জান তোমার প্রথম কার্য। হরনাথ রায়—রতনবাবুর মধ্যম ভ্রাতা, এখন তিনি সকলের বড়—তাঁহার হাতেই জমিদারি। যে সন্ধান করিতে বলিলাম, সাবধা যেন ভুল না হয়।

পিতৃদেব পরদিনই পদমদী চলিয়া গেলেন। আমি লাহিনী পাড়াতেই রহিলাম লাহিনী পাড়ার বাড়ীর আর পূর্ব ভাব নাই, বাড়ীতে আমার মাতামহী ভি পরিবার পরিজন মধ্যে আর কেহ নাই। পুরুষ আত্মীয় মধ্যে এক আমিনদ্দীন জননীর মৃত্যুর সহিত যেন বাড়ীর শ্রী, বাড়ীঘরের পূর্ব ভাব, লক্ষ্মীশ্রী সমুদায় যে

চলিয়া গিয়াছে। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতাম, আমিও কলিকাতায় চলিলাম। দিন নির্ধারিত হইল। মাতামহীর পদধুলি মস্তকে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম। কলিকাতায় যাইয়া স্টেশন হইতে ধর্মতলা পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া শেয়ারের গাড়ীতে কালীঘাট পর্যন্ত আসিয়া তথা হইতে পদব্রজে চেতলায় আসিলাম। বাসার সকলে আমায় দেখিয়া মহা খুশি। তখনি নাজির সাহেবের নিকট সংবাদ গেল। তিনি আসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আমার বসা ওঠা শয়ন ইত্যাদির স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে সকলের সহিতই দেখা হইল, কয়েক দিন আর আমাদের লিখাপড়ার কথা কাহারও মুখে শুনি না। খোদ কর্তাটির মুখেও শুনি না। চাঁদ মিঁয়ার মুখেও নহে। নাজির সাহেব প্রায় ২৪ ঘণ্টা অন্দরমহলেই থাকেন, সিভিল কোর্ট আমিনী কার্য, আমাদের দেশে মহাজনী বড় বড় জং-নৌকা মাল-বোঝাই হইয়া গম্যস্থানে যে ভাবে যে প্রকারে যায়, সিভিল কোর্ট আমিনী কার্যও প্রায় তদ্রূপ। ব্যস্ততা নাই—তাড়াতাড়ি নাই। ধীরে সুস্থে গদীয়ানি চালে কার্য হইতেছে। প্রজার দাখিলা দেখিয়া ওয়াশিল নির্ণয়—অর্থাৎ দায়ী পক্ষ প্রজার নিকট হইতে যত টাকা খাজনা বাবদ আদায় করিয়া লইয়াছেন, সেই টাকাটা দাখিলা দেখিয়া নির্ণয় করিতেছেন। খুব সহজ কাজ, হিসাব রাখার জন্য দুইটি মুহুরীর, প্রজা ডাকা-হাঁকার জন্য দুইজন প্যাদা চাপরাসী, কোন কোন স্থানে জমির মাপ আবশ্যক হইলে চেন কম্পাস জমি মাপের সমুদায় সাজ সরঞ্জাম যন্ত্র ইত্যাদি, একপ্রস্থ সকলই আছে। আবশ্যক মত তদন্ত জন্য গ্রামে যাওয়া-আসার হেতু দুইটি ভাল ঘোড়া রহিয়াছে। নাজির সাহেবের বড় পুত্রকে পাবনা হইতে আনা হইয়াছে। কারণ এই আমিনী কার্য তাঁহাকে দিয়া, নাজির সাহেব আলীপুর জজ আদালতের স্থায়ী নাজির হইবেন। যে নাজির আছে তাহাকে জজসাহেব ১৫ দফা কার্যের ত্রুটি দেখাইয়া সাস্‌পেণ্ড করিয়াছেন। বিচারে শীঘ্রই একেবারে বরতরফ হইবে। কর্তার ইচ্ছা কার্য, যাহা করেন তাহাই হয়। এসব উলট-পালট শেষ হইল। চাঁদ মিয়াঁর সঙ্গে একত্রে স্কুলে ভর্তি হইব। চাঁদ মিঁয়াও সে নাম করেন না। দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আর বারুণী ঠাকুরাণীর সহিত অতি নির্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রলাপ করেন।—আমার সহিত ঠাকুরাণীর এত দিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে। লম্বোদরী ক্ষীণ-গ্রীবা—ঠাকুরাণীর বহু প্রলোভন মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বৎসর কাটাইয়াছি। গায়ের রঙ, দেহের আঘ্রাণ, মনমজান প্রাণমাতান ভাব দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে, আত্মমন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হইত কারণ বড় বড় মহানুভব ঋষিতুল্য জ্ঞানী, পূজ্যপাদ

পূজনীয় গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ, হরিহরাত্মা। আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গী, খেলার দোসরগণের সরল ব্যবহারে এক একবার প্রাণ ঢলিয়া পড়িত, আবার যেন কানে কানে কে যেন কি কহিয়া ছুটিয়া পালাইত—মাথা ফিরাইয়া আর তাহার দেখা পাইতাম না। ধরি ধরি করিয়া ধরিতেও পারিতাম না। সেই কান-কথা যেন হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিত—সাবধান! মহাপাপ! তুমি পরাধীন, তোমার জন্মদাতা পিতা বর্তমান। পিতা বর্তমানে স্বাধীনতার পুষ্পমাল্য গলায় পরিধান করিতে নাই। স্বেচ্ছাচার চন্দন-তিলক লেপন করিতে নাই। তাহার পর তুমি অকৃতদার কুমার। যৌবনসুখের সুখভোগ-গণ্ডীর অন্তর্গত হইলেও তুমি পঞ্চ-মকারের কোন ম-কার সিদ্ধি লালসায় হস্ত প্রসারণ করিতে পার না। তোমার পক্ষে এইক্ষণ সংযম-ব্রত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম ব্রতাশ্রয়ে ঈশ্বরের নিকট রিপুদমন প্রার্থনা করিয়া পবিত্র ভাবে থাকিতে হইবে। তবে সিদ্ধমনোরথ হইতে পার। তখন শুনিতাম—এখন চাঁদের ষোলকলায় পড়িয়া, এক একবার সাধনব্রত বাঁধন ছিঁড়িয়া অবোধ মত্ত মন রস-সরোবরে সুনির্মল মৃণাল হস্ত হইতে পাত্র লইতে ইচ্ছা করে। ষোলকলা এড়ান শক্ত কথা, বিবেক কষাঘাতও কম নয়। সর্বোপরি, কথা গোপন থাকিবে না। "যাদু" যে কান-কথা কানে তুলিয়া দিয়াছে, সে কথায় তো বিষম ব্যাঘাত—অমনি পিট্টান্।

আমার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া বহুক্ষণ যাদু আমার পিছনে লাগিয়াই আছে। যাদু গ্রাম্য লোক, নিরক্ষর—নাজির সাহেবের খানসামা। বিদ্যা নাই, বুদ্ধি কিছু কিছু আছে। সে এক টানা। কোটনামুর অংশই বেশী। কুটনীপনাও জানে। আমি শুইয়া আছি, আমার পা দাবিতেছে, আমি ডাকি নাই। পা-দাবান, হাত-টেপান, গা-পিটান আমার অভ্যাস নাই। যাদুর মনে আছে, আমাকে বশকরা বশীভূত করা। তার মুখফোটা মিলনমন্ত্রে আমাকে উত্তেজিত করা। এ চাল যাদু নিজ বুদ্ধিতে চালিতেছে না। আড়ালে পাকা খেলওয়াড় আছে। যাদু বলিতেছে, "আপনার চাকুরী ধরা, আপনি মুখে বলিলেই হইল। প্রথম আপনাকে ডিপুটী করিয়া দিলে অনেক কথা উঠিবে; জজসাহেব বলিয়াছেন, প্রথমে কোন বড় জমিদার স্টেটে—যে জমিদারি সরকার বাহাদুরের হাতে আছে, সেই সকল জমিদারি মধ্যে যে জায়গায়, আবহাওয়া ভাল, সেইখানেই ম্যানেজার করিয়া পাঠাইবেন। মাসিক মাহিয়ানা প্রথম দেড়শত, দুই বছর কাজ করিলেই দুই শত। আর এখন দেড়শত টাকা মাহিয়ানা ছাড়া মাস মাস বার বরদারী খরচ ২৫ টাকা —এটা ধরা আছে, সাহেব হুকুম দিয়াছেন। নোটিশ দেও, আরও লোকে জানুক,

আরও দরখাস্ত পড়ুক, শেষে অন্য বিবেচনা। একমাস মুলতবী থাকিবে। সাহেব বলিয়াছেন যে, "তোমার (নাদের হোসেন) বড় ছেলেকে লাভের আমিনী কাজ দেওয়াইলাম, তুমিও শীঘ্রই নাজিরি পদে পাকা হইবে (•এখন একটিং)। তোমার কনিষ্ঠ পুত্র এক সপ্তাহ মধ্যে কলিকাতা পুলিশের ইনস্পেক্টার হইবে। একশ টাকা মাহিয়ানা। আর তোমার মেয়ের যার সঙ্গে বিবাহ দিতে স্থির করিয়াছ সে যাতে একটা খাসমহলের ম্যানেজারী পায় তাহার চেষ্টা করিব। তাহার হাতের ইংরেজী লিখাটা কেমন তাহাই লইয়া আইস আমি দেখিব"। দেখিবেন, কাল আমাদের হুজুর আপনাকে ইংরেজী একখানা দরখাস্ত নকল করিতে দিবেন। ভাল চাকরী যদি হইল মাস মাস মোটা মাহিয়ানা পাওয়া গেল—মেহনতের প্রয়োজন? দিব্বি আপন পরিবার নিয়ে চাকরি-স্থানে সুখে থাকিতে পারিবেন। আপনার চাকুরীর জন্য আমাদের হুজুর সদরআলাকে বলিয়াছেন, তিনিও আলীপুরের মুন্সেফের সেরেস্তাদার করিতে চাহেন। দেখুন! কেউ একটা চাকুরী পায়না। আপনার সাধা চাকুরী দুইটা দুই দিকে। আর একটি কথা, আপনার একটি পয়সাও খরচ নাই। সমুদায় খরচ হুজুরের। আমাদের হুজুরের মতলব এই যে, আপনি একটি পয়সাও দিবেন না। বিবাহের আগে কাহাকেও একথা বলিবেন না। এই বাড়ীর মধ্যে আমি জানি, চাঁদ মিঁয়া জানেন আর হুজুর জানেন চাঁদ মিঁয়ার মাতাও জানেন—কিন্তু হুজুরের মুখে শুনেন নাই। (হুজুর অর্থ নাদের হোসেন) বিবাহ হইয়া গেলে হুজুর সকলকেই জানাইবেন। নিমন্ত্রণ করিয়া মজলিশ করিবেন। এই কলিকাতাতেই খুব ধুমধামে মজলিশ করিবেন! এইক্ষণে চুপচাপ কাহাকেও বলিবেন না। সেই জন্য এত চুপচাপ। মেয়েকে মক্তারপুর বাড়ীর এক অংশ দিবেন। বাগানের ভাগও দিবেন, দেখিবেন কতবড় বাগান! পা-দাবা ছাড়িয়া হাত টিপতে আরম্ভ করিয়া বলিল, ঘুমাইবেন না, এখনকার কথাগুলি খুব খেয়াল করে শুনিবেন, আমার কথা যদি মিছে হয়—শেষে আমাকে একশত পয়জার আপন হাতে এক দুই করিয়া গনিয়া মারিবেন। আর যদি সত্য হয় তবে বক্‌সিস্—শুনুন। আমি ঘরের লোক, ছোটবেলা হতে এক সঙ্গে ধুলখেলা পুতুলখেলা করেছি। ছোট বিবির বয়স এইবারে তিন বছর। তার সম্বন্ধে কোন কথা নাই। বড় বিবি যেমন খাপসুরত তেমনি দেখিতে। আপনার সঙ্গে এমনই মানাইবে যে খোদাতালা যেমন দু'জনকে জোড়া মিল করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। নাজির সাহেবের তিন মেয়ে। বড় মেয়ের নাম লতিফন, আর মেজটির নাম আজীজান। দুইটির বিবাহই হইবে। লতিফন বিবি ভারি খাপসুরত,—বগা সুন্দর নয়। মেজটা বগা ধবধবে

সুন্দর। লতিফন অর্থাৎ, বড় বিবি যাঁর সঙ্গে আপনার বিবাহ পছন্দ করে ঠিক হয়েছে তিনি যেমন দেখতে ভাল, লিখাপড়াতেও তেমনি ভাল। হেরাসতুল্লা মামুজী বড়বিবিকে লিখাপড়া শিখিয়েছেন। মেজটাও পড়তো, কিন্তু সে এক বছরে ক, খ, গ, ঘ পড়তে পাল্লে না। হরফ কয়েকটা চিন্তে পাল্লে না। ক, খ দুই অক্ষর চিন্তে পারে—লিখতে পারে—কেবল "ক"। লতিফন বিবি অনেক পড়েছে। যে কেতাবের মধ্যে বনমানুষ আছে, হাতীর দাঁতের মত দাঁত বের করা সিন্ধুঘোটক আছে—তারই কাছে মানে শুনেছি, সমুদ্রের ঘোড়া—পানীর মধ্যে থাকে। হাতের অক্ষর দেখে, সকলেই খুশী হয়, বাড়ীর সকলকে কেতাব পড়ে শুনান। তিনি রাতদিন লিখাপড়া নিয়েই আছেন। গায়ের রঙ দুধে-আলতা মিশান। চক্ষুদুটি মোটা কিন্তু লম্বাছন্দ। ভ্রূ-দুটি ভারি খাপসুরত। হায় রে চুল! যেমনই চুলের গোছা, তেমনি লম্বা—পিঠ ছেয়ে মাজা পাছা ঢেঁকে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। শরীরের আঙ্গেট্‌ কাকে দেখাই, আপনাকে বোঝাই কাকে দেখিয়ে। মানানসই লম্বা—বেঁটে নহে। এমন কোন পুতন্তের পুত নাই কি কোন মেয়েমানুষ নাই যে, লতিফন বিবির চোখ মুখ নাক হাত পায়ে একটা খুঁত বাহির করিতে পারে! এর পর সেলাইয়ের কাজ, উলের কাজ, খুব ভাল জানে, ঘরকন্নার কাজ সেই করে। সেই বাড়ীর গিন্নি, নরম মেজাজ, কথা খাঁটী। যা মুখে বলবে—বাবা! তার একচুল পরিমাণ নড়চড় হবে না। সমুদায় প্রস্তুত, আপনি রাজী হলেই, হুজুর আপনাকে সঙ্গে করে বাটীতে নিয়ে যান। দশ দিনের মধ্যে কার্য শেষ, তাহার পরেই চাকুরী। চাকুরীস্থানে গমন। আহা!

আমি কোন কথা কহিলাম না। মনের মধ্যে তোলপাড় আরম্ভ করিল। যাদুর কথায় মনের মধ্যে নানা কথার ঢেউ তুলিয়া দিল। যাদু কিছুতেই ছাড়ে না,—তার কথাই তখন—এই আপনার মনের কথা বলুন। নিতান্ত জেদ করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, যাও তুমি এখন যাও। আমি বুঝে দেখি, এমন একটা শক্ত কথার জবাব আমি হঠাৎ দিতে পারিব না। কাল রাত্রে আহারের পর এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে উত্তর দিব। যাদু চলিয়া গেল। আমার চক্ষে ঘুম হইল না। কত কথাই মনে উঠিতেছে। তখনই কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। নিদ্রিত নয়, জাগ্রতও নয়, স্বপ্নও নয়, যেমন প্রত্যক্ষ প্রদর্শন। হৃদয়ের অন্তঃস্থানে অনুরাগ-রাগে রঞ্জিত একটি চিত্র—কিসের চিত্র? মানস চক্ষেই যেন দেখিতেছি। যাদুর বর্ণনা হইতেই যেন ক্রমে চক্ষু নাসিকা বদন বক্ষ হস্তপদ সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন কি সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশকলাপ ক্রমে হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিতে

উঠিতে যুগল আঁখির কৃষ্ণরেখা সংযুক্ত নীলাভ তারা দুটি যেন ফুটিয়া আমার হৃদয়াকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। মধুমাখা ওষ্ঠ দুখানিতে যেন সুমিষ্ট মধুর হাসির আভা যেন স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল, এরূপ ত কোথাও দেখি নাই। জাগ্রত অবস্থায় কোনস্থানে দেখি নাই—স্বপ্নে কত রাজ্যের নব নব ভাব, নূতন রাজ্যের কত পাহাড়, কত নদী, কত লোক-সমাগম, তীর্থস্থান দেখা যায় আমিও কত দেখিয়াছি। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, সে সুদৃশ্য নব দৃশ্যও অদৃশ্য হইয়াছে। কৈ সে-সকল স্থানে কোনদিন, কি রাত্রি কোন অবস্থাতেও এরূপ রূপ দেখি নাই, কখনও চক্ষে পড়ে নাই। সত্যই কি এরূপ রূপমাধুরী সুশ্রী নারীমূর্তি, বঙ্গরাজ্যে আছে? অন্য চক্ষে সুশ্রী নাও দেখাইতে পারে। অনেকের চক্ষে আমার চক্ষের অনুরূপ নাও দেখাইতে পারে। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমার চক্ষে যেন অন্যরূপ রূপ দেখিতেছি। এ নূতন রূপ কোথা হইতে কোন পথে আসিয়া আমার হৃদয় মন্দিরে হাসিমুখে প্রকাশ পাইল! যাদুর রূপবর্ণনার অনুরূপই কি এইরূপ? যাদু বলিয়াছে—চক্ষু এমন, হস্ত এমন, দেহখানি এমন, বর্ণ এইরূপ। এই তো মোটামুটি বর্ণনায় আমার অজ্ঞাতে কল্পনাদেবী মূল বর্ণনা ঠিক রাখিয়া দেহগঠন, হস্তপদ-সঞ্চালন, চক্ষু-উন্মীলন ভাব দেখাইতেছেন, এখন কি করি? কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? তন্দ্রা ছুটিল, চিন্তা—আরও চিন্তা।

ইঁহারা এই ঘটনা সম্বন্ধে এইক্ষণে কাহাকেও বলিবেন না। কার্য শেষ হইলে প্রকাশ করিবেন। ইঙ্গিতে আমাকেও নিষেধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের ইচ্ছা আমি এইক্ষণ কাহাকেও এ কথা না বলি। আশা দিয়াছেন অনেক। প্রথমে চাকুরী। যেরূপ ভাব দেখিতেছি, ফজলে হক মিঞা সিভিল কোর্টের আমিন হইয়াছেন। চাঁদ মিঁয়াও পুলিশ ইনস্‌পেক্টার শীঘ্র হইবেন, হওয়াও সম্ভব। মুরব্বীর জোর আছে, নিশ্চয়ই হইবে। আমার মত গণ্ডমূর্খকে যে ম্যানেজারী দিতে পারেন না তাহাও মনে করি না। লিখাপড়া যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে তাহা যে থাকিবে তাহার আশা নাই। পূজনীয় পিতা ঋণগ্রস্ত, লাহিনী পাড়ার খাজনা বাকি পড়িয়াছে। নড়াইলের জমিদার খাজনার দাবিতে নালিশ করিয়া ডিক্রি করিয়াছেন। বাকি-পড়া মহল ক্রোক দিয়াছে, সেই জন্য হরনাথ রায়ের সঙ্গে নাজির সাহেবের আলাপ আছে কি না? বিশেষ আলাপ আছে। তাহার পর নাজির সাহেব ২৪ পঃ জজ আদালতের বড় নাজির। সেই ২৪ পঃ অন্তর্গত কাশীপুর। এ অবস্থায় নাজির সাহেবের অনুরোধ রক্ষা হইতে পারে। পিতার নিকট সে সংবাদ সময় মতই দিয়াছি। কি করিতে হইবে সে

কথাও শীঘ্রই পত্রে পাইব। পিতা বার বার বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার তিনটি কথাতেই এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, নাজির সাহেবের বাসায় থাকিলে নূতন একটি কার্য হওয়া নিতান্তই সম্ভব মনে করিয়াই বলিয়াছেন, পিতা মাতার অমতে কোন কার্য করিলে সে কার্যের শেষ ফল ভাল হয় না। অভিমত না লইয়া কোন নূতন কার্য করিও না। না জানাইয়া কোনরূপ নূতন কার্যে প্রবৃত্ত হইও না। তাহার পর আরও কথা—নাজির সাহেবের পুত্র এই ফজলে হক মিঁয়ার সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। পাঁচশত টাকাও লইয়াছিলেন সে টাকা দেওয়া হয় নাই। ঐ সম্বন্ধে স্বর্গীয়া জননী যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে আছে। নিতান্ত দুঃখের সহিত বিশেষ বাধা জন্মাইয়াছিলেন। শেষে পিতার মনের ভাব জানিয়া পাঁচশত টাকা লওয়ার কথা শুনিয়া ঈশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই যেন ঈশ্বর মঞ্জুর করিয়া সামসন্নেসাকে জগৎ হইতে উঠাইয়া লইলেন। মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এখন যে কি বিপদে পড়িতাম তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। মাতামহী বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাঁ-ও করিবেন না, না-ও করিবেন না। বাধাও দিবেন না—পোষকতাও করিবেন না। কিন্তু মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইবেন। পিতা ত কিছুতেই সম্মত হইবেন না। তবে তিনি বেশী পরিমাণ কিছু টাকা পাইলে সম্মত হইতে পারেন। আমার বিবাহ দিয়া কিছু টাকা হস্তগত করিবেন, তাঁহার কথার ভাবে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবেন ইহাই তাহার মনের বাসনা। নাজির সাহেব টাকা দিবেন না। আমাকে যদি হাত করিতে পারেন তবে আর টাকা দিবেন কেন? আমার দশা যে কি হইবে সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। আজীবন যাহার সঙ্গে একত্র বাস, একত্র একসঙ্গে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া আমার অভিমত কিনা? আমি তাহাতে অনুরক্ত হইব কি না? আমি সুখী হইব কিনা—সে বিষয় কোন পক্ষই দেখিতেছেন না। নাজির সাহেব টাকাকড়ি কিছু না দিয়া তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ ঘরের একটি ছেলেকে ফাঁদে আটকাইতে পারিলেই তাঁহার আশা পূর্ণ। পিতার ইচ্ছা—পুত্রের বিবাহ যে ঘরেই দিই না কেন, কিছু বেশী পরিমাণ লাভ করিতে পারিলেই নড়াইলের দেনা, অন্য অন্য দেনা অতি সহজেই পরিশোধ করিতে পারিব। তাই বলিতেছি, আমি কি করি, আমি এখন বিবাহ না করিয়াই বা কি করি? লিখাপড়া যা হইবার হইয়াছে, মনও সন্তুষ্ট থাকে, অথচ একশত টাকা মাহিনার একটি চাকুরী পাই তাহা হইলেই বা কি করি? আরও বিবাহ আছে, চেষ্টা করিলে

হইতে পারে। পূজনীয় পিতাঠাকুর তাঁহার মনমত, টাকাওয়ালা মহাজন, গরুর দালাল, কি কোন গাঁজার বেপারী, কি আফিং-এর কারবারী লোকের ঘরে বিবাহ বন্দোবস্ত করিয়া আদেশ করিতে পারেন। হল বেপারী, হল কারবারী, আমি কোন ভয় করি না। ভয় করি কেবল তাহার সহিত যদি আমার মনের মিল না হয়, যদি তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা না করে, যদি সে পাত্রী আমার চক্ষে বিসদৃশ হয়, আমার চক্ষু যদি তাহাকে দেখিতে না চায়, যদি তাহার গায়ের গন্ধ আমার সহ্য না হয়—তখন আমি কি করিব? আমি যেমন চাই, আমার মন যেরূপ চায়, সেরূপ যদি না হয় তখন আমার উপায় কি? হউক হাজার সুশ্রী, হউক লক্ষপতির কন্যা, হউক সে জাত্যংশে মহাঋষির বংশ; হউক সে মহামানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চবংশ! আমার চক্ষে যদি সুশ্রী বোধ না হয়, চক্ষের আবর্জনা হৃদয়ের মহাকণ্টক, অতি নীচ, অতি ক্ষুদ্রমনা বলিয়া বোধ হয় তখন আমি কি করিব?

নাজির সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিফন্‌নেসার কথা যেরূপ শুনিতেছি, আমার মন, আমার হৃদয়, আমার চক্ষু যেরূপ প্রমাণ করিয়া দিতেছে, কল্পনা-আঁখিতে যেরূপ দেখিতেছি—আমার অন্তরে যেরূপ ছায়ার অবির্ভাব হইয়াছে, হৃদয়দর্পণে যেরূপ ছায়া বসিয়া গিয়াছে, চক্ষের তারায় যে আকৃতি স্বভাবত ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমি লতিফনকে বিবাহ করিলে সুখী হইব।

যদি সে আমার মনমত না হইবে তবে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে কেন? হয়ত অনেকে হাসিবেন। দেখা নাই, চেনা নাই,—ভালবাসা জন্মিল, হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল! কথা যথার্থ, কিন্তু মানুষের নাম শুনিয়া কি রূপের একটা ধারণা হৃদয়পটে অঙ্কিত হয় না? দশটা গরমিল হইলে একজন অবশ্যই কল্পনার অনুরূপ মিলিয়া যায়। শত শত প্রমাণ রহিয়াছে। পাঠকগণ মধ্যে যে, কেহ ইহার প্রমাণ প্রয়োগ না করিতে পারেন তাহা নহে। তাহাও যদি না হয়, আমার হইল। করি কি? যাদুর ঐরূপ সাধারণ বর্ণনাতেই লতিফনের রূপরাশি আমার চিত্তপটে স্বভাবত ফুটিয়া অঙ্কিত হইল। এখন কি করি? সে রাত্রে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ভালমন্দ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলাম না। মন একবার এদিকে, আবার অন্য দিক ঢুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিতা বলিয়াছেন, পিতামাতার অবাধ্য হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের নিবারণসত্বে কোন কার্য করিতে অগ্রসর হইলে তাহাতে সফলকাম হওয়া যায় না। পিতা মাতার অভিপ্রায় না জানিয়া কোন নূতন কার্যে অগ্রসর হইও না। তাঁহাদিগকে

গোপন করিয়া যে কার্য করিবে সে কার্যে কখনই সুফল ফলিবে না। বরং তাহার পরিণাম ফল ভয়ানক হইতে পারে। মনের মধ্যে যেন স্বভাবত বলিয়া উঠিল এরূপ পাইবে না। বিনা মেহনতে বিনা চেষ্টায় বিনা অর্থব্যয়ে এমন মনমত ধন আর পাইবে না, ফলাফল কপালের কথা। কে বলিতে পারে ভবিষ্যতে কি হইবে কার্যফলের সুনিয়মী করিয়া কার্য করিতে সাধ্য কার? ভাবী জ্ঞান এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহার নাই। প্রবাদ দৃষ্টান্তের কথা বিস্তর রহিয়াছে। রাত্র প্রভাত হইল পাখীরা বিশ্বপতির বিশ্বমোহন করুণার গুণকীর্তন করিয়া জগৎকর্ণে সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। নাজির সাহেবের বাহিরবাটীর আঙ্গিনার সংলগ্ন রাজা নামে এক বৈষ্ণবীর বাড়ী ছিল। বৈষ্ণবী এখন আধ-বয়সী। নাজির সাহেব বৈষ্ণবীর সহিত হাসি তামাসা করিতেন, আমরা তাহাকে মান্য করিতাম। তাহার একটি পোষা কোকিল ছিল। ঐ সময়ে সেও কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল আমার চক্ষে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। উহার মধ্যে স্বপ্ন—কোথায় যেন গিয়াছি কোন নগর সহর নহে। সামান্য এক পল্লীগ্রাম। ঝোড় জঙ্গল কিছু নাই কেবলই ধানক্ষেত, আর স্থানে স্থানে খেজুরের গাছসকল দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যেও ধানের আবাদ। ধান ক্ষেতের মধ্যে যেন একটা একতলা দালান। সেই দালানের ছাদের উপর উত্তর দিকে ১৬।১৭ বৎসর বয়সের একটি স্ত্রীলোক এক ধ্যানে এক মনে বসিয়া কি যেন দেখিতেছে। রাজা বৈষ্ণবীর কোকিলের রব আমি শুনিতেছি। ঐ দালানের পূর্বদিকে নব মুকুলিত একটি আমগাছে পিকবর ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইতেছে। স্ত্রীলোকটি এক ধ্যানে বসিয়া ভাবিতেছে শেষে দেখি যে, সে আমাকেই এক ধ্যানে দেখিতেছে। আমি যেন দালানের নিকট যাইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, চিনিতে পারিলাম না। তাহার চক্ষের দিকে যেই নজর পড়িয়াছে—দেখি, সেই স্ত্রীলোকটির চক্ষে জল, যেন লজ্জা পাইল, লজ্জিত হইয়া ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বপ্নযোগেই যেন বোধ করিতেছি, প্রাণের মধ্যে সেই একপ্রকার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কোথায় যেন দেখিয়াছি—কোথায় দেখিয়াছি? চেনা চেনা করি, চিনিতে পারিলাম না স্ত্রীলোকটি আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা কপালে আঘাত করিয়া চলিয়া যাইতেই মনে হইল, একি? সেই রূপ, আমার হৃদয়াঙ্কিত সেই রূপ !!

নাজির সাহেবের প্রাভাতিক কোরাণপাঠ কানে প্রবেশ করিতেই তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। কোকিলের ডাক বন্ধ হয় নাই। সে তাহার খাঁচায় বসিয়া যথাস্থানে ডাকিতেছে, আমার হৃদয়পিঞ্জরের ভালবাসা-পাখীটি সজলনয়না শিরে করাঘাত

করিয়া চলিয়া গেল। যে আগুন জ্বালাইয়া গেল তাহা আর নির্বাণ হইল না, প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে যাদুবাবু আমার গা হাত পা টিপিতে আসিত, অদ্যও নিয়মিত সময়ে আসিয়াই তাহার কার্য সে করিতে আরম্ভ করিল। আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া আছি। দুশ্চিন্তায় শরীর যেন বলহীন হইয়া অলসভাবে পড়িয়া আছি। স্বপ্নে কি দেখিলাম! মনের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল—শেষে কি আমার কান্নাই সার হইবে? যাদু বলিতেছে—উঠুন। রাত্র প্রভাত হইয়াছে। আমি ঈশ্বরের নাম করিয়া উঠিতেই যাদু বলিল, আপনার মুখ চোখ অত ভারি ভারি বোধ হইতেছে কেন? রাত্রে বুঝি ঘুম হয় নাই? কান্দো-কান্দো ভাবও যেন দেখায়!

আমি বলিলাম—স্বপ্নে কান্দিয়াছি। কেন কান্দিলাম, বলিতে পারি না।

"কান্দার কথা আমি শুনিতে চাহি না। হাসি-খুশী আমোদের কথা, শুভ কথা, ভাল কথা—দুই কুল এক হওয়ার কথা, দুই মন এক সূতায় বাঁধিবার কথা। হুজুর কাল রাত্রে আমাদের সকল চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা মীর সাহেবকে কেহই মীর সাহেব বলিয়া ডাকিতে পারিবে না। বড় দুলা মিয়াঁ বলিয়া ডাকিও। আজ হইতে আপনি আমাদের বড় দুলা মিয়াঁ। আমরা তো সমুদায় ঠিক করিয়াছি। ডাক পর্যন্ত বদলাইয়া গেল। আর কিছুই বাকি নাই। আপনার মুখের কথা একটি কথা"—

আর কথা কি? যে বাঁধনে বাঁন্ধিয়া ফেলিয়াছ আর আমার নড়াচড়া করার শক্তি নাই। এ ফাঁদ এড়াইবার শক্তি নাই। হাত-পা বাঁধার সঙ্গে মনও বাঁধা পড়িয়াছে, আর কথা কি? যাদু ভারি দুষ্ট, রাজবাড়ীর কোটনা। কথায় বলে যে চালাকের বিচি পোড়াইয়া খাইয়াছে। আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বলুন—আমাদের বড় বিবি লতিফন বিবিকে বিবাহ করিবেন কি না? আমি একটু মুচকি হাসি হাসিয়া উত্তর করিলাম, হাঁ। লতিফন বিবিকে খোদার মরজি হইলে বিবাহ করিব। আমি তাহার হুকুমবরদার তাঁবেদার হইব। যাদু খুশীতে ভরিয়া এক দৌড়ে নাজির সাহেবের নিকট যাইয়া সমুদায় কথা বলিল। আজ বাড়ীতে নূতন রকমের খুশী আরম্ভ হইল। বিবাহ করিব মনে মনে স্থির করিয়াই যাদুর নিকট মনের কথা প্রকাশ করিলাম।

ব্যবহার ও কার্যে বোধ হইল, নাজির সাহেব মনে মনে স্থির করিয়াছেন—যে, মীর সাহেবকে এখন আর কলিকাতা রাখা সঙ্গত নহে। কারণ অনেক লোক এমন আছে যে তারা এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। কি, তাঁহার দেশ হইতে

কোন লোক আসিয়া মন ভাঙ্গাইয়া দেশে লইয়া যাইতে পারে। যদিও বিবাহ হইতে এখনও তিন মাস বিলম্ব—জোগাড়, আয়োজন করিতে হইবে। আমাকেও সে সময় অন্তত ১০ দিনের জন্য বাটী যাইতে হইবে। সাহেবের নিকট বলিয়া ছুটি লইতে হইবে। এই সকল কার্য শেষ করিয়া সকলে একত্র মক্তারপুর যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। মীর সাহেব আর ফজলে হককে অগ্রে মক্তারপুর পাঠাইয়া দেওয়া হউক বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত বাটীতেই থাকুন; তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ কর্ম করিতে পারিব; এই কথাই বোধ হয় মনে মনে স্থির করিয়া নাজির সাহেব একদিন ফজলে হক মিয়া এবং আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন যে, আপনারা দুই ভাইয়ে আগামী কল্য প্রাতের ট্রেনে মক্তারপুর চলিয়া যান। সঙ্গে যাদু খানসামা যাইবে। বিবাহ যে কয়েকদিন না হয় সে কয়েকদিন মক্তারপুরে থাকাই ভাল বিবেচনা করি।

আমার আর আপত্তি কি? সে সময় আমি তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছি, যেখানে লইয়া যায় সেই ভাল। পিতাপুত্রে গোপনে আরও কথাবার্তা কি হইল তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা রাত্রি প্রভাত হইলে, ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া শিয়ালদহ স্টেশনে চলিলাম। পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, কৃষ্ণগঞ্জ স্টেশনে নামিতে হইবে। সেখান হইতে ১৪ ক্রোশ পথ ঘোড়ার গাড়ী, নয় গরুর গাড়ীতে যাইতে হইবে। নাজির সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত বাঁধা রাস্তা, পাকা সড়ক—ঘোড়ার গাড়ী সর্বদা যাওয়া, আসা করে। শিয়ালদহ যাইয়া ৭॥০ টার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বেলা ১১টার সময় কৃষ্ণগঞ্জ স্টেশনে নামিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কলিকাতায় স্থানে স্থানে যেরূপ গাড়ী ঘোড়া ভাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে এখানে বুঝি তাহাই। স্টেশনের বাহিরে পূর্বদিকের রাস্তার উপর দেখি, একখানি গাড়ীও নাই। যাদু বলিল, ঘোড়ার গাড়ী প্রত্যহ থাকে আজ নাই কেন? নাই পাওয়া যায় গরুর গাড়ী করিয়া যাইব। গরুর গাড়ীর নাম শুনিয়া তো আমি অবাক! শুধু অবাক? সন্দেহ ও ভয়। কখনও গরুর গাড়ীতে চড়ি নাই—চড়া অভ্যাস নাই, জীবনের প্রথম কৃষ্ণনগর হইতে আমরা কয়েক জনে গরুর গাড়ীতে করিয়া বগুলা পর্যন্ত আসিয়াছিলাম। আসিয়াছিলাম বটে, আমি গাড়ীতে চড়ি নাই, সারাটি পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিয়াছিলাম। এখন গরুর গাড়ী যদি ভাড়া করিয়া আনে তবেই তো আমি গিয়াছি। সঙ্গে মনের মত, খোলা প্রাণের বন্ধুলোক হইলে হাঁটিয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না। হাসি রহস্য গান, রঙ্গ তামাসা করিতে করিতে অনেক দূর যাওয়া যায়। এবারের সঙ্গী একজন মান্যমান লোক। কারণ ইনি নাজির

সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যে কন্যাদ্বয়ের বিবাহকথা—তাহারা দুই জনই ইহার কনিষ্ঠা ভগিনী, আমার সহিত এখন কোন সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ হইলেও আমাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে। আর একটি লোক "যাদু", নাজির সাহেবের খাস খানসামা। ইহারা কেহই আমার সমবয়সী নহে। বয়সে অনেক বড়। আর একটি চাকর সঙ্গে আছে বটে সে সামান্য মুটিয়া মজুরের ন্যায়। আমোদ আহ্লাদ হাসি তামাসা করিব কার সঙ্গে? কলিকাতা হইতে এ পর্যন্ত আসিয়াছি, নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা ভিন্ন একটিও বলি নাই। মন খুলিয়া হাস্য করা দূরে থাকুক, সম্মুখের দুটি দাঁতও কোন কথার প্রসঙ্গে বাহির হয় নাই। তাহার পর গান করিব? আশ্চর্য কথা! গান করা আমার অভ্যাস আছে। সর্বনাশ! যাদের বাড়ীতে বিবাহ করিব যার ভগ্নীপতি হইব তাহার সম্মুখে গান!! হয়ত সে বলিয়া উঠিবে—হাঁ, ছেলেটা কিন্তু বড় বেয়াদব। লজ্জাও বড় কম। গান—বিশুদ্ধ গান, সৎগান, ঈশ্বর উদ্দেশ্যে গান, জাতীয় গান, এ সকল গান সকলেই সকলের সম্মুখে গাহিতে পারে। আমার মতে আমি দোষ দিতে পারি না।

আমাদের সমাজে গানের নামেই চটা,—গানের নামেই ছি ছি!! শত শত ঘৃণা। উচ্চ দরের মুসলমান, শিক্ষিত মুসলমান-সমাজে সঙ্গীত ঘৃণার্হ, কাটমোল্লার দলেই বেশী নিন্দনীয়। এই স্থানে কয়েকটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ! মার্জনা করিবেন, এই গান আরব দেশে, মক্কা শরীফে হইতেছে, মদীনা শরীফে হইতেছে। তুরস্ক সুলতান, যিনি জগতের মুসলমানের ধর্মগুরু, তাঁহার রাজ্যেও গান বাজনার আদর আছে, এমন কি ভদ্রঘরের মেয়েরা গান এবং বীণা-বেহালা বাজাইতে না জানিলে মেয়েদের বিবাহ হওয়াই কঠিন। বোগদাদ, মেসের, পারস্য, তাহার পর বাড়ীর নিকটে আফগান রাজ্যে গানের চর্চা আছে। কাবুলীদিগের গান বাজনা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। স্বয়ং আমির বাহাদুর আমাদের মাননীয় বঙ্গাধিপ লাট ফ্রেজারের বাড়ীতে তাল-মান-লয় বাজনার সহিত গান গাহিয়াছিলেন। যত দোষ বঙ্গে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের কতকাংশে।

যাক ওকথা, এখন আসল কথা কি? যাই কিসে—ঘোড়ার গাড়ীর নাম এদেশেই নাই। যাদুর কথা মিথ্যা কথা, পূর্বে শুনিয়াছিলাম যশোহরের লোক ভারি চক্রি, আর ঘোর সংসারী; কাজ উদ্ধার করিতে সকল পথেই যাইতে পারে। সকল প্রকার কথাই বলিতে পারে। এই তো প্রথম নমুনা। যাহাদের বাটীতে যাইতেছি, তাঁহারাও ত এবিষয়ে কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই। বোধ হয় ইঁহারা গরুর গাড়ীতেই যাওয়া আসা করেন। হউক গরুর গাড়ী আমি যত দূর পারি

হাঁটিয়াই যাইব। ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহার কূলকিনারা না দেখিয়া আর ফিরিব না, মনের গতি ফিরাইব না।

ফজ্‌লে হক সাহেব বলিলেন, মীরসাহেব! গাড়ী ত দেখি না, কি করি, উপায় কি? ঐ "দৌলতগঞ্জ" গ্রামে বিস্তর গরুর গাড়ী আছে, একজনকে ঐ গ্রামে পাঠাইয়া গরুর গাড়ী আনাইয়া যাওয়াই ভাল, কি আমরাই হাঁটিতে হাঁটিতে ঐ গ্রামে যাইয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া চলিয়া যাই। মনে মনে ভাবিলাম, আমার পক্ষে দুইই সমান, গাড়ী পাইলেও যা, না পাইলেও তা? আমি বলিলাম—লোক পাঠাইবেন, গাড়ী আনাইবেন, যদি না পায়, পাইয়াও যদি ভাড়ায় বনতি না হয় ফিরিয়া আসিবে, চলুন, আমরাই যাই, নিজে দেখে শুনে ভাড়া করিবেন। চলিলাম —সকলেই হাঁটিয়া চলিলাম, দৌলতগঞ্জের কাঁসারীরা আমাদের দেশে কাঁসার বাসন বিক্রয় করিতে যায়, সেই দৌলতগঞ্জ ঈশ্বর আজ দেখাইলেন, সমুদায় দৌলতগঞ্জ তন্ন তন্ন করিলাম, গরুর গাড়ী পাওয়া গেল না। তখন কথা হইল পথে যাইতে যাইতে যেখানে গরুর গাড়ী পাইব সেখানেই ভাড়া করিব। চলিলাম। চলিলাম, কিন্তু বান্দা রাস্তা ছাড়িতে হইল। কাঁচা রাস্তা স্থানে স্থানে বান্দা রাস্তার চিহ্ন মাত্রও নাই, কিছুদূর যাইয়া কষ্টবোধ হইতে লাগিল, কি করি আপন ইচ্ছায় আসিয়াছি দোষ দিব কাহাকে? কলিকাতা হইতে মনে করিয়া খাদ্যসামগ্রী পাউরুটি ইত্যাদি কিছু সঙ্গে আনিলেই হইত, সে সকল বন্দোবস্তের ভার আমার ছিল না, অনুমানে বুঝিলাম ইঁহারা রাস্তাঘাটে চলিতে হইলে খাদ্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া যে, পথে চলা দরকার, তাহা তাঁহাদের মাথাতেই নাই, পথে যাহা পাওয়া যায় তাহাই ভাল, চিড়ে মুড়ি বাতাসা আর মহেশপুরের দধি দিনে আহার করিলাম, হালদা মহেশপুর খুব প্রবীণ প্রাচীন গ্রাম, ২২ জন চৌকিদার এক গ্রামে, গ্রামে একটি থানা আর একটি আউট পোষ্ট। গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে মুদী! দোকান হিন্দু-প্রধান স্থান, রাস্তার ধারের একটি বৃহৎ বৃক্ষমূলে বসিয়া কলাপাতে আহার করিলাম, আহারের সময় বড় তামাসা হইল, চিড়ে দই খেজুরের গুড় একত্র কলাপাতে গাছতলায় বসিয়া কখনও খাইয়াছিলাম না। এই প্রথম, কাজেই আমি ও বিষয়ে নিতান্তই আহাম্মক। চিড়ের উপরে যেই দই ঢালিয়া দিয়াছি, কি জানি কি পাপে জানি না—দধি স্রোত বহিয়া চিড়ে গুড় ঠেলিয়া কতকটা মাথায় করিয়া পাত ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সকলের হাস্য। পাতে যাহা থাকিল তাহাই অনেক বাঁচিয়া গেল, কোন প্রকারে ক্ষুধার শান্তি করিয়া, জলপান করার পাত্র সঙ্গে নাই, দোকানী একটা ঘটি দিয়াছিল, তাহার হুকুম যে ঘটিতে মুখ লাগাইয়া জল খাইও

া, কি করি একজন হাতের উপর জল ঢালিয়া দিল যাহা হাতের তালুতে ধরিল গাহাতেই দুই চার ঢোক জলপান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিলাম। এ-সুখের াহারে সঙ্গীদের পান না খাইলেই নহে। পান সুপারী চুন আনিয়া ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারে খাইয়া তাঁহারা সুখী হইলেন। পান তামাক খাওয়া আমার অভ্যাস নাই, আমি খাইলাম না। আহারান্তে আবার পূর্ববৎ পদব্রজে মন, প্রায় একক্রোশ পথ চলিয়া আসিলে একখানা গরুর গাড়ীর সহিত দেখা হইল। াল বোঝাই গাড়ী, তাহার ছাত ছাপর বিচালী চাটাই কিছুই নাই। সাধারণ ালবাহী গাড়ী যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই; অধিকন্তু জরাজীর্ণ পুরাতন। আর হ্য হয় না, পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, বেদনায় মাটিতে পা পাড়িয়া হাঁটা কঠিন ইয়াছে। গাড়োয়ানের সহিত কথাবার্তা হইতে লাগিল, সে আমাদের নির্দিষ্ট স্থান র্যন্ত যাইতে পারিবে না। চৌগাছা পর্যন্ত যাইতে পারিবে। চৌগাছা হইতে ক্তারপুর তিন ক্রোশ ব্যবধান, কি করা যায়, অগত্যা তাহাই স্বীকার হইয়া ।।৶০ আনা ভাড়া সাব্যস্তে গাড়ীতে উঠিলাম। কাঁচা রাস্তা কেবল লোক চলাচল করে লিয়াই রাস্তা বলিতেছি। স্থানে স্থানে উঁচু নিচু থাকায় আমরাও উঁচু নিচু ইয়া উঠা পড়া করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। যাই হউক, বসিয়া রহিয়াছি স্থিরভাবে না থাকিলেও বসিয়া আছি। পায়ে হাঁটিতে হইতেছে না। রাত্র দুই প্রহর সময় চৌগাছার বাজারের উপর গাড়ী পৌছিল। সম্মুখের তিন ক্রোশ পথ াই কি প্রকারে? ১১টা হইতে রাত্র ১২টা পর্যন্ত কতক গাড়ী কতক পায়ে হাঁটিয়া ১১ ক্রোশ পথ আসা হইয়াছে, বাকি তিন ক্রোশ। গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া ভাবিতেছি কি করা যায়, এই নিশীথ সময় পথে বাহির হই, কি এই বাজারে কোন দোকানীর চালায়, কি পীড়ের উপর দুই আনা পয়সা দিয়া শুইয়া থাকি। পথে কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের দেশের ন্যায় জঙ্গলা দেশ নহে। বাঘ শূকরের নামমাত্র নাই, জঙ্গলই নাই, থাকিবে কোথা, কেবল ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ঐ ধান ক্ষেত মধ্যে পাত্‌লা পাত্‌লা খেজুরের গাছ। অন্য জঙ্গলের নামমাত্র নাই। পায়ে বরদাস্ত হইবে কিনা, কয়েক ঘণ্টা বসিয়া থাকায় পায়ে রস ভর করিয়াছে। আমরা যে গাড়োয়ানের গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, দেখি যে, সেই লোকটা আর একটি লোক সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। আসিয়া বলিল আপনারা গাড়ী খুঁজিতেছেন, নিন, এই গাড়োয়ানের গাড়ী আছে, খুব ভাল গাড়ী দুই ছাপ্পরওয়ালা সওয়ারী গাড়ী। শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, ১৲ টাকা ভাড়া স্বীকারে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীর মধ্যে বিচেলী পাড়া, তাহার উপর একখানি

াতুর পাড়া আছে, আমি গাড়ীর মধ্যে যাইয়া, সঙ্গের একটা গাঁঠুরি মাথায় দিয় শুইয়া পড়িলাম। ফজলে হক মিঁয়া সাহেবের তামাক খাওয়া অভ্যাস। এমন অভ্যাস যে হুঁকার আগুন নেবে না। এক পুড়িতেছে, চাকরে আবার সাজিয়ে আনিতেছে, হুঁকা মুখে করিয়াই পথে হাঁটিতেছেন, সারাটি পথ এই হুঁকা টানিতে টানিতে আসিয়াছেন, এখন গাড়ীতে বসিয়া মনের সুখে, হুঁকার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, আমি হুঁকার সেই বেয়াড়া মহাবিরক্তিকর ডাকে বড়ই নারাজ ছোটবেলা হইতে আজ পর্যন্ত নারাজ, কানের কাছে ঐরূপ শব্দ হইতে আরম্ভ হইয় বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। কি করি কিছু বলিতেও পারি না, সহ্য হয় না। শেষে দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় কোন সময় ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না মক্তারপুর নাজির সাহেবের বাহিরবাটীর আঙ্গিনার উপর গাড়ী আসিলে ফজলে হক সাহেব আমাকে জাগাইতেছেন। জাগিয়াই দেখি যে, গাড়ী চলিতেছে না— অথচ গরু দুটিও গাড়ীতে জোতা নাই। উঠিয়া বসিতেই ফজলে হক বলিলেন নামুন এই ত আসিয়াছি। একেবারে বাহির আঙ্গিনায় গাড়ী, আমার শরীর বেদনায় জ্বর জ্বর হইয়াছে। আমি বলিলাম, আমাকে শুইবার জন্য একটু স্থানের অনুমতি করুন, শরীর-বেদনায় জ্বর জ্বর হইয়া পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, গাড়ী অনেকক্ষণ আসিয়াছে, আমি ঐ বৈঠকখানা আটচালা ঘরে আপনার শুইবার জন্য বিছানা বালিশ বাটীর মধ্য হইতে আনিয়া বিছানার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। ঐ বৈঠকখানা আটচালা ঘর। চলুন! আপনাকে শোয়াইয়া আসি। ঘরের বর্ণনা এখন ঘুমন্ত চক্ষে করিতে পারিব না। চক্ষের পাতা উঠিতেছে না। বসিতেও পারিতেছি না। মোটামুটিভাবে দেখিলাম বৃহৎ আটচালা। খুব উঁচু পোতা ইটের গাঁথনি, ইটের পাকা মেজে, চারিদিকে ইটের গাঁথুনি, দেয়ালের বেড়া পরিষ্কার চুনকাম করা, দালানই বোধ হয়, কেবল উপরে চাল দেওয়া খড়ের ছাউনি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা এবং একখানি টেবিলের উপরে সরপোষ দিয়া ঢাকা কোন না কোন খাদ্যসামগ্রী, তক্তাপোষের উপর ফরাশ বিছানা, বড় বড় গাও-তাকিয়া লাগান আছে। ঐ বিছানার উপরেই একটা উঁচু স্থানে পরিষ্কার চাদর পাড়া। সেরানায় অন্য বালিশ দেওয়া আমার শয়ন-শয্যা, মনে মনে অনুমান করিয়া শয্যার দিকে যাইতেই ফজলে হক মিঁয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, সারাটি দিন উপবাস গিয়াছে, কিছু খাইয়া শুইয়া থাকুন।

আমি বলিলাম, আমায় মাপ করিবেন, এখন আর কিছুই খাইব না। খাইতে পারিবও না। শরীরের বেদনায় বড়ই কাতর হইয়াছি, তাহার উপর ঘুম এতই

চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তাহার কথা না শুনিয়া আর উপায় নাই। তিনিও আর উপরোধ করিলেন না। একটি লোককে আমার হাত-পা দাবিয়া দিতে নিযুক্ত করিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। পরের বাড়ী, আমাকে বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিবে কেন ? আমি বাহিরে পড়িয়া রহিলাম, তিনি বাড়ীর মধ্যে শুইতে গেলেন।

বাড়ীর মধ্যে আমিও না যাইতে পারি তাহা নহে। আমি নিদ্রায় বড়ই কাতর। বিবাহ হইতে এখনও তিন মাস বিলম্ব। রাত্রি প্রভাত হইলেই এমনভাবে বাটীর মধ্যে যাইয়া সমুদায় দেখিয়া আসিব যে, কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না। যাহা প্রকাশের যোগ্য তাহা পাঠকগণকে শুনাইব। রাত্র আমাদের হিসাবে ৪ ঘণ্টা। মনের কথা মনেই আছে—বৈঠকখানায় অন্য কামরার মধ্যে হইতে টুন টুন শব্দে একটা ঘড়ি বাজিয়া আমার কথার প্রমাণ করিয়া দিল। আমি শুইলাম। চাদরখানা পরিষ্কার, ধুইয়া আইসার পর আর ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু বালিশটা খাঁটী নয়। বালিশের খোল পরিষ্কার ধবধবে। কিন্তু কাহার যেন মাথার নীচে ছিল। স্ত্রীলোকের মাথার সুঘ্রাণ তেলের অতি উত্তম ঘ্রাণ আমার নাকে আসিতে লাগিল। ভাবিলাম, এ কার বালিশ আমাকে মাথায় দিতে দিয়াছে ? কর্ত্রীর বালিশ ? তাহা দিবে না। তাঁর মাথায় চুলের গন্ধ এরূপ সুগন্ধিযুক্ত হইতে পারে না। ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রীর মাথার বালিশ ? তাও ত নহে, তিনি শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়াছেন, অমনি মাথার বালিশটা ছাড়িয়া দিয়াছেন—অসম্ভব। ফজলে হক মিয়াঁর মধ্যম ভগ্নী, সে ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগাইবে কেন ? তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিবে কেন ? বাড়ীর লোকেও জানে, পূর্ব হইতে চিঠিপত্র আসিয়াছে, খবরাখবর হইয়াছে সকলেই জানে—আসিতেছে। যার যেখানে ব্যথা, সেইখানেই তার হাত। বালিশ আর কাহার নহে।—(নিদ্রা) ঘুম ভাঙ্গিল, চতুর্দিকে চাহিয়া দেখি আমার শিয়রের দিকে সম্মুখে পার্শ্বে ১০।১২টি স্ত্রীলোক খাড়া হইয়া আমাকে দেখিতেছে। পুরুষও দুই তিন জন আছে। উঠিয়া দেখি অনেক বেলা হইয়াছে। প্রায় ৮টা। বিছানা হইতে উঠিয়া বসিতেই ফজলে হক সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর বলিলেন, আপনার শরীর অসুখ বলিয়া আমি জাগাই নাই। আসুন। বারান্দায় আসুন। স্ত্রীলোকগণ যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে বলিলেন—দেখলে ত, বর দেখিলে ? এখন বাড়ী যাও, আবার যখন ইচ্ছা হয় আসিয়া দেখিও। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, এই সকল মেয়েরা আমাদের বাড়ীর নিকটের। ঐ দেখুন ! ঐ সকল বাড়ী, এই বাড়ীর সীমা সংলগ্ন, কাহারও বাড়ী ঐ সীমা হইতে দশ হাত তফাত হইবে। এরা কেহই

মোসলমান নহে সকলেই হিন্দু। উহাদের সঙ্গে আমাদের বড়ই মিশামিশি ভাব। ওরা সকলেই বাড়ীর মধ্যে যাইতেছে, ভগ্নীদের নিকট যাইতেছে, কথা কহিতেছে। এরা আমাদের আপন লোক আমাদেরই প্রজা। প্রজা ত অনেকেই আছে, তবে এরা একেবারে বাড়ীর আঙ্গিনায় থাকায় এদের সঙ্গে নিতান্তই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কাল রাত্রেই ওরা খবর পেয়েছে যে আমরা এসেছি। দেখুন, ওদের মনের ভাব কি প্রকার। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এখনও পর্যন্ত কেহই দেখিতে আসে নাই, পাড়ার লোকেরা দেখিয়া গেল।

স্ত্রীলোকেরা বলিল, ভাই সাহেব! আমরা বড় খুশী হয়েছি। কত ভাবনা করেছি কত জনে কতই দুঃখ করেছি যে, হায়! বড়দিদি এমন সুন্দরী, এমন চালাক-চতুরা ঘরকন্নায় পাকা, লিখাপড়া জানা মেয়ে, তার কপালে না জানি কেমন বর জোটে। ঈশ্বর কিরূপ বর তৈয়ার করে রেখেছেন তা কে জানে? প্রজাপতির নির্বন্ধ কিরূপ বর-ই যেন হয়—এইটি আমরা কথায় কথায় এতদিন কত চিন্তাই করেছি। তা আজ আমরা খুশী হলেম, বর দেখে বড়ই খুশী হয়েছি। যেমন বড় দিদি তেমন বর। ঈশ্বর যেন এই দুইজনকেই এক জোড়া করে তৈয়ারী করে রেখেছেন। এ বরের জোড়া বড়দিদি, বড়দিদির জোড়া এই বর। তাহা ছাড়া এ পৃথিবীতে যেন জোড়া নাই। হাজার খোঁজ, জোড়া পাওয়া যাইবে না। যেমন মেয়ে, তেমনি ছেলে, একটুকু উনিশ-বিশ নাই। দুই জনেই সমান, আমরা বড় খুশী হয়েছি। দাদা, আমরা চল্লেম।

স্ত্রীলোক-দল চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, সকলগুলি স্ত্রীলোকই বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। নাজির সাহেব বেশ ভাল জায়গায় পছন্দ করিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। ফজলে হক মিয়াঁর সঙ্গে আহারাদি করি। বৈঠকখানাতেই বাস করি। বৈঠকখানা যেমনি পরিষ্কার দেখিতেও তেমনি সুশ্রী। একদিন বিকালে বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি "কবতক্ষ" [কপোতাক্ষ] নদী অতি নিকটে। পাঁচ শত হাত ব্যবধান হইয়া কবতক্ষ পূর্ব পশ্চিম দিকে সাগরদাঁড়ী মাইকেল মধুসূদন দত্তের পবিত্র জন্মস্থানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত মহাকীর্তিবান, বঙ্গের অলঙ্কার, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়দিগের বসতি স্থান পলো গ্রাম যাহার অন্য নাম "অমৃতবাজার"। অমৃতবাজার নামে একটা বাজার রহিয়াছে। ঘোষ মহাশয়েরা সে স্থানের জমিদার। মক্কারপুরের নিকটে পূর্বদিকে নাজির সাহেব নদীর কিনারায় আমের বাগান প্রস্তুত করিয়াছেন। গাছগুলি তত তেজের দেখিলাম না, এখনও ছোট ছোট গাছ, গাছগুলি যত্নে থাকিলে এতদিন

জাঁকিয়া উঠিত। অযত্ন হেতুতেই মরকাটে ধরিয়া রহিয়াছে। বাড়ী বেশ পছন্দ জায়গায়। দক্ষিণে নদী, পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দূরে গ্রামের অন্য অন্য বসতি। প্রজার বসত বাটী, পূর্বে রাস্তা, রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে মুন্সী হেয়াছতুল্লা—দেয়াসতুল্লার বাড়ী। এই দেয়াসতুল্লা পাংশার থানায় বহুদিন থানার জমাদারী করিয়াছিলেন। দুই একবার পদমদীতেও গিয়াছেন, আমাদের সকলকেই জানেন

সকল দিক দেখিলাম, বাটীর উত্তর দিক দেখিতে পারিলাম না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, কোন বিষয়ে কষ্ট নাই। কবতক্ষ নদীর গলদা চিংড়ী খুব ভাল। আর বেগুনও প্রশংসনীয়। সকল হইতে সস্তা খেজুরের গুড়। বেশ সুখ স্বচ্ছন্দেই রহিলাম। দুই একদিন ফজলে হক মিয়াঁর সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে যাইতাম। ঘাটে নামিলে পাড়ার ধীবর-পত্নী, ধীবর-কন্যাগণ, বাড়ীর নিকটস্থ অন্যান্য হিন্দু পরিবারেরা যাঁহারা ঘাটে থাকিতেন, কি ঘাটে আসিতেন, সকলেই আমাকে দেখিয়া ভালবাসিয়া আশীর্বাদ করিতেন। আপনা আপনিই বলিতেন, ঈশ্বরের কি মহিমা! এমন মিলন আমরা কোথাও দেখি নাই। সকল স্থানেই একটু উনিশ-বিশ দেখিয়া থাকি, এমন সুন্দর মিলন কখনও দেখি নাই। গায়ের রং যেন বদল দেওয়া যায়। চক্ষু নাক হাত পা গঠন প্রায় একরূপ, কেবল ভিন্ন ভেদ মধ্যে অতি মোলায়েম আর মোলায়েম। এর কেবল গোঁফের রেখা দিয়াছে, তার মুখে জ্যোতির্ময় লাবণ্য ফুটিয়াছে। ইহারা সুখী হউক। ইহার কপালের জোর যে এমন সুন্দর স্ত্রী লাভ করিবে। লতিফনেরও খুব কপালজোর, এমন সুন্দর নম্রস্বভাব মিষ্টভাষী সরল, দেখিতে অতি সুন্দর স্বামী পাইবে। পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছিল। মেয়েটা বোধ হয় কোন প্রকারে দেখিয়াছে। সে যে খুসী হইয়াছে তা বলিতে পারি না। আজকেও সকালে গিয়াছিলাম, আজ দেখি সে লতিফন যেন আর নাই। মুখের উপর রক্ত ভর করিয়াছে, একেই পটল-চেরা চক্ষু। আজ দেখি চক্ষু দুটি হাসহাস করিতেছে, আমাদিগকে খাতির করিয়া বসাইল। কতই খাতির করিল, নিজে পান সাজিয়া আনিয়া দিল। তার মনের ভাবই যেন এই—তোমরা আশীর্বাদ কর, আমি যেন সুখী হই। স্ত্রীলোকেরা ফজলে হক মিয়াঁকে বলিল, ঈশ্বর যেন আপন হাতে দুই মূর্তি গড়াইয়া এক জোড়া করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। ঈশ্বর ইহাদিগকে সুখে রাখুন। যে দিন কবতক্ষ নদীতে স্নান করিতে যাই, সেই দিনই স্ত্রীলোকের মুখে ঐ রূপ কথা শুনি। সেই দিন শুনি, আহা যেমন বর তেমনি কনে, এমন মিল কোথাও দেখি নাই। এদের অপেক্ষা সুশ্রী অনেক আছে। কিন্তু এরূপ মিলন ভাব কোথাও

দেখি নাই। দেখিলেই বোধ হয়, দুটি পিঠেপিঠি ভাই ভগ্নী। হায় রে! ঈশ্বরের লীলা। এর জন্ম কোথা, আর ওর জন্ম কোথা। শুনেছি—দশ দিনের পথ তফাত। কেহ বলে—দিদি, দেখেছ? আর একটা কাণ্ড লক্ষ্য করেছ? যেদিন এই ছেলেটা আমাদের গ্রামে এসেছে, যে দেখে গিয়েছে সেই একে ভালবেসেছে। একটি মুখে এর নিন্দার কথা শুনলেম না। নাজিরের খুব কপাল, ঈশ্বরের নিকট দুই হাত তুলে সে যেমন চেয়েছিল তেমনি পেয়েছে। সুখে থাকুক, এরা চিরসুখী হউক। আমার কন্যা থাকিলে, কথার কথা, আমি বিয়ে দিয়ে ঘরে রাখিতাম।

কত কথা শুনি। যাহার যাহা ইচ্ছা সেই বলিতে থাকে। একদিন বিকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাটীর উত্তর দিকে মাঠে বেড়াইতে গিয়াছি। সোজা উত্তরে গিয়া যেই দক্ষিণে মুখ ফিরাইয়াছি, হৃদয়ের মধ্য হইতে কি একটা তাপ বাহির হইয়া আমাকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিল, চলিবার শক্তি রহিল না। স্থিরভাবে একটা ধান্যক্ষেত্রের আলির উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি আশ্চর্য, আমার স্বপ্নদৃষ্ট সেই দৃশ্য। সেই একতলা দালান। মোসলমানের বাড়ীর যেরূপ প্রাচীরের নিয়ম, তাহা নাই। দালানের পিছনের উত্তর দিকের জানালা খুলিয়া দিলে নিতান্ত কম হইলেও তিন মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত ময়দান দেখা যায়। ময়দানের মাঝে মাঝে খেজুরের গাছ আর ধানের খেত। আমরা কয়েকজন দালানের পিছনে অনুমান ২৫ হাত ব্যবধানে দাঁড়াইয়া ময়দানের দৃশ্য দেখিতেছি। উত্তরে বহুদূর দেখা যায়। যাহারা ধানক্ষেতের কিনারায় থাকে তাহাদিগকে দেখা যায়, তাহাদের কথাও শুনা যায়। আর একটু সরিয়া গেলে কথা কহা যায়, উত্তর শুনা যায়। বাড়ীর মধ্যে একটি দক্ষিণদ্বারী দালান। পূর্বদিকের পশ্চিমদ্বারী দালানের ছাদে উঠিলে আর আবরণই থাকে না। ছাদে যে উঠে তার পদতল পর্যন্ত দেখা যায়। বাহিরের বৈঠকখানার উত্তরের বারান্দায় বসিলে বাটীর মধ্যের ছাদের উপর যাহারা চলা-ফেরা করে, বেশ দেখা যায়, ইসারা ইঙ্গিতে কথাও বুঝান যায়। ছাদের উপরে দুই তিন জনকে উঁকি ঝুঁকি মারিতে দেখিলাম, কিন্তু যে আকৃতি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, চক্ষের উপর ভাসিতেছে, সেরূপ দেখিলাম না। দেখিলাম, একজন বর্ষীয়সী রমণী, একজন ১৩।১৪ বয়স্কা যুবতী আরও বেশী বয়সের দুই জন স্ত্রীলোক। বেশী বয়সের দুই জনকে সহচরী অথবা কাজকর্ম করার লোক বলিয়া বোধ হইল। দাসী বাঁদীর ন্যায় চেহারা, বে-আবরু অথবা অসভ্য বলিয়া বোধ হইল না। যে মুখখানি খুব ফুটফুটে সুন্দর দুই ঠোঁটের দুই দিক বাহিয়া পানের লালা পড়িয়া লাল রঙ হইয়াছে, দূর হইতে মুখের

তা ভালরূপ দেখা গেল না ; তত্রাচ যাহা নজরে পড়িল নাক যেন একেবারেই মুখখানা গোলগাল গাড়ীর চাকার মত। তিনিই উঁকি ঝুঁকি মারিয়া খিতেছেন, আর হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছেন। একবার মুখখানি সম্মুখের ই বর্ষীয়সী রমণীর পিছনে ঢাকিতেছেন আবার হাসিমুখে মুখ দেখাইয়া কাচুরি খেলিতেছেন। যাদু আমাদের সঙ্গে ছিল। রাত্রে আমার নিকট যখন সিয়া বসিত, অন্য কেহ না থাকিলে বাটীর মধ্যের অনেক কথা কহিত। তাহার দশ্যাই এই যে, আমার সহিত যাহার বিবাহ সাব্যস্ত হইয়াছে তিনি খুব ভাল ; শলে আমাকে দেখিয়াছেন, মনে মনে বড়ই খুশী হইয়াছেন। খুশীর লক্ষণ এই এবারে আসিয়া সর্বদাই তাঁহাকে খুশীই দেখিতেছি, আগে যখন আসিয়াছি, নে দিন রাত মুখ মলিন, দুঃখিত ভাব। এবারে সে পূর্ব ভাবের কিছুই নাই। দিন ত হাসি তামাসা, খোসগল্প। আর মুখের চেহারা যেন দপ দপ করছে, শ্যামবর্ণ ঙ্গর মধ্য হইতে যেন জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দু, সেদিন বিকালে পিছনের দালানের ছাদের উপর যে দেখিলাম তাহার ধ্য তিনি অবশ্যই ছিলেন। যাঁহার পিছনে থাকিয়া যিনি বার বার উঁকিঝুঁকি রিতেছিলেন তিনিই বুঝি ?

যাদু মুখখানি ভারি করিয়া বলিল, আপনি বুঝি তাহাই বুঝিয়াছেন। বড় জান ছাদে উঠিয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, চাকরানী সঙ্গে করিয়া দে উঠিয়াছিলেন। এই বুঝি আপনার বুদ্ধি আর বিবেচনা।

—আমি ত চিনি না। যাহা আমার মনে বলিল, তাহাই তোমাকে লাম।

—না না, তিনি ওরূপ পাতলা-বুদ্ধি মেয়ে নহেন। বিবেচনায় হালকা নহেন। লেমানুষের মত তাঁহার ব্যবহার নহে, তাঁহার ভাবীসাহেব তাঁহার চাইতে সে বেশী, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনায় একেবারে হালকা, বড়ই হালকা, ভারিত্ব নাই। বুবুজানের মত ধীর গম্ভীর নহেন। ভাবীসাহেব বড়ই হাসকুটে, দিন রাত সি তামাসা নিয়েই আছেন। আর বড় বুবুজান—বাবা! তাঁহার মাতা এই ল দেখে মেয়েকে ভয় করেন. বুবুজান সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কথা কহেন না, হার সম্মুখে দাঁত বাহির করিয়া খিটখিট করিয়া হাসেন না—সেরূপ হাসি খিতেও পারেন না। সামান্য হাসির কথায় যেমন মেজলা বুবুজানেরা হাসিয়া টকুটি হন, বড় বুবুজান তেমন নহেন। আপনি কাহাকে দেখিলেন বুঝিব প্রকার ?

"আর যে মেয়েটা খুব সুন্দর ধবধবে দুই গালচি বয়ে পানের পিক পড়ছে সে
মেয়েটা বড়ই হাসকুটে ? তুমিই আগে বলেছ তিনি নন।"

"বুঝেছি, বুঝেছি। তিনি মেজ বুবুজান, আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পারে
বলে ঐরূপ লুকোচুরি খেলছিলেন।"

"তোমার কথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, বিশ্বাস করে নিলেম
যাহাকে আড়াল করে [illegible] বিবি ঐরূপ তামাসা করছিলেন, তিনি কে ?"

যাদু একটু অগ্রসর হইয়া মাথা বাড়াইয়া বলিল, উনিই আমাদের ভাব
সাহেব। বড়মিয়াঁর বিবি।

মেজো বিবির কথা চুপে চুপে অত গোপনে সাবধান হয়ে চারদিক নজর ক
বলিল না, এর কথা এত গোপনে সাবধানে বলিল কেন ? কারণ কি ? মনে এ
খটকা বাধিল, সে দিন আর বেশী ঘাটাইব না, মনে করে চেপে গেলাম
একথা সেকথার পর বলিলাম, দেখ যাদু! আসল মূল গোড়াই হচ্ছো তুমি
এদেশে আমাকে টানাহেঁচড়া করে তুমিই এনেছ। যে কষ্ট পেয়ে এসেছি, ত
তোমার অজানা ত কিছু নাই।

যাদু বলিল, হুজুর! সে কথা ত আপনার কাছে বলিই নাই। বাড়ীর মধে
সেই সকল কথা, যেদিন আমরা এসেছি তার পরদিনই হয়েছিল। বড় মিয়া
আপনার কষ্টের কথা, পায়ে ফোস্কার কথা, সারাটি দিন না খাওয়ার কথা, যখ
তাঁহার মায়ের কাছে বলিলেন, মা বিবি ত খুব আপশোস করতে লাগিলেন। মেজ
বুবুজান আপনার গাড়ীচড়ার কথা, গাড়ীতে শোয়ার কথা শুনে হেসে আটখান
হইলেন। আপনি এত বড় হয়েছেন, গাড়ী চড়িতে জানেন না, সেই তাঁহার হাসি
কারণ। বড় বুবুজান শুনিতে শুনিতে তিনি হাসিলেন না। একটা কথাও বলিলে
না, মুখখানি যেন ভারি করে উঠে চলে গেলেন। ভাবীসাহেব কতই ঠাট্টা বিদ্রূপ
করলেন। আর বেশী হাসি হয়েছিল আপনার শোবার বালিশ লইয়া। মেজ বুবুজা
শুয়ে শুয়ে কেচ্ছা শুনিতেছিলেন। তাঁহার মাথার বালিশ চাহিলে তিনি বলিলেন
আমার বালিশ কেউ নিও না, বলিয়াই বালিশের উপর বসিয়া রহিলেন। তাহা
পর মা বিবি ভাবীসাহেবের নিকট বালিশ চাহিলেন যে, বাহিরে একটা ভদ্রসন্তা
আসিয়াছে তোমার মাথায় বালিশই হউক, কি অন্য একটা বালিশ দেও! আমা
বিছানার বালিশ আছে কিন্তু বড়ই ময়লা। তাহা না কাচিয়া আর দিতে পারি
না। ভাবীসাহেব বলিলেন, আমার বালিশের ওয়াড় ময়লা। আজ আবার তিনি
আসিয়াছেন, তাঁহার জন্য একটিমাত্র ফরসা ওয়াড়ের বালিশ আছে। বলেন ও

সেইটাই দিই। মা বিবি ভাবীসাহেবের মনের ভাব বুঝিয়া বড় বুবুজানকে জানাইলেন। তিনি আপনার নাম, আপনার বাড়ী কোথা—এসকল আগেই শুনেছিলেন। নাজির সাহেবের পত্রে সকলি জানিয়াছিলেন। কোন পত্র তিনি ইচ্ছা করিয়া পড়েন না। ঐ পত্রে তাঁহার বিবাহের কথা আছে, আর আপনার নাম, নিবাস, বাপের নাম, বয়সের কথা, কেমন দেখায় সে সকল কথা লিখা ছিল। তিনি মা বিবির নিকট হইতে পত্র চাহিয়া লইয়া নিজেই পড়িয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মনের কথা ত কেহ পায় না। আপনারা আসিবেন বোধ হয় মনে মনে তাহার দিনও গণিয়া রাখিতেন—মা বিবি বুবুজানের কানে কানে কি কহিতেই, বাক্স খুলিয়া নূতন ধোয়া চাদর, আর আপন মাথার বালিশ দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন। আপনি পায়ের বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন, রাত্রে কিছুই খাইবেন না শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। নূতন ওয়াড় বাক্স হইতে বাহির করিয়া আর এক বালিশে সেই ধোয়া ওয়াড় পরাইয়া নিজে রাখিলেন, আপনার মাথায় দিবার জন্য তাঁহার মাথার যে বালিশটা ছিল সেইটাই দিলেন। মা বিবি বড় বুবুজানের কথায় কার্যে কোন কথা কহেন না। তিনি জানেন, বড় মিয়াঁ সাহেব অপেক্ষা, বড় বুবুজানের বুদ্ধি বেশী। নাজির সাহেবও সময় সময় বলিতেন যে, লতিফনের মত বুদ্ধি বিবেচনা ফজলে হকের নাই! বিদ্যাও নাই কি করিব! বুবুজান নিজের মাথার বালিশ আমার হাতে দিয়া তিনি আর একটা বালিশে নূতন ওয়াড় লাগাইতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, নূতন ওয়াড় বাহিরবাটীতে আপনার জন্য দিবেন। আমি পূর্বের বালিশ হাতে করিয়া ভাবিতেছি, কি করি, বেশী কথা বলিলে তিনি চটিয়া জান কি করি? আমি বিলম্ব করিতেই আমাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বালিশ বিছানা লইয়া যা। আমি কেবল বলিয়াছি, ঐ বালিশ? আর যাবে কোথা! আগুন হয়ে বলে উঠলেন—তোর বালিশ! না আমার? তোর সে কথায় কাজ কি রে—গোলাম—

আমি দৌড়—।

আচ্ছা শুনিলাম, তোমাদের বড় বিবির কথা। সত্যি সত্যি তিনি কি বাঙ্গলা লিখাপড়া জানেন?

কি বলেন আপনি! নাজির সাহেব কি মিছে কথা বলেছেন?

আমি বলি, সত্যই হউক তাঁহার হাতের একটু লিখা আমাকে দেখাতে পার?

হাঁ পারি এখনই পারি।

"না না" এখন নয় কালও নয়—তাড়াতাড়ি নয়, যে দিন তাঁর সুবিধা হয়

সেই দিন আনিয়া গোপনে অতি নির্জনে আমাকে দিও, আমি তোমাকে মেঠাই খাওয়াইব। পরদিন রাত্রে যাদু আমার পা টিপিতে আসিয়া একখানা টুকরা কাগজ আমার বালিশের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল আমি কাগজ দোত কলম আপনার নাম করিয়া আনিতেছি। সময় সময় আপনার লিখার দরকার হয়। কাগজ কলম নাই অন্যায় কথা, বড় মিয়াঁর কাছে বলিয়া এখনি আনিতেছি।—

যাদু চলিয়া গেল। কাগজটুকু বাতির আলোতে লইয়া গিয়া দেখি, যাহার লিখা তাহার হাতের অক্ষরগুলি পরিষ্কার গোটা গোটা, জড়ান নহে। খুব ছোট ছোট অক্ষরে লিখা আছে, যথা ;—

কাকে বিষ্ঠা খায়—অনর্থক ডাকে। পেটে কিছুই রাখে না। ছোট লোক মূর্খ যা ইচ্ছে তাই খায় পেটে রাখে না। কথা ভাল, কিন্তু সমাজ ভেদে দোষগুণের প্রভেদ, মূর্খের দলে বদ্‌নাম। ব্যস্ততায় নানা বিঘ্ন। কিছুই গোপন থাকিবে না। শয়ন শয্যা স্বহস্তে পরিষ্কারের আশা।—যেখানেই পাইবেন সেখানেই রাখিবেন। পাইব।

কেহ নয় ;
কালি কলম।

এই কয়েক ছত্র পড়িয়াই ত আমি অবাক। আরও দুইবার পড়িলাম। বুঝিলাম।—শেষ কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। কাগজটুকরা অতি সাবধানে গোপনে রাখিয়া দিলাম, আজ পর্যন্ত রহিয়াছে। ঐ কয়েক ছত্র লিখার কথা লইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছি।—যাদু মুখখানি ভারি করিয়া ফিরিয়া আসিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পা টিপিতে টিপিতে বলিল, বড় মিয়াঁর নিকটে যাইয়া দোত কলম কাগজ কালির কথা বলিলে তিনি বিছানায় শুইয়া শুইয়া বলিলেন, কাগজ কলম কালি বাহিরে কিছু নাই অন্যায় কথা।—আমি দিনের বেলা মনে করি নাই। কি করি আমার দোত কলম কোথায় রহিয়াছে—তাহার খোঁজ খবরই নাই। লিখার দরকার হলে, বুধই বিশ্বাস দ্বারায় লিখাইয়া থাকি। বিশ্বাস কোথা ?

—সে সমুদায় বাক্সে বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

—আমাদের বাড়ী দোত কলম নাই। একথা শুনিলে মীর সাহেব মনে মনে কি বলিবেন ? কলিকাতায় দেখিয়াছি তিনি দিনরাত লিখাপড়া করেন। দোত কলম কাগজ সঙ্গে সর্বদা তাঁহার আলাপ। এ কয়েক দিন চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কি করি ! যাদু, তুমি একটি কাজ কর। লতিফনকে জাগাইয়া, তার

কাছ থেকে দোত কালি কলম কাগজ নিয়ে মীর সাহেবকে দাও। আমি কাল সমুদায় যোগাড় করে দিব।

আমি বুবুজানকে ডাকিয়া ডাকিয়া জাগাইতেছি, জানালার ফাঁক দিয়া দেখি তিনি ফুল-বসান একখানা কাগজে কি যেন লিখিতেছেন। আমার কথার উত্তর দিতেছেন না। আমি দোরে ধাক্কা দিয়া ডাকাডাকি করায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? নাম বলিলে তাঁহার চাকরানী লক্ষ্মীকে দোর খুলিতে বলিলেন। আমি ঘরের মধ্যে যাইয়া কাগজ কলম কালির কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, এ বাড়ীতে আর কাহার কালি কলম নাই? যখন দরকার হইবে তখনি আমি দিব? যাও, আমি দিব না। শেষে আপনার নাম করিলাম, তাহাতে চক্ষু রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, তিনি আমার নিকট চাহিতে পারেন না। আমি বলিলাম, তিনি আপনার নিকট চান নাই।

কার নিকট চাহিয়াছেন?

বড় মিয়াঁর নিকট চাহিয়াছেন?

না—আমার বিশ্বাস হয় না। তিনি কখনই চাহিবেন না। সত্য কথা বল, কে চাহিয়াছে?

তিনি চান নাই।—কেউ চায় নাই—আমি মনফন্দি করিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছি, যদি তাঁর দোত কলম কাগজের আবশ্যক হয়।

তুই বাপু যত গোল বাধাইবার ওস্তাদ। সে ভদ্রলোকের একটা মিথ্যা অপবাদ দিলি কেন? যা! এখন যেখানে যাচ্ছিস সেখানে যা। তিনি যখন চাহেন নাই, তোকে দিব কেন? আর তিনি লেখাপড়া জানা মানুষ। এসেছেন বিদেশে পরের বাড়ীতে আপন দোত কলম লিখার সরঞ্জাম ছেড়ে এলেন কেন? হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, অতবড় একটা চাকুরিয়ার বাড়ী লেখাপড়ার চর্চা নাই? গণ্ডাগণ্ডা দোত কলম কাগজ রহিয়াছে। এ বাড়ীতে যে লেখাপড়ার নাম নাই, তা ত আর তিনি জানেন না? আমি দিব না। কখনই দিব না। তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, আর তুইও যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া থাকিস, দুইজন বড় ভাই বড় ভাবীর নিকট দোত কলম চাহিয়া নিয়ে দে গিয়া। আমার কাছে এস না। লক্ষ্মীকে বলিলেন, লক্ষ্মী তুই দেখিস ত যখন বৈঠকখানা ঘরে কেউ না থাকে সন্ধ্যার সময় সকলেই বেড়াইতে যায়, সেই সময় গিয়ে দেখে আসিস ত, বিশ্বাসের কামরায় দোত কলম কাগজ আছে কিনা?

আমি বলিলাম, বুবুজান আজকে দোত কলম কাগজ একখানা দিন।

এখনই এনে দিব। তাহাতে তিনি বলিলেন, দেখ যাদু, তুমি আমার নিকটে চালাকি করো না। তুমি যার জন্য কাগজ কলম চাচ্ছো যদি বলতে ইচ্ছে কর বল গিয়ে—

ঢাল নাই তলোয়ার নাই খামটী মারেঙ্গা।
দোত নাই কলম নাই চিঠি লেখেঙ্গা।

চলে যা, কিছু পাবি না। লক্ষীর প্রতি চাহিয়া "দোর বন্ধ কর"। আমি বাহিরে আসিয়া জানালা দিয়া দেখি তিনি লিখিতে বসিলেন। বাবা, তিন কথায় আমাকে মিথ্যাবাদী করে দিলে।

আমি ঘুমাইতেছি ভাবিয়া যাদু উঠিয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, এর বড় ভাই আহাম্মকের একটা জীবন্ত মূর্তি। চাঁদ মিয়া একটু চতুর, নাজির সাহেব পাকা স্বার্থপর। এ কি? এর আশ্চর্য বুদ্ধি। কায়মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম—হে দয়াময়, তোমার মহিমার অন্ত নাই। দয়াময় সকাতরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমার এ দাসের মনের আশা পূর্ণ করিও। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শুইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, স্বহস্তে শয্যা ঝাড়িতে বলিয়াছে কেন? অবশ্যই কারণ আছে। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রাতে উঠিয়া প্রাত্যহিক কার্য শেষ করিয়া বসিয়া আছি। ফজলে হক উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার লিখাপড়া করা অভ্যাস এখানে বাঙ্গলা কেতাব আছে—জৈগুন সোনা ভান্, আবুশ্যামা হাজারা মস্‌লা, হাতেমতাই—এই সকল কেতাব যদি পড়িতে ইচ্ছা হয় তবে আনিয়া দিই। আর লতিফনের কাছে ভাল ভাল বাঙ্গালা কেতাব আছে, তাহা দেবে না,—কেতাব কাহাকেও দেয় না, আমার নিকট যে কেতাব আছে তাই দিচ্ছি। অবশ্যই একা একা বসে থাকা বড়ই কষ্টের কথা।

দোত কলম কাগজ বাঙ্গলা কেতাব সকলি পাইলাম। বসিয়া বসিয়া কি করি?—কলিকাতার সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত সহকারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহিত পত্রে পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করে ছাপাইতেন আমাকে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন—"আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা"। কেউ জানিত না যে, আমি প্রভাকর পত্রিকায় কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা।—সাদাসিদে ভাবে সংবাদ লিখিতাম। ভুবনবাবু কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন। কোন কোন সংবাদ বাদও দিতেন, সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইতাম, কুমারখালীতে

সে সময়ে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রকাশ হইত। কুমারথালী, আমার বাটী হইতে নিকটে। গ্রামবার্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতাম, সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্তায় সংবাদ লিখিতাম, প্রভাকরেও লিখিতাম। মক্তারপুরে বসিয়া বসিয়া থাকি, কোন কাজকর্ম নাই। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথবাবু কবতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন। এক এক দিন বহুদূর নৌকা করিয়া দেখিয়া আসিয়া লিখিতাম। তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথবাবু আর কলিকাতার দিকে ভুবনবাবু আমার সামান্য লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন।

মক্তারপুরে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। এখনও দুইটি মাস বাকী। এখন বাড়ীর লোকের সহিত আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল, এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের উপদেশে খুব সাবধান সতর্ক হইলাম। যাদুকে আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা করি না। কিন্তু যাদু ছাড়িবার পাত্র নহে। দিনেরাতে বাটীর খবর সে যাহা জানিতে পারিত সুযোগ সুবিধা মত আসিয়া আমাকে জানাইত। আমি সতর্কভাবে শুনিতাম। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতাম না, প্রশ্ন করিয়া কথার খোলাসাও করিতাম না। প্রতিদিন বিছানা স্বহস্তে ঝাড়িয়া বালিশ উলটাইয়া দেখিতাম কিছুই না। এক রাত্রে দেখি এক টুকরা কাগজ বালিশের নীচে রহিয়াছে। ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখি।... 'আপনি বোধ হয় ব্যস্ত হইয়াছেন, বিদেশে আপন লোক কেহই সঙ্গে নাই। আপন বলিতেও কেহ নাই—সকলেই পর—এ কয়েকটা কথা মন হইতে চিরকালের জন্য দূর করিবেন। এখানে সকলই আপনার,—পর কেহই নাই। আপনার জীবনের সঙ্গিনী আপনার সুখ দুঃখের ভাগিনী যে, সেই এখানে আছে। জগতে এমন মায়া মমতা—এরূপ ভালবাসা সম্বন্ধ কাহার সহিত নাই, ও হইবে না। সেই এ বাড়ীতে আছে। ব্যস্ত হইবেন না, ধৈর্যগুণ বড় গুণ বহুকালের কথা! আপনার নিকটে বলিতে লজ্জা হয়—"সবুরে মেওয়া ফলে।" আপনার উপরে আপনার হস্তে যে আত্ম মন দেহ জাতি কুল মান মর্যাদাসমর্পণ করিবে, সেই এখানে আছে—প্রতিদিন একপথে বেড়াইবেন না। এই গ্রামে আবাল বৃদ্ধ সকলেই আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করে, যেখানে পান, সেখানেই রাখিবেন।'

আপনারই

পত্র পড়িলাম, একটু চিন্তাও করিলাম। "সেখানেই রাখিবেন," এর অর্থ কি আমাকেও লিখিয়া এই স্থানেই রাখিতে সঙ্কেত করিয়াছেন? লিখি, এই রাত্রেই লিখিয়া রাখি। লিখিলাম—

'প্রথম ছত্রে "প্রা" লিখিয়া কাটিয়াছেন। তাহার পর "প" লিখিয়া কাটিয়াছেন আমার মন সন্দেহযুক্ত নয়, খাঁটী মন, যাহা মনে তাহাই মুখে। কি বলিয়া সম্বোধন করিব? মনের কথা বলিতেছি। ঠিক করিতে পারিলাম না, আজ আপনি কিছুই বলেন নাই, আমিও কিছু বলিলাম না। দেখি—প্রথমে আপনাকে একটি কথা বলিয়া রাখি, আমার "মা" নাই, আপনার আছে। আমার পিতা আছেন। আমার মাতামহী আছেন, আপনারও আছে। আমার মাতামহ নাই, আপনার আছে আমার যাঁহারা আছেন, আজ পর্যন্ত কেহ জানেন না, আমি আপনার বাড়ীতে আসিয়াছি, তাহারা হয়ত ভাবিতেছেন, আমি কলিকাতায় ভাল থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছি। আপনার আত্মীয়স্বজন জানিতেছেন একরূপ, আমার আত্মীয়স্বজন জানিতেছেন অন্যরূপ। আমি কেন আসিলাম, ঈশ্বর জানেন, মনের কথা ঈশ্বর জানেন। যার জন্যে আসিলাম—আসিয়াছি। "সে আমার" আমার মনে ইহা ধ্রুব বিশ্বাস। পাহাড় টলিতে পারে আমার একথা টলিতে পারে না তবে সে কাহার তা সেই জানে। কারণ আমাদের সমাজের গতি চমৎকার, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত, ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু পরিমাণ নির্ভর করা কর্তব্য। তাহা সমাজে কই, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কে? পিতা মাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন। তাঁহারাই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন, যার বিবাহ তার অভিমতের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না, এই যে এক ভয়ানক প্রথা, ইহারই জন্য আমার প্রাণ সর্বদা কান্দে। কাকে বলিব—লোক নাই, নিজের কান্না নিজেই শুনি, পারিলাম না লিখিতে পারিলাম না—

তোমারই—আমি।'

পত্র লিখিয়া নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিলাম। রাত্র প্রভাত হইল, প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম, 'মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি'। মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল; যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম। আজ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিলাম, মনের কথা কি না! মনে বড়ই লাগিল, লিখিয়া ডাকে রওয়ানা করিলাম। এদিকে সপ্তাহ মধ্যে উত্তর নাই। মধ্যম কন্যার বিবাহ জন্যেও ঘটক ছুটাছুটি করিতেছে। কত স্থানে যাওয়া আসা করিতেছে।

শেষে শুনিলাম ৫।৬ ক্রোশ দূরে পানীসারা গ্রামে মীর হোসেন আলীর সহিত মধ্যম কন্যার বিবাহ স্থির হইল। পাড়া প্রতিবাসী বাড়ীর লোকজন সকলেই বলে মধ্যম কন্যাটা হাবা—এক প্রকার পাগল। বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে, মনে হিংসা পোরা, দেখিতে খুব সুন্দরী অর্থাৎ গায়ের রং খুব পরিষ্কার সাদা ধবধবে। লিখাপড়ার, সংসারে কাজ কর্ম ঘর সংসারের বিধি ব্যবস্থা কিছুই জানে না। একেবারে বেআক্কেল পশুর সমান। তবে মাতা ভ্রাতা তাহাকেই বেশী ভালবাসেন, কারণ সে হাবা। বড় মেয়ে চতুরা বুদ্ধিমতী লিখাপড়া জানে, ভালমন্দ বুঝে, হেরাসতুল্লা মিঁয়া সম্পর্কে মামু হন, তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া লিখাপড়া শিখাইয়াছেন। ঘর সংসারের কাজেও খুব পাকা, প্রতি কথায় ভ্রাতা মায়ের ত্রুটি দেখাইয়া দেয়, তাহাতেই তাঁহারা একটু নারাজ। আর মধ্যম কন্যাটিকে তাঁহারা যে কাতে শুইতে বলেন শুইয়া পড়ে, যাহা বলেন বিশ্বাস করে! ভালই হউক মন্দ হউক তাহার অনিষ্টই হউক, যাহাই হউক ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। যে যাহা বলে তাহাই শুনে। পাড়াপড়শী বলিল, দেখ মেজ বিবি! তোমার যেখানে বিবাহ হইবে, সে গ্রামে বড় জঙ্গল। আর যাঁর সঙ্গে বিবাহ তাঁহার আর এক স্ত্রী আছে। একটি ছেলেও আছে।

মেজ বিবি অমনি বলিয়া ফেলে আমি ত আর সে বাড়ী যাব না। আমার কি? আমি মায়ের কাছে থাক্‌ব। থাক্ না তাহার পাঁচটা বউ আমার কি? থাক্ না তাহার দশটা ছেলে আমার কি? আমি কি বড় বুবুর মত আগা শুনবো, গোড়া শুনবো—পাছা শুনবো? সে লিখাপড়া জানে, তার গুমর বেশী, তার আশা বেশী। দেখিতে ভাল দেখায় কিনা, সে আপন চক্ষে দেখবে। তার কথাই এই যে পরের চক্ষে দেখলে আমার লাভ কি? আমার চক্ষে যদি ভাল না দেখায়—পরের চক্ষে ভাল হলে আমার কি? আমার জিনিস আমি দেখবো, আমি ওসকল কথা জানিনা। সকলে হাসিয়া কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক থাকে না। কত কথাই বাটীর মধ্যে হইতেছে, যাইতেছে, মেজ বিবির বিবাহ—পানীসারায় মীর হোসেন আলীর সঙ্গে হইবে, পাকাপাকিরূপে স্থির হইয়া গেল। আমাকে বিকালে বাড়ীর উত্তরে দেখিলেই মেজ বিবি ছাদের উপর হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া মারেন, লুকোচুরি খেলেন, কত হাসি তামাসা করেন—কিন্তু আমি যাহাকে দেখিতে চাই তাহাকে দেখিতে পাই না। বিছানা স্বহস্তে পরিষ্কার করি। বালিশ উল্টাইয়া দেখি কিছুই নাই। আবার বালিশ বিছানার চাদর আর একদিন বদল হইয়াছে। চাদরখানি খুব পরিষ্কার, বালিশ অন্ত আর একটা

পরিষ্কার ওয়াড় দেওয়া, কিন্তু সেই সুঘ্রাণ, সেই ব্যবহার করা,—সেই মাথার সুগন্ধি তৈলের ঘ্রাণ মাখান। ইহার অর্থ কি? তাহার চিন্তার সীমা অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। অনেক চিন্তার পর বুঝিলাম, হয় আমাকে শাসন করা, নয় গাত্রের ঘ্রাণ মাথার ঘ্রাণ আমার বিরক্তিকর কিনা পরীক্ষা করা। যাহা হউক সপ্তাহ মধ্যে কোন লিখা কাগজ পাইলাম না। প্রত্যহই বিকালে বেড়াইতে যাই। আজ গ্রামের পশ্চিম দিকে গিয়াছি, গ্রামের অন্য কোন ভদ্রলোকের বসতি নাই। মুসলমান কৃষক শ্রেণী, হিন্দু মধ্যেও মালো, কৈবর্ত দাস, আচার্য্য ব্রাহ্মণ, আর দুই তিন ঘর নরসুন্দর। ইহাদের পরিবারগণ সকলেই নাজির সাহেবের বাড়ীর মধ্যে সর্বদা আসাযাওয়া করে, সকলের সাহতেই সৎভাব। তাহাদের বাড়ীর নিকট হইয়া আজ বেড়াইতে যাইতেছি, তাহারা দেখিয়া এপাড়া, ওপাড়া এবাড়ী সেবাড়ী ছুটাছুটি করিয়া এক এক বাড়ীর দেউড়ির পার্শ্বে ২০।২৫ জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য বদনে আমাদিগকে দেখিতেছে। সকলের লক্ষ্য আমার দিকে। আর সকলের মুখেই শুভ আশীর্বাদ, স্বামী-স্ত্রী সুখে থাক। ঈশ্বর ইহাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যেমন কন্যা তেমনি বর।

আমরা গ্রামের অন্তঃসীমা পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিতেই দীননাথ নামে নরসুন্দর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। একমাস মধ্যে দীননাথকে অতি কম হইলেও ১০।১২ দিন দেখিয়াছি। আরও শুনিয়াছি ফজলে হক মিঁয়ার বাল্যবন্ধু! দীননাথ আমাদের সঙ্গে আসিল, আর মুন্সী দেয়াসতুল্লা যিনি পাংশার থানায় জমাদার ছিলেন। তিনি কার্য পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। আমাদের বৈঠকখানা ছাড়িয়া তাঁহার বাড়ী দশ হাত ব্যবধান। মাঝে একটা অতি কম পরিসর কাঁচা রাস্তা মাত্র। তিনিও আসিলেন, বৈঠকখানায় বসা হইল। ফজলে হক সাহেব প্রস্তাব করিলেন। মুন্সী দেয়াসতুল্লাকে বলিলেন, মামা! শুধু শুধু বসিয়া থাকা যায় না। আসুন আজ তাস খেলা করি। বলিয়া তাস আনাইলেন, —না খেলা আরম্ভ করিলেন। আমি তাস খেলিতে জানি কিনা—সেই বিষয় তাঁহাদের মতদ্বৈধ হইল। ফজলে হক সাহেব বলিলেন, জানিলে এতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। দেয়াসতুল্লা সাহেব বলিলেন, বাবাজীর অনেক কথা আমার জানা আছে—আমি পাশাও আনাইতেছিলাম। তাহার অনেক খেলার খবর আমার জানা আছে। এই কথায় অন্য লোক হইলে একবারে কাট হইয়া যাইত। আমার সহ্য করিবার শক্তি আছে, হঠাৎ গলিয়া যাওয়ার কোন জিনিস আমার হৃদয়ে নাই। মনে যে কথা উদয় হইল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, আমি

স্থির ধীর নীরব। দেয়াসতুল্লা সাহেব বলিলেন, বাবাজী আর দীননাথ একদিকে —আমি আর ফজলে হক একদিকে। আমি হাঁ না কিছুই করিলাম না। কিন্তু দেয়াসতুল্লা সাহেবের ঐ কথায় আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, পদমদীর কোন কথা বলিলেও বলিতে পারে, আবার ভাবিলাম নাও জানিতে পারে। জানিলেও উড় উড় ভাবে লোকের মুখে শুনিতে পারে। যাহা হউক—কণ্টকবিহীন স্থান নাই। পৃথিবীর এক কোণে একেবারে অপরিচিত দেশে গেলেও হয়ত শত্রু লাগাই আছে। খোদাতালার অনুগ্রহ ও দয়া এবং ভাগ্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই থাকিব যা করেন তিনি। বাধ্য হইয়া খেলা আরম্ভ করিলাম। রাত্র ১০টা পর্যন্ত খেলা করিয়া সকলেই আহার করিতে উঠিলেন, যাহার যথা গম্যস্থান তিনি তথায় চলিয়া গেলেন। আমাদের দুইজনার খাদ্য বাটীর ভিতর হইতে আনিয়া চাকরেরা যথাস্থানে রাখিয়াছে। আমরাও আহার করিয়া শয়ন স্থানে গমন করিলাম। আমি আমার বিছানায় যাইয়া নিয়মিত আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বিছানার বালিশ উঠাইয়া চাদর উঠাইতেই দেখি আজ লেফাফা করা পত্র। সামান্য টুকরা কাগজ নহে, রীতিমত পত্র। তাড়াতাড়ি লেফাফা ফাড়িয়া পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলাম। অনেক লিখা।

প্রথমেই লিখা আছে—'মাথা খাও পত্রখানি বুঝিয়া পড়িও। উপরি উপরি ভাবে পড়িও না—আজ মন খুলিয়া লিখিলাম। আর শীঘ্র লিখিব না—দুইবার পড়িও।'

"ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—আমি তোমার, তুমি আমার! তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, ধর্মসূত্রে বাঁধা পড়ি নাই, তুমিও বাঁধা পড় নাই। তবে কি সাহসে এমন গুরুতর সম্বন্ধে সম্বোধন করিলাম। আমি তোমায় ভালরূপে জানিয়াছি। আজ দুই মাস গত হয় তোমার মন পরীক্ষা করিয়াছি। তোমাকে চিনিয়াছি। আমি এ জগতে থাকিতে তুমি অন্য কাহারও হইতে পার না। আমিও মনে মনে বুঝিয়াছি, স্থির করিয়াছি, তোমার ছাড়া আমিও অন্য কাহারও হইতে পারি না। কারণ তোমার কথা অচলের ন্যায় অটল। আমি বয়োপ্রাপ্তা কুমারী, আমার কথাও অটল খাঁটী এবং আলবত্। আমার কথা উলট পালট করিবার সাধ্য কাহার নাই। "যদি" কথায় যেমন কথায় বাধা পড়ে "কিন্তু" কথায় কথাটা উলটাইয়ে দেয়। তোমার আমার কথায় "যদি" বসিতে পারে না, "কিন্তু"ও আসিতে পারে না, তত্রাচ বলিয়া রাখি—তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমাকে মরিতে দিও দাসীর এই ভিক্ষা।

"তোমার বামে বসিতে আমার যেরূপ বাসনা, নিশ্চয় আমাকে বামে বসাইতে তোমারও সেইরূপই ইচ্ছা। আমার প্রতিজ্ঞা, ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা। জীবনেও তুমি, জীবনান্তেও তুমি আমার,—মনে সুখ জন্মিল না। কথাটা চাপা দিয়ে শান্তি বোধ হইল না। মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনেও তুমিই আমার স্বামী, জীবন অন্তেও তুমিই আমার স্বামী। প্রাণ জুড়াইল। আজ তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমাকে দেখিবে লিখিয়াছ, তাহা বলিতে পার। কারণ আমি তোমাকে প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়া দেখি। যখন দেখি, বোধ হয় তুমি যেন কি ভাবিতেছ, তুমি পুরুষ তোমার ভাবনা কিসের? আর যদি আমার জন্য ভাবনা, সে নিতান্তই ভুল। যে ভাবনাই হউক আমাকে লিখে জানাইও। আমিও ভাবিব। কারণ আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী। ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আমাকে একবার দেখিতে চাও কেন? আমি কি তোমার মনের মধ্যে আঁকা নাই? যে চক্ষে দেখিতে চাও সে চক্ষের উপরে শূন্যভাবে আমার ছায়া সদা সর্বদা তোমায় দেখিতে কি ছায়া করে নাই? সে ছায়ার ছায়া কি তোমার নয়নে পতিত হয় না? আমার আছে। তোমার থাকিবে না কেন? যাহা হউক আমি তোমার দেখিবার উপায় করিব। আর বেশী নাই। এই আমার শেষ পত্র। সে সময় মুখেই বলিব লিখা লিখির কথা থাকিবে না।

তোমারই দাসী।"

চিঠিখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। কিন্তু চিন্তা হইল, সন্দেহ বাড়িল। লিখিল, আর ভাবিও না। আমি আরও বেশী ভাবনায় পড়িলাম। পত্রে হাতের লিখা দেখিয়া, লিখা কথাগুলি পড়িয়া প্রাণ জুড়াইতাম, তাহাও একেবারে বন্ধ করিল। আবশ্যক হইলে আমাকে লিখিতে বলিয়াছে, সে আর লিখিবে না। দেখা দিবে বলিয়াছে, সেই বা কি প্রকারে? আমি তাহাকে দেখিবার জন্য কতই চেষ্টা করি, দেখিতে পারিনা, কিন্তু সে আমাকে প্রতিদিন দেখিয়া থাকে, কোথা হইতে দেখে? দালানের ছাদের উপরে যাহাদের দেখি তাহাদের মধ্যেই থাকিতে পারে। কাপড়ে জড়ান ঘোমটায় মাথা ঢাকা, কখনও দেখি মাথা হইতে পা পর্যন্ত একেবারে ঢাকা, বোরখা পরায় যুবতী বৃদ্ধা বেশ চেনা যায়, বৃদ্ধা লোকেই বোরখা ব্যবহার করে দেখিয়াছি। যুবতীদের অত মোটা দেহ হইতে পারে না। ক্রমে দিন ঘনিয়া আসিল, আত্মীয়স্বজনের বাড়ী হইতে আইবড় ভাত আসিতে আরম্ভ হইল। পাত্র পাত্রী উভয়েই আইবড় ভাত খাইয়া থাকে। আমার আত্মীয়স্বজন এখানে কেহ নাই। আইবড় ভাত কে দেবে? অনেক কুটুম্ব দুই দিন করিয়া আইবড়

ভাত দেওয়া আরম্ভ করিল। ফজলে হক মিঁয়া একদিন তাঁহার কার্যকারক বুধই বিশ্বাসকে বলিতেছেন—দেখ বিশ্বাস,আজ গরীবপুর হইতে আইবড় ভাত আসিয়াছে দুই জায়গায়। সকল জিনিসপত্র দুই দুই পাত্রে। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, মীর সাহেবের আর বড় বিবির আইবড় ভাত আনিয়াছি। কাল মেজ বিবির আইবড় ভাত আনিব। মীর সাহেবকে সকলেই ভালবাসে, লতিফনের কপাল ভাল, ছোট বেলা হইতেই জানি লতিফন সুখে থাকিবে। খোদাতালা দু'জনকে এমন মিল করিয়া দিয়াছেন যে আমি কখনও এমন দেখি নাই। লতিফনের মেজাজ দেখিয়া তাহার কথাবার্তা শুনিয়া তাহার আত্মমর্যাদার জ্ঞান বুঝিয়া আমাদের সকলেরই বিরক্ত বোধ হইত। এখন দেখিতেছি তাহার সেই ভাবই মহৎ গুণের অংশ। মীর সাহেবের মনের সহিত, স্বভাবের সহিত আচার ব্যবহারের সঙ্গে যেন সমুদায় অংশে মিল, ঈশ্বর লতিফনের জন্য মীর সাহেবকে, মীর সাহেবের জন্যই লতিফনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বুধই বিশ্বাস বলিল, হুজুর! যার কপাল যেমন, হিন্দুরা পূর্বজন্ম মানে এবং বিশ্বাস করে। আমরা তাহা বুঝি না। মীর সাহেব আর বড় বিবির স্বভাব চরিত্র কথাবার্তা মনের উচ্চ ভাব দেখিলে বোধ হয়, পূর্বজন্মে ইহাদের এই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ছিল। কোথাকার ছেলে কোথায় আসিল, কোথায় লাহিনী পাড়া—নামও শুনি নাই। আবার কোথায় মক্তারপুর তাহাদের পক্ষেও ঐ প্রকার এমন অজানা স্থানে এমন মিল, একই ভাব যেন কত কালের ঘনিষ্ট ভাব। বড় বিবি খুব সুখী হইবেন। জমিদারের ঘরে পড়িবেন, আর এমন মাটীর মানুষ স্বামী পাইবেন যে তাহাতে আর কথা নাই। খোদার নিকট প্রার্থনা করি, ইহারা দীর্ঘজীবি হইয়া সুখে থাকুন, আমরা আশীর্বাদ ভিন্ন আর কি করিতে পারি। মীর সাহেব কপাল গুণে উপযুক্ত স্ত্রী লাভ করিবেন, বড় বিবির কপাল গুণে দেবতার ন্যায় স্বামী পাইবেন। মেজ বিবি যেমন হাবা, স্বামীও পাইবেন সেইরূপ বেজায় ভাল মানুষ, —কপাল, বিধাতার লীলা খেলা আমরা দেখি। ক্রমেই দিন ঘনিয়ে আসিল। আজ ১২৭২ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, বিবাহ দিন ধার্য হইয়াছে ৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরেজী ১৮৬৫ সালের ১৭শে মে। আজ বুধবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ। মোসলমানী সরার মতে বিবাহ, বাদ্য-বাজনা রঙ্গ-তামসা কিছু নাই, লোকজন খাওয়ান আছে, তাহারই জোগাড় হইতেছে, পাত্রীর গায়ে তেল হলুদ দেওয়ার উদ্যোগ হইতেছে, পাত্রের গায়ে কে তেল হলুদ দেয়? তেল হলুদ দেওয়াও মোস্লেম প্রথা নহে। বাজী-বাজনায় বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় বেদাত বেশরা

বলিয়া পরিত্যাজ্য। তেল হলুদে সামান্য কিছু ব্যয়, সুতরাং এখনও মোস্লেম সমাজে অনেক স্থানে তাহা পরিত্যাগ করে নাই। কানাঘুষায় কানে আসিল যে পাত্রীও গায়ে তেল হলুদ মাখে নাই। মায়ের নিকট বলিয়াছে যে মীর সাহেবের মা নাই কিন্তু আর আর আত্মীয়স্বজন সকলেই আছেন। মাতামহী-মাতার পিসতুত ভগ্নী পিতৃব্য কন্যা, মাসির কন্যা, মাসি এবং পিসি বর্তমান, আর আর আত্মীয়স্বজন অনেকেই বাঁচিয়া আছেন শুনিয়াছি। তিনি জমিদার পুত্র—জমিদার এরূপ দীনদৈন্য অবস্থায় বিবাহ করিতে কেন আসিয়াছেন, আমা অপেক্ষা আপনারাই তাহা ভাল জানেন। তিনি কি অবস্থার লোক তাহা আপনারাই ভাল জানেন, তাঁহার গায়ে আপনারা কেহই হলুদ দিলেন না। বিবাহের চিহ্ন, হাতে কাঙ্গানা বাঁধা—তাহাও বাঁধিলেন না। বিবাহের কোনরূপ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার কিছুই করিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে কিছু না বলুন, তাঁহার মনে অবশ্যই কিছু বলিতেছে। আত্মীয়স্বজনের কথা দেশের কথা অবশ্যই আজ মনে উদয় হইয়া মনকষ্টের কারণ না হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের গায়ে তেল হলুদ দিবেন, আর সে বেচারা দীন দরিদ্র সামান্য অতিথিবেশে আপনাদিগের বৈঠকখানা ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে, আপনাদের মনে কি কিছুই উদয় হইতেছে না? স্বার্থসিদ্ধির জন্য মনুষ্যত্বের মস্তকে এরূপভাবেই কি আঘাত করিতে হয়? সে কেন এবেশে এ দরিদ্র অবস্থায় এত দূরদেশে স্বইচ্ছায় আসিয়াছে? না, আপনারা আনিয়াছেন? আপনারা জানেন, আর তিনি জানেন। আরও না হয় তাহাকে একবার জিজ্ঞাসাটা করুন সে তেল হলুদ গায়ে দিবে কিনা? আমি ত আপনাদের ঘরের মেয়ে, যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

বড় কন্যার কথাগুলি মায়ের মনে বড়ই লাগিল, প্রতি কথা যেন ধারাল অস্ত্রের ন্যায় অন্তরে বিদ্ধ করিল। তখনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং আর আর অল্পবয়স্ক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন যাহাদের সঙ্গে হাসি তামাসার সম্পর্ক হইবে—ডাকিয়া আমার গায়ে তেল হলুদ দিতে আদেশ করিলেন। তাহারা যে বাটীর মধ্যের আদেশানুসারে আমার গায়ে তেল হলুদ দিতে আসিয়াছে, সে ভাব গোপন করিয়া এটাও একটা কর্তব্য কার্য। ঘরের ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যেরূপ আগ্রহে হাসি-রহস্যের সহিত দিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে আসিয়া তেল হলুদ দিতে প্রস্তুত হইল। তাহার পর বিবাহ উপলক্ষে যে যে আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ আছে তাহা সমুদায় সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যার পর তাহাদের পরস্পর আলাপ কথোপকথনের প্রসঙ্গে, তেল হলুদ দেওয়ার কারণ বিস্তারিতরূপে শুনিলাম। স্ত্রীলোকের মাথায় এতদূর দূরচিন্তা, স্বভাবচরিত্রও অতি

উৎকৃষ্ট, দেখিতেও অতি সুশ্রী (সকলেই বলে) ঈশ্বর যেন জোড়া মিলিয়ে পাঠিয়েছেন, যদিও আমি আজ পর্যন্ত চক্ষে দেখি নাই, তত্রাচ মনে বিশ্বাস যে, আমার চক্ষুও তাহাকে ভালবাসার চক্ষেই দেখিবে।

পাঠক, আমাদের বিবাহ! ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর। অদেখা অবস্থাতেই বিবাহ করিতে হয়, বিবাহের পূর্বে পর্দানশীন পরিবার মধ্যে পাত্রী দেখার নিয়ম নাই। কেহ কাহাকে দেখায় না, পুরুষ ত দূরের কথা, স্ত্রীলোকেরাও দেখিতে পায় না।

বর্তমান সময়ে দেখিতেছি, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর দেখিতেছি, গ্রামে নহে কলিকাতায় দেখিতেছি, বিবাহের পূর্বে পাত্রপক্ষের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের পরিবারেরা এবং মাতা ভগ্নী পিসি মাসি ইঁহারা, পাত্রীকে পাত্রীর বাড়ী যাইয়া দেখিতে পারেন। সম্বন্ধহীন অপরের বাড়ীতে যাইতে অপমান বা দোষ মনে করেন না। কিন্তু পল্লীগ্রামে বিবাহের পূর্বে কোন ভদ্র ঘরের পরিবার পাত্রীর বাড়ীতে যাওয়া দূরে থাক সে কথা কেহ মুখেও আনিতে পারেন না। ভাগ্যগতিকে যদি বিবাহ না হয় তত্রাচ কোন পক্ষেরই কোন প্রকার নিন্দার ভাগী হইতে হয় না। কুমারী কন্যাকে অপর স্ত্রীলোকেরা দেখিয়া গেল, সেকথা বলিয়া যে একটা অপবাদ রটিয়া যাওয়া তাহাও রটে না। পাত্রপক্ষের পরিবারেরা যে সম্বন্ধহীন অপর ব্যক্তির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, অচেনা অদেখা, সম্বন্ধবিহীন স্ত্রীলোক-দিগের সহিত ওঠা বসা করিয়া আসিলেন, খাদ্য সামগ্রী যে কিছু উদরে না ঢালিলেন তাহাও নহে, সে বাড়ীর পুরুষেরা যে তাহাদিগকে গুপ্তভাবে একনজর না দেখিয়াছেন তাহাও নহে। তাহাতে কলিকাতার স্ত্রীলোকেরা কোন দোষ মনে করেন না। লিখক দুইটি পুত্রের বিবাহ এই কলিকাতা সহরে দিয়াছেন, তাহাতেই কলিকাতার মুসলমান সমাজের বিবাহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, বহু গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছেন। মফঃস্বলে কোন পরিবার মধ্যে মেয়ে দেখাদেখি নাই। বিবাহের পূর্বে পাত্রপক্ষের পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোকের পাত্রী দেখিতে গমন বিধিব্যবস্থা নিয়ম নাই। আমাদের দেশে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই বিবাহ করিতে হয়। গ্রামে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। এখন আমার জীবনীর কথা বলি। আমাদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই বিবাহ। যা কপালে আছে তাহাই হইবে। কানা খোঁড়া ফুল অন্ধ কালা হইলেও আর উপায় নাই। ভূতে কাল, চক্ষু কোটরে, নাসিকাশূন্য, কেশ-শূন্য, কুৎসিত কদাকার, ঘেনঘেনে পেনপেনে, শুধু হাড়ের পাঁজা, অথবা ভুঁড়িপেটা

হইলেও আর এড়ান নাই, যে ঢোল গলায় পড়িল, সাদরে গলায় করিয়া নাচিয়া নাচিয়া তাহাই বাজাইতে হইবে, যে বোঝা মাথায় চাপিল—আজীবন মনের কষ্টে মাথায় বহিয়া বহন করিতে হইবে, স্ত্রী-স্বামী মধ্যে সর্বদা কলহ কচকচি, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, বর্জন (তালাক) পুনঃ গ্রহণ ইত্যাদি লইয়া যত ঘটনা হয়, বঙ্গদেশে হিন্দু ভ্রাতাগণ মধ্যে তাহার এক কড়া এক ক্রান্তিও দেখা যায় না—শুনা যায় না। ইহার কারণ কি ? নিরপেক্ষ চক্ষে দেখিলে, বিবাহের পূর্বে দেখাদেখিই ইহার মূল কারণ। আমাদের বিবাহপ্রথা শাস্ত্রসঙ্গত বটে, কিন্তু ভাগ্যফলে পরিণাম ফল—প্রায়ই মনকষ্ট ও দুঃখের কারণ। বিবাহ অন্তে দেখা গিয়াছে কন্যা স্থূলকায়, পাত্র এতই ক্ষীণকায় যে দৈবাৎ কন্যার একখানা হাত অজ্ঞাতে স্বামীর গায়ে পড়িলে, হয়ত ঘুমের ঘোরে স্বামী মহাশয় আর্তনাদে—বাবা রে, মা রে, গেলেম, মলেম বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে পারেন। কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা গিয়াছে—পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়স অধিক, দৈর্ঘ্যপ্রস্থেও অনেক বেশী, স্ত্রী এক ধমক দিলে শক্তিশালী স্বামী চমকে উঠেন, বেশী পরিমাণ হাকৃড়ে উঠলে, ডবল ধম্‌কি দিলে—আর কি বলিব, কাপড়ে চোপড়ে একাকার। আহা ! কোনস্থানে দেখা যায় পাত্রী যেন স্বর্গীয় দেবী, অথবা হয় পরী, স্বামী যেন একটা গাবগাছের ভূত। কোন স্থানে দেখা যায় পাত্রীর মুখখানি যেন কমলদলে গঠিত, উভয় গণ্ড ঈষৎ গোলাপী আভায় রঞ্জিত। কাহার দুধে-আলতা মাখান সুচারু বদনের বর্ণ, তদুপরি মন প্রাণ-মুগ্ধকর—লাবণ্যছটা। কাহার চাঁদবদন। কপাল কপাল, অদৃষ্ট লিপি, স্বামী মহাশয়, না হয় ভালবাসার ডাকেই বলি, আহা ! পতি প্রাণধন যেন গুব্‌রে পোকা, আলকাতরা মাখান কার্তিক ঠাকুর ! অনেক স্থলে, দাঁড়কাকের ভাগ্যে পাকা আম, উহাতে যত মিল, গরমিল, অতি সহজেই বুঝা যায়। আমার ভাগ্যে কি আছে ঈশ্বর জানেন ! তবে লোকের মুখেই জয়, লোকের মুখেই ক্ষয়। তিন মাস পর্যন্ত শতমুখে শুনিলাম, এমন মিল কোথাও দেখি নাই, ঈশ্বর যেন মিল করেই দু'জনকে সৃষ্টি করেছেন—এর অর্থ সুশ্রী নহে, সেও যেমন আমিও তেমন, আমা অপেক্ষা সুশ্রী নহে, আমিও তাহা অপেক্ষা সুন্দর নহি, আমার উপযুক্ত তিনি, তাহার মনমত আমি, তবে চক্ষে দেখিতে পারিলাম না, ইহাই আক্ষেপ।

কলিকাতায় "যাদুর" মুখে রূপ বর্ণনা শুনে কল্পনা করে মনে মনে যেরূপ আঁকিয়া রাখিয়াছি, হয়তো সেইরূপই হইবে। আর তিনটি দিন এক প্রকারে দুই দিন। সেই হইতে পত্র বন্ধ। দেখার উপায় করিবে লিখিয়াছিল পারিল কৈ ?

উপায় দেখি না। বাড়ীর ভিতরে ত আমায় ডাকিয়া পাঠাইতে পারে না। এ সম্বন্ধে তাহার অধিকার নাই। একা একা বসিয়া কত কথাই ভাবিতেছি। বিবাহ করিব পূজনীয় পিতা বর্তমান থাকিতে তাঁহাকে জানাইলাম না। মাতৃদেবী নাই কিন্তু মাতৃদেবী হইতে পূজনীয়া মাতামহী বাঁচিয়া আছেন, তিনি কত কষ্টে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহাকেও জানাইলাম না। মাতৃকুলের আর অনেকে আছেন, কাহাকেও এসম্বন্ধে একটি কথা লিখিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি কি উত্তর করিব, দেখা হইলে কি বলিয়া তাহাদের কথার জবাব দিব—আমি কি আমার দেশ, আমার আত্মীয়স্বজনকে একেবারে পরিত্যাগ করিলাম? তা ত পারিব না। চিরকালই কি আমার গৌরী নদীর তট ছাড়িয়া কবতক্ষ নদী তীরে থাকিব? তাহা পারিব না। পৈতৃক বাসস্থান ছাড়িয়া, পত্নীক বাসস্থানে বাস করিতে পারিব না। আমার পবিত্র জন্মভূমি, সে জন্মস্থান ছাড়িয়া, স্ত্রীর জন্মস্থানের আবর্জনা মাথায় করিয়া আজীবন বহিতে পারিব না।

নিজের মনবেদনা নিজেই সহিতেছি, এমন সময় মুন্সী ফজলে হক আসিয়া আমায় বলিলেন, ভাই মীর সাহেব, একটা কথা। আমার মাতা আপনাকে দোয়া জানাইয়াছেন আর অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তিনি আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, আর কয়েকটা কথা কি তাঁর মনে আছে, তাহা বলিবেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা কহিতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, এখনি আপনাকে বাটীর মধ্যে যাইতে হইবে। আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

আমি তখনি প্রস্তুত হইলাম, মুন্সী ফজলে হক সঙ্গে বাটীর মধ্যে চলিলাম। দেউড়ি পার হইয়া যাইতেই ফজলে হক মিঁয়া বলিলেন আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আসিতেছি। তখনি ফিরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া এক সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। আঙ্গিনা পার হইয়া দক্ষিণ দ্বারি দালানের বারান্দায় উঠিলাম। বাড়ীর মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক, দক্ষিণ বামের ঘরে কেহ, রান্নাঘরের দ্বার জানালার আড়ালে কেহ, আঙ্গিনার মধ্যে খাঁড়া হইয়া আমাকে দেখিতেছে। ফজলে হক মিঁয়া হলের মধ্যে আমাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন, ঘরের মধ্যে নীরব, বোধ হইল কেহই যেন সে ঘরে নাই যে ঘরে আমি বসিলাম। ঘরটা সাজান, দেয়ালে অনেক ছবি ঝুলিতেছে। আমার সম্মুখ দেয়ালে একখানা বৃহৎ আয়না টাঙ্গান আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পার্শ্বেই একটা সেঙ্গারদানী তাহাতে বাদামী আকৃতির

একখানা বড় আয়না লাগান রহিয়াছে। উপরে টানা পাখা ঝুলিতেছে। গৃহসজ্জ একরূপ মন্দ নহে, কিন্তু সকলি ময়লা। ধূলি কালী ঝুলে সৌন্দর্যের অনেক হানি করিয়াছে, সর্বাপেক্ষা বড় আর্শিখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, দক্ষিণের বাদামী আকারের আর্শিখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু তাহার পায়া এবং ড্রয়ারগুলি ময়লা ছাতা ধরা আর গায়ে পায়ার চুনের দাগ। পানের পিক দেয়ালের গায়ে ফেলিয়াছে হাতের চুন সেঙ্গারদানীর গাঁয় পালঙ্কের পায়ায় মুছিয়াছে। বড় একখান মূল্যবান পালঙ্ক তাহারও ঐ দশা, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে অতি নিকটে বারান্দায় একটি কামরা, বোধ হয় দুই হাত ব্যবধান। সেই কামরার দ্বারে বৃহৎ একখানি পর্দা ঝুলিতেছে, আমি পূর্বমুখী হইয়া বসিয়াছি, কোনদিকে স্থির নেত্রে চাহিয় দেখিতেছি না, আসিবার সময় দক্ষিণ বামে কোন দিকে মাথা তুলিয়া দেখি নাই, আড় নয়নে এদিক ওদিক যে এক নজর দেখিয়াছি মাত্র। মাথা হেঁট করিয় সম্মুখে নজর রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি, ঘরের মধ্যে বসিয়াও এদিক ওদিক স্থির ভাবে নজর করিয়া দেখি নাই, আমার নজর ঘরের মেঝের দিকে আর একটু মাথা তুলিয়া নিজের ছায়া সম্মুখের দর্পণে দেখিতেছি মাত্র, পিছনে নজর করি নাই। কিন্তু সম্মুখের আর্শি মধ্যেই দেখিতেছি, আমার পিছনের দ্বার কবাট বন্ধ। আরসীতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে কপাটের ঝিলিমিলি আছে বন্ধ করা। তিন চার মিনিট পর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্দার মধ্যে হইতে কথা আসিল, 'বাবা' আমি তোমাকে দোয়া করিতেছি। ফজলে হক মিয়াঁ সাহেব বসেন নাই, সেখানে পালঙ্ক ব্যতীত বসিবার অন্য কোন আসন নাই, দাঁড়াইয়াই বলিলেন মা! আপনাকে দোয়া করিতেছেন।

আমিও খাঁড়া হইয়া সেলাম করিয়া বসিলাম, আমার সেলাম কথাটা বলিয়াই বসিলাম। পর্দার মধ্য হইতে বলিতে লাগিলেন, বাবা! তুমি আজ তিন মাস এই বাটীর বাহির বাটীতে পড়িয়া আছ, আমি তোমাকে ডাকিয়া কখনও একটি কথাও কহি নাই। সেটা আমারই ভুল, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, শুভ কাজটা হইয়া গেলে ফজলে হক যেমন আমার এক ছেলে তুমিও আমার সেইরূপ আর একটি ছেলে হবে, বাবা! জামাই আর ছেলে কিছু ভিন্ন নাই, ভিন্ন হইবার কোন কথাও নাই, তাই বলিতেছিলাম শুভ কাজটা হয়ে গেলে তুমি বাহির বাটীতে একা একা পড়ে থাকবে না। আমিও তোমায় না দেখে না ডেকে বাঁচব না। আমি সরল মনে বলছি বাবা! তাই ভেবে আমি তোমাকে এতদিন ডাকি নাই। তুমি এতে কিছু মনে করো না। তুমি উচ্চ ঘরের সুসন্তান অনেক

দিন হইতে আমরা জানি, তোমার বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহাও জানি, তুমি বড় ঘরের আদরের যত্নের সন্তান তাহাও জানিতে বাকী নাই। খোদায় তোমাকে এখানে আনিয়াছেন, তাহা না হলে বাবা তুমি এত কষ্ট করে এখানে আসবে কেন? তোমায় দেখে আমরা সুখী হইয়াছি, পাড়া প্রতিবেশী গ্রামের সমুদায় লোক আমার কুটম্বস্বজন সকলই তোমার উপর খুশী! একটি লোকও তোমার উপর নারাজ নহে, স্ত্রী পুরুষে তোমাকে দোয়া করে, আমিও খোদাতালার নিকট দোয়া করি, তোমরা সুখে থাক, নাজির সাহেব আসিতে চাহিয়াছিলেন আসিতে পারিলেন না, কত আফসোস করে লিখেছেন, শুনো। (অন্য স্বরে) পরের তাবেদারী করা, বড়ই শক্ত কথা। কাজকর্মের এমনই ভীড় যে একদিনও কাচারি ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে পারি না। মনে বড় সাধ ছিল যে, আমি লতিফনকে আপন হাতে মীর সাহেবের হাতে সুঁপে দেই, তাহা পারিলাম না। কার্যের গতিকে আমি যাইতে পারিলাম না, অতি কম হইলেও আজ নয় বৎসর ঐ ছেলের প্রতি আমার নজর ছিল, যে প্রকারে হয় মীর সাহেব সঙ্গে, লতিফনের বিবাহ দিব। তোমরা একথা মনে করিওনা যে আমি ঐ ছেলেকে আমার বাসায় প্রথম দেখে পছন্দ করেছি তা নয়। মুন্সী কফিলদ্দীন কুষ্টিয়ার নাজির পূর্বে সে আমার পাবনার বাসায় থেকে লিখাপড়া করিত শেষে আমার সেরোস্তায় কর্ম শিখিত। আমি পাবনার নাজির থাকিতেই কুষ্টিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হয়, তখন কুষ্টিয়া পাবনার অধীন ছিল। আমরাই যাইয়া মহকুমা স্থাপিত করিলাম, আমরাই পাবনা হইতে আমলা নিযুক্ত করিয়া পাঠাই, কফিলদ্দীনকে ঐ নতুন মহকুমার নাজির নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। কলিকাতা যাওয়া আসার সময়ে কফিলদ্দীনের বাসায় যাইতাম, সেই বাসাতেই ঐ ছেলেকে দেখি, চিনিতাম না, শেষে কফিলদ্দীনের মুখে পরিচয় পাইয়া আমি ডাকিয়া কাছে বসাইলাম, রাত্রে এক সঙ্গে আহার করিলাম, পড়া লিখার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কথা সকলের উত্তর পাইয়া এবং ছেলে দেখিয়া আমার খুশীতে প্রাণ ভরিয়া গেল। তখনি মনে মনে স্থির করিলাম, লতিফনের সঙ্গে এই ছেলের বিবাহ যাতে হয় তাহার চেষ্টা করিব, আমার মনের কথা কফিলদ্দীনকে বলিয়া আসিলাম, কফিলদ্দীন শুনিয়া বলিল এ ছেলে পাওয়া কঠিন, বাপ রাজী হইবে কিনা বলিতে পারিনা, যাহা হউক আমি চেষ্টা করিব। সেই প্রথম দেখা হইতেই আমি ভালবাসিলাম, গোপনে গোপনে কত লোক লাগাইয়াছি টাকাও খরচ করিয়াছি, যাহা হউক খোদাতালা ছেলে আমার হাতে দিলেন, সেই ছেলের সঙ্গে আমার লতিফনের বিবাহ, আমি স্বচক্ষে

দেখিতে পারিলাম না। আপনারাই দেখিবেন, আগামী শুক্রবার বাদ জমা মীর মশাররফ হোসেনের হস্তে লতিফনকে দিবেন, আত্মীজনের যে কাজ সাব্যস্ত হইয়াছে আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। আর একটি কথা মীর সাহেবকে জামাইয়ের মত মনে করিও না। আপন পেটের সন্তানের ন্যায় যত্ন করিয়া ভাল বাসিয়া অনেক কথা আছে।

পর্দার মধ্যে হইতে চিঠিখানি পড়া শেষ হইল, কে পড়িল বুঝিতে পারিলাম না, পত্র পড়া শেষ হইলে পুনরায় পূর্বস্বরে কথা আরম্ভ হইল বাবা! পত্রে আরো কথা আছে। তুমি জানিও নাজির সাহেবের পত্র পাইয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। দুদিন পরেই বিবাহ, নাজির সাহেবের পত্র পেয়ে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম, তুমি সম্পর্কে জামাই হইলে কিন্তু ধরিতে গেলে তুমি আমার পেটের সন্তানতুল্য, তোমার মা নাই, আর সকলেই আছে।

পাঠক, ঐ সময় "মা নাই" কথাটি শুনে আমার চক্ষে জল আসিল, আমি রুমাল দিয়া চক্ষু পুছিতে লাগিলাম। আমার বিবাহ! আমার মা থাকিলে কি এই ভাবে বিবাহ হয়, আমার মায়ের এত ভালবাসার সন্তান আমি, সেই মা নাই বলিয়াই বিদেশে আত্ম বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় বিবাহ আমার আপন বলিতে কে নাই, আমার পক্ষ হইয়া দুটা কথা বলে এমন একটি লোক নাই। মা থাকিলে কি একা একা চুপি চুপি আসিয়া এইভাবে বিবাহ করিতাম? পর্দার পাশ দিয়া কি অন্য কোন পথে, সকলেই আমার চক্ষে জল দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন কারণ কি? বিবাহের কথা শুনিলে মানুষে খুশী হয়, এ ছেলেটা কান্দে কেন অমনি জিজ্ঞাসা হইল, বাবা, তোমার চক্ষের জল পড়িতেছে কেন, তুমি কান্দিতেছ কেন?

উত্তর—কান্দিতেছি সত্য। আমি আর এখানে বসিতে পারিতেছি না প্রাণ ভরিয়া না কান্দিলে আমার এ কান্নার শেষ হইবে না। এ কথা কয়েক কান্দিয়াই কহিলাম। বুদ্ধি বিবেক ধৈর্য গাম্ভীর্য সকলগুলিকে টানিয়া আনিয়া একত্র করিলাম, কিন্তু চক্ষের জল থামিল না, মনকে পাথরের মত করিলাম, চক্ষে জল কমিল না। বিবেক বলিতেছে ছি ছি! নূতন শাশুড়ী কথা কহিতেছে তাহারই সঙ্গে কথা, হয় ত ঐ পর্দার আড়ালে আরও কত স্ত্রীলোক থাকিতে পারে, দুদিন পরে যে তোমার হৃদয়ের অধিকারিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীস্বরূপ চিরসঙ্গিনী ধর্মসূত্রে বাঁধাবাঁধি হইয়া চিরজীবনের মত এক হইবে, সেও থাকিতে পারে

তাহার মনে কি হইবে? তোমার ভাবী স্ত্রীর ছোট ভগ্নী আজীজন বিবি ঐ পর্দার আড়ালে তাহার মাতার নিকটে বসিয়া থাকিতে পারে, সে কি ভাবিবে? চিরকাল এই কথা নিয়ে হাসিবে, কত তামাসা করিবে। বিয়ের কথার মধ্যে কান্না?—এ আবার কিরূপ কান্না?

উঠিব না, যাইব না, স্থির হইয়া বসিয়া বলিতে লাগিলাম, ফজলে হক মিঁয়া পালঙ্গের উপর আমার বাম দিকে দক্ষিণমুখী হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বসিয়া নির্বাকে রহিয়াছেন, মুখে কথাটি নাই, তিনিও আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। আমি বলিলাম। শুনুন! সকলেই শুনুন! হঠাৎ আমার চক্ষে জল আসিল কেন? অনেক চেষ্টা করিলাম যে কাঁদিব না। চেষ্টা বিফল হইল, পারিলাম না। আপনার কথা মন দিয়া শুনিয়া যাইতেছি। "আমার মা নাই"—কথা শুনিয়া পূর্ব কথাসকল মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মা আমাকে বড় ভালবাসিতেন, কোন দিন আমার গায়ে হাত দেন নাই, কড়া কথা, কি কোনরূপ কটু কথা বলিয়া গালাগালি দেন নাই। কোনদিন মা আমাদিগকে তুই ত দূরের কথা তুমি বলিয়া কথা কহেন নাই। আপনি, আসুন, বসুন, এই ভাবে কথা কহিয়াছেন, নাম ধরিয়া ডাকেন নাই। আমাকে বড় হুজরত বলিয়া ডাকিতেন। মায়ের এত স্নেহ এত ভালবাসা এতই আহ্লাদ ছিল, যে তাহার তুলনা নাই। সে মা আজ আমার কোথায়?—আমার মা বাঁচিয়া থাকিলে কি দীন দুঃখী গরীব কাঙ্গালের মত নিঃসহায় ভিখারীর মত আমার বিবাহ হইত। আমি যে মায়ের পেটে ছিলাম, সে মা জীবনে কখনও টাকা পয়সা হাত দিয়া স্পর্শ করেন নাই। টাকা পয়সার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার মা ছিলেন, তিনিই কর্তৃত্ব করিতেন একঘরের এক কন্যা টাকাকড়ি অলংকারের অভাব ছিল না, কিন্তু সংসারী লোকের ন্যায় মা আমার লোভী ছিলেন না। কত লোকের বিবাহ দিয়াছেন। সোনা রূপার অলংকার দিয়া বাড়ীর বাঁদী দাসী চাকর গোলামের বিবাহ দিয়াছেন। তাহারই পেটের সন্তান আমি আমার বিবাহ এই প্রকারে হইল? সকলি আমার কপাল। আমি একখানা সুতার কাপড় দিয়াও বিবাহ করিতে পারিলাম না। নিতান্তপক্ষে একটা নথও আমার স্ত্রীর নাকে পরাইতে পারিলাম না। মায়ের কথা মনে হইয়া এই সকল কথা আমার মনে উথলিয়া উঠিয়াছে। ফজলে হক মিঁয়া আমার কথাগুলি শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার গমন দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ বৃহৎ দর্পণ দিকে আমার নজর পড়িতেই, অপরূপ এক নারী মূর্তি ছায়া নজরে পড়িল। পিছনের সে খড়খড়কিযুক্ত কপাট সরিয়া

গিয়াছে। ঠিক চৌকাট নিকটে দ্বারে যুবতী যেন আমার পশ্চাতদিকে, দাঁড়াইয়া আছে। অতি শুভ্র একখানি রুমাল দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া রহিয়াছে। ক্ষণকাল পরে চক্ষুর আবরণ খুলিল, চক্ষে চক্ষে মিলিল—চার চক্ষু একত্র হইল, চিনিলাম। হৃদয়ে অঙ্কিত ছায়া, নিঃসন্দেহে যাহা ভাবিতাম তাহা ভাবিয়া লইলাম। দর্পণে মধ্যস্থিত যুবতীর চক্ষু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর লাল হইয়াছে। সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়া শ্যামজ্যোতি মাঝে মাঝে চমক মারিতেছে। সেই ঈষৎ লোহিত অধর ওষ্ঠে হাসি নাই, বিস্ফারিত জোড়া ভ্রূযুক্ত চক্ষে আনন্দের চিহ্ন নাই। আমার মুখের উপর চক্ষু পড়িয়াই আছে। আমি সময় সময় মুখ হইতে পদতল পর্যন্ত একবার চক্ষু ফিরাইয়া আবার সেই মুখখানির প্রতি চাহিতেছি। প্রতিমা ঘরের দেবীদিগের চক্ষু ভাব যেরূপ, স্থির ধীর, এও সেই প্রকার, আমি আমার হৃদয় প্রতিমা দেখিতেছি। আর কথা কহিতেছি।

আমি এমনি হতভাগা যে আমার স্ত্রীকে আমি একখানা সামান্য চিরুনী পর্যন্ত দিতে পারিলাম না। দর্পণে প্রতিফলিত ছায়ায় দেখিতেছি, যুবতী দক্ষিণ হস্ত উর্ধে উঠাইয়া ঈশ্বরকে দেখাইতেছে, সেই তর্জ্জনী অঙ্গুলী ললাটে স্পর্শ করিল। তখনি উভয় হস্ত উভয় পার্শ্বে হইতে উঠাইয়া অতি মোলায়েমের সঙ্গে সুচিক্কণ রেশমী বসনে আবৃত বক্ষঃস্থলে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখিয়া আমার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া স্থির ভাবে রহিল।

পর্দার মধ্যে হইতে বলিতেছেন, বাবা! ও সকল দুঃখ মন হইতে দূর কর, আমরা যে অলংকার কাপড় দিব, সেই ত তোমার দেওয়া হইল, তোমার পক্ষ হইতে আমরা দিব, না হয় তুমিই হাতে করিয়া দিও।

উত্তর—আপনারা যাহা ভাল বোঝেন করিবেন। আমি ওরূপ মিছে ভাণ চাতুরী শিখি নাই—জানিনা, করিব না।

আমার চিরকাল মনে থাকিবে আমার জীবনের শেষ শয্যা পর্যন্ত মনে আঁকা থাকিবে। লিখা থাকিবে, বিবাহ সময় আমার স্ত্রীকে একটি পয়সার জিনিস দিতে পারি নাই।

এদিকে আমি আমার দুই হস্ত উঠাইয়া আমার হৃদয়োপরি চাপিয়া ধরিলাম, একটু পরেই দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া দর্পণস্থ ছায়াকেই বক্ষের ধন অর্পণ করিলাম।

পর্দার মধ্য হইতে কথা আসিল। বাবা! খোদা তোমাকে আমার মাথার যত চুল তত বৎসর বাঁচাইয়া রাখুন! তোমার অবস্থা ভাল হউক, মনের মত

অলংকার দিয়ে তোমার স্ত্রীকে সাজাইও। এখন আর ওসকল কথা মনে করিও না। আল্লা আল্লা করে এই দুটি দিন কেটে গেলেই তুমি সুখী হবে। যাকে তোমার হাতে দিচ্ছি, সে সকল বিষয়েই শিক্ষা পেয়েছে। লিখাপড়া, সেলাইয়ের কাজ, চিকনের কাজ, পশম উলের কাজ, ঘর সংসারের কাজ, লোকজন চাকর দাসদাসীর প্রতি সদ্‌ব্যবহার করা সকলি জানে। তোমার মন যেমন বড়,—তাহার মন সেই প্রকারের।

একথায় আমি আর কি উত্তর করিব। দেখিতেছি দর্পণের ছায়া যেন সরিতেছে। বিবাহের চিহ্ন—হাতে সূত্র বাঁধা, হাতে একখানা পত্র খামে মোড়া-আঁটা। ছায়া যেন ক্রমেই অগ্রসর—একেবারে আমার পৃষ্ঠে তাহার বক্ষঃস্থল অতি মোলায়েম ভাবে স্পর্শ করিল, অতিত্রস্তে বাহুদ্বয় দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়া পত্র আমার সম্মুখে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। আর দক্ষিণ দিকে ঘাড় নওয়াইয়া আমার কানে কানে তিনটি কথা বলিয়াই প্রস্থান, চাহিয়া দেখি, দর্পণে চাহিয়া দেখি আমার পশ্চাদ্‌দিগের দ্বার বন্ধ।

আমি প্রকাশ্যে বলিলাম—আমি এখন বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করি—

উত্তর—আচ্ছা বাবা এসো!

ফজলে হক সাহেব পর্দার এক পাশ উঠাইয়া আমার সঙ্গী হইলেন। দুইজন একত্রে বাহিরে আসিলাম, এখন আমার প্রথম কার্যই সে খামে মোড়া আঁটা পত্র-খানি পাঠ করা। ফজলে হক মিঁয়া আমাকে বাহিরে রাখিয়াই তখনি বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

বাতির আলোতে পত্র পড়িতে হইবে, কানে কানে যে তিনটি কথা বলিল, বড়ই আশ্চর্য কথা। আহা! যে সময় তাহার সুকোমল হস্ত দ্বারা বাঁধিয়া এক হাত আমার কান্দের উপর, অন্য হাত দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আমার বক্ষোপরি উভয় হাতের সম্মিলন করিয়া মাথা-নওয়াইয়া রেশমী ফুলদার বসন সজ্জিত বক্ষ আমার পৃষ্ঠে চাপিয়া সুগন্ধিপূর্ণ অনুরাগে রঞ্জিত মুখখানি আমার কানের সহিত সংযোগ করিয়া যাহা বলিবার বলিল। মুহূর্ত সময়ের সুখবোধ আমার পক্ষে অতুলনীয় এবং অপ্রকাশ্য। মাথার কেশগুচ্ছ সেই বালিশের সুগন্ধে পরিপূর্ণ। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, সমুদায় শেষ, দ্বার বন্ধ। একি ঘটিল।

সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিলে—পত্র পড়িলাম। লিখা আছে—

স্বামীন্! আমাদের শাস্ত্রে প্রস্তাব আর স্বীকারেই বিবাহ সিদ্ধি হয়। দুইজন সাক্ষীর দরকার। আর একটা প্রধান মহরানা। দেনমোহর কি পরিমাণ কত টাকা? প্রস্তাব, স্বীকার উভয় পক্ষেরই হইয়াছে। বাকী দেনমোহরের কথাটা আমরা ইচ্ছা করিলে মহরানাও ঠিক করিতে পারি। তাহা করি নাই কেন জান? পিতামাতার ভ্রাতার অবাধ্যতা প্রকাশ পায়, শুক্রবারে অবশ্যই হইবে। বিবাহ কথায় সকলেই সুখী হয়, অজানা অচেনা দেশের স্বামী স্ত্রী হইলেই দুই পক্ষই খুশীতে থাকে। যতই দিন ঘনাইয়া আসে ততই আহ্লাদ বাড়ীতে থাকে—আমি যখনই দেখি, তোমার মুখে হাসিখুসীর চিহ্ন নাই। আমার যদিও পূর্বে এক ভাব ছিল, গতরাত্র হইতে আর একভাব হইয়াছে। কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি সে বড় ভয়ানক স্বপ্ন। তুমি বোধ হয় স্বপ্ন বিশ্বাস কর। আমিও বিশ্বাস করি, আমাদের শাস্ত্রে আছে সকল স্বপ্ন সত্য হয় না। স্বপ্ন মধ্যে অনেক কুস্বপ্নও আছে। আমাদের পয়গম্বরগণ যখন সত্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ফল ভোগ করিয়াছেন আমরাও বিশ্বাস করিব, স্বপ্ন সকল মিথ্যা বলি কোন সাহসে? আমার স্বপ্ন বড়ই বিপদের স্বপ্ন। আমার জন্যে ভাবিও না, তোমার জন্যই আমার বেশী ভাবনা। তোমার নিকট এখন আমার কোন কথা ত গোপন নাই, গোপনীয় ভাব নাই। গুপ্ত নামের কিছু নাই, সকলি প্রকাশ্য, আমার দেহ জীবন যৌবন সকলি তোমার। আজই শুনিয়াছ—মা বাপ দুইজনাই আমাকে তোমায় দিয়াছেন। কেবল লোকাচার আচার ব্যবহার কয়েকটি কাজ বাকী। ধরিতে গেলে সে কিছু নয়। আমি তোমার, আমার জন্য তুমি বিপদগ্রস্ত হও, একথা আমার প্রাণে সহিবে না। তোমার জন্য আমি মরি ক্ষতি নাই। আমার জন্য তুমি মর—কি সংসার পরিত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াও ইহা আমার ইচ্ছা নহে।

প্রিয়প্রাণ! প্রাণের ভালবাসার স্বামী, গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি তোমার আমার বিবাহ হইতেছে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইতেছে। ইহারই মধ্যে দক্ষিণ দিক হইতে এক প্রাচীন প্রবীণ ব্যাঘ্র আসিয়া একলম্ফে আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া লইয়া গেল, তুমি বাঘের পিছনে পিছনে দৌড়িয়াছ বাঘ যেন শেষে মানবরূপ ধারণ করিল। কদাকার ভয়ানক মোটা পেট আমাকে বগলে চাপিয়া লইয়া চলিল। নিশীথ রাত্রে তুমি যে গান করিয়া থাক, বাড়ীর লোক কেউ জানে না, কেহ শুনিতে পায় না। যে সময় তুমি গান কর সে সময় কাহার চক্ষের ঘুম ছাড়ে না। আমি প্রত্যহ শুনিয়া থাকি, আর শুনিবার বিশেষ

কারণ তোমার শয়ন কামরা আর আমার শয়ন কক্ষ অতি নিকট তাহা তুমি জান না।

"স্বপ্ন দেখা দিয়ে আজি প্রভাতে কান্দাইলে।"

গানের শেষ-চরণ যেন আমার কাণে যাইতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তুমি নিশ্চয় জানিও আমার মন ডাকিয়া বলিতেছে—আমাদের কপালে সুখ নাই। চারদিকেই বিপদের ছায়া দেখিতেছি। যদি আমার বিপদ হয় হউক আমার জন্মভূমি স্বদেশ, কোন ভয়ের কারণ নাই। এক দিন জন্মিয়াছি, মরিব নিশ্চয়, মরিব বলিয়াই জন্মিয়াছি। মরিব জেনেই একাজ করিয়াছি তাহাতে আর ভয়ের কারণ কি? তুমি সাবধানে থাকিও হঠাৎ পাগলের মত কোন কার্য করিও না, এদেশে তোমার অতুল যশ চারদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খুব সাবধান, খুব সাবধান, সত্যই যদি আমাকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহার জন্য উতলা হইও না। এই আমার অনুরোধ।

মঙ্গল মতে বিবাহ হইয়া শুক্রবার গত না হইলে আমি বিবাহে বসনভূষণ কিছুই ব্যবহার করিব না। তুমি বর সাজিয়া বাহিরে বার দিও।

তোমার চিরসঙ্গিনী

স্ত্রী

পুনঃ—আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখিয়া থাকি, তুমি আমাকে দেখ নাই। উপায় করিব বলিয়াছিলাম, ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার কিছুই করিতে হয় নাই, পিতার পত্রই তাহার মূল, মাতার আন্তরিক যত্নই আমার প্রতিজ্ঞা সফল—

তোমারই লতিফন

পত্র পাঠ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। খেয়াল না অন্য কিছু!

আজ বৃহস্পতিবার কাল শুক্রবার। স্ত্রীলোক কুটুম্ব আসিয়া বাড়ী ভরিয়া গেল। যিনি বিবাহের মন্ত্র পড়াইবেন তিনিও উপস্থিত হইলেন। আমার দাড়ী গোঁফ অল্প অল্প উঠিয়াছে—কিন্তু দাড়ী রাখি না। গোঁফ রাখি। যিনি বিবাহ পড়াইতে আসিয়াছেন, তিনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন, অন্য অন্য লোকের মুখে শুনিয়াছেন, তত্রাচ আমাকে জব্দ করিবার জন্য আমাকে একটা উল্লু বানাইতে আমার থাকিবার কামরায় আসিয়া বসিলেন। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনার নিবাস কোথায়? মুসলমানের মুখে এরূপ সম্বোধন বাক্য জিজ্ঞাসা,—মুসলমানের নিকট হইতে পারে না। গ্রাম্য হিংসুক মুসলমানের বিশ্বাস যে, 'মহাশয়' 'নিবাস' হিন্দুদিগের কথা। মুসলমানকে ওরূপ ভাবে কোন

পক্ককেশ পাকা দেঁড়ে মৌলবী মুন্সী বেশধারী মুসলমান-কখনি জিজ্ঞাসা করিবে না। আমি প্রশ্ন শুনিয়াই মুন্সীজির মনের ভাব বুঝিলাম, আমি উত্তর করিলাম "মহাশয়। আমার নিবাস নদীয়া"।

মুন্সী সাহেবের প্রশ্ন—নদীয়া কোথায় ?

উত্তর। বঙ্গদেশে।

মুন্সী। বঙ্গদেশ কোন দেশকে বলে ?

উত্তর। নবদ্বীপ—নদীয়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া-কুমারখালী, কয়া, কাসিমপুর, মক্তারপুর।

মুন্সী। মহাশয় এখানে থাকেন কোথা ? খাওয়া দাওয়া হয় কোথা ?

উত্তর। এখানে এই বিছানায় শুই, আর ঐ চৌকিখানার উপর আহার করি।

মুন্সী—তবে কি জাতি আপনি ?

উত্তর। নর জাতি।

মুন্সী। নর জাতি কি ? হিন্দু মুসলমান, এই ত দুই জাতি। নর জাতি আবার কোন জাতি ?

উত্তর। পুরুষজাতি।

মুন্সী। তাত দেখতেই পাচ্ছি, আপনি পুরুষ ? আপনার ধর্ম কি ?

উত্তর। মানব ধর্ম।

মুন্সী। মানব ধর্ম ত আছেই—

উত্তর। তবে আবার ধর্ম কি ? বুঝিলাম না—

মুন্সী। সে ধর্মর কথা বলি না। আপনি হিন্দু না মুসলমান ?

উত্তর। হাঁ, তাই খুলে বল্লেই হত—এতদুর ঘোরাফেরার কাজ কি ছিল !

মুন্সী। তাই জিজ্ঞাসা করি আপনি কি হিন্দু ?

উত্তর। হিন্দু অর্থে আপনি কি বোঝেন ? এক অর্থ হিন্দুস্থানে যাহারা বাস করে তাহারাই হিন্দু।

মুন্সী। আমি সে হিন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করছি না।

উত্তর। কোন্ হিন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করেন ?

মুন্সী। যে হিন্দুরা এই বাড়ীর পশ্চিম পাড়ায় বাস করে, গলায় পৈতা দেয়, কেহ মালা পরে, প্রতিমা গড়ায়, পূজা করে—সেই হিন্দুর কথা বলিতেছি।

উত্তর। তা বলুন যতবার ইচ্ছা হয় বলুন। আপনি বলবেন বলুন।

মুন্সী। আরে মহাশয়! আপনি কি পূজা করেন? গলায় পৈতা দেন? কি মালা গলায় দেন?

উত্তর। আপনার চক্ষে কি কোন বেরাম আছে?

মুন্সী। না মহাশয় না—আমার ভাল চোখ।

উত্তর। যা চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তার আবার জিজ্ঞাস্য কি? এই দেখুন গলায় মালা নাই, পৈতে নাই, আর দুদিন এখানে আছেন, পূজা আহ্নিক করিতেও দেখেন নাই।

মুন্সী। না, তা ত দেখি নাই। (সকলের হাস্য)।

ইতিমধ্যে ফজলে হক সাহেব আসিয়া সমুদায় শুনিয়া বলিলেন, মুন্সী সাহেব, আপনি কার সঙ্গে কি কথা বলতে এসেছেন? চলুন ঐ দালানে খাবার তৈয়ারী হয়েছে—চলুন। মুন্সী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ফজলে হক মিয়াঁর মনরঞ্জনের জন্য বলিলেন যে আমি সকলি শুনেছি, জেনেছি চিনেওছি, একটু নাড়াচাড়া করে দেখলেম বুদ্ধিসুদ্ধি বিদ্যা আছে কিনা? এত অল্প বয়সে এত জ্ঞান! "বাড়া কাবেল সাখ্‌স"।

শুক্রবার, বিয়ে বাড়ীতে কেবল লোকজনের আমদানী, আঙ্গিনায় বৃহৎ সামিয়ানা খাড়া হইল। সাধারণ লোকজন আসিয়া বসিতে লাগিল। গরীবপুর হইতে ফকীর মহাম্মদ তরফদার সাহেব দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। দুই বরের জন্য দুই স্থানে পাশাপাশি, জরির মসনদ বৈঠকখানা ঘরের ফরসের উপর বিছান হইল। আতরদান গোলাপ পাশ যথাযথস্থানে রক্ষিত হইল।

ইহার মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল, কেহ দৌড়িয়া নদীর ধারের পথের দিকে যাইতে লাগিল, কেহ বাড়ীর মধ্যে দৌড়িয়া গেল। কথা কি? বর আসিতেছে। মুহূর্ত মধ্যে কতকগুলি লোকসহ মীর হোসেন আলী ২য় বর পালকী চড়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ত ঘরের বর। তিনি হলেন বাহিরের বর। অভ্যর্থনা করিয়া নির্দিষ্ট মসনদে বসান হইল। বর দেখিতে লোকের এত ভীড় হইল যে বৈঠকখানা ঘরে আর লোক ধরে না। ক্ষণকাল মধ্যেই সে গোলযোগ মিটিয়া গেল। বরের প্রতি নজর করিয়া আর কেহ দাঁড়াইয়া দেখিল না, যেই দেখা অমনি প্রস্থান। কেহ কেহ মুখ বাঁকা কেহ মলিন কেহ বেজার করিয়া ঘর হইতে এক চোটে আঙ্গিনায় পার। চুপি চুপি কি বলাবলি করিয়া চলিয়া গেল। বরের সঙ্গে ভদ্রলোক বেশী নাই, কারণ একখানি মাত্র পাল্‌কী বরকে লইয়া আসিয়াছে। আর পাল্‌কী কি ঘোড়া কিছুই দেখিলাম না—তখন আর কোন ভদ্রলোক সঙ্গে

আইসে নাই নিশ্চয়। সরকার গোমস্তা কি অন্য কোন রকমের চাকর হইবে তাহারাই ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া বরের কানে কানে কি কহিতেছে। বরও কান-পাতিয়া শুনিতেছেন—কখন তাহাদের ২।১ জনার মাথা দুই হাতে কখনও এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া কি বলিয়া দিতেছেন। ফজলে হক মিয়াঁর আদেশে আমার পরিচ্ছদ আমি নিজে পরিয়া যে শয্যা খালি ছিল তাহার উপর উপবেশন করিলাম। আমি ত আজ তিন মাসের দেখা বঁর। মক্তারপুর অঞ্চলের প্রায় স্ত্রী-পুরুষে আমাকে দেখিয়াছে, তত্রাচ আমি আমার নির্দিষ্ট মসনদে বসিলে আবার লোকের ভীড় হইল। ঠেলাঠেলি করিয়া আসিয়া দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। ইহারা হাসে কেন? বিরক্তির ভাবই বা প্রকাশ করে কেন? আর কিছুই নহে। ২য় বর বয়সে প্রবীণ, দাড়ী-গোঁফ মাথার চুল সমুদায় সাদা, মাঝে মাঝে এক একটি চুল পূর্বে যে কাল ছিল তাহারই প্রমাণ করিতেছে। দাঁতগুলি যাহা ছিল তাহার মধ্যে অনেকেই নাই, কিন্তু সম্মুখের দুটি দাঁতের মধ্যে একটি একেবারেই নাই, ২য়টি তামার তারের বাঁদন ছাদনে অন্য দাঁতের সঙ্গে পেচাও বন্ধনে এক প্রকার খাঁড়া দেখায় বটে কিন্তু কথার আঘাতে বাতাসের ঘায় অস্থির। যেন পড়-পড় বোধ হয়, বুক হইতে পেট পর্যন্ত বেহদ্দ মোটা—গায়ের কাপড় পেটের উপর ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। আঁচকানের বোতাম কিছুতেই লাগে নাই। পাঁচ ছয় আঙ্গুল ফাঁক হইয়া রহিয়াছে, নূতন বর দেখিয়া সর্বসাধারণের সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা শুনিয়াছে, বরের বাটীতে আর একটি স্ত্রী ঘর আলো করিয়া আছেন। তাহার পর "খাদেমা" একজন আছেন। খাদেমা অর্থ "সেবিকা"। "খাদেমার" উপরেই বেশী টান। দুইয়ের উপরে এক করিয়া তিন করিতে আসিয়াছেন, বয়স ত "আল্লাহাফেজ।" এ বয়সে যুবতী মেয়ে বিবাহ করিবেন, পাত্রীকে বামে বসাইয়া ধান দূর্বায় বরিত হইবেন ইহাতেই লোকের মুখে আর হাসি ধরিতেছে না। বিবাহের পর আহার, সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বাটীর মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিসের গোলমাল বুঝিবার সাধ্য নাই। যে লোক বাটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিতেছে, তাহারই মুখ ম্লান, বিশেষ বিষাদিত ভাব, মুখ মলিন, কাহার কাহার চক্ষে জল। প্রবীণ প্রাচীন আত্মীয়স্বজন সকলের গুরুজন, সর্বশ্রেষ্ঠ বয়োবৃদ্ধ নাজির সাহেবের শ্বশুর ফকীর মামুদ তরফদার তিনিও বাটীর মধ্যে। কি কারণে এই শুভ সময় দুঃখের কারণ—অমঙ্গল লক্ষণ, কিসে কি কারণে এই গোলযোগ উপস্থিত? বাহির বাটীর কেহই জানিতে পারিতেছে না, ফজলে হক মিয়াঁ আমাদের একজোড়া বরের নিকট আসিয়া বলিলেন যে

এখনি বিবাহ হইবে। মুন্সী সাহেব আসিয়া বসুন, ফজলে হক মিয়াঁর দুই চক্ষে জলের চিহ্ন। বিশেষ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া চার চক্ষু একত্র হইতেই, চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। সহ্য করিয়া রুমালে মুখ ঢাকিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

উকীল—বিবাহের উকীলদ্বয় আসিল, সকলেই দুঃখিত, সকলের মনের ভাব অন্যপ্রকার, যেন কোন প্রকারে বিবাহটা হইয়া গেলেই তাঁহারা রক্ষা পান। এমন খুশীর কার্যে কেহই খুশী নহেন—উকীল সাক্ষী আসিলেন, মুন্সী সাহেব উপস্থিত হইলেন, উকীল নিজ পরিচয় দিয়া সাক্ষীর নাম করিতেছেন। এমন সময় দেখি আমার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যিনি ছোটবেলা হইতেই মাতামহীর নিকটে রহিয়াছেন, আমাদিগকে কোলে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, আমাদের বাড়ীর লাহিনী পাড়ার বাটীর, কাজকর্ম দেখাশুনা, পুরুষ পক্ষে তিনিই কর্তা, নাম আমিনদ্দীন সম্পর্কে আমার মামা—লোক একটি মাত্র সঙ্গে, একেবারে বিবাহ সভার মধ্যে উপস্থিত। আমি এখন বর। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি না, এবাড়ীর লোক কেহই তাঁহাকে চিনে না। তিনি কাহার আদর অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়া আমার বামপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। আমার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন, সকলেই নিষেধ করিতে লাগিলেন, এবং এই আগন্তুক কোথা হইতে আসিলেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহারা অবকাশ পাইলেন না। এদিকে বড় বরের বিবাহ মন্ত্র পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি সে সময় আমিনদ্দীন মামা সাহেবকে দেখিয়া অস্থিরচিত্তে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছি। তিনিও কাঁদিতেছেন, আমি আমার মামাকে দেখিয়া অন্যমনস্ক। আমার কানে পাত্রীর নাম যেন উকীল বলিল—"লতিফন্নেসা", কানে শুনিয়াও সেদিকে মনযোগ করিতে মনই হইল না। শুনিয়াও যেন শুনিলাম না। হোসেন আলী সহিত বিবাহ সময়ে লতিফনের নাম কেন হইল? আমার দেশের কথা, মাতামহীর কথা, পিতার কথা, মনে উঠিয়া আমাকে বুদ্ধিহারা জ্ঞানহারার ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। আরও আশ্চর্য হইয়াছি, বাটীতে আমি কোন পত্র লিখি নাই কাহাকেও সংবাদ দিই নাই। ইনি কি প্রকারে সন্ধান জানিয়া আমি যেখানে আছি, সেই স্থানে আসিলেন! আমার মনের বেদনা চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সময় উকীল সাক্ষী বিবাহ পড়াইতে আসিলেন। তাহাদের প্রস্তাব উক্তির পর আমি স্বীকার উক্তি অম্লানচিত্তে মুখে উচ্চারণ করিলাম, পাত্রীর নাম যে তাঁহারা উলট-পালট করিবেন, তাহা আমার মনে উদয় হয় নাই। শেষে পাত্রীর

নাম করিতেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, একে আমার মন অন্য কথার, অন্য ভাবনায় অস্থির, তাহার পর এই সাংঘাতিক নাম। আমার কলিজা ফাটিতেছে, মুখে কিছুই বলিতে পারিতেছি না, স্থির হইয়া বসিয়া আছি। আমার বিবাহ ত বহুদিন হইয়া গিয়াছে। মাত্র শাস্ত্র পালার মত কটা নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি অম্লানচিত্তে অম্লানমুখে স্বীকার উক্তি যাহা মুখে বলিতে হয় তাড়াতাড়ি এবং অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিয়াছি। নামের সময় শুনি আজীজননেসা—নাম শুনিয়াই আমি অজ্ঞান হইয়া বালিশে মাথা ঠেকাইয়া রহিলাম। আমার কোনরূপ জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না। কতক্ষণ ঐ অবস্থায় ছিলাম জানি না—একটু হুঁস হইলে চাহিয়া দেখি, আমার মামা আমার মাথার নিকট বসিয়া মাথায় হাত দিয়া আছেন। ফজলে হক মিয়াঁ গোলাপ পাশ হইতে আমার মাথায় অজস্ররূপে গোলাপ ঢালিতেছেন। কেহ বাতাস দিতেছে। চুপ্ চুপ্। আসল কথা প্রকাশ করিতে সকলের মুখবন্ধ করিতেছেন। স্বয়ং ফকীর মামুদ তরফদার—সঙ্গেই ফজলে হক মিয়াঁও আছেন। জাত গেল! জাত গেল! চুপ চুপ। সকলেই জিজ্ঞাসা করে মীর সাহেব ওরূপ হইলেন কেন? উত্তর তাঁহার মামা আসিয়াছেন, বাড়ীতে কেহ জানে না, গোপনে বিবাহ করিতেছেন—বাড়ীতে মাতামহী, পিতা তাঁহারা কাঁদিয়া অস্থির—এই সকল কথা শুনিয়া আর এই বিয়ে-বাড়ীর গোলযোগে মাথার গর্মি চড়িয়া এইরূপ হইয়াছে। বিছানায় শুইয়া রাথাই এখন কর্ত্তব্য, থাক্ দেনমোহরের কথা হইল না। কাগজে লিখাই হইল না। ঐরূপ সাদা স্ট্যাম্পই রহিয়া গেল। কেহ বলিলেন একটু সুস্থ হইলে পরে হইবে, তাড়াতাড়ি দরকার কি? আমি শুইলাম, বিছানায় যাইয়া চক্ষু বুজিতে কত চেষ্টা করিলাম, তাহা হইল না।

আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তবে আমার প্রাণ দেহ হইতে বাহির হয় নাই। আমার মামা নিকটে উপস্থিত। আসল কথা কিছুই মুখে আনিতে পারি না, তখন একটু স্থির হইয়া ভাবিলাম, কি করিতাম মামা না আসিলে আমি কি করিতাম? এরাই সকল—ইহাদের দেশ, ইহাদেরই লোকজন আত্মীয়স্বজন—আমি একা কি করিতাম?

আর মামা আসিলেন তাহাতেই বা কি হইল, তিনি এই সাংঘাতিক কেলেঙ্কারীর কথা শুনিলে কি ভাবিবেন?

কি করি? প্রাণ-প্রতিমা লতিফনের কথা হাতে হাতে ফলিয়া গেল, তাহার স্বপ্নও অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। হায়! হায়! এ দুঃখ এ কষ্টের কথা মুখে

আনিতে পারি না। এরূপ কেন ঘটিল—কেই বা ঘটাইল। লতিফনের চেহারা অন্তরে উদয় হইয়া চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। ওদিকে বাড়ীর মধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল, কেন কি হইয়াছে? কেহ বলিল না। এই বিবাহ দিনে, সুখের দিনে কেবলই ক্রন্দন, কারণ কি? ডাক্তার আনিতে তখনি দুই তিন দিকে লোক ছুটিল। বড় বর মসনদে বসিয়াই আছেন। তিনি খুশীতে ভরিয়া গিয়াছেন। দৈবাৎ আমার কানে আওয়াজ আসিল। গন্ধমে মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা যাইতেছেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেই মূর্চ্ছা ছুটিয়া যাইবে, ঠাণ্ডা ঔষধ পেটে পড়িলেই মূর্চ্ছা সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই।

আমি ভাবিলাম, কাহার পীড়া? কে বার বার মূর্চ্ছা যাইতেছে, কেহই আমার নিকটে আসে না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সুযোগ হয় না। সুবিধা পাইতেছি না, ডাক্তারবাবু আসিলেন, বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরে—ডাক্তারবাবু বাহির বাটীতে আসিয়া আমারই কামরায় বসিয়া প্রেসক্রীপসন লিখিয়া তাঁহার নিজের ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিয়া মামার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কাহার পীড়া—কি পীড়া, কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবুও আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়। আজ বিবাহের দিন। আমোদ আহ্লাদ মধ্যে দুঃখের কারণ, শক্ত পীড়া—মূর্চ্ছা রোগ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় মূর্চ্ছা, রোগী ত আর দেখতে পেলুম না। কানে শুনে যতদূর বোঝায় অনুমানে বুঝলেম। কিন্তু যে যে কারণে হিস্ট্রীয়া হয়, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে ত পাইলাম না, শুনিতেও পাইলাম না।

ফজলে হক মিঁয়া যতদূর জানেন বলিলেন, তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারা গেল না, হিস্ট্রীয়া রোগ বলেই বোধ হইল। বড়ই দুঃখের কথা, মেয়েটির আজকেই বিবাহ হয়েছে, বর এখনও বিবাহের বিছানায় মসনদে বসেই আছেন। এই অল্প সময় তিনিও বিশেষ চিন্তিত হয়েছেন। এখনও শুভদর্শন হয় নাই, ইহারই মধ্যে এই সাংঘাতিক পীড়া, সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছাও বলি (আমিনদ্দীন মামাকে সম্বোধন করিয়া) মহাশয় মাফ্ করবেন, একথাটা, আমরা মানুষ—তাহাতেই বলি। মানুষের জন্য মানুষেরই দুঃখ বোধ হয়। তাহাতেই দুঃখের কথা বলি, নিন্দা করিতেছি না। আপনাদের মধ্যে ন্যায় বিচারের ভাগ অতি কম, আপন স্বার্থ ভোগ সুখলাভ, সন্তোষ, নিজের পেট পুরিলেই হইল। অপরের সুখ-দুঃখ, সন্তোষ-অসন্তোষের দিকে লক্ষ্য খুব কম। ঐ বয়সে ওকে বিবাহ করিতে কে পরামর্শ দিয়াছিল মহাশয়? তারপরে আবার শুনলেম যে, একটি স্ত্রী, পুত্র আর

একটি রাখিত স্ত্রীলোক বাড়ীতে ঘর-দোর আলো করে বসেই আছেন। সে দুইটি স্ত্রীলোক ওঁকে নিয়ে সতীনে সতীনে দিনরাত ঝগড়া বিবাদ করে প্রাণ যায়, তারমধ্যে এ আবার কি? বড়ই দুঃখের কথা। চল্লেম মহাশয়। ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন।

আমি শুইয়া শুইয়াই সকল কথা শুনিলাম। কিসে কি হইয়াছে, তাহাও বুঝিলাম। আমার মামা আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। তিনি পূর্ব কথা কিছুই শুনেন নাই, জানেনও না। তাঁহার নিকট কেহ বলিবেও না।

আমার শরীরে অসুখ হইয়াছে, এই কথাই তিনি জানেন। অন্তরের কথা কিছুই জানেন না। আর বলিবও না যা হইবার হইয়া গেল। তাঁহার নিকট বলিলে মাতামহীর নিকট বলিবেন, পিতার নিকট অপর আত্মীয়স্বজনের নিকট বলিবেন, তাহা হইলে দেশময় এই কেলেঙ্কারী কথা দশজনের মুখে রটিয়া যাইবে, চুপ করিয়া থাকাই ভাল। নির্বাকে হৃদয়-যন্ত্রণা সহ্য করাই ভাল। আবার সেও আগে জানাইয়াছে, সাবধান করিয়াছে। "উতলা হইও না। আমার মা-বাপের মুখে অপরে যাহা দিতে ইচ্ছা করে দেউক, তুমি তাহাদের মুখে কালী লেপিয়া দিয়া তোমার পবিত্র বংশকে কলঙ্কিত করিও না। ঈশ্বর বিচার করিবেন।" সেকি জানিতে পারিয়াছিল?—আমি মনে মনে এইসকল ভাবিতেছি, আমিনদ্দীন মামা বলিলেন, "এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "পূর্ব হতে একটুকু ভাল বোধ হইতেছে। আপনি যখন বৈঠকখানা ঘরে উঠিলেন দেখিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। নানা প্রকারের ভাবনা-চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছিল, তাহার পর হঠাৎ আপনাকে দেখে আমার বুদ্ধি-জ্ঞান কিছুই ঠিক থাকিল না। যাহোক, আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। কি প্রকারে আমার সন্ধান জানিতে পারিলেন?"

"আমরা পরম্পর শুনিলাম! নাজির সাহেব আপনাকে বিবাহ দিবেন। অন্য কোন স্থানে নয়, তাঁহারই বড় কন্যার সঙ্গে বিবাহ। বিবাহ জন্য তাঁহারা মক্তারপুর নাজির সাহেবের বাটীতে গিয়াছেন। আপনার মাতামহী বিবাহের কথা শুনিয়া অস্থির—কান্দিয়া কান্দিয়া কত কথাই আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম কলিকাতা নাজির সাহেবের বাসা—সেখান হইতে মক্তারপুর অর্থাৎ যেখানে নাজির সাহেবের বাড়ী—যে-বাড়ীতে বিবাহ হইবে। আপনার পিতাও শুনিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, ছেলে বিবাহ করিবে, করিতে পারে তার ইচ্ছা—কিন্তু আমার অমতে বিবাহ! আমি সেখানে যাইব না। পুত্রবধুর মুখ

দেখিব না। আমার বাড়ীতেও আনিব না। পুত্র! আমার পুত্র আমারই আছে, যদি আমার ইচ্ছা হয় আমি আমার মনমত বিবাহ দিব। সেই বধূকেই ঘরে আনিব তাহাদের সঙ্গেই আমার কথা, কার্য, কুটুম্বিতা।

আপনার মাতামহী বলিয়াছেন, যেখানেই বিবাহ করুক আমি তাহাকে ঘরে আনিব। বাজার হইতে, অ-স্থান কু-স্থান হইতে, যেখান হইতে যে জাতির মেয়ে সে ভালবাসিয়া স্ত্রী বলিয়া আনিবে, আমি তাহাকে আদর-যত্ন করিব, ভালবাসিব। বাড়ীতে অতি স্নেহ সহকারে ভদ্র ব্যবহারে গ্রহণ করিয়া রাখিব, আমি তাহার ভালবাসাকে তাহারই জন্য ভালবাসিব, আর যদি সত্য সত্যই বিবাহ করিয়া থাকে বউ নিয়া শীঘ্র শীঘ্র লাহিনী পাড়ায় আমার নিকট আসিতে বলিবে।" আমি নীরব, কোন কথাই বলিলাম না। আমার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছে আমিই জানি।

বিবাহের পর মুখ-দর্শন, স্ত্রী-আচার একটা প্রথা আছে তাহা হয় নাই। বড় জামাই বড় কন্যার মুখ দেখাদেখি হইয়া গেলে পরে আমার পালা। বিবাহ সময় হইতেই কান্নাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ হইয়া শেষে মারাত্মক মূর্ছা ব্যাধির আবির্ভাব, বাড়ীসমেত লোক অস্থির! কথায় কথায় শুনিলাম এখন একটু সুস্থির হইয়াছেন, ডাক্তারবাবুও বলিলেন, এখন একটু ভাল আছেন শুনিলাম। একটু পরেই সন্ধ্যায় বাতি জ্বালা হইলেই যাদু খানসামা আসিয়া ধরিল, আপনাদিগকে বাটীর মধ্যে যাইতে হইবে। আমি বলিলাম, আমার শরীর অসুখ, আমি যাইব না। আমার কথায় আর কেহ প্রতিবাদ করিল না। ফজলে হক মিঁয়া সারাটি দিনের মধ্যে আমাকে দেখিতে আসেন নাই। তিনি কোথায় আছেন তাহাও শুনি নাই। সামান্য কিছু আহার করিয়া আমি শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্রি এগারটার সময় বাড়ীর মধ্যে আবার সোরগোল হাঙ্গামা, সেই দিনের বেলার মত কান্নাকাটি গোলযোগ।

শেষে শুনিলাম, বড় জামাইবাবু বাটীর মধ্যে যাইয়া বসিয়া আছেন পর্দার আড়ালে পাত্রী। পাত্রীর মাতামহী পাত্রীকে ধরিয়া সম্মুখে বসিয়া আছেন। যেই পর্দা উঠাইয়া মুখদর্শন করাইবেন—পাত্রীর মুখের কাপড় সরাইতেই দেখিলেন, পাত্রীর দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়াছে, আর সকলে সোরগোল করিয়া উঠিয়াছে। জামাইবাবু ঐ অবস্থা দেখিয়াই বাহিরে তাঁহার নির্ধারিত ঘরে আসিয়াছেন। আসিয়া সকলের কান্নাকাটি। অনেক কষ্টে দাঁতি-লাগা ছাড়াইলে নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু আসিয়া শুনিয়া ঔষধ দিলেন। সে রাত্রি আর মুখ দর্শন হইল না।

তাহার পর দুই দিন জামাইবাবু বাহির ঘরেই থাকিলেন। শেষে বলিলেন, উপরিভাব হইয়াছে, হয় জেন, নয় ভূতের আসর হইয়াছে। আমার বাড়ীতে দুই দিনের জন্য লইয়া যাই। কবিরাজ দ্বারা, ভূতুড়ে রোজার দ্বারা ইহার দাওয়াই জড়িবুটী মন্ত্রতন্ত্র তাবিজ না করিয়া দিলে আরাম হইবে না। বিবাহ দিয়াছেন জামাইও ছাড়ে না, সকলে ধরিয়া বাঁধিয়া জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে দিলেন। ফজলে হক মিঁয়া স্বয়ং ভগ্নীর সঙ্গে চলিলেন। পাত্রীর মাতামহীও পাত্রীর সঙ্গে পানিসারা নাত্‌জামাই বাটী চলিলেন।

আমার পোড়া অদৃষ্টে এ পর্যন্ত মুখদর্শন ঘটে নাই। তাঁহাদের ইচ্ছা খুব ছিল, আমারই ইচ্ছা হয় নাই। বাড়ীসমেত লোক আমার জন্য দুঃখিত। শাশুড়ী ঠাকুরাণী কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া নীরবে নির্জনে চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর এখন তাঁহার মুখে কোন কথা নাই। ঐ বাড়ীর কার্যকারক বুধই বিশ্বাস আমার মনকষ্ট হইবে, মনিবের কন্যার প্রাণে আঘাত লাগিবে, প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন ভাবিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছিল। আমিনদ্দীন মামু সাহেব নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন, এই অবসরে বুধই বিশ্বাসকে ডাকিতেই বিশ্বাস সেলাম বাজাইয়া বসিল। বসিয়াই বলিল, হুজুর, আপনার চক্ষের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইবার শক্তি আমাদের নাই। এই বাড়ীর লোক পাড়া-প্রতিবেশী কে না আপনার জন্য দুঃখিত হইয়াছে, চোখের জল না ফেলিয়াছে? এই পাড়ার হিন্দু স্ত্রীলোকেরা যাচ্ছেতাই বলিয়া হোসেন আলী মিঁয়াকে গালাগালি দিয়াছে। আর যাহারা এই উলট-পালট করার নায়ক-নায়িকা তাহাদের চৌদ্দপুরুষের খবর নিয়া বাপান্ত করিতেছে। আমরাও বলিয়াছি, তাহারাও বলিয়াছে, এখনও বলিতেছে। আসল কথা কি? আপনি ত শুনিতে পান নাই। তখনি চুপ চুপ, পাছে কোন রকম একটা গোলযোগ হয়। সেইজন্য চুপ চুপ, কথা যেন অন্য মানুষের কানে না যায়। মক্তারপুরের পার্শ্ববর্তীর লোক আপনাকে চিনিয়াছে। কম হইলেও দশ বার খানা গ্রামের লোক শখ করিয়া এই বাড়ী আসিয়া আপনাকে দেখিয়া গিয়াছে। আমার আত্মীয়স্বজন মুখে অনেক গ্রামের লোকের মনগত ভাবের কথা শুনিয়াছি, একটি লোকও আপনার প্রতি নারাজ নহে। সকলেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর যেমন জোড়া মিলাইয়া দিয়াছেন, কায়েম রাখুন দোয়া করি। আমরা মুখে চুপ চুপ করিলে কি হইবে?

আমি বলিলাম—আসল কথাটা কি হইল, কিসে একথা উঠিল, কাহার কথায় বিবাহের আধ ঘণ্টা পূর্বে এ উলট-পালটের মন্ত্রণা হইল।

"তাই বলিতেছি! হোসেন আলী মিঁয়ার সহিত এক কন্যার বিবাহ সাব্যস্ত হইলে, সকলেই বলিলেন, মীর সাহেব সহিত লতিফনের বিবাহ একপ্রকার হইয়া গিয়াছে বলিতে হয়, কারণ তাহারা দুইজনই পূর্ণ বয়সের দুইজনই রাজী। দুইজনার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে আমি স্বামী, আমি স্ত্রী! আর বিশেষ কথা এই যে, কলিকাতা হইতে মীর সাহেবকে আনাই হইয়াছে, বড় মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিব বলিয়া। নাজির সাহেবও তাহাই পছন্দ করিয়াছেন। ফজলে হক মিয়াঁর নিতান্ত ইচ্ছা, এখানে আসিয়া আজ তিন মাস রহিয়াছেন, লতিফন বিবির মনে বিশ্বাস মীর সাহেব তাঁহার স্বামী, সেও মীর সাহেবের স্ত্রী। মীর সাহেবের মনেও একেবারে বাঁধাবাঁধি কথা। এই তিন মাসের মধ্যে তাঁহাদের উভয়ের মনের কথা যে ভাঙ্গাভাঙ্গি না হইয়াছে তাহা নহে। মুখে না হইতে পারে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস পত্রদ্বারা নিশ্চয় তাঁহারা আপনার মনের কথা দুইজনে লিখালিখি করিয়া জানিয়াছেন। আমি সত্য কথা বলিব প্রণয় ভালবাসা, যাহা মানুষের মধ্যে হইতে পারে তাহা হইয়াছে, আর আমি ইহাতে বলিতে পারি, এখানে আমরাই সকলে আছি। তাদের যে পরস্পর দেখাশুনা হইয়াছে আমি মনে করি না। আপনারা যাই বলুন, আমার পিতার হুকুম যাহা তাহাই আমি করিব, এই কথা বলিয়া ফজলে হক মিঁয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পরদিন কর্ত্রী আপনাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া পাঠান। তাহার উদ্দেশ্য এই যে আপনাকে ভাল করিয়া তিনিই দেখেন। আর নাজির সাহেবের লিখিত পত্র শুনাইয়া আপনার মনকে সুস্থির রাখেন, বাড়ীর মধ্যে হোসেন আলী সম্বন্ধে যে যে কথায় আলোচনা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া আপনি মনে মনে দুঃখিত হন, সেইটি প্রকারান্তরে না হতে দেওয়াই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি আপনাকে দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে তাহা বলিবার নহে। লতিফন বিবি ভারি বুদ্ধিমতী। তিনিও হোসেন আলীর সম্বন্ধে কথার একটু আভাস পাইয়া ভাত পানি খাওয়া বন্ধ করেন। কর্ত্রী তাঁহাকে ডাকিয়া আপন কাছে বসাইয়া আপনার সঙ্গে কথা বলেন, নাজির সাহেবের পত্র তাঁহারই দ্বারা পড়াইয়া আপনাকে শুনান। তিনি পত্র পড়িয়া আপনাকে শুনাইতে নারাজ হন। শেষে মায়ের অনুরোধে বড় ভাই ফজলে হক মিঁয়ার অনুরোধে আপনাকে পত্র পড়িয়া শুনাইলেন, আর কোন সন্দেহ রহিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হোসেন আলী মিঁয়া সম্বন্ধে কথাটি কি? তাহা ত কেহই বলছে না। "কথা কি? হোসেন আলী মিঁয়া বয়সে আপনার অপেক্ষা

অনেক বড়। তিনি আপনার কথা আগেই শুনিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষের ঘটক আসিয়া আপনাকে দেখিয়াও যায়। হোসেন আলী মিঁয়া আর গোপনে সন্ধান লইয়াছিলেন। বড় মেয়েটিই বুদ্ধিমতী, ঘরকন্নার কাজেও খুব পাকা, দেখতেও ভাল। তিনি ঘটকের দ্বারা বলে পাঠান—আমি যখন আপনাদের অন্য জামাই অপেক্ষা বয়সে বড়, দেখতেও প্রবীণ, তখন আমার সঙ্গে বড়টির বিবাহ দিতে হইবে, আর তাহা না হইলে—আপনারই দেখিবেন বর কন্যা মানাইবে না। এই কথাতেই এত গোল।

"সে কথা টিকিল না। ফজলে হক মিঁয়ার কথায়, কর্ত্রীর বিবেচনায় সে কথা টিকিল না—তাঁহারা বলিলেন দুই মেয়ে প্রায় সমান। তিন বছরের ছোট-বড়তে কি আসে যায়? তাহার পর মীর সাহেব সহিত যদি লতিফনের বিবাহ অগ্রেই হইয়া যাইত তাহা হইলে হোসেন আলীর কথা টিকিত কি প্রকারে? তিনি একথা মুখেও আনিতে পারিতেন না। যদিও শাস্ত্রসঙ্গত মত বিবাহ এখনও হয় নাই তিনি বলিতে পারেন। আমরা যাই ভাবি, যাই মনে করি, কিন্তু তাদের দুজনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ভাবিতেছি।

"এই কথা বলিয়াই সেদিনের গোল মিটিয়া গেল,—তাহার পর হোসেন আলী অন্য চাল চালিয়া কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া গরীবপুরের কয়েকটি ভদ্রলোক ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিশেষ ফকীর মামুদ তরফদার প্রভৃতিকে বাধ্য করিলেন। বিবাহের দিন সকলেই উপস্থিত। হোসেন আলী মিঁয়া বর সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিলে গরীবপুরের দল—বাটীর মধ্যে কর্ত্রীর নিকট কথা উপস্থিত করিলেন। কর্ত্রীর মত তখনও পূর্ব মতেই আছে। পিতার কথায় কিছুতেই মত পরিবর্তন করিতে চাহিলেন না। তাহার পর ফকীর মামুদ তরফদার বলিলেন মনুষ্যে কি বলিবে? ছোট ছোট, বড় বড়। তুমি ত আর হোসেন আলীকে দেখ নাই? তিনি মীর সাহেবের চাইতে অনেক বড়। তাহার বিবাহ কিছুতেই আত্মীজনের সহিত হইতে পারে না—অসম্ভব! দেশময় একটা কলঙ্কের কথা রটিয়া যাইবে! বড় কন্যার সহিত বড় বরের বিবাহ না হইয়া ছোট বরের সহিত কেন হইল! এ সকল কার্য আত্মীয়স্বজনের মতানুসারেই করিতে হয়। কর্ত্রীর মামা, কর্ত্রীর ভগ্নীপতি আর আর আত্মীয়স্বজন সকলই একমত হইয়া বলিলেন, দুই বর ত বসিয়াই আছেন, যে দেখিবে সেই বলিবে বড় মেয়ের সঙ্গে বড় বরের বিবাহ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বাড়ীর মধ্যে তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইল। ফজলে হক মিঁয়া নারাজ, তিনি একা কি করিবেন? ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা সকলেই একবাক্যে

বলিলেন—দেও, তোমরা বিবাহ দেও। আমরা এমন অন্যায় অবিচার অসঙ্গত দৃষ্টিকটু অমানান,—পক্ষপাতময়, বিবাহ মধ্যে কেহই থাকিব না। মেয়ে দুটিই তোমার পেটের, স্বপত্নী কন্যা নহে, ইহাতে এরূপ অবিচার করিলে খোদাতালার নিকটেও দায়ী হইতে হইবে—মা বিবির মন একটু নরম হইল। হোসেন আলী জাত্যংশে ইহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তাঁহার সহিত কন্যা বিবাহ দেওয়া নিতান্ত গৌরবের কথা। তারও নিতান্ত ইচ্ছা—বড় বিবিকে বিবাহ না করিলে সে এখনই উঠিয়া যাইবে। তাহার পক্ষের লোকজনে একথাও প্রকাশ করিল, মা বিবি কি করেন, পিতার কথায় বাধ্য হইয়া শেষে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে রাজী হইলেন। ফজলে হক মিঁয়া দেখিলেন, সকল আত্মীয়স্বজনকে নারাজ করিয়া একাই এমন একটি গুরুতর ভার মাথায় নিয়া শেষে কিসে কি হইবে ভাবিয়া নীরবে রহিলেন, বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ ত নয় ধরিয়া বাঁধিয়া মুখে মুখে স্বামী গছান হইল। সে সকল কথা আর শুনিয়া এখন কি হইবে? বড় বিবি "এজেন"—দেন নাই। সম্মতি প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার সম্পূর্ণ নারাজীতে বিবাহ হইয়াছে। যেই এই সকল কথা তাঁহার কানে উঠিয়াছে ঐ যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাহার পর তিনি আর শয্যা হইতে উঠেন নাই। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে সকলি দেখিয়াছেন। ডাক্তার আনা দৌড়াদৌড়ী কান্নাকাটি ইত্যাদি—

"যাহা অদৃষ্টে ছিল হইয়া গেল, তাহা বলিয়া আর আক্ষেপ করিবেন না। চঞ্চল চিত্ত হইবেন না। স্থির ধীর ভাবে অদৃষ্টের লিখা প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে যাহা কর্তব্য তাহাই করুন। আমি বুঝিতেছি এ বেদনা, এমন বেদনা, হঠাৎ মন হইতে সরিবে না। আমার বাড়ীর লোকজন, পাড়া প্রতিবাসী গ্রামের লোক সকলই এই বিবাহে দুঃখিত হইয়াছে। ঐ পাড়ার হিন্দু স্ত্রীলোকেরা দুস ছি ছি, আর গালাগালি দিয়া বলিতেছে, এই যে বাঁধাবাধি কাজ ভাঙ্গিয়া দিয়া উলট পালট করা হইল, ইহাতে কাহারই ভাল হইবে না। কন্যার মায়ের কান্নাকাটিই সার হইবে, মনের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে, প্রাণ বাহির হইবে না। হোসেন আলী সুখী হইতে পারিবে না। আজীজন বিবির কপালে কি আছে ঈশ্বর জানেন, বড় মেয়েটির যে কি হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধিতেই আসে না। তবে ভদ্রঘরের অতি সৎ মেয়ে, কোনরূপ কলঙ্কের কার্য করিবে না। যাতে মা বাপের মুখে চুনকালী পড়ে সে কার্যের দিকে কখনই যাইবে না। এ জগৎ ছাড়িতে তাহাকে কে কয়দিন আটকাইতে পারে?

"আমি ত প্রায়ই বাটীর মধ্যে কার্যগতিকে যাইতেছি। অন্য অন্ত বিবি সাহেবেরা বলিতেছেন, কয়দিন? স্বামীর সঙ্গে ভালবাসা হইলেই এসকল কথা অন্তর হইতে সরিতে থাকিবে। বয়স নিতান্তই কাঁচা। মনে একটা শব লাগিয়াছে, অনেকেরই ওরূপ হয় কিছুদিন পরেই সরিয়া যায়। এই ত আমার বড় মেয়ে বদরণের বিবাহও এইরূপ হইয়াছিল। এ ত দুই তিন মাসের কথাবার্তা। ছোটবেলা হতে বদরুণের বিবাহ আমার বড় বোনের ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হয়ে, একেবারে পাকাপোক্ত হয়েছিল। তাহারা সম্পর্কে ভাই ভগ্নী কিন্তু মনে মনে জানিত যে আমাদের দুইজনে বিবাহ হইবে সেই সম্বন্ধে উভয়ের ভালবাসা না হইয়াছিল তাহা নহে। শেষে তাহারা ভাই বোন বল আপনা আপনি ছাড়িয়া দিয়াছিল। একত্র বসে তাহারা কত কথাই বলাবলি করিত! হাসি তামাসা করিত। দুইজনারই বিবাহের বয়স হয়েছিল শেষে কোন কারণে বিবাহ হইল না। অন্য জায়গায় বিবাহ কথা স্থির হইলে বদরণ স্পষ্ট বলে উঠলো আমি আর ওপথেই যাইব না। চিরকাল আইবড় হয়ে চিরকুমারী থাকিব। লতিফনের ততদূর হয় নাই। সে-মুখে একটি কথাও বলে নাই। আমার মেয়ে সোরগোল করে চেঁচিয়ে বাড়ী তোলপাড় করে তুলেছিল শেষে বাপ ভাই পাড়া প্রতিবাসী, আর আর আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা বুঝাইয়া কহিতে কহিতে দুইদিন পরে হাঁ হুঁ কিছুই করিল না—নারাজীর ভাবও প্রকাশ করিল না। বিবাহ হইয়া গেল। সেই বদরণের পেটের এই ছেলে দেখতেই পাচ্ছ। তবে হাফেজ আমার ভগ্নীর ছেলে সেই যে বাড়ী হইতে গিয়াছে আর আসে নাই। আজ পর্যন্ত বিবাহ করে নাই। বোধ হয় বিবাহ করিবেই না। তা যাহা হউক পুরুষছেলে দশদিন পরে দুটি বিয়ে করতে পারে। মেয়েদের কাঁচা মন, প্রথমে মনে বড়ই লাগে শেষে সয়ে যায়। ওর জন্য চিন্তা কি? এই দেখ। তোমরা দেখ,—পানিসারা হইতে ফিরিয়া আসিলে দেখ,—লতিফনের আর সে ভাব নাই। অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।"

কথা হইতেছে ইহার মধ্যে যাদু আসিয়া বলিল যে আপনার শরীর ভাল থাকে তবে সন্ধ্যার পরেই বাটীর মধ্যে যাইতে হইবে।

আমি বলিলাম যে আমি আজ রাত্রে কিছুতেই যাইতে পারিব না। আমার শরীর আজও ভাল হয় নাই। তারপর আমার মামা আজ কয়েকদিন পর্যন্ত আসিয়াছেন তাঁহার সহিত আমার কোন কথাই হয় নাই। আমি আজ যাইতে পারিব না। বুধই বিশ্বাসও বলিল তোমরা এত ব্যস্ত হও কেন? তাড়াতাড়ির

দরকার কি? আজ না হয় কাল দেখিবেন। দেখাশুনা হয় নাই স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হয় নাই। তাতে ক্ষতি কি? আজ না হয় কাল হইবে। তোমরা ওঁর প্রতি কোন কার্য আর জবরদস্তি করিও না। দিন কত সাম্‌লে যাও। অত বাড়াবাড়ি করিও না। শেষে হিতে বিপরীত হবে। চল—মা·বিবির নিকটে আমিই যাইতেছি। যাহা করিয়াছ সেই ধাক্কা আগে সামলাও। যাঁহারা ঘটাইলেন, তাঁহারা ত পেট পুরে খেয়ে, কিছু পকেটে পুরেই ত সরে পড়েছেন, এখন ভোগ আমাদের। তারপর আর কার কি হবে ঈশ্বর জানেন। হুজুর! আমি এখন বিদায় হই। আপনি বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমানের মত কার্য করুন। বুধই বিশ্বাস বিদায় হইল।

রাত্রে আমিনদ্দীন মামার সহিত অনেক কথাবার্তা হইল। শেষে সাব্যস্ত হইল বিবাহের কথা শুনিলে পিতাই বা কি বলেন মাতামহীই বা কিরূপ বিবেচনা করেন, সমুদায় খোলসা করিয়া লিখিবেন। তাহার পর যেরূপ হয় করিব। আরও কয়েক দিন থাকুন, আমি একা থাকি বড়ই কষ্ট হয়, এদেশের লোকগুলা সেই এক রকমের। আমি এখানে একটি লোকের মনও সাদা দেখিলাম না। কাহার মুখে সরল সোজা কথা শুনিলাম না। পেঁচাও বুদ্ধি পেঁচাও কথা। মনের মনে জিলেপীর পেঁচ ছাড়া মানুষ দেখলাম না। মেয়ে মদ্দে অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত কথারই চলন বেশী। পুরুষেরাই অতিরিক্ত বোল চালে খুব বাহাদুর। সত্যের গৌরব এদেশে থেকে যেন উঠে গিয়েছে। গাল গল্পের আমদানি বেশী। স্বার্থ সাধনই এক প্রকার কর্তব্য কার্য মধ্যে পরিগণিত। আর যশোহরের এই অঞ্চলে খান্‌দানী ঘরনা মোসলমানের বসবাস নাই। মৃজানগর, তালা, তেঁতুলিয়া, এখান হইতে বহুদূর, এ অঞ্চলে মোসলমান জমিদার নাই। ২।৩ ঘর তালুকদার আছে মাত্র। আর সকলেই গাঁতীদার। প্রধান প্রধান জোতদারকে গাঁতীদার বলে। এ দেশের আবাদ, খেজুরের চারা পোতা সেই ক্ষেত্রে ধানের আবাদ। মাঝে মাঝে কোন ক্ষেতে অরহর, এ দেশে আইরি বলে। মোসলমান ভদ্র সমাজের মত উঠাবসা, আদব কায়দা, পরণ পরিচ্ছদ, রন্ধন আহার, ব্যবহার কিছুই নাই। উচ্চদরের কৃষকশ্রেণীর আদর্শই ইহাদের সমুদায় কার্য। এঁরা কলিকাতায় থাকেন, নাজির সাহেব মুর্শিদাবাদ জিলার লোক তাহাতেই কিঞ্চিৎ ভদ্রতা আছে মাত্র।

কথায় কথায় রাত্র হইয়া গেল, বিছানায় শয়ন করিলাম। রাত্র প্রভাতেই শুনি যে অদ্য সন্ধ্যা পর্যন্ত বড় মিঁয়া, ভগ্নীকে লইয়া বাটী আসিবেন। "পানিসারায়

গিয়া বড় বিবির পীড়া আরও বেশী হইয়াছে। বাড়ীতে শুধু মূর্ছারোগ ছিল পানিসারায় গিয়েই ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। তাহার পর গতকল্য হইতে হঠাৎ পেট বেদনা। যাহা হউক আপনাদের শুভ দর্শনটা তাহাদের আসিবার অগ্রে হওয়া ভাল।" তখন আর কোন কথা কহিয়া এড়াইতে পারিলাম না। হাত মুখ ধুইয়া বসিলাম। অন্য অন্য কার্য্যে চিঠিপত্র লিখিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল তখনি আমার ডাক পড়িল। আমি বাড়ীর মধ্যে চলিলাম। আমার মুখের বিনম্রভাব, লাবণ্যহীনতা, উদাস নয়ন, উদাস মন, শুষ্ক হৃদয় নিরাশনীরে বিধৌত কলেবর কান্তি সর্বোপরি অতি দুর্বল, ভাব দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা কানাকানি আরম্ভ করিল। কেহ দীর্ঘনিশ্বাস, কেহ হা-হুতাশ খাইয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল আমি যাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। শ্যালক সম্পর্কে দুই তিন জন আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন। ফজলে হক মিঁয়ার স্ত্রী আরও তিনটি স্ত্রীলোক লাল শালুর সাদা পায়জামার মুখে ঝুটা পাত্‌লা গোটা লাগান পায়জামা ঐ লাল সালুর পেশ্‌ওয়াজে ও চাদরে জড়ান একটি মূর্তিকে একপা দুপা হাঁটাইয়া আমার শয্যা পার্শ্বে বসাইলেন। সেই ঘর—আমি যে ঘরে প্রথমদিন বসিয়াছিলাম। আজিও দেখিলাম সে দ্বার বন্ধ দালানের মধ্যে মেজের উপর ফরস বিছানা, সেদিন যেদিকে মুখ করিয়া যে ভাবে বসিয়াছিলাম, আজ সে ভাব নয়, সেই সীঙ্গারদানীর আরশী ব্যতীত বৃহৎ দর্পণখানা সেখানে নাই। কেহ কোনই কথা কহে না আমিও কোন কথা কহিলাম না। মাথাটি হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি বাড়ী সমেত লোক যেন আমার নিকট লজ্জিত। বিশেষ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মুখে আজ একটি কথাও নাই। অনেকক্ষণের পর ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রী বলিলেন, শুধু শুধু বসিয়া লাভ কি? যাহা দেখাইতে আসিলাম তাহাই দেখাদেখি করি। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"উঠুন! আপনি খাঁড়া হউন।"

আমি বলিলাম দুঃখিত স্বরে এবং উদাসভাবে বলিলাম—"খাঁড়া হইতে আমার ইচ্ছা হয় না। বসে বসে যাহা হয় করুন।"

"না না তা কি হয়? যা চিরকাল চলে আস্‌ছে আপনি তাহার অন্যথা করিবেন কেন? আপনি আপন বলে খাঁড়া হতে না পারেন, আমি হাত ধরে উঠিয়ে খাঁড়া করে নিচ্ছি। আপনি যেন একেবারে গা ঢালিয়া দিয়া বসিয়াছেন, আর একটি কথা আগে বলি, সে দিন যে আপনি বাটীর মধ্যে আসিয়াছিলেন, আমি আপনার সম্মুখ হইয়া দুই একবার কার্য গতিকে চলিয়া গিয়াছি, আপনি আমাকে চিনিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে হাসি তামাসা

করার অধিকার আমার আছে। আমার কথায় চটিবেন না, মনেও কিছু করিবেন না। আচ্ছা বলুন ত আমার বাপ-মার বাড়ী কোথা? আমি কোন দেশের লোক!" আমি তখন তাঁহার মুখের দিক তাকাইয়া অতি বিনম্রভাবে বলিলাম "আপনাকে জানি এখন চিনিতেও পারিয়াছি। আপনার বাড়ী আমাদের দেশে। আপনার বাড়ী পদ্মার উত্তর পারে পাবনায়, আমার বাড়ী পদ্মার দক্ষিণ পারে লাহিনী পাড়ায়।"—"হাঁ তবে সকলি জানেন। যখন জানেন তখন খাঁড়া হন"। আমার হাত ধরিয়া উঠাইতেই খাঁড়া হইলাম। পেশওয়াজ মোড়া একটি খর্বাকার বোধ হয় মনুষ্য মূর্তির হাত ধরিয়া পাশাপাশি খাঁড়া করিলেন। ক্ষণকাল পরেই সঙ্গীয় লোক তিন জনার মধ্যে একজন প্রবীণা গোছের স্ত্রীলোক একখানি বৃহৎ দর্পণ ধরিয়া আপন মনমত খাঁড়া হইতেই ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রী বলিলেন, ঐ আয়নার মধ্যে নজর করুন। আমি নজর করিতেই আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আরসীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। চক্ষু নিচে করিয়া মাথা হেঁট করিলাম। আমার কলিজার কাঁপনী তখনও যায় নাই। চক্ষে পড়িল, চক্ষে ছায়া পড়িল গৌরবর্ণ কিন্তু মুখের গঠন ওষ্ঠ অধর চিবুক নিতান্তই কদাকার। নাসিকা একপ্রকার নাই বলিলেও হয়। ভ্রূর রেখা আছে মাত্র এক নজরে দেখিয়া আর দেখিতে ইচ্ছা হইল না। চক্ষু মুদ্রিত সুতরাং চক্ষের ভাব দেখিতে আমার ভাগ্য হইল না। কেবল ঈশ্বরের নিকট হৃদয় হইতে কান্দিয়া কহিলাম, দয়াময়! আমার কপালে ইহাই ছিল! মনে মনে বলিয়া বসিয়া পড়িলাম। ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রী বলিলেন সে কি বসিলেন কেন? এখনও অনেক বাকী আছে।

আমি দুই হাত জোড় করিয়া কহিলাম, এখন আমায় মাপ করুন। আমি বাহিরে যাই, আবশ্যক আছে, আবার যখন ডাকিবেন আসিব, বাকী যাহা থাকে বাজাইয়া লইবেন; এই কথা বলিয়া উঠিতেই তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আমি যখন ডাকিব তখনি আসিতে হইবে"।

অবশ্য আসিব, বলিয়া উঠিলাম। চাপকানের পকেটের রুমালখানা পকেটে রাখিতে পারিলাম না। হাতে করিয়া চক্ষুর উপরে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। আমিনদ্দীন মামু সাহেব, আমার মুখের চক্ষের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, আমি স্ত্রীর মুখ দেখিয়া সন্তুষ্ট হই নাই। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে প্রবেশ করিতেই চাহিয়া দেখি মুন্সী ফজলে হক সাহেব যে ঘোড়ায় পানিসারা গিয়াছিলেন, সেই ঘোড়ার উপরে হোসেন আলী অন্য আর একটি ঘোড়ার উপর ফজলে হক সাহেব আসিতেছেন। তাঁহারা ঘোড়া হইতে নামিলেই দেখি পালকি এবং একখানা ডুলি

আর কয়েকজন চাকর পালকী ডুলির পিছনে পিছনে আসিতেছে। পালকী দেউড়ী দিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। সকলেরই মুখ মলিন গম্ভীর কথাটি মুখে নাই। ফজলে হক সাহেব আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভাই ভাল আছেন?

আমিও সবিনয়ে বলিলাম ঈশ্বর যে ভাবে রাখিয়াছেন তেমনই আছি। ফজলে হক সাহেব চলিয়া গেলেন, হোসেন আলী দুই চারটি কথা কহিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট স্থান বাহির বাটীর দেউড়ীর দালানের সংলগ্ন একটি কক্ষে সেই স্থানে গমন করিলেন।

পাঠকগণকে এই স্থানে এই অবসরে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমি তন্ত্র মন্ত্রের বড়ই ভক্ত ছিলাম, ভূত নামান, তুড়মি খেলা, সাপ ধরা, ইত্যাদি কার্য আমি বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলাম। হিন্দুস্থান পঞ্জাব লাহোর অঞ্চলের বড় বড় গুণী। গুণী অর্থ এই স্থানে গুণজ্ঞান, তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক্, যাদু টোনা ইত্যাদিতে জ্ঞানী পণ্ডিত। সেই সকল গুণীর সঙ্গে আমাদের দেশে ও বাড়ীতে কুষ্টিয়ায় কলিকাতায় নানাস্থানে তুড়মি খেলা করিয়া পরস্পর ক্ষমতার বুঝ সমুঝ করিয়াছি। অধিকাংশ স্থানেই আমাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। যাঁহারা ঐ সকল মন্ত্র তন্ত্রের বলে যাদু ইত্যাদির খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত, অজ্ঞ, বুদ্ধিশক্তির চালনা ক্ষমতা একেবারে নাই বলিলেও হয় তাঁহারা মনে মনে নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন, যে আমি একজন মহা গুণিন, যাদুমন্ত্রে মহাপণ্ডিত। কলিকাতা হইতে মক্তারপুর আসিলে পর একদিন দেখি যে একজন হিন্দুস্থানী সাপুড়ে যাহারা প্রায়ই গেরুয়া বসন পরে সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় গেরুয়া চাদরে এক হস্ত ঢাকিয়া এক পার্শ্বে গের দেয়, মাথায় ঐ রঙ্গ করা চাদর জড়ান পাগড়ী দিয়া থাকে একখানি বাঁশের লাঠির দুই দিকে গেরুয়া বসনে ঢাকা দুইটি বৃহৎ ঝাঁপী বা পেটারী, দুই কর্ণে বড় বড় জোড়া বালি, দুই হস্তে তামা লৌহা অন্য ধাতুর ৩।৪ গাছি করিয়া বালা, মুখে দীর্ঘ দাড়ী গোঁফ তুবড়ী বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে উপস্থিত। বাহির দালানের রকের উপর আমরা বসিয়াছিলাম তুবড়ী বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে সেইখানে উপস্থিত হইল। বাঁশীর রবে পাড়ার লোক দলে দলে আসিয়া সাপুড়েকে ঘিরিয়া লইল। সাপুড়েকে গ্রামের লোক এতই ভয় করে যে সাহস করিয়া তাহার নিকটে কেহ যায় না, কাছে ঘেঁষেনা। সকলের মনেই বিশ্বাস যে তন্ত্র মন্ত্রে যাদুবিদ্যায় ইহাদের খুব দখল। বাঙ্গলা দেশে ইহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। মন্ত্রের আকর কামাখ্যা-কামরূপের শিক্ষা উহাদের ধড়ে কি আছে কি না আছে!

তাহারাও আপন ভূষণ পরিচ্ছদ সাজগোজ ক্রমশঃই ভয়প্রদ ভীষণাকার ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে, দেখিলেই নিরীহ এবং দুর্বল চিত্তের লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের ত কথাই নাই। বাঁশীর স্বরে অনেকের মন আকৃষ্ট করে। তুবড়ীর বাঁশীর আওয়াজ সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। সাপুড়ে, বাঁশের পেটরা খুলিয়া এক একটি সাপ বাহির করিয়া খেলা আরম্ভ করিল। ক্রমেই বড়, ক্রমেই বড় সাপ বাহির করে, আর দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়া ভয়ে ভয়ে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে পিছনে সরিয়া যায়। পাড়ার হিন্দু-মুসলমান স্ত্রীলোকেরা পূর্ব দিকে একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সকলেই নির্বাকে দণ্ডায়মান।

বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা, আমরা যে দালানের বুকের উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম, তাহারই পশ্চাদ্দিকের বড় কামরায় জানালার নিকট দাঁড়াইয়া যাঁহার যেখানে সুবিধা তিনি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বসিয়া সাপের খেলা দেখিতেছিলেন। আঙ্গিনার মধ্যে খেলা হইতেছে। আঙ্গিনার সম্মুখে দালানের সিঁড়ি রক, তাহার পর কামরার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা আছেন, সেইখানে থাকিয়াই অনেকে ভয়ে বোধ হয় কাঁপিতেছেন। তাঁহাদের অনেক কথা আমার কানে আসিতেছে। কেহ গুণ জ্ঞানের কতই গুণগান করিতেছেন, কেহ মন্ত্র যে সত্য তাহা শাস্ত্রসঙ্গত বচনে প্রমাণ করিতেছেন, যে ব্যবহার করে অর্থাৎ যে প্রয়োগ করে, সে শাস্ত্রমতে মহাপাপী—এই সকল কথার আলোচনা করিতেছেন।

আমার মনের ভাব, মনের গতি অন্যরূপ; আমি যাদুবিদ্যা জানি, তাহা ভাবী প্রিয় সহধর্মিণী প্রণয়িনীর পিত্রালয়ে সকলকে দেখাইয়া মুগ্ধ করিব, নিজের গুণপণা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদের সহিত ভাবী ঘরণীকে নারী সমাজে বিশেষ ভাবে গৌরবিণী আদরিণী করিয়া তুলিব, [এই] আশয়ে ফজলে হক মিয়াঁকে ডাকিয়া গোপনে বলিলাম,—আপনি অনুমতি করেন তবে এই সাপুড়িয়াকে একটু শিক্ষা দিয়া দেই। তিনি শুনিয়া মহা আগ্রহে—মহা সন্তোষের সহিত বলিলেন, এখনই করুন। আমার মুখ হইতে কথা প্রকাশ মাত্র ফজলে হক সাহেব তখনই কথাটা যেন কাড়া-পেটা করিয়া চারদিক ছড়াইয়া দিলেন।

সকলেই আগ্রহসহকারে আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। গ্রামস্থ জনসাধারণ, এমন কি স্ত্রীলোকদলেও একটা হুলস্থূল ভাব পড়িয়া গেল। শেষে, দালানের মধ্যেও ঐ কথার আলোচনা হইতেছে—আমার কানে আসিল। কেহ বলিতেছে ওমা! ছেলে মানুষ সাপের মুখে যাইবে? না, না, তোমরা বারণ কর! কি জানি কি হয়! কার কথা আর কে শুনে? আমি নীচে নামিয়া গিয়া একটু

আড়ালে যাইয়া আমার কর্তব্যকার্য ভুকতাক মন্ত্রতন্ত্র হইতে মারণ উচ্চাটন প্রক্রিয়া হইতে রক্ষার—সর্পতেজ হীন করিবার গাছ-গাছড়া উপস্থিত মত যাহা চক্ষে পড়িল তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে যেরূপ গুপ্তভাবে রাখিতে হয় রাখিয়া সাপুড়ের নিকটে আসিতেই ভদ্র দর্শকগণ মধ্যে হইতে একজন সাপুড়িয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওহে খেলোয়াড়! এখন দেখা যাইবে। ঐ কথার পীঠপীঠই ফজলে হক মিঁয়া উর্দু ভাষায় বলিলেন, দেখা যাঁবে। সাপুড়িয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেই, আমার কোনরূপ সঙ্কেতেই সে বুঝিল যে আমি একজন খেলোয়াড়। একটি প্রক্রিয়া বলুন—আর সঙ্কেতই বলুন, এমন একটি ভাব ঐ যাদুবিদ্যা মধ্যে আছে যে, সে ব্যক্তি বহুদূরদেশীয় ভিন্নদেশী, অজানা অচেনা হইলেও সে বুঝিবে যে ইনি আমাদের অন্তরের গুপ্তভেদ সকলি জ্ঞাত আছেন। আমিও তাহা সঙ্কেতে বুঝিতে পারিব যে, সে আমার সহিত খেলা করিতে নারাজ নহে। আমি সাপুড়িয়ার দুই হস্ত ব্যবধানে দাঁড়াইতেই সে বলিতে লাগিল—তাহার জাতীয় ভাষায় সর্বসাধারণকে বলিতে লাগিল যে ইনি যাদুমন্ত্রে খুব পাকা খেলোয়াড়, বুঝতে পারছি, কিন্তু বয়স কাঁচা, আমার সম্মুখে টিঁকিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ আছে। ছেলে মানুষ! আমার এই কাজে দাড়ী চুল পাকিয়া গিয়াছে—এক ফুঁতকারে উড়িয়া যাইবেন ইত্যাদি। কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ নাও করিলেন। কেহ ফজলে হক মিঁয়াকে ডাকিয়া—আমাকে সাপুড়িয়ার সঙ্গে খেলা করিতে নিষেধ করিতে পরামর্শ দিলেন। কেহ বলিলেন যে, অহে! আমার দেশের ছেলে নয় ন'দের লোক, কোমরে বল না থাকলে খাড়া হয় নাই, বিদ্যায় বল না থাকিলে মুখ শুকাইয়া যাইত। আমি চারদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সকলের চক্ষুই আমার দিকে। বিশেষ দালানের মধ্যের দরজায় জানালার ঝিলিমিলি, ছোট ছোট দরজার কপাট সমুদায় খুলিয়া গিয়াছে। মুখ আর চোখ ভিন্ন তাহাতে কাঠের নাম নিসান কিছুই দেখা যাইতেছে না। প্রথম রহস্য দেখার জন্য আড়নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি হাসিতে হাসিতে খেলোয়াড়ের ভাষাতে বলিলাম—খেল, তোমার সাপ লইয়া খেলা কর। বাবুদের খেলা দেখাও। একটি সাপ পট উঠাইয়া হেলিতে দুলিতেছিল, আমি হাতে তিনটি তুড়ি দিয়া মাটিতে চপেটাঘাত করিতেই সাপ তাহার স্বভাববশে রাগিয়া গর্জিতে লাগিল—এবং যে স্থানে আমি চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, সেই স্থানে ফোঁস ফোঁস করিয়া সজোরে দংশন করিল, কতকটা লালা সেইখানে পড়িয়া গেল। মাথা উঠাইয়া পুনঃ ফণা ধরিয়া বাঁশীর রব কান পাতিয়া শুনিতেই আমি বাম হস্তে তাহার লেজে এক মোড়া দিতেই

আবার গর্জিয়া আমার দিকে আসিতেই আমি একটা কৌশল করিলাম, যে অমনি মাথা নওয়াইয়া ফিরিয়া খেলোয়াড়ের ঝোলার মধ্যে গেল। দর্শকগণ দেখিয়া অবাক, সাপুড়িয়া যেন রাগিয়া রাগিয়া বলিতে লাগিল—আচ্ছা আচ্ছা! মালুম কিয়া, দেখো, দেখো, রোখো! আপ কেয়সা যাদুগার হেঁ। এই বলিয়া প্রবীণ এক গখ্‌র সাপ বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিতেই সে আর মাথা খাড়া করিল না। ঐ ঝোলার দিকে চলিল। পুনরায় খেলোয়াড় একেবারে দুইটা আলাদ্‌ সাপ বাহির করিয়া সজোরে মাটিতে ফেলিয়া দিতেই উভয় সাপ গর্জন করিয়া উঠিতেই মাথা নওয়াইয়া তাড়াতাড়ি খেলোয়াড়ীর কাপড়ের মধ্যে লুকাইল, দর্শকগণ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। খেলোয়াড়ী যেন ক্রোধে আগুন হইয়া চারদিক ঘুরিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল, এবং বার বার আমার দিকে চাহিতে লাগিল। আমি পূর্বেই যাদুর দ্বারা মাসকলাই এক মুট সংগ্রহ করিয়া হাতের মধ্যে রাখিয়াছিলাম। খেলোয়াড় তুবড়ি বাজাইতেছে, আর চক্র দিয়া ঘুরিতেছে; তিন চক্র আমার সম্মুখ দিয়া যাইয়া চতুর্থ বার ঘুরিয়া আসিতেই মন্ত্রপূত করিয়া একটি মাসকলাই তুবড়ির উপর নিক্ষেপ করিয়াছি। বাঁশী বন্ধ হইয়া গেল, আর বাজে না। কত কারকিত, কত চেষ্টা, কতবার উলট পালট করিয়া ফুঁ দিল কিছুতেই আর বাজে না। শেষে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জানুর তল দিয়া মাথার উপর আনিয়া তিন চার পাক ঘুরা-ফেরা করিতেই বন্ধ ছুটিয়া গেল। পুনরায় বাজাইয়া সম্মুখে আসিতেই এমন কৌশল করিলাম, যে তুবড়িও বন্ধ হইল আর বাজে না, শেষে হাতে ধরিয়া নল দুটি মুখের মধ্যে লইতেও পারে না।

খেলোয়াড় বলিতেছে (তাহার ভাষাতে) এত অল্পবয়সে এমন তেজের বাণ তুমি অভ্যাস করিলে কি প্রকারে?

ঝোলার মধ্য হইতে একখানি হাড় বাহির করিয়া তুবড়িতে ছোঁয়াইতেই তুবড়ি খালাস হইল। তাহার পর নানাপ্রকার খেলা হইল। শেষে আমি একটা লৌহ শলাকা যাহাকে টেকো বলে, চরখায় সুতাকাটা টেকো আনাইয়া তাহার উপর একটা সুপারি রাখিয়া দিলাম, বলা হইল এই সুপারি মুখে উঠাইয়া লও। যেই মুখে উঠাইতে গিয়াছে, টেকোটা গণ্ড ভেদ করিয়া অর্ধেক পরিমাণে বাহির হইয়া পড়িল। দর্শকগণ ভাবিল আমার মত ওস্তাদ খেলোয়াড় বাঙ্গলা মুলুকে নাই—যাক আর পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাহি না। অর্থ আর স্বার্থই জগতের সার পদার্থ। সেই যে আমার নাম ডাক পড়িয়া গেল যে আমি একজন ভয়ানক যাদুকর। আমি মন্ত্রবলে মানুষকে প্রাণে মরিতে পারি, পাগল করিতে পারি,

হাসাইতে পারি, কাঁদাইতে পারি, ভূত প্রেত সকলি আমার বাধ্য, অনুগত, আমা আজ্ঞাবহ, এই একটি ধারণা সর্বসাধারণের মনে বসিয়া গিয়াছিল।

যে পর্যন্ত কথা রাখিয়া দিয়াছি তাহার পর হইতে বলি। শেষে শুনিলাম বড় বিবির পীড়া আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক অধিক পরিমাণে বেশী হইয়াছে অধিকন্তু জ্বর, পেটের বেদনা—বাঁচাই মুস্কিল। রাত্রে ফজলে হক সাহেব আসিয়া ঐ সকল কথা কহিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন ভাই, তোমাকে আর কি বলিব, আজ তিনদিন তিনরাত মধ্যে আমার অবসর নাই, চক্ষে ঘুম নাই।

ক্ষণকাল এমনি ভাল হয় যে রোগ ব্যাধি যেন কিছুই নাই। যেন ভাল সময়ের মত ভাব, বুদ্ধি জ্ঞান বেশ, কথাবার্তায় কোন ভুলভ্রান্তি নাই। আবার যে সেই-জ্বর। ওটা কিছু নয়, কমজোরিতেও হইতে পারে। পেটের বেদনা, ন খেতে খেতে হয়েছে বেশ বোঝা যায়। আসল ব্যারাম যে কি তাহা কেউ ধরতে পারে না। ঘোর উন্মাদ, এখন ত বিছানায় পড়েছে, ধরে না তুললে আর বলে উঠে বসবার শক্তি নাই। ডাক্তার কবিরাজ দেখান হইল, তাহারা বলে যে আমরা অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, রোগ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কি রোগ ঈশ্বর জানেন! উপরিভাব অর্থাৎ ভূত প্রেত জেন পরী শাকচুন্নীর কু-দৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পানিসারাতে এক ভূতের রোজা আছে, তাকে আনানো হয়েছিল সে কতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ করে, ধূপধুনা দিয়া মরার মাথা, চাঁড়ালের হাড় পূজা করে ভূত আনলে। আমরাও ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে বসে থেকে ঘরের মধ্যের প্রথম লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপির পর গালাগালি, ভয় দেখান, 'তুই অসময় আমায় ডাকলি কেন? তোর ঘাড়টা ছিঁড়ে ফেলবো, ঘাড়টা মট্ করে ভেঙ্গে দেব'।—রোজা শক্ত ছেলে। ছেঁড়া ভাঙ্গা কিছুই হল না। উপদেবতা শান্ত হয়ে বোধ হয় পিঁড়ির উপর বসলেন। পিঁড়িখানার উপর একটা কাঠ ফাঁড়ার মত শব্দ হল মাত্র। শেষে অনেক কথার পর উপদেবতা বললেন, 'ও রোগ আর সারবে না। সারবার উপায় নাই'। এই কথা বলে উপদেবতা চলে গেলেন। ঘরখানা মড়্‌মড়্ করে উঠলো। শেষে রোজা ঘর হতে বাহিরে এসে চুপে চুপে বললে, আমার দ্বারা হলো না। ওকে আটকাতে পাললেম্ না। আমার ওস্তাদকে আসতে হচ্ছে। সেখানেই আসবার কথা ছিল। অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে আরম্ভ হলো। কথা ঠিক করে এসেছি। তারা কাল আসবে, মায়ের ইচ্ছা যে তারা আসুক আর না আসুক, তিনি বলেন যে, উপরিভাব, ভূত প্রেত ছাড়ান

ওস্তাদ আমার ঘরে থাকতে পরের আশ্রয় নিতে হলো, পরের খোসামদ করতে হলো। আমার কপাল, অদৃষ্টের লিখা। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা যে আপনি একবার দেখতেন উপরিভাব কিনা?

আমি একটু চিন্তা করে বললেম, "তা তিনি একথা বলতে পারেন, এখন বলা বৃথা। তা যাই হউক, তাঁর হুকুম মত আমি দেখবো। আমি দেখবো. ওস্তাদ রোজা এসে গেলে পর আমি দেখবো।"

"সে আসুক আর নাই আসুক আপনাকে দেখিতে হইবে।"

"আচ্ছা আমি দেখবো। একটি কথা, হোসেন আলীকে সেই সময় উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

"তবেই তো বড় গোলের কথা। সে হোসেন আলীর নাম শুনতে পারে না, দেখা ত দূরের কথা। যেই হোসেন আলী নাম তার কানে গেল, কি আশ্চর্য কাণ্ড তখনি যেন তার রাগ ক্রোধ বেশী হয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বার বার মূর্ছা যায়।"

"আচ্ছা এক কাম করবেন। হোসেন আলী নাম কেউ মুখে না বললেও হোসেন আলী চুপ করে ঘরের এক কোণে গোপন ভাবে থাকবেন। তিনি আমাদিগকে যেন দেখিতে পান। তাঁকে হঠাৎ আমরা কেউ নাই দেখলেম, এমনই ভাবে তাঁকে ঘরের মধ্যে রাখবেন।"

"আচ্ছা তাই হবে। ভাল, আর বিলম্ব করবেন না—চলুন।"

"এখনই যেতে হবে?"

"এখনই"।

আমি তখনই প্রস্তুত হইলাম। আজ আবার বাটীর মধ্যে চলিলাম। ঈশ্বর ভরসা। বাটীর মধ্যে যাইয়া একেবারে রোগীর কামরার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দেখি সেখানে ফজলে হক সাহেবের স্ত্রী আছেন, আর দুটি স্ত্রীলোক পীড়িত শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। পীড়িত লোকের শয্যা ও ঘরের মধ্যে যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক তাহার কিছুই নাই। প্রথম হইতেই বলি—বিছানা বালিশ নিতান্ত অপরিষ্কার, সমুদায় ঘরে আবর্জনা ছড়ান। ওখানে আগুনের ছাই, ওখানে পোড়া কাষ্ঠ খণ্ড কয়লা মুখে করিয়া পড়িয়া আছে। জল খাবার গ্লাস, অন্ন অন্ন খাদ্যের জন্য থালা, বাটি যাহা ঘরে আসিয়াছে তাহাও স্থানে স্থানে কোনটা সোজাভাবে কোনটা গড়ান ভাবে উলটপালট ভাবে পড়িয়া আছে। জলের কলসী হইতে জল ঢালিয়া লইয়াছে, কি কাহাকেও দিয়াছে, কলসীর সম্মুখে

কতক স্থান জলে ডুবিয়া আছে। দুই তিনটা পাটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকটুভাবে কোনটার অর্ধ জড়ান ভাগ দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছে। কোনটা গড়াইয়া পড়িয়া মেঝেতেই পড়িয়া আছে। কোনটা সোজা পড়িয়াই আছে। কত জনার পদাঘাত পদপেষণ অঙ্গুলির আঘাত সহ্য করিতেছে। বোধ হয় কোন স্ত্রীলোকের তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে। আগুনের তাওয়া এখন ছাই ভরা। তাওয়ার নিকট জল পোরা নারকলী হুঁকা গড়াইয়া পড়িয়া মনের আক্ষেপে দুর্গন্ধময় জল ছাড়িয়া ছড়াইয়া আক্ষেপেই জলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। হুঁকার মাথার কল্‌কেটি ছুটিয়া দুহাত তফাতে পড়িয়া রহিয়াছে। হুঁকার গুল, কল্‌কের ঢালা ছাই ৪।৫ জায়গায়, বেশ ছাঁচে-ঢালা হইয়া কলিকার মধ্যস্থানের আদর্শ দেখাইতেছে। রোগী নয়, অন্য কেহ ঐ ঘরে বসিয়া আহার করিয়াছে। তাহার উচ্ছিষ্ট এঁটো ভাত ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। মাছের কাঁটা, চিংড়ির ঠেঙ্গ, বেগুনের ডাঁটা, অর্ধপেষিত লঙ্কার খোসা দুই-একটি বীজসহ ঐ ভাতের মধ্যে পড়িয়া লাল, লোহিত, পীত, হরিৎ রঙ্গের বাহার মারিতেছে। মাছের কাঁটা, চিংড়ির ঠেঙ্গ, লতা ডাটার আদর্শ দেখাইয়া গৃহ শয্যায় ছড়ান অন্নের সামিল হইয়া রহিয়াছে। রোগীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে। তেলের বাটিটি শিয়রের দিকে রাখিয়া গিয়াছিল। চলাফেরা করিতে পায়ের ধাক্কা লাগিয়া তেলের বাটি অর্ধ চক্রাকারে, তৈল আছে [কিনা] দেখা যাইতেছে না। কিন্তু দুই জালার নিম্নে মেঝের সংলগ্ন স্থানের কিঞ্চিৎ দূরে দুইটি মুরগী দুইটি তাওয়ায় বসিয়া আপন আপন আণ্ডায় তা দিতেছে। ঐ কোণেই ভাঙ্গা ইঁট, গুঁড়া সুরকির এক গাদা রহিয়াছে। আমি দ্বারে দাঁড়াইয়াই ফজলে হক মিয়াঁকে বলিলাম, "আমার কথা মত যদি কাম করিতে পারেন তবে আমি এর মধ্যে যাই। তাহা না পারিলে আর আমাকে এই বিষয় অনুরোধ করিবেন না।"

"আপনি যাহা বলেন তাহাই শুনিব ও করিব।"

আমি তাঁহাকে সমুদায় দেখাইয়া দিলে তিনি বুঝিলেন যথার্থই অন্যায় হইয়াছে। "চলুন আমরা ঐ ঘরে গিয়া বসি। এদিকে ঘর পরিষ্কার হইতে থাকুক।" "তাহাতে দোষ নাই কিন্তু রোগীর তাহাতে বড়ই অসুবিধা হইবে দেখিলেই বুঝিতেই পারিবেন। জিনিসপত্র সরান, তোলাপাড়া, ইহাতে বড়ই অসুবিধা হইবে। আমি বলি উহাকেই কোন প্রকারে অন্য ঘরে লইয়া যা যাউক, এ ঘর পরিষ্কার হউক। পরিষ্কারের পর আমি একবার দেখিব, তাহার পর তাঁহাকে আনিবেন।"

আমার কথাই শুনিলেন। এই কামরার পশ্চিম পাশেই সেই বড় কামরা, যে কামরায় আমি প্রথম দিন বসিয়াছিলাম। দুইখানা বৃহৎ বৃহৎ দর্পণ ছিল। সেই বড় কামরার অবস্থাও ঐ দশা—আবর্জনা ছড়ান। কি করা যায়—আর দুইজন স্ত্রীলোক আসিয়া রোগীকে যত্নের সহিত জাগাইয়া কোলে করিয়া বসিল। একটু স্থির হইয়া আস্তে আস্তে পাশের কামরায় লইতে হইবে। আমরা দাঁড়াইয়া আছি, রোগীকে স্ত্রীলোকেরা অতি মোলায়েম, এবং নরমের সহিত ডাকিয়া স্নেহের ভাবে জাগাইতে চেষ্টা করিতেই তিনি বলিলেন, "কেন আর বিরক্ত কর ?"

"এ ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।"

"কার জন্যে ?"

"তোমার জন্যে।"

"আমার জন্য ঘর পরিষ্কার—। হায়! হায়!"

"মীর সাহেব তোমার অষুধ করছেন, তাঁরই কথামত ঘর পরিষ্কার হচ্ছে। নোংরার মধ্যে পড়িয়া আছেন, তিনি ঐ দাঁড়িয়ে আছেন। নিজে ঘর পরিষ্কার করাবেন, সেইজন্য একটু সময় অন্য ঘরে আপনি থাকিবেন। শুয়ে থাকুন, বসে থাকুন কোন আপত্তি নাই, এ অতি ময়লা ঘর এ ঘরে—মীর সাহেব আপনাকে থাকিতে দিতে চান না।"

"যাও ভাই! তোমরা আমাকে বিরক্ত কোরো না। মীর! কোন মীর! আমাকে কোথায়ও থাকিতে দিতে চান না!

"কোন্ মীর কোথা থাকিতে দিতে চান না? কাকে? দাঁত-পড়া চুল-পাকা টোপ-খাওয়া গাল? মীর—যাঁহার রাজরাণী জেলেনী আর এক কপাল-পোড়া হতভাগিনী ঘরণী আছেন, সে গরীবের মেয়ে ওগো! তারই কোলে ছেলে। যে মীরের মাও আছেন আলাপাতা খান। সেই মিঠে কড়া জেলেনী সতিনী! (সজোরে উঠিয়া বসিয়া) আমার সতিনী? ছি ছি, ঘৃণা ঘৃণা! সেই দুপোরে, আমি কিছু খাবনা, তবু জোর করে কালো আলকাতরা-মাখা খানিক কি যেন জোর করে আমার মুখের মধ্যে দিয়া মুখ চাপিয়ে ধরে ছিল। প্রাণ যায়! নিশ্বাস ফেলিতে পারি না! কি করি! ওগো আমার প্রাণ যায় কি করি! দায় ঠেকিয়া গিলিলাম। গন্ধ—এমন দুর্গন্ধ যে আর বলতে পারি না। আমাকে অষুধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ছেলে কোলে করে সেই মীরের আসল বিবি চুপি চুপি আসিয়া বলে গেল, আপনি কল্লেন কি? চামচিকা আর কাকলাস পোড়ান, হাড় বাছা লবণ তেল মাখান চাটনী—আর তোমার বাঁচোয়া নাই।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বাঁচোয়া নাই বলছো, কি হবে ?

"তোমার মরণ হবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে তুমি মরে যাবে। আমি বলিলাম মরিয়া যাইব এইত কথা। ভাল কথা। আমার মরণে ভয় নাই। আমাকে প্রাণে মারতেই ঔষধ খাওয়াইয়াছে। ভাল করিয়াছে। আমি যা করতেম আমার মনে মনে যা ছিল সে তাই করেছে। সে আমার প্রাণের বৈরী নহে। সে আমার প্রিয় ভগিনী ! তারই উপপতি যে মীর, সেই মীর ? যে মীর কোন বিচার ধার ধারে না। আগে পাছে বিবেচনা করে না। পরের মনের ভাব বুঝিতে পারে না। আপন পেট পুরিলেই সুখী হয়, আপন সুখই যাহার চক্ষে পড়ে। হায় ! হায় ! যে মীরের বাড়ীতে আমার মা আমাকে এক প্রকার ধরে বেঁধে জোরজবরানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই মীর ?"

—"না না, সে মীর নহে। যে মীরের এ দেশে কেউ নাই। মানুষ ত দূরের কথা আপন বলতে একটা পশু, গরু, ঘোড়া দূরের কথা একটি কুকুর যাহার এদেশে নাই, সেই মীর। তোমার অবস্থা দেখে, তিনি দুঃখিত হয়ে তোমাকে আরাম করার জন্য চেষ্টা করছেন, সেই মীর বলেছেন। তাঁরই কথায় এ ঘর পরিষ্কার করে তবে তোমাকে আবার এইখানে আন্‌বো। ওঠো, আমাকে ধরে ওঠো। খাড়া হও।"

"খাড়া হচ্ছি। একটু স্থির হইয়া গত কথা মনে করিয়া লই। আচ্ছা বলতো, তিনি এখনও এই বাড়ীতে আছেন ? আমার ত বিশ্বাস হয় না !"

"হাঁ তিনি এখানেই আছেন।"

"না না, তিনি থাকিতে পারেন না। এ পাপপুরীতে তিনি থাকিতে পারিবেন না। এ নরক নিবাস তাঁহার থাকিবার স্থান নয়। আমি জানি তাঁহার পায়ের ধূলি ঝাড়িয়া দিয়া চলে গিয়াছেন।"

"না না যান নাই। তিনি তোমার ব্যারাম আরাম করার জন্য কত কি করছেন।"

"পাগলের কথা।—তিনি আমার ব্যারাম আরাম করবেন কেন ? তিনি কি আ—" বলিয়াই ভ্রাতৃবধূর ক্রোড়ে মূর্ছা। সকলে কান্দিয়া উঠিতেই আমরা ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখি নিশ্বাস বহিতেছে, কিন্তু অজ্ঞান। মজলে হক মিয়াঁ বলিলেন, এ মূর্ছা বেশীক্ষণ থাকিবে না। কয়েক দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি মাথায় গোলাপ জল, ঠাণ্ডা জল, দিলেই মূর্ছা ছুটিয়া যাইবে। আমি তাড়াতাড়ি মাথার চাঁদিতে মুখ দিয়া জোরে ফুঁৎকার দিতে লাগিলাম। অপর অপর স্ত্রীলোকেরা

হাত পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। গোলাপ জল ছিটকাইয়া দিতেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। আমি পিছনের দিকে থাকিয়া মাথায় গোলাপ জল বসাইয়া দিতেছি। আবার কথা বলিতেই তাঁহার ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "আর কথা বলিবেন না। চলুন বড় কামরায় যাই, এ ঘর পরিষ্কার হোক।"

"যাচ্ছি। ভাবি কি? ভগ্নী! ভাবি কি? কথাটা ভাবতে ভাবতে আর কিছুই বোধ হইল না। ভাবছি কি? এ বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমার এই ঘরের বিছানা, আবর্জনা ময়লা কাহারও চক্ষে প'লনা। দুর্গন্ধে আমার ব্যারাম আরও বেশী হচ্ছে, সে কথাটা কই কাহার মাথায় আসিল না?" হঠাৎ মাথার উপর হাত দিয়া আমার দক্ষিণ হাতের কফনি ধরিয়া—"এ কে? আমার মাথায় গোলাপ দিচ্ছে?"

সকলেই নীরব, আমার নাম কেহ বলে কিনা? বলিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, তাই সকলে ভাবিতেছে।

হাত ধরিয়াই বলিলেন, "কে তুমি? এমন সুন্দর ভাবে মাথায় গোলাপ জল বসাইয়া দিতেছ? প্রতিবার হস্ত চালনায় আমার যেন বল বেশী হইতেছে, আমার বোধ হইতেছে, কলেজার কম্পন, ক্রমেই যেন দূর হইতেছে। ভগ্নি! যিনি আমার ব্যারাম আরাম করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তিনি কৈ? এখন তাঁহাকে দেখিতে আমার কোন বাধা নাই। দুইদিন পরেই বুঝিবে।"

'বুঝিব, এখন উঠুন।'

"উঠিতে ইচ্ছা করি। ঘরের দুর্গন্ধে এক মুহূর্তও থাকিতে ইচ্ছা করছে না। তবে—"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রার ভাব। হাত ধরাই আছে। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া তেজের সহিত—"মনে হয়েছে। সে ঘ্রাণ এখন কোথা হইতে আসিল? আমার বালিশের ঘ্রাণ" মাথা ফিরাইয়া চাহিয়া আমার চক্ষে-চক্ষে দৃষ্টি পড়িতেই সজোরে উঠিয়া—ধরা হাত ধরিয়া সজোরে উঠিয়া—"হাঁ! তুমি? তুমি মানুষ না দেবতা, তোমার মনে এত দয়া! আমার জন্য এত পরিশ্রম তোমার? হাঁ আমি খুব বুঝিয়াছি তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তুমি নরাকার পশু নও। আমি সরল মনে বলিতেছি, তুমি সত্যই মানুষ। আমায় ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছ, উঃ! ভুল বলিলাম, মার্জনা করিয়া জোরজবরানে তোমার অনিচ্ছায় আমার ভগ্নীর সহিত তোমার বিবাহ দিয়াছে। এখন আমি তোমার ভগ্নী! তুমি আমার ভাই! দয়া করে যদি আমাকে যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইতে পার—পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পার, ঈশ্বর কৃপায় নীরোগ করিতে পার, তোমারই নাম থাকিবে।

আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি"। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া "ধর্মতঃ—বলিতেছি এখন তুমি আমার প্রাণের ভাই, আমি তোমার ভগ্নী। এই যে তোমার বুকে মাথা রাখিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে, কোন অসুখ নাই। আমি জানি তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে না। হিংসাও করিবে না। আমার হিত ভিন্ন অহিতের কথা মনেও আনিবে না। ধর, আমাকে ধরিয়া লইয়া চল। (ভ্রাতৃজায়ার প্রতি) ভগ্নি ! তুমিও ধর।"

সকলে একত্র হইয়া পাশের বড় কামরায় গমন। শয্যা পাতাই ছিল। যেই শয়ন অমনি নিদ্রা। কয়েক রাত চক্ষে ঘুম নাই। নিদ্রা দেখিয়া চুপে চুপে সকলেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। মাত্র একটি পরিচারিকা আর তাহার ধাত্রীমাতা নিকটে রহিল। আমি নিজে সেই অপরিষ্কার কামরার মধ্যে আসিয়া পরিষ্কার সম্বন্ধে বলিয়া একেবারে জল দ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার করিতে বলিলাম, ঘরটা শুষ্ক হইলে প্রথম ধূপ ধুনা পরে লোবান জ্বালাইয়া সুগন্ধময় করিবে উপদেশ দিলাম। সেই দিনেই বড় ওস্তাদ সহ ভূতড়ে ফকীর আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগকে আদর যত্ন করিয়া রাখা হইল। সন্ধ্যার পরেই ফুল পাতিয়া ভূত আনিতে হইবে সাব্যস্ত হইল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগীর সন্ধান লইতেছিলাম, অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলেই ক্ষুধার কথা বলিয়াছে, ঠাণ্ডা জিনিস, ভাল ফল এই সকল খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাই আহার করিয়াছে এখন বেশ ভাল ভাবে কথা কহিতেছে। আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই নিজ বলে উঠিয়া বসিল। ধাত্রীমাতা নিকটে বসিয়া আছে আমি যাইয়া সম্মুখে বসিলাম, "এখন কেমন আছেন ?" জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "কোনরূপ অসুখ বোধ হইতেছে না। বুকের মধ্যে যে বেদনা বোধ হইত তাহা কমে নাই,—"

আমি চিকিৎসা করি,—আহার ঔষধ-ব্যবস্থা সমুদায়, আমার আদেশের উপর নির্ভর। পাগলামী ভাবটা আছে, কি সারিয়া গিয়াছে পরীক্ষা করা আবশ্যক মনে করিয়া বলিলাম, মাথার চুলগুলি অমন উষ্কখুষ্ক ভাবে রহিয়াছে, মাথায় তেল দিন, বাজে তেল দিবেন না আমার পড়া তেল দিবেন।

যে মুখে কখনও হাসি দেখি নাই একটু হাসির আভা দেখাইয়া বলিলেন, তুমি পড়িয়া দিয়াছ ? কি বলিয়া পড়িয়াছ ! কাহার নামে পড়িয়াছ ?

আমি নিরুত্তর, পরিচারিকা তেলের বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া সরিয়া গেল, আমি অতি নম্রভাবে মান্যের সহিত বলিলাম, এই তেল মাথায় মাখুন ! চাঁদির উপরে বসাইয়া দিন।

বুঝিলাম পড়া তেল চাঁদির উপর বসাইলেই রোগ দূর হইবে, দেহ মন শীতল হইবে। এ মাথা আর ঘুরিবে না। পাগলও আর হইবে না। তাতো বুঝলেম, মাথায় কে? মাথায় তেল দিয়ে দেয় কে? যার মাথা, সে দিতে পারে না শক্তি নাই। যার ওষুধ তাহারই কর্তব্য, এখানে আর কেউ নাই, থাকিলেও তার মত কেউ পারবে না। —"সকালে তুমি আমায় অজানিতে মাথায় কি দিচ্ছিলে মনে নাই। বড়ই আরাম বোধ হচ্ছিল, দেখ, তুমিই দিয়ে দেও।"

আমি তখনি তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে বসিয়া মাথায় তেল দিতে আরম্ভ করিলাম, তেল দিয়ে মাথায় চাঁদিতে তেল বসাইয়া চুলগুলি আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিলাম। শেষে দেখি যে তিনি ঘুমাইয়া গিয়াছেন। বিছানায় শোয়াইয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইতেই, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—"দেখ—তোমার নিকট আমার বলিবার কোন কথা নাই। আশীর্বাদ করিও, তোমার মুখখানি মনে করিতে করিতে যেন আমার মৃত্যু হয়। হাতখানা বুকের উপর রাখিয়া দেখ দেখি, আমি কি আর বাঁচিব? প্রাণ বাহির হইবার সময় যেন একবার দেখিতে পাই, আমার অন্তিম সময় না দেখিয়া এখান হইতে যাইও না। তুমিও কি এদের সঙ্গে পাগল হইয়াছ? ভূত প্রেতে আমার ব্যারাম ভাল করিবে? না, তুমি ভাল করিতে পার? আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়া গিয়াছে, এখন আমার মান সম্ভ্রম লজ্জা কিছু নাই। আমার কথায় আশ্চর্যবোধ করো না। আমার জীবন যৌবন প্রাণ সকলি তোমাকে দিয়া বসিয়াছি, আর কোন ভাবনা আমার নাই। সময়ে আরও কয়েকটি কথা বলিব। শুনেছি ভূতড়ে কবিরাজ এসেছে, সন্ধ্যার পর ভূত আনিবে, সে সময় তুমি সেখানে থেকো আমার অনুরোধ। সকলেই থাকিবে। মনের একটা সাধ ছিল, সরে এস, কানে কানে বলি, মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিব।" তিনি বলিলেন—"এখন প্রকাশ্যে তুমি আমার ভগ্নীপতি, অন্তরে অন্তরে তুমিই আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী, এই শেষ—জীবনে এই আশা পূর্ণ হইল। তোমার পবিত্র মুখের উপর পবিত্র ভাবে মুখ রাখিয়া আমার চিরসাধ পূর্ণ হইল।"

আমি ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। নির্ধারিত ঘরে লইয়া যাইতে বলিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর ফুলপাতা ভূত আনা। পীড়ার কারণ, আরোগ্যের উপায় আবিষ্কার। পর্দা দ্বারা বারান্দার কতক স্থান ঘেরা হইয়াছে।

তাহারই মধ্যে ভূতের আসন পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় রোজা নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া ধূপধুনা, জবাফুল, আল চাল, কাঁচা কলা, পাকাকলা, নারিকেল, ডাব, ইত্যাদি নানাবিধ ভোগের সামগ্রী একখানা কাঠের পাত্রে করিয়া

সাজাইয়া রাখিয়াছে। একটা মরা মানুষের মাথা, চণ্ডালের বাম পাঞ্জরের হাড়—জারজ সন্তানের বাম বাহুর অস্থি, নানারূপ সাজ-সরঞ্জাম রাখিয়া, ছোট রোজা সহ পর্দার মধ্যে যাইয়া কি কি প্রক্রিয়া করিল তাহা তাহারাই জানে। দর্শকগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। বাটীর মধ্যের আঙ্গিনা দর্শকগণে ভরিয়া গিয়াছে, গ্রামস্থ মান্যমান, ভদ্রলোক হিন্দু মুসলমান অনেকেই উপস্থিত। বলাবাহুল্য হোসেন আলী ও ফজলে হক উভয় উপস্থিত। গ্রাম্য মুন্সী মৌলবী ও দুই চারিজন উপস্থিত। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এবং অন্য অন্য বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ ভূতের কথা শুনিতে আসিয়া ঘর পুরিয়া বসিয়া আছেন। এক ঘন্টা পর বড় রোজা, আর ছোট রোজা পর্দার বাহিরে আসিয়া, পর্দার দ্বারদেশে জানু পাতিয়া বসিলেন। এবং বড় রোজা বলিতে লাগিলেন, যে অনেকে ভূতের কথাই বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে রোজারাই নাকি-স্বরে কথা কহে। সঙ্গী চেলারা গোপনে ভূত সাজিয়া লোককে ভয় দেখায়, আপন মতলব মত কথা কহে। আপনারা দেখুন। পরীক্ষা করুন। আমরা দুটি প্রাণী মাত্র আছি। আপনাদেরই দেয়াল-ঘেরা বাড়ী অপর লোকজন আসিবার সম্ভাবনা নাই। আরও বলিতেছে, প্রদীপ আপনাদের মধ্যেও জ্বলিতেছে, আসনের নিকটেও চার প্রদীপ একত্র জ্বলিতেছে। এই পর্দা উঠাইলাম দেখুন। কিন্তু আসনের নিকটে যাইতে পারিবেন না। যিনি যেখানে বসিয়া আছেন, সেই স্থান হইতেই দেখুন। যাঁহার নিতান্তই সন্দেহ হয় আমরা যেখানে বসিয়া আছি, ইহার এক হাত পরিমাণ স্থানে দূরে থাকিয়া ভাল করিয়া দেখুন। এই পর্দা-ঘেরা স্থানের মধ্যে কিছু আছে কি না, সন্দেহজনক কোন জিনিসপত্র আছে কি না? আমরা কিছুই সঙ্গে আনি নাই। আপনারা পূজার উপকরণের যে যে জিনিসপত্র দিয়াছেন তাহা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য নাই। মানুষ ত দূরের কথা। এই বলিয়া পর্দার দ্বার সরাইয়া দিল—পূজার জিনিসপত্র ছাড়া কিছুই নাই। কিন্তু অনেকেই ঐ সকল পূজার সামগ্রী সাজান কেতা, ধূপধুনার ধুম, ধুনার গুঁড়ার পুটলী এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে কয়লার আগুনে অল্প অল্প পরিমাণ ধুনার গুঁড়া পড়িতেছে। আর আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাহা দেখিয়া অনেক সরলচিত্তের লোক, অনেক কুসংস্কারপূর্ণ অন্তঃকরণে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। বড় রোজা পর্দা ফেলিয়া দিয়া এবার পর্দার দ্বার সম্মুখ করিয়া বসিলেন—ছোট রোজা আমাদিগের দিকে মুখ রাখিয়া যে ভাবে বসিয়াছিলেন, সেইভাবেই রহিলেন।

একটা কথা এইখানে পাঠকগণকে বলিয়া রাখি। বড় ছোট দুই রোজাই মক্তারপুরের লোকের এবং ঐ গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামবাসী লোকের মুখে কথায় কথায়, কথায় কথায় কি—তাহাও শুনুন। যাদুমন্ত্র তুকতাক ভূতড়ে রোজা তুড়মি খেলোয়াড়দিগের কর্তব্য কার্য—ইহাদের শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ এই যে, যে স্থানে ঐ সকল বিদ্যার প্রাদুর্ভাব দেখাইতে যায়—আগে হইতেই সে স্থানের সন্ধান লয়। কোন্ ব্যক্তি কিরূপ, কোন্ ব্যক্তির স্বভাব কিরূপ, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভাব, যতদূর সাধ্য তাহা লোকের মুখে গ্রামবাসী পাড়া-প্রতিবাসীর মুখে "কথায় কথায়" সংগ্রহ করিয়া রাখে। জগতে যে ব্যক্তি যত সন্ধান রাখে, সে তত চতুর—একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার্য। রোজাদ্বয় মক্তারপুর নাজির সাহেবের বাটী আইসার পূর্বে সমুদায় তত্ত্ব সন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিবার সময়ে বর্ণনাকারী, কি ব্যক্ত-করা ব্যক্তি বুঝিতে না পারে যে বিশেষ কোন কার্য উদ্ধারের জন্য এই সকল কথা সংগ্রহ করিতেছে—সে বিষয় বিশেষ সাবধান হইয়াই সতর্কভাবে কথা সংগ্রহ করিতে থাকে। তাহাতেই "কথায় কথায়" শুনিয়াছে যে, ঐ বাড়ীর ছোট জামাই, মীর সাহেব ভারি চতুর, যাদুমন্ত্রে—ভূতপ্রেতের বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, ভারি যাদুকর। এই সকল কথা শুনিয়া আসিয়াই গুপ্তভাবে আমার সহিত নির্জনে দেখা করিয়াছে। তাহাদের সঙ্কেতেই বুঝিয়াছি যে তাহারা একজন পরিপক্ক ও দক্ষ খেলোয়াড়। আমার সহিত ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে সংমিলন হওয়ায় আমাদের বিদ্যার নিয়মানুসারে—বিধি-অনুসারে আমি তাহাদের যাহা, তাহারাও আমার তাহা—প্রকাশ্যে লোকে যাহাই দেখুক, আর যাহাই বুঝুক।

বড় রোজা পর্দার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভূতের বন্দনাসূচক একটি মন্ত্র মুখস্থ উচ্চকণ্ঠে আওড়াইয়া প্রায় ১৫ মিনিট 'মাথা হেঁট' করিয়া থাকিতেই বাহির দালানের ছাদের উপর হইতে কথা আসিল। —আজ আবার কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ?

তখন রোজা মাথা উঠাইয়া বলিলেন, বাবা! বিপদে না ঠেকিলে কি আপনাকে স্মরণ করি।

এই কথার পরই বাটীর মধ্যের আঙ্গিনায় উর্ধ্বস্থান শূন্য হইতে উত্তর হইল—বল্ তোর কি বিপদ, কি আবশ্যক!

রোজা। বাবা! ছাদ হইতে নামিয়া যখন আঙ্গিনায় আসিলে তখন আমার সম্মুখের এই আসনে নির্ভর করিলে আমার প্রতি লোকের বিশ্বাস হয়। তোমার গৌরবের সহিত আমার আদরও বাড়ে।

—আমি ওখানে যাইব না। যাইতে পারিব না। যাইতে আমার সাধ্য নাই। তুই বাবু আসন পাতিয়া দিলে কি হইবে?

—বাবা সে কি কথা। আজ ৫০ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যাহা শুনি নাই সেই কথা। তুমি আসিতে পার না, এমন জায়গা ত আমি দেখি না।

—এত কথায় তোর কাজ কি রে বাপু। তোর কথা কি তাই বল্।

রোজা বলিল—বাবা! কি জন্য এখানে আসবে না, বল?

উত্তর—আমি তাহা বলবো না। কেন নিজে খাটো হবো আর একটি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিব কেন? তোর কি কথা শীঘ্র বল্ আমি যাই। আমাকে এখনি সিলেটে যাইতে হইবে। সেখানে হইতে আবার গোরকপুর যাইব। সেখানে আমার জন্য লোকে অপেক্ষা করিতেছে।

"আচ্ছা বাবা! আপনি আসনে না এলে আমার মনে বড়ই দুঃখ হবে"।

"তুই বাপু বুঝিস্ না, চিনিস না, সে কথা শুনিস না?; তোদের ঐ বারান্দায় মহামন্ত্রজানা লোক আছে, তাকে যদি তফাৎ করতে পারিস তবে আমি আসনে গিয়া বসিতে পারি। তা ত তোরা পারবি না, আমি আসনে বসিব না।"

"বাবা! তার নামটি বলুন দেখি, তাকে এখান হতে তফাৎ করতে পারি কি না?"

"তোর মত আমি পাগল কি না? তার নাম বলে আমি মারা যাই আর কি? আমার কি আর বিপদ আপদ নাই। আপদ বিপদ তোদের আছে আমাদেরও আছে। আর জানিস্, মনে রাখিস্ গুপ্ত কথা প্রকাশ করতে নাই। বল্ তোর কথা কি?"

দর্শকগণ সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন! লোকজন কেহ নাই দালানের ছাদের উপর হইতে কথা, শূন্য আঙ্গিনা হইতে কথা অথবা ভূতেরা যে প্রকার নাকি সুরে খাঁদা স্বরে সচরাচর কথা কয় লোকের বিশ্বাস, এ তাহাও নহে। খাঁটি গলার আওয়াজ! স্পষ্ট কথা।

বড় রোজা বলিল, "বাবাজী! আকার ইঙ্গিতে তার নামটা বলিলেও আমরা সাবধান সতর্ক হতেম।"

"না—না তা হবে না আমি চল্লুম।"

রোজা—"না বাবু দোহাই তোমার আমার কথার উত্তর দেও।"

"বল শীঘ্র বল।"

"এ বাড়ীতে যার রোগ হয়েছে তার কি রোগ? আর সে বাঁচিবে কি না?"

—"দূর বেটা, হতভাগা মানুষ বুঝি জগতে বাঁচতে এসেছে? সে মরবে তুই মরবি না? তার এ রোগ আরাম হবে না, আর জানিস্ বিষের ঔষধ বিষ, যাতে রোগ হয়েছে, তাতেই সারা ভিন্ন আর কিছুতেই আরাম হয় না, হতে পারে না। তার উপরে আবার সতীনের ভালবাসা। খেতে চায় না, জবরদস্তী করে মুখে ঠেলে গুঁজে চেপে ধরে খাওয়াইয়াছে। একে মনের ব্যারাম, শক্ত ব্যারাম ওগো কঠিন আঘাত অর্থাৎ তাতেই সারা, তার উপরে সতীন। রোজা কবিরাজের চৌদ্দ পুরুষ আসিলেও মনের অন্তরের ঘা আরাম করতে পারিবে না, আরাম হইবে না,—হবে না, ফিরে জন্মে যদি মিলন হয় তবে—আর কেন? বৃথা—"

হোসেন আলী ফজলে হককে বলিলেন,—আপনারা একজন হাতের মধ্যে কিছু রেখে, মুটবন্ধ করে সকলের সম্মুখে গিয়া বলুন, তুমি ত সকল কথাই বলিলে, —বল ত, আমার হাতে কি আছে? এখনি বুঝতে পারব ও সকল কথা সত্য কি মিথ্যা। ফজলে হক বলিল, ধরুন আপনিই ধরুন।

—না না, আমি পারিব না। কি জানি কোনরূপ আপদ বিপদে পড়ি, ওর কথা শুনে আমার ভয় হয়েছে, আমি পারিব না। আমাদের সকলের চাইতে এর সাহস বেশী (আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ইনি ধরুন।

আমি অস্বীকার করিলাম।

হোসেন আলী বলিলেন—কেবল যাদুমন্ত্রই জান, সাপের খেলা জান, ভূতের কাছে জড়সড়।

আমি বলিলাম—দেখতে হবে ক্ষমতা বেশী কার? তার পর অন্য কথা? একি জোর বোঝাবুঝি? আচ্ছা আপনারা নাই ছাড়েন আমিই ধরি। এই দেখুন আমার হাতে কিছুই নাই। আমি খালি হাতই ধরিব।

আমি উঠিয়া গিয়া রোজার পাশে একটু দূরে বসিতেই ভূত বলিল—

"ওরে আমি যাই। সময় হয়েছে, আর বাপু! তুই রাতকানা, তোর পাশে বসে আছে কে চিনিস?"

"চিনি না"।

ভূত বলিল,—চিনি নে! আক্কেল থাকতে বুঝে নে। বাপের বেটা, আচ্ছা বুকের পাটা, খুব সহগুণ! সামলে গেছে। ধরে থাকলেই ধরা পড়ে।

আমি বলিলাম, ঠাকুর! আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি প্রবীণ প্রাচীন, আমি নিতান্ত অজ্ঞ—আপনার সম্মুখে বালক। আমি আপনাকে জানি—চিনি, কোন কোন লোকের অনুরোধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

ভূতে বলিল—বাবাজী, তোমায় এরা চিনে নাই। চিনিলে এমন হত না। তুমি আপন দেশ ছেড়ে এখানে জাত মজাতে এসেছিলে কেন? তোমার ধড়ে কি আছে, তোমার ক্ষমতা কি এরা তা কেউ জানে না।

যে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে, ভালবাসার মাথায় কুড়ল মেরে একটি, তার উপরে আর একটি, তাতেও সখ মিটে নাই, তার উপরে প্রণয় ভালবাসা নয়, পশুবৃত্তি নিবারণ জন্যে ঘুষ দিয়ে কি কাণ্ডটা করেছে! একজনার প্রাণ গেল, একজন প্রায় পাগল হয়েছিল, সাম্‌লে উঠলো—তার কি লাভ হবে! যাক্ ও কথা। তোমার কথা, কি বাবাজী বল। পাগলের কথায় পাগ্‌লামী করো না।

আমি বলিলাম—আপনি আমাকে যাই বলুন, আমার মনে কোন খট্‌কা নাই। একজনার মনে সন্দেহ হলেই দশ জনার হতে পারে। আপনি অনুগ্রহ করে এই সভার মধ্যে সকলের সম্মুখে বলুন আমার হাতের মধ্যে কি আছে?

ভূত হা-হা—করিয়া হাসিয়া বলিল, যারা বলেছে, তাদের কপালে যা আছে তোমার হাতেও তাই আছে।

আমি বলিলাম—আপনি খুলে বলুন।

—"আরে বাবা! আর কি বলবো তার কপালেও কিছু নাই, তোমার হাতেও কিছু নাই।"

হোসেন আলীর মুখ শুকাইয়া গেল। ভয় আরও বেশী হইল। আমি একটি টাকা পকেট হইতে লইয়া গোপনে, সকলকে দেখাইয়া আবার বলিলাম, আপনি এইবারে বলুন,—আমরা যাই।

ভূত বলিল, বাবাজি কি বলব! যার জন্য এ জগতের লোক পাগল আমিও কোন সময় ছিলাম। এই কেলেঙ্কারী, খুনমারি যাতে ঘটেছে, তাই—আর কি বলবো রূপচাঁদ—টাকা। আমি চল্লেম তোমাদের আসনের দীপ নির্বাণ হল।

কথা বলা, দীপও দপ্‌ করিয়া নিবিয়া যাওয়া, ভূতেরও প্রস্থান—আমি ছাড়া সকলেই হতজ্ঞান। ভূতের কথায় সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া দুঃখিত হইয়াছেন। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সকলেই আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। আমিও বাহিরে আসিলাম। ফজলে হক মিঁয়া সহ হোসেন আলী বাহিরে আসিয়া বসিলেন। যথাস্থানে সকলেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্র প্রভাত। প্রভাতেই উভয় রোজা বিদায় হইয়া গেল। বিদায় সময় ফজলে হক মিঁয়াকে

ডাকিয়া হাত মুখ নাড়িয়া অনেক কথা বলিয়া গেল। তিনি কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, দেখা গেল মুখখানি ম্লান—নিতান্তই দুঃখিত। হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া বসিয়া আছি। বাড়ীর মধ্যে যেন হুলুস্থুল ব্যাপার, কান্নার আওয়াজ গোলযোগের সহিত কান্না। একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিতে লাগিল—হায় হায়! আজ আবার এ কি হইল? রাত্রে বিছানায় পড়ে এতই ঘুমাইয়াছে জাগে নাই, উঠে নাই। সকালবেলা দিব্বি উঠে বসেছে রাত্রের ভূতের কথা তাহার মায়ের মুখে আর আর সকলের মুখে, শুনিতেছে। ঘুমিয়েছিল বলে ভূত কি বলিয়াছে তাহা শুনিতে পায় নাই, সকালবেলাই উঠিয়া, রাত্রের সকল কথা একমনে শুনিতেছে। নুরুর মাতা, ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রী বলিল "ভূত একেবারে মনের কথা বলে ফেলেছে"।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?"

—"বলেছে কোন ব্যারাম নাই। যে ব্যারাম, সে ব্যারামের ঔষধ নাই। তোমরা নিজেই করেছ নিজেই ভোগ।"

তিনি বলিলেন "কে কি কল্লে—আমি ত কিছুই বুঝলেম না"।

নুরুর মাতা কানে কানে কি কথা বলিল। তাহা শুনেই চুপ করিয়া থাকিয়াই একটু পরেই দেখা গেল চক্ষে জল—আর কথা নাই। বসিয়াছিল পড়িয়া গেল। দাঁতে-দাঁতে খিল। সকলে কান্দাকাটি—বড় দুলা মিঁয়াকে ডাকিতে আসিয়াছি। হোসেন আলী উঠিতে পড়িতে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। ঘোর গোল কান্দাকাটি বৃদ্ধি, ক্রমেই বৃদ্ধি। ক্ষণকাল একেবারে নিস্তব্ধ। আবার সেই দাসীটা আসিয়া আমাকে বলিল, শীঘ্র আসুন শীঘ্র আসুন। আপনার শাশুড়ী আপনাকে ডাকিতেছেন। আমি পরিচারিকা সঙ্গে বাটীর মধ্যে যাইয়া দেখি রোগীর সেই পরিষ্কার করা কামরায় লোকে পরিপূর্ণ। লতিফন বিবি তাঁহার মাতার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছেন। কখন জ্ঞান, কখন অজ্ঞান, সকলের চক্ষুই জলপূর্ণ। কোন স্ত্রীলোক আর পর্দার আড়ালে নাই। সকলেই প্রকাশ্য ভাবে দাঁড়াইয়া। ফজলে হক মিঁয়া শয্যার এক পার্শ্বে। হোসেন আলী বারান্দায় দ্বারের নিকটে খাড়া। তাহার চক্ষে জল। কোচার কাপড় দিয়া সময় সময় চক্ষু মুছিতেছে। আমি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

লতিফন বিবি মাঁতাকে বলিতেছেন—মা! আমার আর বেশী সময় নাই। আমি চলিলাম, মা! তোমাদের এত মিনতি করিলাম। আমার এ সময় অন্তিমকাল যাহাকে বলে—তোমরা অন্তিমকালের মানে কি বুঝিবে? যে বুঝিবার

সে বুঝিবে, এ সময় আমাকে একবার দেখাও, মা জন্মের মত চলিলাম—আমি চলিলাম, আমাকে একবার তার মুখখানি দেখাও। মরিবার সময় আরামের সহিত মরিতে পারিব।

মাতা শুনিয়া মাথায় ঘা মারিয়া মারিয়া বলিলেন, কৈ? তোমরা কেহই ছোট দুলা মিয়াঁকে ডাকিলে না?

লতিফনের চক্ষু উর্ধ্বে উঠিয়াছে। একজন বলিল তিনি অনেকক্ষণ আসিয়া ঐ যে দোরের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন।

দুই তিন জনে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার হাত ধরিয়া রোগীর শয্যার নিকট ফজলে হক মিয়াঁর নিকটে বসাইয়া দিল। আমি নীরবে বসিয়া এক ধ্যানে সেই জোড়া ভ্রূ আর সমুজ্জ্বল কপোল ও কপালের দিকে চক্ষুর দিকে চাহিয়া আছি, লতিফন বিবির মাতা বলিলেন—আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, তুমি বুদ্ধিমান, সকলি বুঝিতেছ, এখন আর আমার লজ্জাই কি, সরমই কি? তুমি আমার পেটে জন্ম নাই, তত্রাচ তুমি আমার সন্তান। পেটের সন্তান হইতে তোমাকে ভাল জানি, যাতে যা হয়েছে, তোমার অজানা কিছুই নাই, বাবা। তোমায় দেখে ভূত, প্রেত সেও ভয় করে। কাল রাত্রে শুনেছি, ভূতের মুখে শুনেছি। আমাদের বুদ্ধির দোষে যাহা হইবার হইয়াছে,—আর উল্টাইবে না। লতিফনের ব্যারাম আর সারিবে না। সেও বলিয়াছে, আমরাও বুঝিয়াছি, এই তার শেষ সময়। তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছে বাবা! তুমি মনে কোন কথা রাখিও না। গোপন করিও না। লতিফনকে বল। এখন আর তার সঙ্গে কাহার কি সম্বন্ধ? সে ত এখন পরলোকের যাত্রী তাহার এখন চলন্ত পথ। সে চির বিদায় পথে দাঁড়িয়েছে—এই যায়! এখন লজ্জা সরম কিছুই নাই। আমি এই সকলের সম্মুখে ধর্মতঃ বলিতেছি—তুমিও মনে প্রাণে ভালবাসিতে, সেও তোমাকে কিরূপ জানিত তার দশা দশজনই দেখিতেছে। এই যে ভালবাসা হইয়াছিল আমি জানি, বিশুদ্ধ মনের খাঁটী ভালবাসা, আমি ধর্মতঃ কহিতেছি, কোন মন্দ ভাব ছিল না, দুইজনেরই সম্পূর্ণ আশা ছিল বিবাহ হইবে, বিধির বিধানে তাহা হইল না। তা যাহা হউক তুমি যদি মনে কোনরূপ কষ্ট পাইয়া থাক তাহা এখন দূর করিয়া লতিফনকে দোয়া কর, পরকালে তাহার যেন মুক্তিলাভ হয়। তুমি মন পরিষ্কার করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ কর। বাবা! তুমি সৈয়াদজাদা সৈয়াদ,—তোমার একটা আহা! উহুঁ! দীর্ঘ নিশ্বাসে, আমাদের যাহা হইবার তাহা হইবে, লতিফনের কোন দোষ নাই, আমি আর আর কথা ভাঙ্গিয়া বলিব না—এই কথাই তুমি বুঝিও তাহার

কোন দোষ নাই। তুমি তাহার গোনার খাতা মাফ করিয়া দেও। সকলে মনে মনে বলিবে বিবাহ দিলে একজনার সঙ্গে, গোনা মাপ চাও আর এক জনার নিকটে, যাহারা জানে না তাহারা বলিতে পারে যাহারা জানে তাহারা বলিতে পারিবে না।

উপযুক্ত বয়সে পুরুষ-স্ত্রী দুইজন রাজী হইলেই বিবাহ হয়, সাক্ষী বাড়ী সমেত লোক, তবে আবার দিলে কেন? লোকের অনুরোধে। দায়ে ঠেকিয়া আর আমাদের মনের দুর্বলতা দুই বরের বয়সের তারতম্যে। যাক্ এখন আর সে কথার কোন ফল নাই।"

আমি নীরব, ফজলে হক মিঁয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া আমার হাত ধরিয়া বললেন—ভাই। তুমি আমাকে মাফ করিও—আমি কি জানি শেষ ফল এই হইবে?

লতিফন বিবি জিহ্বা বাহির করিয়া জলের সঙ্কেত করিতেই তখনি জলপাত্র পুরিয়া জল আনিল, তাহার মাতা গ্লাস হাতে করিয়া মা, মা! করিয়া জল খাওয়ার কথা বলিলে—লতিফন চক্ষু মেলিয়া জলের গ্লাসের দিকে তাকাইতেই আমার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল, চক্ষে চক্ষে যেই মিল হইয়াছে, অমনি বলিয়া উঠিল, কপালে আঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার পোড়া কপাল, তুমি আসিয়াছ? দেও জল দেও, আমার মুখে উঠাইয়া দেও, কোন লজ্জা নাই। আমি জগৎ ছাড়িয়াছি, কাহার ভয়? তুমি আমার মুখে জল দিবে কোন কথা নাই, কেউ কিছু বলিতে পারে না, কাহার সাধ্য নাই। আমি কোন মন্দ কাজ করি নাই। কোন পাপের কাজ করি নাই। ভয় করিব কেন? সরে এস, গ্লাস ধর—জল দেও। জীবন শেষে আজ তোমার হাতে জল খাইয়া বিদায় হই। আশা ছিল বহুকাল খাইব। আমার কপাল দোষে তাহা হইল না—আমি চলিলাম। তুমি আশীর্বাদ করিও। দেও জল মুখে দেও, আজ এই ঘর-পোরা মানুষের সম্মুখে, আত্মীয়স্বজন, ভ্রাতা মাতা, কত মুরব্বির সম্মুখে মনের কথা বলিয়া যাই। কথাগুলি দুনিয়ায় থাকিবে সেইজন্যই এতক্ষণ প্রাণ বাহির হয় নাই। যমদূত এই ঘরের মধ্যে কি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। কি ভয়! মিথ্যা কিছু নয়, সত্য—সকলই সত্য কিছু ভয় নাই। খাঁটী জিনিসে কোন ভয় নাই। এক সম্পর্কে তুমি আমার প্রকাশ্যে ভাই। ভাই-ভগ্নীর মুখে জল দিবে লজ্জা কি? কোন কারণে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছ? আমার প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মিয়াছে? আমি মনে মনে জানি তাহা তুমি করিবে না। তবু মানুষ—আচ্ছা—ভগ্নী ভাবিয়াই জল দেও। মা

ভাই আত্মীয়স্বজন সম্মুখে তোমার হাতেই আজ শেষ পিপাসা শান্তি করিব। দেও জল দেও, আমার পিপাসা শান্তি কর—"

গ্লাস লইয়া জল মুখে দিতেই বলিলেন, আমাকে উঠাও, আমি জল পান করি। গ্রীবা নিম্নে হাত দিয়া সজোরে উঠাইতেই বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়া আমার হস্তে জল পান করিয়া একটু স্থিরভাবে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, যতক্ষণ আমার শক্তি আছে, শ্বাস বহিবে তোমাকেই চক্ষে দেখিব কেবল তোমারই কথা বলিব। সংক্ষেপে বলিব, আপনারা সকলেই শুনুন—

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভগ্নী সকলের মুখেই শুনিলাম, তুমি আমার জন্য আমাকে বিবাহ করিতে এখানে আসিয়াছ। আমি বহু কষ্টে কৌশলে তোমাকে দেখিলাম, যেই দেখিয়াছি তুমি যে খুব সুশ্রী তা নহে। তোমাকে দেখেই আমার মনের ভাব সেই এক প্রকার হইল তাহা আমি প্রকাশ করিব না। তখনি যেন, তোমার এই রূপ ভালই হউক অপরের চক্ষে মন্দই হউক, আমার অন্তরে এবং চক্ষের উপরে আঁকিয়া গেল। কিছুতেই আর সরিল না। আমি মনে মনে ঈশ্বরে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম দয়াময়! এই আমার স্বামী। ভালবাসার কথা বলিব না, ভালবাসা যার-তার মুখে বলিলে অপরে বুঝিবে কি? আপন ভালবাসার কথা অপরে শুনিলেও যাহা, না শুনিলেও তাহা। তুমি আমাকে যত চিঠি লিখিয়াছ সমুদায় একত্র করিয়া কাপড়ে মুড়িয়া তাবিজ করিয়া ঠিক হৃদয়ের উপর এই বক্ষের উপর ঝুলাইয়া রাখিতাম। যে দিন আমার জীবনে শেষ অঙ্কের সূত্রপাত দিন, আমার আশার শেষ, সতীত্ব রক্ষার শেষ দিন, ভাবিলাম সেই দিন তোমার পত্রগুলি আমার বক্ষের উপর রাখিতে আর অধিকারিণী থাকিলাম না। কি জানি আমার অদৃষ্টে কি আছে? যমের হাতে পড়িতে হইবে, কি পশুর হাতে পড়িতে হইবে? কোন জঙ্গলে আমাকে টানা-হেঁছড়া করে নিয়ে যাবে, সে পবিত্র পত্র-কবচ আমি কখনই হৃদয়ে ধারণের অধিকারিণী থাকিব না ভাবিয়া অতি যত্নে ঐ হাত-বাক্সে রাখিয়া দিয়াছি। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে, তাহা আমার বিশ্বাস আছে। আমার লিখা পত্র তোমার নিকট ঐ প্রকার যত্নেই আছে আমি জানি। যদি তোমার ভাগ্যে কখনও ভালবাসা বুদ্ধিমতী স্ত্রী হয়, তোমার মনস্তুষ্টি করিতে পারে।

তোমাকে যদি চিনিতে পারে তবে তাহাকে আমার ঐ পত্রগুলি পড়িয়া শুনাইও। পত্রে তুমিও হাতে কলমে লিখিয়া স্বীকার হইয়াছ আমিও এই হাতে লিখিয়া স্বীকার হইয়াছি "তুমি আমার স্বামী"। তুমিও লিখিয়াছ "তুমি আমার

স্ত্রী"। ধর্মসূত্রে বাঁধাবাঁধি হইয়া দুই জনেই প্রস্তাব স্বীকার করিয়াছি, বাকি ছিল মোহরানা। সে কথা[র]ও মীমাংসা আছে। প্রকাশ্য বিবাহের দিন—তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই দেনমোহর অবধারণ করিও। বিবাহের দিনের পূর্বদিন আমি একটু কানাঘুষা শুনিয়াছিলাম, শুনিয়াই তোমার নিকট শেষ পত্র লিখিয়া বিদায় লইয়াছিলাম,—"জল দেও"। জলপান করাইলে বলিল, "মা! দোহাই তোমার ধর্মের! তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি দোহাই তোমার খোদা রসুলের, মিথ্যা বলিও না। মামু হেয়াস তুল্লা, দোহাই আপনার মাতাপিতার, আপনি সাক্ষী, ভাই উকীল মাতা আমার নিকট বসিয়া, হোসেন আলীর সহিত বিবাহ, আমি এজেন দিয়াছিলাম, মত প্রকাশ করিয়াছিলাম? আপনারা কি আমার উক্তি লইয়া উকীল হইয়াছিলেন?—বলুন যদি ধর্ম মানেন? খোদা রসুল মানেন? বলুন! —আমি যাহা বলিতেছি সত্য না মিথ্যা?" নীরব। সকলেই নীরব।

"আমি স্বীকার হই নাই। আপনারাই হাঁ হুঁ করিয়া চলিয়া গেলেন। শেষে শুনিলাম, সকল বিয়েই এইরূপই হয়। তারপর আমাকে ধরে বেঁধে পশুর হাতে সঁপে দিলেন। কার ধন কাকে দিলেন? কার ভালবাসা, কার হৃদয়ের মাণিক জবরানে কার হাতে দিলেন? ইহার ফল পাইবেন, এ অন্যায় বিচারের ফলভোগী হইবেন। আমি দেখিতে পারিব না, জগতের লোকে দেখিবে আমি গোল করিলাম না, কুলে কলঙ্ক হইবে লোকে নিন্দা করিবে! চুপ করিয়া রহিলাম। আত্মমন ঈশ্বরে সঁপিয়া তাঁহাকেই ডাকিলাম, হোসেন আলীর সহিত আমার বিবাহ! কি আক্ষেপ! কি আক্ষেপ! কি ঘৃণা! কি ঘৃণা! সে আমার স্বামী হইবে, আমি তাহার স্ত্রী হইব, এই ত আপনাদের আশা। হোসেন আলী গণ্ডমূর্খ,—স্বামী স্ত্রীর মর্ম কি বোঝে? বিবাহসম্বন্ধ স্বর্গীয় সম্বন্ধ—মহা পবিত্র সম্বন্ধ। জগৎসৃষ্টির পূর্বে—ঈশ্বরের আদেশে এই সম্বন্ধের সৃষ্টি। কোথায়? স্বর্গে—কে পাত্র কে পাত্রী? তাহা হোসেন আলী জানে? মূল কারণ কি? কি কারণে এ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল? সে সম্বন্ধে হোসেন আলী ত জানেই না। আপনারাও জানেন না—যে জানিবার সে জানে। হজরাত আদম বর। বিবি হাওয়া পাত্রী! বিবাহ পড়াইলো হজরাত জেব্রাইল। এত গেল ধর্মভাবের সম্বন্ধ। প্রণয় ভাবের অর্থ কি তাহা হোসেন আলী জানে? এ বিশুদ্ধ পবিত্র প্রণয়ের মধ্যে কি আছে, কেন স্বামীর জন্য স্ত্রী প্রাণ দেয়, কেন স্ত্রীর জন্য স্বামী প্রাণ হারায় তাহা সে গণ্ডমূর্খ জানে? এই ত আমি প্রাণ দিতেছি—কেন দিতেছি তাহা কি সে বোঝে—সে পশু—পশু-আচরণই বোঝে। সেই হইবে

আমার স্বামী, ধিক্ আমার জীবনে ? এই মুখে তাহাকে স্বামীন্, প্রাণের ভালবাসা স্বামীন্ বলিয়া সম্বোধন করিব ইহাই কি তাহার বিশ্বাস ছিল ? আমাকে সে স্ত্রী বলিয়া আমার উপর স্বামীত্ব করিতে কি তাহার সাধ্য হইত ? লতিফনকে স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন, ব্যবহার, কথা, কার্য করা দূরে থাকুক লতিফনের নিকটে আসিতে, কাছে বসিতে তাহার সাহস হইত ? আমাকে বাধ্য রাখিতে পারিত ? আমার উপরে কর্তৃত্ব করিতে কি তাহার ক্ষমতা জন্মিত ? আমি সিংহের সিংহিনী ! শৃগালের সাধ্য কি সিংহিনীর নিকটে আইসে ? আমার ঘরের হাতায় কিনারায় কোন মন্দ উদ্দেশ্যে আসিতে পারিত ? আসিলে যাহা করিতাম তাহা মনেই রহিল। আপনারা নিজ নিজ স্বার্থে আমার জীবনদীপ নির্বাণ করিলেন। (কান্দিতে কান্দিতে আমার হাত ধরিয়া) আমার ইহকাল পরকালের গতি ! প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন হৃদয়বল্লভ !—স্বামী প্রাণে ছুরি মারিয়া কলেজা পার করিলেন। আমি স্ত্রীলোক কোমলপ্রাণা ধারণাশক্তি, অতি কম। হৃদয়বল বঙ্গললনার নাই বলিলেই হয়। আমি পাগল হইলাম, জীবন হারাইলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার স্বামী বাঁচিয়া থাকিবেন, কিন্তু হৃদয়ের আঘাত বেদনা যন্ত্রণা আজীবন থাকিবে—ভোগ করিবেন"। মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা, আজীজন সহিত আমার স্বামীর বিবাহ দিয়া দিয়াছ ? যে বিবাহ দিয়া দিয়াছ— সে নামে বিবাহ, তাহা হইতে পারে না। সে বিবাহ হইতে পারে না। আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইতে পারে না। ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হারাম্ হারাম্—আমি মরিব। কিন্তু আমাকে দেখাইয়া (আমার ধরা হাত বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া) এই মনে কি করিয়া অন্তরের কাটা ঘায়ে লবণ মাখাইয়া দিয়াছ ? আজীজন কখনই সুখী হইবে না, হইতে পারে না। এমন প্রশস্ত অন্তর, এই দেবসদৃশ প্রশস্ত হৃদয়, আমার এই স্বামীর সুপ্রশস্ত মনের সীমার মধ্যে যাওয়া দূরে থাকুক আজীজন তাহার কিনারায় যাইতে পারিবে না।

আমার সময় হইয়া আসিল বেশী দেরি নাই। এখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। "জল দেও"—জল পান করিতে বুকে আটকিয়া যাইতেই সঙ্কেতে বাম হস্তের ইসারায় দেখাইতেই গলা হইতে বুক পর্যন্ত অতি ধীরে ধীরে মোলায়েমের সঙ্গে হাত ফিরাইতেই জলটা নামিয়া গেল।

পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"একটি কি দুটি কথা বলিতে পারিব তিনটি বলিতে বোধ হয় সময় পাইব না। এই ঘরে যাহারা আছে আল্লার দোহাই, সকলেই শুনুন। আমার স্বীকার-উক্তির প্রমাণ এজেন না লইয়া আমার না-রাজিতে

উকীল সাক্ষী চলিয়া গেলে, নিরাশ্রয়ার আশ্রয় যিনি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত মনে প্রাণে ডাকিলাম আশ্রয় চাহিলাম। "আমায় রক্ষা কর", কাতরে বলিলাম "দয়াময় এ দেহ মন হৃদয় কিছুই আমার নহে, সকলি আমার স্বামীর, তুমি রক্ষা কর। ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা কর। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তখনই পেটে বেদনা, চারদিকে অন্ধকার মাথা ঘুরিয়া মূর্ছা। হায়! সে অবস্থাতেও আমাকে তাহার বাটীতে না লইলে নয়।" আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"শুন মনোযোগ করিয়া শুন, অন্যমনস্ক হইতেছ আমার কাছে সরে এস, আমার বক্ষের উপর হাত চাপিয়া দিয়া থাক, কলেজা ছিঁড়িতেছে। তুমি হাতখানা দিয়া রাখিলে একটু আরাম বোধ হয়। এখন মরিব ঠিক কথা নহে, আমি আজ কয়েকদিন হইল মরিয়াছি! শুন ঐ ব্যারাম অবস্থাতেও ধরে বেঁধে লইয়া চলিল। যাইয়া দেখি সে ত মানুষের বাড়ী নয় নরককুণ্ড। কোথায় স্ত্রী আচার, হোসেন আলীর স্ত্রী কি, কি জানি না খেঙ্গরা হাতে করিয়া আমাকে ঝাঁটা পেটা করিতে উপস্থিত। শেষে শুনিলাম ইনিই প্রাণের ভালবাসা রাখিত রাক্ষী। ঝাঁটা বিবি যিনি তাহারই ঘরে আমরা উঠিলাম। এই সাংঘাতিক পীড়াই আমার সর্ব বিষয় মঙ্গলের কারণ। মা! আর পারি না—প্রাণের মায়া বিষম মায়া। তবে আমার সম্মুখে—আমার ইহকাল পরকালের গতি—স্বামী আমার, প্রাণের প্রাণ দেহ-মন সমুদায়ের অধিকারী স্বামী উপস্থিত। যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহা হইয়াছে। শেষ পত্রে লিখিয়াছিলাম তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমার দেহ আমার নাই। আজ তিন মাস হইল যাহার—তাহাকে দিয়াছি। আমার আর কিছুই নাই মা, সকলি তাহার।"

আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সকলই তোমার। আমার মরা লাশ অন্য কাহাকে দেখিতে দিও না। তুমি দেখিও, কারণ তুমি আমার ভাই! প্রাণের ভাই! দেহ ভিন্ন রহিয়াই গেল। মনে-মনে দুয়ে এক হইয়াছিলাম, দেহ এক হইল না। সে আশা পূর্ণ হইল না, না হউক, চাই না—আমার যাহাতে গৌরব তাহা হইয়াছে, তুমি আমার জন্য কাঁদিয়াছ, সেই আমার সুখ, স্ত্রী-ভাগ্যে সেই মহামূল্য সুখ! এস—এগুয়ে এস সময় হইয়াছে, যাহা সাধ ছিল তাহা পূর্ণ করি—তোমার জানুর উপর মাথা রাখিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাই এই শেষ কথা। আমার সতীত্ব রত্ন তোমারই গৌরবের ধন, তাহা রক্ষা করিয়া জনমের মত বিদায় হইলাম।

আমার সদ্‌গতির জন্য উপাসনা পাঠ করিও। স্বহস্তে একমুঠ মাটি আমাকে দিও। এই শেষ ডাক—স্বামী! প্রাণের স্বামী! আমি চলিলাম।"

লা এলাহা এল্লালাহা মোহাম্মদ রসুলাল্লা—পড়িতে পড়িতে চক্ষুতারা নীচে নামিল। কোন পথে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল—কেহই দেখিতে পাইল না। মুখ বিকৃত হইল না। মাত্র ঠোঁট দুখানি একটু তরতর করিয়া নড়িয়া উঠিল, সেও যেন মৃদু হাসির আভা—শেষ, সমুদায় যন্ত্রণার শেষ। মায়া মমতা ভালবাসা সকলি ফুরাইল।

ঘরের মধ্যে যত লোক ছিল তাহার মধ্য হইতে অনেকেই বলিয়া উঠিল আহা এই এত কথা, এত কথা সব ফুরাইল, কোন পথে চলিয়া গেল কেহই ত কিছু দেখিল না। অজ্ঞান হইল না, প্রলাপ বকিল না। চক্ষুতারা ফুটিয়া বাহির হইল না। বিকারে খিটিমিটি করিল না। আহা শেষ কথা—কি কথাই বলিয়া গেল!

পাঠক! আর মায়ের ক্রন্দন, আত্মীয় স্বজনের আক্ষেপ দুঃখ আর কি বলিব! হোসেন আলী কাহাকে না বলিয়া বাটী চলিয়া গেল। মৃত দেহের গোর-করণ সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি হইল না, লতিফন যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহা সকলই সম্পন্ন হইল।

শব্দসূচী

অয়রান—নির্জন, ১০১

আজায়েব—অদ্ভুত জীব বা বস্তু, ২০৯
আলবত—খাঁটি, নিশ্চিত, ২৪১
আসিয়াতনামা—লিখিত উইল বা দলিল, ৫৫

উভরিয়া—উপচে পড়া, ৭১

এজাহার—জিজ্ঞাসাবাদ, ৪২
এজেন—সম্মতি, ২৬৭
এবারত—লিখন, পদ্দরীতি, ৭৯
এয়ার আসনা—ঘনিষ্ঠ বন্ধু (এয়ার—বন্ধু, আসনা—বন্ধু), ২৬

ওছা<ওরস—উত্তরাধিকার, ১৪২
ওফা—বিশ্বস্ততা, ৮৮
ওয়াসিল—প্রাপ্ত, সংগৃহীত, ২১৩

কমর—কোমর, ৫
কবুলিয়ত—স্বীকৃতিপত্র, ৫৪
কাফন-দাফন—কবরস্থ করা (কাফন—শববস্ত্র, দাফন—মাটি দেওয়া), ৩১
কাবেল—যোগ্য, ২৫৭
কলমা—ইসলামধর্মের মন্ত্রবিশেষ, ৭২
কিস্তিবন্দী—চুক্তি, ১৯
কিরে (দেশজ)—প্রতিজ্ঞা, ২৯
কুপদহ—জলের গভীর খাদ, ৬০
কুরসীনামা—কুলপঞ্জী, বংশলতিকা, ৫
কেচ্ছা—কাহিনী, ৭৩

খতগীর—পত্রনবীশ, ২৬
খাদিমী—সেবা, ২৬
খানে অয়রান—(খানে<খানহ ফা—স্থান) পরিত্যাগ, ১০১
খানা খারাবি—ধ্বংস, ১০১
খুরি—মাটির পাত্র, খাদ্য, ১৮৯ ;
খেজালত—কষ্ট, ১৩৫
খোরাকী—ভরণপোষণ, ৩৫
খোলা—ধান মাড়াই-এর স্থান, ২৭

গরিরা—দুঃস্থ ব্যক্তি, ১৩৫
গোমর—মুখ ভার, ২৮
গোর—কবর, ৭

ঘরানা—বনেদী, ১৫

চকে—অঞ্চলে, ৫২
চাপকান—পরণের পোশাক, ৪

জবরাণ—জোরপূর্বক, বলপূর্বক, ৩২
জাকাত—মুসলমানদের ধর্মনির্দেশিত আয়কর বিশেষ, ৭১
জানাজা—শবের উদ্দেশ্যে শেষকৃত্য প্রার্থনা, ৩৩
জালেম—অত্যাচারী, ২৩
জাহেল—মূর্খ, বর্বর, ২৫
জিম্বা—দায়িত্ব, ১৮
জেলদ্—চামড়ায় বাঁধানো বই, ৯৩

তমিজ—ভব্যতা, শিষ্টতা, ১৩৭
তলবী—শমনকৃত, ২০
তল্লাস—অনুসন্ধান, ২৩
তাগাদগিরী—আগাম স্মরণ করান, ৯৭
তালেবেলেমি—বিদ্যাশিক্ষা (তালেব—ছাত্র, এলম—বিদ্যা), ১৫
তৌজি—কর-তালিকা, ৪৪

দরুদ—মঙ্গলসূচক প্রার্থনা, ৭২
দাখিলা—রশিদ, ২১৩

দাদ—প্রতিশোধ, ৯৩
দেনমোহর—মুসলমান বিবাহে স্বামী কর্তৃক দেয় যৌতুক, ২৫৪
দেলবাহলান—মেলামেশা, ১৩৭

ধড়—দেহ, ১৯

নজরানা—উপঢৌকন, ২১
নাউজ বিল্লাহ—আল্লাহর নিষেধ বা অভিশাপ প্রার্থনা, ৬৫
নাচার—বেচারা, বাধ্য হয়ে, ১২
নারাজ—অসম্মত, ২৩৯
নেমখুন—অকৃতজ্ঞ, ১০৯
নিকাহ—বিবাহ, পুনর্বিবাহ, ৪৭
নেগাহবান—পুণ্যবান, ৩১

পয়গম্বর—ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বা অবতার, ২৫৪
পয়জার—জুতা, চটি, ২১৫
পয়দাকরনেওয়ালা—জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা, ২২
পস্তানী—হাহুতাশ, ২৭
পাট্টা—ইজারা, দাখল, ৫৪
পাঁপরে < ফাঁপরে—বিপদে, ৩৭
পাল্লাদার—ঝালরযুক্ত, ১৫৮
পায়দল—পদব্রজ, ৪২

ফরাস—ফরাস, গদিযুক্ত বিছানা, ১৪

বয়দারী—বহনকারী, ২১৪
বয়েত বাহাস—কবিতায় তর্ক-বিতর্ক, ১২৩
বালাগত্তি—সাবালকত্ব, ৪২
বেদাত—ধর্মবিরুদ্ধ, ২৪৩
বেকেতা—বিকৃত, ১৯৩
বেশরা—শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ২৪৩
বিসানবোয়—দুর্গন্ধ, ১৯৩

মলঙ্গ—এক শ্রেণীর মুসলমান ফকির, ৪৬
মহবুবন—প্রেমভাব, ১৪২
মহরানা—যৌতুক, ২৫৪
মুজরা—বেতন, ভাতা, ১৪১
মুসাবেদা—প্রতিলিপি, নকল, ২৩
মেড়ুয়াবাদী—পশ্চিম দেশাগত হিন্দুস্থানী সম্প্রদায়বিশেষ, ১১০
মোহর দস্তখত—সিলযুক্ত স্বাক্ষর,

রেকাবী—থালা, ১২
রোখ—লক্ষ্য, দৃষ্টি, ৭৪
রোখে—দিকে, ৮
রোজা—উপবাস, ১১১

লাএলাহা ইল্লাহ মহামদার রসুলল্লাহ—আল্লাহ (ঈশ্বর) এক এবং রসুল (মহম্মদ) তাঁর প্রেরিত নবী, ৩১
লেফাফা—খাম, ২৪১
লোগাত—শব্দ, ভাষা, ১২২

শরীফ—পবিত্র, ৮১

সাধতা—ভ্রান্তি, ১২৫
সাহরগ—ঘাড়ের পার্শ্ববর্তী শিরা, ১০৯
সেরেস্তা—অফিস, ২০
সোহরত—প্রচার, ১১২

হকদার—দাবীদার, ভোগাধিকারী, ২৪
হুকুম তামিল—আদেশ পালন, ৩৯
হুকুমনামা—আদেশপত্র, ৪২